অমর - বাণী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা

অমর-বাণী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর চরণপ্রান্তে
ব্রহ্মচারী বিরজানন্দ কর্ত্তৃক
সংগৃহীত

ব্যাখ্যাতা
মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
এম, এ; ডী, লিট্, পদ্মবিভূষণ

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘ
ভদৈনী, বারাণসী

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘ
ভদৈনী, বারাণসী-১

প্রথম সংস্করণ ঃ দোল পূর্ণিমা, মার্চ, ১৯৬৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মহালয়া, সেপ্টেম্বর, ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ ঃ রাস পূর্ণিমা, নভেম্বর, ২০১৪

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

মুদ্রক ঃ
অনুপ প্রিন্টার্স
মৌলবী বাগ,
বারাণসী

Dedicated at the feet

of

Shree Shree Ma Anandamayee

in memory of a very staunch devotee

and renowned philanthropist

Lokumal Kishinchand Chellaram

by

Lokumal Kishanchand Charity Trust

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় পনের বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে পরমারাধ্যতমা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর জন্মোৎসবের সময় মায়ের বিভিন্ন ভক্তগণের নিকট বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে প্রদত্ত মায়ের উপদেশ সমূহ প্রকাশ করার এক প্রস্তাব হয়। এই প্রকার বহু উপদেশ ব্রহ্মচারী শ্রীবিরজানন্দজীর নিকট যত্নপূর্বক সংরক্ষিত ছিল। জিজ্ঞাসু ভক্তগণের বিভিন্ন প্রকার সংশয়ের সমাধানের নিমিত্ত নানা স্থানে ও সময়ে এই সব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

তত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসু ভক্তগণের শঙ্কা সমাধানের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমায়ের মুখারবিন্দ হইতে যে সকল গভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশবাণী নিঃসৃত হইয়াছে সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে এক প্রকার মহাবাক্যেরই অন্তর্গত। এই সকল উপদেশ বাক্য যথাসম্ভব মায়ের মুখোচ্চারিত ভাষাতেই নিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত বিবেচনা করিয়া মাতৃভক্ত ব্রহ্মচারী বিরজানন্দজী ১৯৪৫ সাল হইতে যখনই অবসর পাইতেন অন্যান্য কার্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া মা'র উপদিষ্ট বাণী সঙ্কলন করিতেন। তাঁহার এই প্রশংসনীয় উদ্যমের ফলে মায়ের কিছু কিছু বাণী সংগৃহীত হইয়াছে।

মা'র কথাগুলি অত্যন্ত সরল ও সহজ ভাষায় নিবদ্ধ হইলেও অনেকের পক্ষে উহা দুর্বোধ্য মনে হয়। কারণ বিষয়ের গভীরতা বশতঃ কখনও কখনও আলোচনার মর্ম সাধারণ বুদ্ধিমান লোকের পক্ষেও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইয়া পড়ে। মা চিন্তা করিয়া কোন প্রশ্নের উত্তর দেন না। প্রশ্ন কর্তার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই যে উত্তর মা'র মুখে আসিয়া যায় তাহাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়, কিন্তু চিন্তা করিয়া উত্তর না দিলেও দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহার কোন বাক্যই শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না, এমন কি মহাজনগণের অনুভবের বিরুদ্ধও হয় না। তবে সত্যের স্বরূপ

অখণ্ড ও অভিন্ন হইলেও উহার প্রকাশের অনন্ত ধারা আছে। শ্রোতার অধিকারগত যোগ্যতার তারতম্য, দেশ ও কালের বৈচিত্র্য ও অন্যান্য বহু কারণবশতঃ সকল শ্রোতার নিকট মা'র মুখ হইতে সব প্রকার উপদেশ নির্গত হয় না। মা স্বয়ং বিচার না করিলেও যেখানে যেরূপ প্রয়োজন হয় সেখানে ঠিক সেইরূপ বাণীই স্বভাবতঃ নির্গত হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে মা কোন প্রশ্নের সমাধান করেন না। কারণ মা'র কোন নিজের দৃষ্টিকোণ নাই। দৃষ্টি গণ্ডীবদ্ধ হইলেই দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য থাকে এবং ঐ বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে সকল প্রশ্নের বিচার ও মীমাংসা সম্ভবপর হয় না। শ্রোতার দৃষ্টিকোণই মায়ের দৃষ্টিকোণ বুঝিতে হইবে। বুদ্ধদেবের অথবা তাঁহার ন্যায় জগদ্‌গুরু স্থানীয় আচার্যগণের উপদেশ-প্রণালী সম্বন্ধে বোধিচিত্ত-বিবরণকার বলিয়াছেন—

'দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগা' ইত্যাদি।

অর্থাৎ যাঁহারা সত্যের অখণ্ডরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া জিজ্ঞাসু ভক্তের প্রয়োজন অনুসারে জ্ঞানের উপদেশ দান করেন তাঁহারা যাহাকে উপদেশ দিতে হইবে তাহার যোগ্যতা, চিত্তগত সংস্কার, রুচি ও অন্যান্য সামর্থ্য অনুসারেই উপদেশ দান করিয়া থাকেন, কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে করেন না। শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশবাণী সম্বন্ধেও এই সত্যটি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। একদিক্ হইতে বলা যায় যে তাঁহার নিজের পৃথক্ দৃষ্টিকোণ নাই বলিয়াই তিনি সকলকে আপন করিয়া নিজেকে তাহাদের সহিত অভিন্নরূপে দেখিতে পারেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে মা'র সকল কথা বুঝিতে পারা যায় না। এই অভিযোগ যে শুধু অশিক্ষিত পুরুষ বা মহিলা ভক্তের মুখ হইতে শোনা যায় এমন নহে, বহু শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিও প্রকারান্তরে এই কথা সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, মা যখন সাধারণ

ভাবে কথাবার্তা বলেন, তাহা অবশ্য বোধগম্য হয়, কিন্তু যখন কোন তত্ত্বের বিষয় বা কোন গভীর ভাব সম্বন্ধে বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা করেন তখন তাঁহার ভাষা একেবারেই দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। এতদ্‌ব্যতীত কখনো কখনো অতি সরল বিষয়েও তাঁহার উত্তর স্পষ্টভাবে সকলের বোধগম্য হয় না।

যাঁহারা এই প্রকার অভিযোগ করেন, তাঁহাদের অভিযোগ তাঁহাদের দৃষ্টিকোণ হইতে যে অমূলক তাহা আমি বলি না। তাঁহাদের অভিযোগের কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু এই অভিযোগ যে বস্তুতঃই অমূলক তাহা তখনই বুঝিতে পারা যাইবে, যখন অভিযোগকারিগণ নিজের নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ ত্যাগ করিয়া অখণ্ডসত্যের প্রকাশের দিক্‌টা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। আমার মনে হয় এই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ব্যাপার এত বেশী জটিল যে তাহা কাহারও আদেশ অনুসারে সকলের পক্ষে করা সম্ভবপর নহে; এবং নিজের আন্তর প্রেরণা হইতে করিবারও সামর্থ্য সকলের নাই। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি মনুষ্য নিজ নিজ পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতির অধীন। জন্মকালীন বাসনা, সংস্কার, রুচি, যোগ্যতা প্রভৃতি সহজাত ভাব লইয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি রচিত হয়। ইহাই তাহার বন্ধনের হেতু, ইহাই তাহার অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিলাভের অন্তরায়, ইহাই তাহার অবিরোধময় উদার দৃষ্টি ও বিশ্বপ্রেম লাভের পথে মুখ্য কণ্টকস্বরূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ বুদ্ধিক্ষেত্রে সাময়িক ভাবেও ব্যাপক দৃষ্টি আশ্রয় করা যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খণ্ডদৃষ্টি হইতে অব্যাহতিলাভের আশা দুরাশা মাত্র। দৃষ্টি উদার হইলে বা স্বচ্ছ হইলে তাহাতে সকল দৃশ্যই নিজের অবিকৃত স্বরূপ লইয়া প্রতিফলিত হয়। নিজের ব্যক্তিগত সংকোচ ও সংস্কার পরিত্যক্ত হইলে প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণটি নিজের দৃষ্টিকোণ রূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। তখন বিরোধ থাকে না, বিরোধের কারণ থাকিলেও দৃষ্টির উদারতালাভে বিরোধ কাটিয়া যায়। সাধারণ লোক যে

উদার দৃষ্টি সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহাতে দোষের কিছু নাই। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক অসাধারণ লোকও সংকুচিত দৃষ্টির অধীন হইয়া জীবনের পথে এবং ব্যবহার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশে দর্শন, তত্ত্ববিচার, জ্ঞানের আলোচনা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রতি মতের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক রূপে বড় বড় জ্ঞানী পুরুষেরও আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল মতবাদিগণ নিজের মত স্থাপন করার উদ্দেশ্যে প্রথমে পূর্বপক্ষ রূপে অন্যের মত খণ্ডন করিয়া থাকেন, কারণ পরমত খণ্ডন না করিলে নিজমত স্থাপন সুসাধ্য হয় না। মতের সঙ্গে মতান্তরের বিরোধ আছে বলিয়াই বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিতে হয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন দৃষ্টিকোণ থাকিতে পারে এবং কোন কোন উদার চিত্ত মহাজ্ঞানী পুরুষের তাহা দেখাও যায়, যাহা আশ্রয় করিলে পরস্পর বিরুদ্ধ মতের মধ্যেও অবিরুদ্ধ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবিরুদ্ধ অংশ সাধারণ ব্যাপক সত্যের অন্তর্গত—বিরুদ্ধাংশ খণ্ড সত্যের অন্তর্গত। সামান্যের অন্তর্ভুক্তরূপে যেমন বিশেষ আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি ব্যাপক সত্যের মধ্যেই খণ্ড সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যাপক সত্যের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকিলে, খণ্ড দৃষ্টির ভেদ মারাত্মক হয় না, কারণ ঐ স্থলে সমন্বয়ের আদর্শ জাজ্জ্বল্যমান ভাবে প্রকাশিত হয়।

এই বিষয়ে ভূমিকারূপে অধিক সমালোচনা না করিয়া আমরা মায়ের প্রসিদ্ধ উক্তিগুলি যথাসম্ভব সংযত ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব এবং বুঝিতে চেষ্টা করিব এই সকল উক্তির তাৎপর্য কি এবং মনুষ্য-জীবনে ঐ তাৎপর্য গ্রহণের সার্থকতা কোথায়। জগতের প্রতি ক্ষেত্রে বিরোধ, এবং একমাত্র বিরোধই উগ্রভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে শুধু বুদ্ধি ক্ষেত্রেই নহে, কর্মক্ষেত্রেও, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেও জীবনের

প্রতি ভূমিতে এই বিরোধ উগ্র রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহার পরিণাম দুঃখ, অশান্তি ও অবসাদ। কিন্তু অবিরোধময় সমন্বয় দৃষ্টি অনুশীলন করিতে পারিলে এই সকল বিরোধ অদৃশ্য না হইলেও হীনবীর্য হইয়া যায়। তাহাতে কাহারও ক্ষতি তো হয়ই না, বরং বৈচিত্র্যে পূর্ণসত্তার শোভা বর্ধন করে। কিন্তু কথা এই, সমন্বয় দৃষ্টি তখনই সম্ভবপর যখন ভেদের মূলে অভেদকে সাক্ষাৎকার করা যায়। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন, "অবিভক্তং বিভক্তেষু"—ইহাই সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ। বহুর মধ্যে এককে দেখা ইহার-ই নাম ভেদের মধ্যে অভেদ সাক্ষাৎকার। অভেদ সামান্যরূপ, ভেদ উহার একদেশ মাত্র—ইহা বিশেষ রূপ।

ব্যাপ্য ব্যাপকের অন্তর্গত, সুতরাং বিশেষ রূপের মধ্যে সামান্য রূপ অনুগত থাকে। যেমন একজন পাঞ্জাবীকে ভারতীয় বলা যায়। প্রাদেশিক দৃষ্টিতে পাঞ্জাবী এবং বাঙ্গালীতে ভেদ, এমন কি বিরোধ থাকিলেও ব্যাপক দৃষ্টিতে অর্থাৎ ভারতীয় দৃষ্টিতে কোন ভেদ নাই। কিন্তু বিচারে নিজেকে ভারতীয় মনে করা যত সহজ, কার্যতঃ ঐ ভাবে ব্যবহার করা তত সহজ নয়। তাই বিরোধ কাটিয়াও কাটে না। কিন্তু ইহা দৃষ্টান্ত মাত্র। ভারতীয়ের বিরোধ অভারতীয়ের সঙ্গে সম্ভবপর। সেখানেও এই নীতি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ অখণ্ড সত্তায় উপনীত হইতে পারিলে দেখা যায় সেখানে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা বিরাজ করিতেছে, কোন প্রতিযোগী সত্তা বিদ্যমান নাই। তাই কোন বিরোধেরও সম্ভাবনা নাই। সেই অনন্ত, অদ্বৈত, মহাপ্রকাশময় সত্তার ভিত্তিতে বিরোধ এবং অনন্ত বৈচিত্র্য স্ফুরিত হয়। সেই সত্তাতে দাঁড়াইতে পারিলে অর্থাৎ বোধক্ষেত্রে সেই অখণ্ড সত্তাকে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে প্রত্যেকটি খণ্ড সত্তার তাৎপর্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় এবং এক খণ্ড সত্তার সহিত অন্য খণ্ড সত্তার যে কোন বিরোধ নাই তাহা বাস্তবিক ধরিতে পারা যায়। বুদ্ধি এই

উদার ভাবে মার্জিত হইলে ব্যবহার ক্ষেত্রে বিরোধের ভাব কমিয়া আসে।

সব সত্য—

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে দার্শনিকগণের মধ্যেও 'সব সত্য' এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে কঠিন দার্শনিক আলোচনার অবতারণা না করিয়াও ইহা বলা চলে যে, মীমাংসকদের মধ্যে প্রভাকর এবং বৈষ্ণব বেদান্ত সাহিত্যে শ্রীরামানুজাচার্য কতকটা এই ভাবে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল জ্ঞানই যথার্থ ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য ছিল। অবশ্য ইহা খ্যাতিবাদ প্রসঙ্গে বিচারের একদেশ সম্পৃক্ত। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না। সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, "সর্বং সর্বাত্মকম্'—ইহা যোগভাষ্যকার ব্যাসদেবের কথা। ইহার তাৎপর্য এই যে সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুতেই সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু অভিন্ন রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। খুঁজিতে পারিলে এবং খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে যে কোন জিনিষের সন্ধান এবং আবিষ্কার সম্ভবপর। কারণ একটি কণার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব যখন প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে এবং পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রতিফলিত হইতেছে, তখন যে কোন স্থান হইতে যে কোন জিনিষের অভিব্যক্তি হইতে পারিবে না কেন? কারণ যাহা অব্যক্ত ভাবে আছে তাহা উপযুক্ত করণের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে। 'নাই', এমন কথা কোথায়ও বলা চলে না। এই জন্যই সৃষ্টিতে যে আধারে যে ভাবের আধিক্য দেখা যায় ব্যবহার ক্ষেত্রে ঐ ভাব অনুসারেই ঐ আধারকে পরিচিত করা হয় এবং ব্যবহার ভূমিতে ইহাই স্বাভাবিক। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছে, "প্রাধান্যেন ব্যপদেশঃ"। এক সের দুধের মধ্যে ১২ ছটাক দুধ এবং ৪ ছটাক জল থাকিলে, জল থাকা সত্ত্বেও ঐ এক সেরকে যেমন দুধই বলা হয়,—অথবা এক সেরের মধ্যে ১২ ছটাক জল ও ৪ ছটাক দুধ থাকিলে

দুধ থাকা সত্ত্বেও ঐ এক সেরকে যেমন জলই বলা হয়, ব্যবহার ক্ষেত্রে সর্বত্রই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ জলের মধ্যে দুধ প্রভৃতি সর্বত্রই আছে, মাত্রা কম বলিয়া তাহা অনুভূত হয় না। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি বস্তুতেই জগতে অনন্ত বস্তুর উপাদান রহিয়াছে। কিন্তু সেই সকলের মাত্রা এত ক্ষীণ যে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা 'নাই' একথা বলা চলে না। যাহারা জ্ঞানী এবং অন্তর্দর্শী তাঁহারা ঐ সূক্ষ্ম ক্ষীণ মাত্রাও দেখিতে পান এবং প্রয়োজন হইলে উহাকে পুষ্ট করিয়া বা প্রবল করিয়া অন্যকেও দেখাইতে পারেন। এই যে দৃষ্টিকোণ ইহা সকল প্রকার বিরোধের সমাধানের একমাত্র মার্গ।

মা বলেন, যে যাহা বলে সবই সত্য। কথাটা শুনিতে খুব হাল্কা বলিয়াই মনে হয়, কারণ আমরা সত্য-মিথ্যার পরস্পর বিরুদ্ধ গণ্ডি রচনা করিয়াছি যাহা অনুসরণ করিলে একটি যদি সত্য হয়, অপরটি অসত্য না হইয়া পারে না। কিন্তু যদি বুঝা যায় এই সত্য আপেক্ষিক, কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা সত্য, সুতরাং দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হইলে ঐ সত্য সত্যরূপে পরিগণিত হয় না, তখন সত্যের রূপ পরিবর্তিত হইয়া যায়। যাহাকে সত্য মনে করা হইয়াছিল, তখন আর তাহা সত্য থাকে না। কারণ দ্রষ্টার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তন কালগত ভাবেই হউক অথবা দেশগত ভাবেই হউক অথবা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেই হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ফলে বিরোধের উদয় অবশ্যম্ভাবী। যদি কেহ এই পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণের সহিত পরিচিত হয়, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যে সত্য তাহা অবশ্যই স্বীকার করিবে। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে তাহার পূর্বসিদ্ধান্ত আর সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে না। ইহার কারণ এই, এক খণ্ড দৃষ্টি হইতে অন্য খণ্ড দৃষ্টি অবলম্বন করা হইয়াছে। সুতরাং এই খণ্ড দৃষ্টি কাটিবে কি করিয়া? কিন্তু দৃষ্টি যদি খণ্ড

না হয়, অখণ্ড হয়, অপরিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে উভয় মতই সব প্রকার দৃষ্টিকোণ অনুসারে সত্য বলিয়া সে গ্রহণ করিতে পারিবে। পূর্বদৃষ্টি ও পরদৃষ্টি পরস্পরের বিরুদ্ধ হইলেও অখণ্ড দৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ যুক্ত। হস্তে এবং পদে বিরোধ থাকিলেও যেমন উভয়ই সমগ্র দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তাহাতে সন্দেহ নাই, তেমনি বিভিন্ন মতও পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অখণ্ড তৎ তৎ দৃষ্টিকোণ অনুসারে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। মা সাধারণতঃ তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে অখণ্ড দৃষ্টির দিক্ হইতেই তত্ত্ব আলোচনা করেন ও উপদেশ দিয়া থাকেন। তাই পরস্পর বিরুদ্ধ সত্য তাঁহার নিকট সমভাবে সমাদর লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি ইহাও জানেন যে কোন মত সত্য হইলেও পূর্ণ সত্যের স্বরূপ উহা নহে। কারণ পূর্ণ সত্যের স্বরূপের সন্ধান পাইলে একের সন্ধান পাওয়া যায়—তখন বিরোধ থাকে না। অর্থাৎ বিরোধ থাকিয়াও অবিরোধের মধ্যে সমন্বিত ভাবে প্রকাশ পায়। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ত্রিকালবাদ যেমন সত্য অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্তমান আছে, ইহা যেমন সত্য, তেমনি এককাল বাদও সত্য অর্থাৎ একমাত্র বর্তমানই আছে, অতীত অনাগত নাই ইহাও সত্য। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা কাল মোটেই স্বীকার করেন না, উহাদের মতও সত্য। কারণ এমন দৃষ্টিও আছে যে দৃষ্টিতে কাল মোটেই ভাসে না। এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে।

ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে বিরুদ্ধ মতের বিরুদ্ধ ভাব বিরুদ্ধ রূপে স্বীকার করা হইল না। কারণ বিরোধ যেখানে আছে, সেখানে বিরোধ আছেই, ভেদ যেখানে, সেখানে ভেদও আছে, বহু যেখানে সেখানে বহুও আছে, এবং ক্রম যেখানে, সেখানে ক্রমও ঠিকই আছে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, বিরোধের মধ্যে অবিরোধও আছে, ভেদের মধ্যে অভেদও আছে, বহুর মধ্যে একও আছে এবং ক্রমের মধ্যে অক্রমও

আছে। আবার ইহাও সত্য, বিরোধ-অবিরোধ, ভেদ-অভেদ, বহু, এক এবং ক্রম-যৌগপদ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না, এমন স্থিতিও আছে। সবই এক সঙ্গে সত্য, অথচ পূর্ণ সত্য যে কি তাহা ইহা দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না এবং কোন প্রকারেই তাহা প্রকাশ করা যায় না এবং কোন প্রকারেই তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলা যায় না, কারণ উহা ভাষার অতীত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে 'অমরবাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এই রূপ কল্পনা বার বার মনে আসিয়াছে কিন্তু নানা কারণে দীর্ঘদিন উহা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে নাই। অবশেষে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘের সুযোগ্য পরিচালকগণের আগ্রহে পুস্তকের প্রকাশন কার্য সম্পন্ন হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আমি বাস্তবিক আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই পুস্তকের সম্পাদন কার্য আমার পরমস্নেহভাজন শ্রীমান্ হেমেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীকে অর্পণ করিতে চাহিলে সে ঐ প্রস্তাব সানন্দচিত্তে গ্রহণ করে এবং দীর্ঘদিন ধরিয়া অতি যত্নে ও পরিশ্রমের সঙ্গে সম্পাদনকার্য সমাপ্ত করিয়াছে। এই কার্যের জন্য সে আমার ঐকান্তিক আশীর্বাদের পাত্র।

শুদ্ধ ও সুন্দর মুদ্রণের জন্য অনুপ প্রিন্টার্স এর সুযোগ্য পরিচালক শ্রী অনুপ দত্ত আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

২এ, সিগরা
বারাণসী
শ্রীপঞ্চমী, ১৯৬৯

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

নিবেদন

অমরবাণী মা আনন্দময়ীর ভক্ত জিজ্ঞাসুজনের নানা অধ্যাত্ম প্রশ্নের উত্তর রূপে প্রাপ্ত বাণীর একটি সংকলন। কখনও ক্ষুদ্র আবার কোনও বৃহৎ গোষ্ঠীতে উপস্থিত জিজ্ঞাসু যখনই কোন প্রশ্ন করিয়াছেন মা তাঁহার অনবদ্য সহজ ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসুর আধারগত যোগ্যতা অনুসারে ঐ প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিয়াছেন। মা'র বাণীর যে স্বরূপ তাহা কোন বিশেষ ভাব বা বিচারের সীমায় বদ্ধ না হইয়াও প্রত্যেকটি শব্দ যেন একটি বিশেষ মুহূর্ত—একটি বিশেষ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত, অথচ সমস্ত ভাবের অতীত রূপটি ঐ শব্দের অন্তরে ধৃত হইয়া বিরাজমান, যাহার ফলে প্রত্যেকটি মানুষ সে যে কোন ভাবধারার পথিক হোক্ না কেন যদি সে বাস্তবিক সত্যানুসন্ধানী হয় নিজের পথের নির্দেশ লাভ করিবে। এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকার স্বয়ং বলিয়াছেন, 'মা সর্বদা অর্থাৎ খাঁটি সত্যে অবস্থিত রহিয়াছেন বলিয়াই বাদী ও বিবাদী উভয়কেই সমরূপে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।' (ব্যাখ্যা নয়, পৃঃ ২৩৮)

মা'র বাণী যুক্তি অথবা বুদ্ধি দিয়া গড়া কোন বিচারপ্রসঙ্গ নয়। একটি কোন বিশেষ ভূমি হইতে অবতরণ করিয়া সাধারণ মানুষের উপযোগী কোন বোধভূমিতে স্থিত হইয়া উত্তর প্রদান নয়। তাঁহার যে স্থিতি তাহা স্বতঃই স্বপ্রকাশ। সেই স্থিতিতে প্রশ্নও নাই উত্তরও নাই অথচ যেখানে প্রশ্নের ভূমি সেখানেও তাঁহারই স্বরূপ, আবার উত্তরও তিনি নিজে। একের মধ্যে দুই—দুই হইয়াও এক। মা নিজেই এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'এ শরীরটা কিছু বলে না। তোমরা দেখছ বলছেন, তিনি কিন্তু কিছু বলেন না। তোমার কাছে কিছু আছে বলে তুমি কিছু দেখছ। তিনি কারও বাড়ী যান না, খান না, চলেন না, বলেন না। এটা সত্য কথা। যা আছে ঐ আছে।' (বাণী ২৮)

মা'র বাণীর সংকলনকার ব্রহ্মচারী বিরজানন্দ যিনি কমলদা নামে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমে বিশেষভাবে পরিচিত, ১৯২৫ সালে ঢাকায় মা'র সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তখন হইতেই মা'র সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ১৯৪২ সালে তিনি আশ্রমে যোগ দেন এবং মা'র অনন্য ভক্ত ও বিশিষ্ট কর্মিরূপে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মা'র শ্রীমুখ হইতে যে সমস্ত বাণী নির্গত হইত তিনি তাহার যথাযথ রূপটি স্থায়িভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেন। তিনি স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণধী এবং পরম বস্তুর অনুসন্ধানী বলিয়া বুঝিতে পারেন যে ঐ বাণী সাধারণের পক্ষে অনধিগম্য ও সুদুর্লভ। সুতরাং একবার মাত্র শ্রবণে বাণীর নিগূঢ় গভীরে প্রবেশ লাভ সম্ভব নয় জানিতে পারিয়া বাণীসমূহকে যথাযথ রক্ষা করিতে তিনি প্রযত্নশীল হন। তিনি প্রথমে ঐ বাণীসমূহ নিজের সাধন জীবনের পাথেয়রূপে এবং নিজের মননের সুবিধার জন্য সংগ্রহ করিতে যত্নবান হন। নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে জড়িত থাকিয়াও তিনি ঐ সময় একটি নিয়ম স্থির করেন যে যখনই মা'র মুখ হইতে কোন শব্দ উচ্চারিত হইবে তিনি তখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। তখন তিনি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক এবং কাশীর আশ্রমের কর্মসচিব। উক্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্যে রত থাকিয়াও তিনি যখনই শুনিতে পাইতেন মা কোন প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিতেছেন, তখনই সমস্ত কাজ ফেলিয়া তিনি আলোচনা চক্রে যোগদান করিতেন। তারপর রাত্রির নিস্তব্ধ মুহূর্তে বসিয়া শ্রুত বাণীর সংশোধিত রূপ প্রদান করা, বাণীর গভীর তাৎপর্য অনুধ্যান করা প্রভৃতি কার্যে রাত্রির শেষ প্রহরও হয়ত কখনও কাটিয়া যাইত। মা'র উচ্চারিত বাণীর অখণ্ড শুদ্ধ রূপটি অক্ষুন্ন রাখার জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি পরে কোন সময়ে তাঁহার মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, যাহার ফলে মা'র উচ্চারিত কোন শব্দ কখনও হয়ত হারাইলেও তাহার মূল সুরটি তিনি কখনও হারান নাই। যদি কখনও

কোন বিশেষ কারণে তিনি বাণী লিপিবদ্ধ না করিতে পারিতেন তখন তাঁহার ক্ষোভের শেষ থাকিত না, কিন্তু কখনও এমনও হইত, যে কথাটি বা যে প্রসঙ্গ তিনি সংকলিত করিতে পারেন নাই তখন মা যেন স্বতঃই ঐ প্রসঙ্গে পরে আবার কাহারও প্রশ্নের উত্তরে অবিকল সেই কথাই বলিতেছেন। এ ছিল এক আশ্চর্য সংযোগ—তখন তাঁহার সব ক্ষোভ সব দুঃখ দূর হইয়া হৃদয় অপরিসীম আনন্দে ভরিয়া উঠিত। এবার আর কোন ভুল নয়। শব্দের যথাযথ রূপটি ধরিয়া রাখিবার আর কোন বাধাই থাকিত না।

কমলদা এইভাবে দীর্ঘদিন ধরিয়া নিজ ডায়েরীতে মা'র বাণী সংগ্রহ করিতে থাকেন। তারপর একবার প্রসঙ্গবশে ঐ ডায়েরীর কোন একটি খণ্ড বিশিষ্ট বিদ্বান্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে দেখিতে দেন। কবিরাজ মহাশয় বাণীর অসামান্য মহত্ত্ব দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া বাণী সমূহ প্রকাশিত করিতে আগ্রহী হন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দুরূহ অংশ সমূহের ব্যাখ্যা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তারপর ধীরে ধীরে আনন্দবার্তা নামক আশ্রমের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত উহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে।

সাধারণ মানুষী ভাষায় গহন তত্ত্বকে প্রকাশ করা অসম্ভব। শব্দ ঐ তত্ত্বকে ইঙ্গিতে বুঝাইতে চেষ্টা করে মাত্র। এই জন্য বাণীর ভাষা প্রচলিত কথ্য ভাষার শৈলীতে রচিত হইয়াও উহা ইঙ্গিতময়—অনেক গভীর অর্থের দ্যোতনায় উজ্জ্বল।

বাণীর প্রকাশনের সঙ্গে সঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের রচিত ব্যাখ্যাও আনন্দবার্তায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন নিবন্ধ সমূহ সাধারণ পাঠকের নিকট সুদুর্লভ বিবেচনায় আজ বাণী ও ব্যাখ্যা পুস্তকাকারে

পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। বাণীর অনেক দুরূহস্থল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণের হৃদয়গত হইবে আশা করা যায় এবং ঐ সঙ্গে ইহাও আশা করা যায় যাঁহারা সাধন পথের পথিক তাঁহারাও তত্ত্ববস্তুর মননে ইহা হইতে লাভবান হইবেন। যে বাণী ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে তাহাকে মননের উপযোগী করিয়া পাঠকের হৃদয়গত করার কৌশল অনেকেরই অজ্ঞাত, কিন্তু ব্যাখ্যাকারের নিজ উপলব্ধির আলোকে ব্যাখ্যাত সব অংশগুলিই হীরক দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। তাই আমরা দেখিতে পাই যেখানে যাহা কিছু অনুক্ত বা দুরুক্ত তাহাই ব্যাখ্যাকার নিজ অসামান্য প্রতিভায় উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বাণী যদি রস হয় তবে ব্যাখ্যা তাহারই আস্বাদন।

কাশী
শ্রীপঞ্চমী, ১৯৬৯

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

বাণী

ব্যাখ্যা

— ঃঃ —

অমর-বাণী

১

প্রশ্ন ঃ আপনি সেদিন বলিয়াছিলেন, ধ্যানে যে দর্শনাদির কথা, তাহা প্রকৃত দর্শন নয়, ছোঁওয়া মাত্র।

মা ঃ হ্যাঁ, স্পর্শের দিক্ দিয়া এই কথা। অর্থাৎ পরিবর্তিত হয় নাই, কিন্তু ভাল লাগিতেছে এবং তাহা বুঝাইয়া বলিতে পার, অর্থাৎ বিষয়ে রস আছে। সুতরাং উহা স্পর্শমাত্র; স্থিতি হইলে বিষয়-রস এইভাবে গ্রহণ করিতে পারিতে না। বাস্তবিক স্থিতিতে রস কোথায়?

প্রশ্ন ঃ আত্মা আর ব্রহ্মে উপাধিগত ভেদমাত্র। "আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ"—এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে যে উপলব্ধি হয় তাহা আত্মদর্শন। ব্রহ্মের দর্শন হয় না। সুতরাং এই দর্শন ব্রহ্মের আংশিক অর্থাৎ উপাধিগত দর্শন —ইহা সত্য কি?

মা ঃ যদি অংশ মান, তবে অংশ বলিতে পার। কিন্তু ব্রহ্মে কি অংশ আছে? তোমার আংশিক ভাব আছে বলিয়াই স্পর্শ—কিন্তু তিনি পূর্ণ, যা-তাই!

প্রশ্ন ঃ জ্ঞানের কি ক্রম আছে?

মা ঃ না। স্বরূপ-জ্ঞান যেখানে সেখানে নানা, জ্ঞান ও ক্রম কোথায়? এক জ্ঞান-স্বরূপ যেখানে। ক্রম মানে— বিষয়ের দিক্ ছাড়িয়া একেবারে ভগবৎমুখী হওয়া, ভগবানকে পাওয়া হয় নাই কিন্তু এই পথে চলিতে ভাল লাগিতেছে। যে ধারায় চলছ— ধ্যান, ধারণা, সমাধি। এই এক এক জায়গার অনুভবও আবার অনন্ত। এখানে মন আছে, তাই অনুভব। এক এক জায়গার অনুভব জ্ঞানের ইচ্ছা। পূর্বের বিষয়াসক্ত মনে ভগবান আছে

কি নাই—এইভাবে ভগবানকে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন মোড় ফিরিয়া যাওয়ায় সেখানকার যা তারই প্রকাশ ত স্বাভাবিক। ইহাই স্থানের নামগুলি। ধ্যানে যা প্রকাশ হয়, তাহার নাশ কখন? যখন স্বয়ং প্রকাশ।

প্রশ্ন ঃ মনের নাশ হইলে শরীর থাকে কি?

মা ঃ প্রশ্ন করা হয়, জগদ্‌গুরু আচার্য উপদেশ দেন কি করিয়া? অজ্ঞান হইতে কি? তাহা হইলে ত মন নাশ হয় নাই, ত্রিপুটী-লয় হয় নাই? তবে তিনি তোমাকে দিবেন কি? কোথায় পৌঁছাইবেন? কিন্তু কোন এক স্থান আছে যেখানে এ প্রশ্ন আসে না। দেহ কি জ্ঞানের বাধক? দেহ আছে কি নাই, সে প্রশ্ন কোথায়? কোন স্থলে এ প্রশ্ন দাঁড়ায়ই না। যে স্থান হইতে প্রশ্ন হয় এই স্থিতিতে না দাঁড়াইলে মনে হইবে প্রশ্ন করা হইতেছে আর উত্তরও পাওয়া যাইতেছে। উত্তর যেখানে—প্রশ্নোত্তরের প্রশ্নই নাই। সেখানে অন্য, ভিন্ন, কোথায়? তাহা না হইলে জগদ্‌গুরুর নিকট হইতে উপদেশ পাওয়া হইতেই পারিত না এবং শাস্ত্রাদির উপদেশও বৃথা হইয়া যাইত। এটাও একটা দিকের কথা।

এই যে এম, এ, পাশের দিক্ দিয়া ক্রম বলা হয়, এটা সাধনার দিক্ দিয়া। যেখানে স্বয়ং প্রকাশ সেখানে প্রশ্নই নাই। কিন্তু যে কাজ করা যায়, যেমন ধ্যান-ধারণা, তাহার ফল প্রকাশ হইবেই। কিন্তু ঐখানে ফলাফলের কোনও প্রশ্নই নাই—থেকেও নাই, না থেকেও আছে, এইরূপ আর কি।

কেহ যে বলে, মনের আঁশ থাকে—কোন জায়গার কথায় আঁশ থাকে, আবার অপর জায়গায় আঁশ থাকা না থাকার প্রশ্নও আসে না। সব জ্বালাইতে পারে আর আঁশ জ্বালাইতে পারে না? না-হ্যাঁ-র কোন প্রশ্নই নাই, যা-তাই।

স্বীকার-অস্বীকারের দিক্ আছে বলিয়া ধ্যান-ধারণা। উদ্দেশ্য—এই

স্বীকার-অস্বীকারের পারে যাওয়া। আশ্রয় চাই ত? যে আশ্রয় লইয়া পার হওয়া যায় সেই। আশ্রয় আর অনাশ্রয়ের প্রশ্ন উঠে না। সেটা আশ্রয়হীন আশ্রয়। যেখানে বাক্যের দ্বারা বলা হয়, তাহা ত পাওয়াই যাইতে পারে। কিন্তু সে যে বাক্যাতীত।

প্রশ্ন ঃ পুস্তকে পড়িয়াছি, কেহ কেহ বলেন— আমাকে নামিয়া আসিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে মনে হয় আপন স্থিতিতে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে মনের সহায়তা লওয়া হয়। যেমন রাজা হইয়াও মেথরের অভিনয়ের সময়ে তাহাকে তাৎকালিক মেথর ভাবে ভাবান্বিত হইতে হয়।

মা ঃ যদি অভিনয় করিতে হয় তবে নামা-ওঠার প্রশ্ন ত হয় না। স্বরূপে থেকে নিজেকে নিয়ে নিজে খেলছেন। কিন্তু যদি নামা ওঠা বল, তবে সেই স্থিতি কোথায়? যদি সেই স্থিতি বল, তবে দ্বিতীয় অস্তিত্ব? এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। আচ্ছা, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখান হ'তে এরূপ কথাই আসে, এটা মানি।

প্রশ্ন ঃ ইহা ত আপনি অজ্ঞানীর দরজায় নামিয়া গ্রহণ করিতেছেন। জ্ঞানীর দরজায় দাঁড়াইয়া বলুন।

মা ঃ (হাসিয়া বলিলেন) তোমার এই কথাও আমি মানি। এখানে কিছুই বাদ যাইবে না। সুতরাং জ্ঞানীর দরজা, অজ্ঞানীর দরজা, সবই ঠিক। কথা কি, তোমার সন্দেহ হয়, এখানে সন্দেহের প্রশ্ন নাই— একেবারে নিঃসন্দেহ। তুমি যেখান হইতে যাহা বলিতেছ তাহা ঐ ঐ ঐ।

প্রশ্ন ঃ তাহা হইলে আপনাকে আর জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কি?

মা ঃ যা তাই। সংশয় আসা স্বাভাবিক। কিন্তু চমৎকার এই—সেখানে যে আলাদা দাঁড়াবার জায়গাও নাই। সন্দেহ নিয়া আলোচনা, নিঃসন্দেহ হইবার জন্য ত? সুতরাং আলোচনা ভাল, কে জানে কখন তোমার পর্দা

সরিয়া যাইবে? আলোচনা মানে এই লোচন দূর করা। এই দৃষ্টি ত দৃষ্টি নয়, ইহা ত যাবার জন্যই। যেখানে দৃষ্টি সৃষ্টির প্রশ্ন নাই, সেই দৃষ্টি। তাতেই অ-লোচন, এ লোচন নয় অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষু, দৃষ্টিহীন দৃষ্টি। আলাদা দৃষ্টির জায়গা কোথায়? এখানে (নিজেকে দেখাইয়া) দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন নাই, সেবাও হয় না। তোমাদের যেখান সেখান,— সেখান হইতে এই কথা।

প্রসঙ্গক্রমে কেহ বলিল— মৌনের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। মা জিজ্ঞাসা করিলেন— ইহা কি করিয়া হয়? এখানে "দ্বারা" কথাটি এলো কেন?

মুক্তিবাবা ঃ মৌনই জ্ঞান, যাহা সাধন তাহাই সাধ্য।

জনৈক ঃ মৌন বলিতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মৌন বুঝিতে হইবে।

মা ঃ হ্যাঁ! কিন্তু "দ্বারা" কথাটি কেন?

অপর কেহ ঃ কেবল আত্মচিন্তা, ইহাই "দ্বারা"র অর্থ।

মা ঃ বাক্-সংযমে মনের ক্রিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি এই সংযমে সহায়তা করে। যতই মনের গভীরতা হয় ততই এই ক্রিয়ার শিথিলতা আসে। তারপর মনে হয় যিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনিই মীমাংসা করিবেন।

মন যদি বিষয় ভাবনায় তোলাপাড় করে সেই অবস্থায় মৌনে যাহা দিবে তাহা পাওয়া যাইবে না। যেমন ক্রোধের সময় চুপ করিয়া থাকিলে, কিন্তু কোন এক সময়ে তাহা burst করিবেই। মন যদি ভগবানের দিকে লাগান হয় তখন উহা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও মনের শুদ্ধতার জাগরণ হয়। বিষয় চিন্তায় শক্তির ক্ষয় হয়। এই অবস্থায় মৌন না থাকিয়া বাক্য ব্যবহারে মনের release হয়। নতুবা এইরূপ মৌনে ইন্দ্রিয়ের উপর আঘাত পড়ে। ফলে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু অন্তর্মুখীন গতিতে অসুখ ত হইবেই না, পরন্তু ভগবৎ চিন্তায় গ্রন্থিগুলি খুলিয়া যায়। তাহার ফলে যাহা পাওয়া হয়।

মৌন মানে তাহাতে মন লাগাইয়া রাখা। প্রথমে মৌন থাকায় বলার প্রয়োজন বোধ হয়, পরে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন থাকে না। এমনও হয়, ভ্রমর যেমন মধু আহরণ করে, তেমন নিজের প্রয়োজন ও আপনিই আহরণ হইয়া যায়। যাহা প্রয়োজন তাহা আপনিই অনুকূল হইয়া যায়, আপনিই আসিয়া যায়, ঐ যে তাঁহার সঙ্গে যোগ হইতেছে।

কাষ্ঠ মৌন থাকিয়া শরীর রক্ষা হয় কেমন করিয়া? আপনা-আপনি সব যোগাযোগ হইয়া যায়, সে কতকটা সাক্ষীর মত সব দেখে। যত যুক্ত হইবে তত দেখিবে—বিঘ্ন চলিয়া যাইতেছে আর যাহা প্রয়োজন আপনি আসিয়া যাইতেছে। এক হয় হইয়া যায়, আর হয় যোগাড় করিয়া সংগ্রহ। মৌন মানে যার মন আর অন্যদিকে দেওয়ার জায়গাই নাই। শেষে মন আছে কি নাই এবং কথা বলা আর না বলা সবই সমান। মৌনের দ্বারা তাঁহার লাভ এটা ঠিক নয়। কারণ কিছু দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না, জ্ঞান স্বপ্রকাশ। আবরণ নষ্ট হওয়ার জন্য অনুকূল ক্রিয়াদি।

মুক্তিবাবা ঃ নবদ্বীপের মৌনী সাধু কেমন?

মা ঃ অভ্যাসে শরীরটা স্থির রাখা হইল। কিন্তু মনের কোন পরিবর্তন আসিল না। ইহা দেহের অভ্যাসমাত্র। মনের স্থিতিতে এরূপ জাগতিক ব্যবহার আসিতে পারে না। অবশ্য এইরূপ অভ্যাসও একেবারে ব্যর্থ যায় না, কিছু হয়। তবে যাহা দরকার তাহা আর হইল না।

২

প্রশ্ন ঃ হঠযোগের উপকারিতা কি?

মা ঃ হঠ মানে কি? জোর করিয়া একটা কিছু করা। এক হয় হওয়া, আর হয় করা। 'হওয়া'তে প্রাণের গতি যেখানে থাকিলে যাহা প্রকাশ হইবার হইবে। কিন্তু শারীরিক ব্যায়াম মাত্র হইলে মনের কোনও পরিবর্তন হয় না। বাহ্য ব্যায়ামে শারীরিক গতির স্ফূর্তি হয়। অনেক সময়ে শুনা যায় আসনাদি বন্ধ করিয়া দিলে গায়ে ব্যথা হয়। যেমন শরীর প্রয়োজনীয় খাদ্য না পাইলে দুর্বল হয়, তেমনি মনেরও খাদ্যের প্রয়োজন। মনে খাদ্য পাইলে ভগবদভিমুখী গতি, আর শরীরের খাদ্যে জগতের দিকে গতি। মাত্র ব্যায়াম শরীরের খাদ্য।

আর করার দিক দিয়া—করিতে করিতে হওয়া, অর্থাৎ অভ্যাসের গতিতে যাহা হইতেছিল তাহার পার হওয়া। তখন একটা গতি আসে। সেটা না আসা পর্যন্ত হঠযোগের উপকারিতা বুঝা যায় না। হঠযোগের ফলে শরীরের পুষ্টি যদি ভগবানের দিকে দেওয়া হয়, তবে ক্ষয় হয় না। নতুবা যোগ না হইয়া ভোগ। 'হওয়ার' মধ্যে পরম গতি। ভগবদভিমুখী না হইলে হঠযোগ ব্যায়াম মাত্র। স্বাভাবিক গতিতে তাঁহার স্পর্শ না পাইলে ফল হইল না। শুনিতে পাওয়া যায় অনেক প্রকার যৌগিক ক্রিয়া—নেতি ধৌতি এইসব করার পর বিকট ব্যাধি। নৈনিতালে এবার দেখিলাম একটি ছেলের এই হঠযোগের ফলে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবিশ্রান্ত দাস্ত, বন্ধই হইতেছে না। সে এবং তাহার আর কয়েকজন সঙ্গী মিলিয়া এই স্থির করিয়াছিল, এই যোগে পারদর্শী হইয়া কলেজ খুলিবে এবং এই শিক্ষা দ্বারা সকলকে তাঁর সহিত যুক্ত করিবে। কিন্তু সকলেই অসুস্থ।

উপযুক্ত শিক্ষক থাকিলে নব নব শিষ্যের প্রাণের গতি বুঝিয়া

আগাইয়া বা পিছাইয়া চালান— যেন সব সময়ই নৌকার হাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এরূপ না হইলে অনুকূল হয় না। যিনি চালাইবেন তাঁহার প্রত্যেক জায়গার প্রতিটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ থাকার দরকার— একেবারে সতেজ প্রত্যক্ষ। এ'যে পরম পদের ডাক্তার। এই ডাক্তারের সহায়তা না পাইলে ক্ষতির আশঙ্কা।

অনুকূল তবেই হয় যদি তাঁর স্বভাবের ছোঁয়া লাগিয়া যায়। যেমন নদীতে নামিয়া যতটা পারিলে আপন শক্তিতে সাঁতরাইলে, পরে যদি current-এ পড়িয়া যাও, তখন আর পারা না পারা নাই, আপনিই টানিয়া লইয়া যাইবে। কাজেই সেই ছোঁয়া না আসিলে ক্ষতি। স্বভাবের গতিতে পড়া চাই। স্বভাবের গতি যেখানে প্রকাশ ছোঁয়া লাগে আর বিজলী যেমন টক্ করিয়া টানিয়া লয়, এমন একটা জায়গা আছে কর্মের অপেক্ষা নাই। সেই ছোঁয়া না লাগা পর্যন্ত তোমার যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে তাহা তাঁহার সেবায় লাগাও। — সেবা, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি।

সাধারণতঃ সহজভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক কর, ইচ্ছা হইতেছে আরও বেশী করিয়া একটু জপ ধ্যান করি। এই ছোঁয়া মাত্র; ক্রমে স্বভাবের গতি আসিবে, আশা। এ ক্ষেত্রেও অহং আছে, কিন্তু এখানকার অহং তাঁহার দিকে যুক্ত হওয়ার দিক্। প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দিক্ কিন্তু অহংকারের ক্রিয়া— বিঘ্ন, বাধা।

হঠযোগ, রাজযোগ যাহাই কর শুদ্ধ ভগবদ্‌ভাবের অভাব হইলে ক্ষতি। আসন ইত্যাদি করিতেছ, স্বাভাবিক গতি হইলে দেখিবে যেন আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে। ইহার লক্ষণ কি? যেন একটা যোগ, একটা রস আর তৎ স্মৃতি। জাগতিক কর্মাদি অভ্যাস করিতে করিতে যাহা হয় তাহা নয় কিন্তু। আপনা হইতে স্বভাবতঃ প্রকাশ হইতেও পারে, সেই কথারই এই। সেই জন্যই তৎস্মৃতির কথাটা আসিল। স্বাভাবিক গতি

ভগবদভিমুখী কেবল।

আবার হয়ত ধ্যান করিতে বসিলে, দেখিলে কোন সময় যে রেচক, পূরক, কুম্ভক হইয়া যাইতেছে তোমার বিনা চেষ্টায়। স্বভাবতঃ যে গতিটা রহিয়াছে, তখন ভগবৎমুখী প্রকাশে গ্রন্থি খুলিয়া যায়। এই যে ধ্যানে বসিলে, দেখিলে এটে সেটে সুন্দর আসনটি হইল, মেরুদণ্ড সোজা হইয়া গেল, তখন বুঝিবে তোমার প্রাণের গতিটা তাঁর দিকে হইয়াছে। নয়ত জপ করিতেছ, গতিটা ঠিক আসিতেছে না, কোমর ব্যথা হইয়া আসিতেছে। এইরূপ জপেও ক্রিয়া হয়, তবে বিশেষ ক্রিয়াদি হইল না। অর্থাৎ মনটি চাহিতেছে, কিন্তু দেহ অনুকূল হইতেছে না। ফলে ভগবৎ রসের স্ফূর্তিটা পাইতেছে না।

বিষয় চিন্তায় বিষয় ভোগ আরও বিস্তার করিয়া দেয়। পরমার্থের দিকে স্ফূর্তি জাগ্রত হইলে ভগবৎ কামনায়, ভগবৎ তত্ত্বে, সমস্ত দৃশ্যে ভগবৎ স্মৃতি— এইগুলির বিস্তার হয়, এদিকের শিরায় শিরায় গ্রন্থি খুলিয়া যায়। কি করিলে তাঁকে পাওয়া যায়, এই ভাবের আলোড়ন তাহার মধ্যে আসিয়া পড়ে। ফলে সমগ্র দেহমনের গতি স্থির, ধীর, গম্ভীর করিয়া দেয়।

তোমাদের অভ্যাসের জন্য স্বভাবতঃ কা'রও কা'রও আসন ইত্যাদি করিতে ইচ্ছা হয়। ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠার ভাব না থাকিলে তাহার স্বভাবের গতিতে যাওয়া সহজ হয়। অন্যথা মনটা শরীর নিয়া নিবদ্ধ থাকিয়া গেলে ব্যায়াম মাত্র।

কা'রও যেদিকে যাওয়ার তাকে সেদিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়; অথচ সে এই সময় প্রথম দিকে ধরিতে পারে না, অথবা ধরিলেও ছাড়াইতে পারে না। সমুদ্রে পাঁচজন স্নান করিতে নামিয়াছে, সংকল্প হইল সকলের আগে সাঁতরাইয়া যাইবে। ইহাতে পিছনের দৃষ্টি থাকে। যাহার একমাত্র

সমুদ্রই লক্ষ্য তাহার আর দেখবার বা জানবার কেহই থাকে না। তখন যা' হবার তা' হবে। সমুদ্রের ঢেউ-এ ছাড়িয়া দিলে current -এ পড়িবে— নাইতে গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। তিনি ত ঢেউ-এ ভাসাইবার জন্য কিনারা পর্যন্ত আসিয়াছেন। নিজেকে যে সেই লক্ষ্যে ছাড়িয়া দিতে পারিবে তাহাকেই গ্রহণ করিবেন। পারের দিকে লক্ষ্য থাকিলে আর যাওয়া হইল না— স্নান করিয়া বাড়ী ফিরা। লক্ষ্য পরম ও চরমের দিকে থাকিলে স্বভাবের গতিতে নিয়া যাইবে। নিয়ে যাবার দিকে যাবার ঢেউ ত আছেই। নিজেকে ছাড়িতে পারিলে তিনি তাকে নিয়ে যান। ঢেউ রূপে হাত বাড়াইয়া তিনি ডাকিতেছেন— আয়, আয়, আয়।

প্রশ্ন ঃ কর্ম দ্বারা কি করিয়া লাভ হয়?

মা ঃ নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা। যদি প্রতিষ্ঠার ভাব থাকে তবে হয় কর্মভোগ। কর্ম করিলে— আর প্রতিষ্ঠা; ফল ভোগ করিলে; আর ফল ছাড়িলে, যোগ।

প্রশ্ন ঃ আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কাজ হয় কি করিয়া?

মা ঃ "তৎ" জ্ঞানে সেবায়। ভগবৎ প্রাপ্তি বাসনা ত এ বাসনা নয়। তোমার যন্ত্র এই যন্ত্র দ্বারা কাজ করাইয়া লও। "তৎ" জ্ঞান থাকে বলিয়া যুক্ত হইয়া যাওয়া হয় মুক্তির দিকে। যে কাজই হউক পূর্ণাঙ্গস্বরূপে হওয়া, শোক, তাপ বা দুঃখের যেন অবসর না থাকে— কেবল তুমি যা করাও এ ভাব।

আর এক কথা— আমার ত্রুটির জন্য কাজটি ঠিক হইল না। আমি আরও ভাল করিয়া সেবা করিতে পারিতাম— এই ভাব না থাকিলে উপেক্ষার কর্ম হইবে। এইজন্য নিজের শক্তি মত কোন ত্রুটি না থাকে। তারপর যা হয়,— তোমার হাত, অর্থাৎ তোমার হাতের যন্ত্র আমিও ত। কাজেই দেহ, মন, প্রাণ দিয়া সেবা কর। পরে যা' হবার তা'তেই— তুমি

এইরূপে প্রকাশ হইয়াছ, এই হ'বার, তাই এই হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ যখন স্বাভাবিক ক্রিয়া চলিতে থাকে, তখনও ত ক্রিয়াই কাজ করিতে থাকে, সুতরাং অন্য কোন গুরু না থাকায় সন্দেহের সমাধান হইবে কি করিয়া?

মা ঃ ক্রিয়া দুই রকম? দুই রকম কেন অনন্ত রকম। তথাপি তাহার মধ্যে কথা থাকে। আসন করিতে আরম্ভ করিলে, আসনে কথা বলে— যেমন তুমি আমি কথা বলি। কি রকম?— যাঁর জন্য আসন করা তাঁর যখন প্রকাশ হয়। এই আসনে কি পাবে? তাঁর প্রকাশ, ইহাই কথা কওয়া।

অসুস্থ রোগীর নড়াচড়া করিলে তাহার পরিশ্রম হয়, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস হয়। স্বভাবতঃ সকলেরই বসিবার, চলিবার ঢং অনুযায়ী সর্বদা শ্বাসের গতি বদলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু ধরা পড়িতেছে না। Control থাকিলে কেহ হয়ত ইচ্ছা করিলে গতিটা এই level রাখিব। তোমরা যে আসন কর, আসন আরম্ভ করিলে জানা থাকে না কোন্ পা আগে বা পরে তুলিলে নিঃশ্বাস লওয়া বা ফেলার দরকার। ফলে এটা ওটা উল্টা হইয়া যায়। কেন?— যেমন জানা না থাকিলে একটা জিনিষ খুলিতে গিয়া এলোমেলো হইয়া যায়। যখন আসন হইয়া যায়, তখন দেখা যায় আপ্না আপ্নি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে পায়ের ওঠা পড়া ঠিক হইয়া যাইতেছে। গুরুর ক্রিয়া তখনই দেখা যায় যখন নিঃশ্বাসের সঙ্গে আসন যুক্ত। পূর্বে জানা ছিল না, এখন নিজের কাছে ধরা পড়িল।

মনের দিক দিয়া নিজে সাক্ষীর মত দেখা যায়, যেন শিশুর মত দেখা —কে যেন সব করাইয়া যাইতেছে, আর আমার মনের গতি যেন স্থির হইয়া যাইতেছে।

তোমার শরীরের গতি, প্রাণের গতি যে স্থানে গেলে— আমার স্বর বাহির হইতেছে— পরমার্থ দিকের সুকৌশল সেই পথের ক্রিয়া যাহা

হইলে ভগবৎ কথা— যাহাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বল, সেখানে স্থিত হইলে, অর্থাৎ তোমার ঐ গতিটা ঐ কেন্দ্রস্থ হইলে সেই জাতীয় কথা বাহির হইবে। একটা স্থান আছে, হয়ত তুমি জান না, বুঝ না— যেমন আসন তুমি জান না, অজানিত ভাবে হইয়া যাইতেছে। কে করাইতেছে?— অন্তর গুরু। সেইরূপ এই যা মন্ত্রস্ফুরণ, তাহার উত্তর, তাঁর তত্ত্ব প্রত্যক্ষ মূর্তি দাঁড়ান, তত্ত্বসহ মূর্তি প্রকাশ হওয়া। তখনই পাওয়া যায় অন্তর গুরুর পরিচয়— ভিতরে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। শুধু জবাব নয়, সেই তত্ত্বটা পাইয়া যাওয়া, সেই দর্শন। এই অজানিত ভাবের জবাব পাওয়া।

আর একটি দিকের কথা— অজানিত যন্ত্রটি কি তাহার প্রকাশ। তখন মন্ত্র, তত্ত্ব, গুরু, ইষ্ট, সব প্রকাশ হইয়া যাইতেছে। এখানে জ্ঞাতভাবে পাওয়া। জপ করি, ধ্যান করি— টক্ করিয়া এই জিনিষটা কি? গুরুই আমাকে বলিয়া দিলেন, যাহা হইতেছে গুরুই বলিয়া দিতেছেন।

একটা ক্রিয়ার দিক্ আর একটা মনের দিক্। অর্থাৎ ক্রিয়া প্রধান বা মন প্রধান। যদিও মনঃসংযোগেই সব। দুইই একসঙ্গে কাজ করে, কিন্তু প্রাধান্য থাকে। আসন দিক্ নিয়া ক্রিয়া প্রধান; মন্ত্রে দিক্ নিয়া মন প্রধান। আবার বাহিরে যিনি করাচ্ছেন তিনি কে?— সেও সেই, আলাদা ত নাই।

এই সব কথা এখান হইতে একটু ওখান হইতে একটু ভেঙ্গে চুড়ে বলা হইল। বলা হয়, যার যেটা অনুকূল, যে যতটা ধরিতে পারে।

৩

মা ঃ বাবা, নিষ্কাম কর্ম কাহাকে বলে?

জনৈক ভক্ত—আমার ত মনে হয় নিষ্কাম কর্ম সম্ভব নয়। কর্ম বা তাহার ফলে আসক্তি না থাকা, মাত্র কর্তব্য জ্ঞানে কর্ম করা। শাস্ত্রে বলে কেবল মাত্র আপ্তকাম ব্যক্তিই নিষ্কাম কর্ম করিতে পারে। যতক্ষণ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্কাম কর্ম অসম্ভব। তবে ভগবৎ অর্পণ বুদ্ধিতে আরদ্ধ কর্ম পরিণামে নিষ্কাম কর্মে পরিণত হইবার আশা।

মা ঃ সকাম নিষ্কাম যাহাই বল কর্মের কথা ত। কর্ম ছাড়া ত আর থাকা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই স্থিতি না আসে। কাজেই এদিকেও ধর না। যখন গুরুর উপর আপনাকে ছাড়িয়া দিবে তখন গুরু যা বলেন তাহাই পালন করা। এখানে গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ করাই তোমার বাসনা। সুতরাং সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে গিয়া তোমার যে কাজটি ভাল করিয়া করিবার বুদ্ধি আসে তাহাও কি এই জাতীয় বাসনা বল? এই যে ভাল করিয়া করা; ইহাও গুরুর ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়াই—এ বাসনা ভাল।

একটু কোথায় নিজের জাগিলেও নিষ্কাম কর্মের দিক্ না। মনে কর একটি কাজের অধিকাংশই করিয়া ফেলিয়াছ, শেষ পর্যন্ত অপরে আসিয়া তাহা সমাপ্ত করিল। সমগ্র কর্মের নামটি হইল এই শেষোক্ত ব্যক্তির—এই ভাবে একটু মাত্র লাগিলেও নিষ্কাম কর্মের দিক্ আর কোথায়? প্রতিষ্ঠাহীন কর্মের দিক্ আর কি। যখন গুরুর কাছে ছাড়িয়া দিলে, তিনি যাহা করেন, যেখানে ফেলিবার ফেলুন। নিজকে তাহার হাতে যন্ত্রবৎ। একটি ধাক্কা আসিলেও আদেশজনিত কর্ম ধৈর্যের আশ্রয়ে করিয়া যাওয়া, এই সময়ে হয়। তাহা হইলে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও তিতিক্ষার স্থিতির দিক্, শক্তি বৃদ্ধি

হয় মনে রাখা। ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব থাকে। নির্দ্বন্দ্ব কখন— যখন লাগা-না-লাগার প্রশ্ন নাই। কর্মের মধ্যে যখন যে আদেশ হয় তাহাই পালন করিতে প্রস্তুত। মনে কর ক্ষুধার্ত হইয়া ভাতের গ্রাস মুখের কাছে তুলিয়াছ, আদেশ হইল এই মুহূর্তেই অন্যত্র যাওয়ার। সানন্দে হাতের গ্রাস ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন। বুঝিতে হইবে এই অবস্থায় এখন এই দিকের আনন্দে স্থিত হইবার দিক্। যখন হওয়ার দিকে চলে তখন কর্মের ত্রুটিতে বকুনি দিল বা না দিল লাগে না। ইহার পরে হইয়া যায় তাহার হাতের যন্ত্র। দেহটি যন্ত্রবৎ চলে, সাক্ষীর মত যেন দেখিয়া যাইতেছে। তখন দেখে এই শরীর দিয়াই নানা কর্ম হইয়া যাইতেছে, আর তাহা, বেশ সুন্দর ভাবেই হইতেছে। নিষ্কাম কর্ম বড় সুন্দর, নিজের ভোগ বাসনার দিক্‌টা নাই কিনা। যতক্ষণ গ্রন্থি না খোলে, নিষ্কাম কর্ম করা হইতেছে মনে করিলেও লাগিবে— চোখ মুখের চেহারা, হাব ভাব সব বদলাইয়া যাইবে। 'আমার যেন ফলের ইচ্ছা না থাকে'— এটাও একটা ফল ইচ্ছা। কিন্তু এই নিষ্কাম কর্মের চেষ্টা থাকিলে আশা থাকে নিষ্কাম কর্ম হওয়ার। এই হইয়া যাওয়ার মধ্যে ভিতরে অনেক পরিবর্তন আসিয়া যায়। গ্রন্থি মানে বিরুদ্ধ ভাব অর্থাৎ অহঙ্কার যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্কাম কর্ম করিতে গেলেও কখনও আঘাত দিবেই। কারণ বাঁধা আছে কিনা, বন্ধনে টান লাগে।

জনৈক ভক্ত : তবে ত আপ্তকাম হওয়ার পূর্বে নিষ্কাম কর্ম সম্ভব নয়।

মা : যখন নিষ্কাম কর্ম হইতেছে আর সাক্ষীর মত দেখিয়া যাইতেছে, তখন ভিতরে একটি আনন্দের স্ফুরণ হয়। দেহে যদি একটা চোট লাগে তাতেও তখন আনন্দ। স্ফুরণ আর আত্মদর্শন এক কথা নয়। নিষ্কাম কর্মে আনন্দ স্ফুরিত হয়— তাঁর তৃপ্তিতেই নিজের তৃপ্তি, তাঁর আনন্দেই নিজের আনন্দ। ঐ এক জায়গায় গিয়া আনন্দ নিবদ্ধ হইল। জাগতিক কামনার

দিক্ শিথিল বলিয়া এই অবস্থায় অনেক কর্ম পূর্ণাঙ্গীন ভাবে হয়। কিন্তু কোন সময় যেখানে দেখা গেল নিজের সম্পূর্ণ চেষ্টায়ও কাজটি পূর্ণাঙ্গীন ভাবে হইল না, তাতেও আঘাত নাই। কারণ সবটাই ত থাকা চাই— এখানেও তাঁরই ইচ্ছা। দেখ, কি সুন্দর লাইনে চলছে। কিন্তু নিজস্ব বোধের কর্মে ত্রুটি না থাকাকালীন এই কথা। এই অবস্থায়ও আত্মদর্শন কোথায়? কেন? নিষ্কাম সকাম ত কর্মেরই কথা। নিষ্কাম কর্ম হইয়া যাইতেছে, এখানে কর্ম আলাদা হইল। একমাত্র আত্মাই যেখানে, সেখানে গুরু, আদেশ, কর্ম আলাদা আলাদা হইতে পারে না। যেখানে আদেশ, কর্ম কথা থাকিবে সেখানে আত্মদর্শনের কথা হ'তেই পারে না যে। আপ্তকামের ক্রীড়া আলাদা আর নিষ্কাম কর্মের চেষ্টায় যে নিষ্কাম কর্ম হইয়া যাওয়া সে কথাটি জিজ্ঞাসা এই কথা হইল।

সমাধির স্থানে গিয়াও যেন সমাহিত হইতেছে, সেও ত একটা স্থান। এই অন্তর ক্রিয়ার গতিতে নিরাবরণ যেখানে, ঐখানে সেই কথা। বাসনা ক্ষয়ের চেষ্টায় বাহ্যকর্মে আত্মদর্শনের কথা ত আসিতেই পারে না।

বাবা, একটা কথা—এক সময়ে ভোলানাথ যখন যাহা আদেশ করিত এ শরীর তাহাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে যাইত। কিন্তু যখন দেখিত শরীর এলাইয়া পড়িতেছে, জাগতিক যে জাতীয় ক্রিয়া শরীর নেয় নাই, সয় নাই, তখন নিজেই নিজের আদেশ সানন্দে ফিরাইয়া লইত। এখানে কিন্তু কর্ম করিতে না পারা সত্ত্বেও তাহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে একদিকে পালন হইল।

যাহা হউক, একবার ভোলানাথের ভগিনীপতি কুশারী মহাশয় আসিল। সে প্রতি কার্যে এই শরীরকে ভোলানাথের আদেশের উপর চলিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল—'কেন, আপনার নিজের কথা নাই

কিছু? সবই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে, এমন কি কথা? যদি সে আপনাকে অন্যায় কিছু করিতে বলে, তাহাই কি আপনি করিবেন?' বলা হইল — কর্মটা যদি উপস্থিত হয় সে আদেশে কর্মটা করিতে গেলে যাহা হইয়া যায়। এই উত্তর শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। তারপর হইতেই তাহার ভাব পরমার্থের দিকে চিরতরে বদলাইয়া গেল।

পরমার্থ কোন স্থিতিতে স্বাধীনভাবে স্বক্রিয়া সম্ভব, বন্ধন নাই কিনা। আর যেখানে বন্ধন নাই, সেখানে বিপদ বিপথ নাই। তার বিপথে পা পড়ে না।

প্রশ্ন ঃ আপনার এই অবস্থা ত আত্মদর্শনের পরে আসিয়াছে?

মা ঃ এ শরীরের কথা বাদ দেও। আত্মদর্শনের পর এ অবস্থা হ'তে পারে যদি বল, সব কিছু লইয়াই কোন জায়গায় খেলা করিতে পারা যাইতে পারে বুঝিয়া লও অর্থাৎ নিজেকে নিয়াই নিজে, সে কথা এ কথা নয়। তখন যে সে অভিন্ন — ভিন্ন থাকিয়াও অভিন্ন। অভিন্ন থাকিয়াও ভিন্নের মত এবং তৎ স্ব। আদেশ পালন করা না করা সবই ঐ। আত্মদর্শনের পূর্বে যে যন্ত্রবৎ কাজ করিয়া যাইতেছে তাহার লক্ষণ আছে। পূর্ব অবস্থায় কর্মের গতি, চল্‌তি মুখ, অভাব পূরণের দিক। আর স্থিত হইলে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা, করা না করা, ঐ যা বল। ঐ রাজ্যে সবই সম্ভব—খেয়েও না খাওয়া, না খেয়েও খাওয়া। পা নাই চলে, চোখ নাই দেখে, এই জাতীয় কত কি কথা বলত। যেমন যেখানে আত্মস্থিত সেখানে কে কার আদেশ পালন করিবে? সে যে সঙ্গহীন — ভিন্ন আর ত কেহ নাই। সে ত আর কারও সঙ্গে কথা কয় না, ভিন্ন ব্যবহার আর কোথায়? নিষ্কাম কর্মের স্থান আলাদা, আত্মদর্শন আলাদা কথা। গুরু, প্রীতি, কর্ম, আমি — এই চারিটি যখন, তখন আত্মদর্শনের প্রশ্ন আসে না। তবে একটা কথা। ভগবৎ কর্ম ত আর এ জাতীয় বাসনার কর্ম নয়। এক কর্ম যোগে — যে কর্মে

প্রকাশ, আর কর্ম ভোগে — যাতে বিষয় ভোগ। যে কর্ম দ্বারা ভগবানে যে নিত্য যোগ আছে তাহার প্রকাশ হয়, তাহাই কর্ম, আর সব অকর্ম। যোগ যে নূতন করিয়া হয় তাহা নয়, যে নিত্য ও আছে তাহার প্রকাশ।

আচ্ছা, আর এক কথা শোন। কোন কোন জায়গায় কর্ম করিয়া বড় রস লাগে, কাজ করিয়া খুব আনন্দ হয়। এখানে কর্ম করিয়া কি হইবে বা না হইবে সে দিকে খেয়াল নাই। কর্মের জন্যই কর্ম করা। কর্মের প্রীত্যর্থে কর্ম—এখানে প্রকাশ্যে গুরুও নাই—তাঁহার প্রীতিও নাই। এই রকম একটি স্থিতিও আছে। কর্মের মধ্যে তারতম্য আছে। বিষয় বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া ভাল লাগে আপেক্ষিক সুখ। এটা কাহারও জন্য—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ইত্যাদি। এইজন্য যেখানে তার ফল সে দিয়া যাবে। ভোগ,—যোগ নয়, সুখ আর তার সঙ্গে দুঃখও পাশাপাশি।

আর পূর্বোক্ত কর্মে যে ভাল লাগে কথাটা, তাহা যদি কাহারও জন্য না। মনে কর কোন সময়ে রাস্তায় চলিতে চলিতেও কত কর্ম করিয়া যাইতেছে কাহারও জন্য নয়—কর্মের জন্যই কর্ম, কর্মই তাহার একমাত্র ভগবান। ইহারও একটা স্থান আছে। কিন্তু ঐ কর্ম করিতে করিতে কখন একদিন তার কর্ম ছাড়িয়া যায়। এক হয় লোকের হিতে কর্ম, এখানে এ লক্ষ্যও না। এ জাতীয় কামনা বাসনার দিক না। অবশের মত করিয়া যায়। আচ্ছা করে কেন? এখানে একমাত্র কর্মেই রতি— ভগবান যখন কর্মরূপে আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রকাশ হন, এই কর্ম করিতে করিতে কর্ম ছাড়িয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ কর্মে ত কর্ম বাড়িয়াই যায়, ছাড়িয়া যাইবে কেন?

মা ঃ তা জান না? কোন এক জায়গায় একাগ্র হইতে পারিলে, যেমন কর্মই অবশের মত করিয়া যাইতেছে, এই কর্মে অকর্ম করিতে পারে না। কাজেই তাহার কর্ম খসিয়া যাওয়ার দিক্।

কত রকম স্থান আছে, এই একটি স্থান। এখানে ত আর জ্ঞানী নয়, কিন্তু অকর্ম করিতে পারে না। এখানে যে শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় কর্ম করিবে কিনা তারও বিচারের অবসর নাই। একাগ্রতার দিক্ বলিয়া অশাস্ত্রীয় অপকর্ম তাতে হয় না। এই যে দেহ যাহার আশ্রয়ে কর্ম করে, তাহার গতি কোন একটা শুদ্ধ স্রোতে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার ফলে সে সৎকর্ম করিয়া যাইতেছে।

যেখানে ব্যক্তি সেখানেই না সুখ দুঃখের কথা। স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়া যে আসক্তিতে আচ্ছন্ন, যখন কঠিন ব্যাধি হয়, বড়ই জ্বালায় যখন ছট ফট, তখন স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, কন্যার কথা চিন্তা করিবার স্থান কোথায়? নিজেকে নিয়াই নিজে হাহাকার নয় কি? সেই সময়কালীন উহার এ মোহের বন্ধন প্রধান নয়, দেহের উপর যে মোহ তাহাই হয় প্রধান। নিজে আছে তাই সকল আছে। এদিকে এই নিয়াই জীবের আসা যাওয়া গতাগতির কথা উঠে।

এখানে ধর যিনি ভগবানেতে অনুরক্ত, সেখানে কিন্তু দেহাভিমান নাশের দিক্। তাহা হ'লে এই মোহ, এই বন্ধন নাশ অর্থাৎ বাসনা নাশ না, স্ব। যেখানে বাস কর 'স্ব না' রূপেতে প্রকাশ, তার নাশই হয় অর্থাৎ নাশই নাশ হয়। আবার জাগতিক কামনা যা' বল তার মানেও এই, স্ব প্রকাশের কর্ম নয় বলিয়া যে কর্ম। সে নয়, এই ত হইল আসল কথা, যা বল? এ শরীর আরও একটি দিকের কথা বলে, কি জান? ইষ্ট যেমন স্বয়ং, নাশও সেই স্বয়ং, নষ্টও সে স্বয়ং। স্বয়ং যেখানে কথাটা থাকে—একমাত্র। তবে আর কার সঙ্গ? তাই না নিঃসঙ্গ অসঙ্গ কথাটা হয়। ছদ্মবেশী যাহাকে বলা হয়; ছদ্মবেশটা কে? সেই ত।

জগৎ ব'লে যে কথা বল, জগৎ মানে গতি, আর যে বদ্ধ সেই জীব। বল না যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী। যেখানে গতাগতির

প্রশ্ন থাকে না, বন্ধের প্রশ্ন থাকে না, তা'কে নিত্য বলত। এখন ধর যেখানে গতি, অতএব তার সেখানেই বা বন্ধন কোথায়? এক জায়গায় কি সে থাকছে? যে রকম এক যায়গায় থাকছে না বল তেমন মনোনাশেও তাকে খুঁজে পাচ্ছ না। যে হেতু এক জায়গায় বন্ধনে থাকছে না, সে হেতু সে মুক্ত বলতে পার কি? আচ্ছা যায় কি, আসে কি? গতি দেখ না সমুদ্রের দিকে। স্বয়ং স্ব-মুদ্রারূপে। এই যে তরঙ্গ জলেরই ত ঢেউ, জলেতেই ত লয়। আর জলই ত ঢেউতে, তাঁরই স্ব-অঙ্গ ত, ঐ জলই অঙ্গ। জল বরফ ঢেউ হবারও মূলে কি? এটাও ত একটা স্থানের কথা। ভেবে দেখ। উপমা সর্বাঙ্গীণ হয় না। তবে জগৎ দৃষ্টিতেও দেখলে ত। আসলে কি পেলে? দেখ।

আচ্ছা, এক জায়াগয় থাকে না ব'লে নিত্য নয় বলে থাক ত? কি থাকে না? কে থাকে না? কে আসে? কে যায়? পরিবর্তন-বদলানটা কি? কে? মূল ধর। সবই ত ছেড়ে যায়। সব ছেড়ে যায়— অর্থাৎ মৃত্যু মৃত্যু হ'য়ে যায়। কে যায়, কোথায় যায়, কেই বা আসে, কোথায়ই বা আসে? আসা যাওয়াটাই বা কে? আবার কোন ক্রিয়ারই কোন প্রশ্ন নাই, আসা যাওয়ার প্রশ্ন নাই— কোথায় জন্ম, কোথায় মৃত্যু? ভাব।

দেখ, এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, তোমরা বলবে এক আত্মা। আবার তিনি সাকার রূপেতেও স্ব-আকার। স্ব যে সেই নিত্য যিনি আছেন তিনি আকার রূপেতে। তাঁর মধ্যে কি আছে? অক্রিয়া? কি অক্রিয়া? ভগবৎ কর্মই কর্ম আর সব অকর্ম, তোমরা বল না জগৎ দৃষ্টিতে। যে ক্রিয়ার সেখানে প্রশ্ন নাই। সেখানে আছে কি? না, স্ব-ক্রিয়া— স্বয়ং ক্রিয়া রূপেতে। স্বয়ং আকারে, এই জন্যই সাকার বলে। স্বয়ং গুণরূপে, এই জন্যই সগুণ বলে। ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় যেখানে প্রকাশ স্বয়ং ক্রিয়মাণ, অকর্তা হয়েও। সেই তিনি সত্য, স্বরূপ।

অক্রিয়া অথচ আকার। আকার মানে মূর্তি, তার মধ্যে অক্রিয়া অকর্তা। কার উপর কর্তা হ'বেন? কে, কেউ কোথায়? এই যে ক্রিয়ার বন্ধন দেখছ—এ রূপেই নয়, স্বক্রিয়া, স্বয়ং নিত্য যা নষ্ট হয় না। নষ্ট মানে যা ইষ্ট নয়। সে যে অনিষ্ট হয় না, একমাত্র ইষ্টই। তবে ধর, এই যে নিরাকার নির্গুণ সাকার সগুণ—জল, বরফ। জলের আর বরফের দূরত্ব কি, মূলে বল? তা হলে একমাত্র সেই বলত। এই যে চিন্ময় চৈতন্যময়, তারই নানারূপ, সেই যিনি অরূপ। সে জন্য কথা হইল জাগতিক ক্রিয়াই বল, সাধকের ক্রিয়াই বল, তৎ-সর্ব কর্মই মুক্ত। অর্থাৎ কর্মের কোন প্রশ্নই নাই। সেই জন্যই কথা হয় কি জান, এক নিত্য বস্তুই আছে, আর তোমরা নানা রকমারী দেখায় নিবদ্ধ, তাই অনিত্য বলিয়াই তোমরা ব'লে থাক, 'কোন কর্মই ত থাকে না, পরিবর্তনই তাহার স্বভাব।' এই যে পরিবর্তনশীল জগৎ, ইহার পরিবর্তন হইয়া কি হয়? বন্ধনের কোন প্রশ্নই থাকে না যে কর্মে, সেইটাই ত হওয়া! জগৎ কথাটা বলা হয়, যে গতিতে মৃত্যুর দিক্, অর্থাৎ সর্বদা পরিবর্তন রূপই তাহার স্বভাব। যেখানে ব্যক্তি অর্থাৎ নিবদ্ধতা, শুধু এই গতিটারই পরিবর্তন। তৎমুখী অনেকেই চেষ্টা করছে এক এক দিক্ দিয়ে—চেষ্টাটা সকলেরই কর্তব্য। এই দিক্‌টা বদলাবার জন্যই সাধারণ মানুষের তৎ-কর্ম বিষয়ে থাকা ত। কিন্তু এখন তুমি বিচার করিয়া দেখ তুমি নিত্য, মুক্ত, কেন না কর্ম সদাই মুক্ত, সে বেঁধে থাকতে পারে না। সংসারেও দড়ি দিয়ে কোন কিছু যদি বাঁধ, দেখ না পচে খসে যায়। লোহার শিকল, সোনার শিকল, যা দিয়ে বাঁধ, সেও একদিন ভেঙ্গে যায়, নষ্ট হয়। এমন কি জাগতিক কোন বন্ধনে তুমি বাঁধতে পার, যা কখনও ভাঙ্গে না, নষ্ট হয় না? সাময়িক বন্ধনের হাহাকারটা শুধু, এই রকমই হচ্ছে মনের বন্ধন। মন যে এক জায়গায় বেঁধে থাকার নয়। সে চঞ্চল বালকবৎ—কোন ভাল মন্দ বিচার নাই, আনন্দই তার লক্ষ্য। ক্ষণিক আনন্দে সে ত তৃপ্ত নয়, তাই সে চঞ্চল। কিন্তু যতক্ষণ সে

সেই পরম তত্ত্বের সন্ধান না পাবে ততক্ষণ তার শান্ততা কোথায় ? সমাহিত আত্মস্থ। নিজেতেই নিজে। তুমি মুক্ত বলেই এটা মনে রাখ, মুক্তি চাওয়াই তোমার স্বভাব। অতএব কর্মরূপেও যদি কাহারও ভাগ্যে তিনি প্রকাশ হন তা হলেই কর্ম ছাড়িয়া যায়। গতির নিবদ্ধতা যে মৃত্যুর দিক। শুধু এটা ত্যাগ করার জন্যই মানুষ নানা উপায় করে থাকে। যা ত্যাগ হইয়া যায় তাহাই ত ত্যাগ করা।

আরে! মনোনাশ মনোনাশ যে বলিস্, মন যে মহাযোগী রে, মহাযোগী। তোরাই ত বলিস্ বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ। এই যে জড়বৎ তাকেই তো তোরা মানিস্ বড়। আরও বলিস্ যা আছে এ ভাণ্ডে তাই ব্রহ্মাণ্ডে। অবতার প্রকাশ যেখানে গোপাল রূপে খেলা করে, কত মিষ্টি, কত রস। যখন সাধারণ লোকে বালগোপালের বাল্যলীলা পড়ে, দেখে, শোনে, তখন তাহাদের নিজের বালকটির কথাই মনে আসে। কেন না যাহার সঙ্গে পরিচয়। সেই তত্ত্ব গ্রহণের অধিকার কোথায় ? যখন রাধা কৃষ্ণের প্রেম-বিলাস, রাসলীলা, রামলীলা দেখিস্, এই যে সব চিন্ময় অপ্রাকৃত লীলা, কোথায় দর্শন ? যেখানে অনুভব সেখানে চিন্ময় লক্ষ্য করিয়া গ্রহণ।

প্রশ্ন ঃ যেখানে চিন্ময় অনুভব সেখানে জাগতিক গ্রহণ কিরূপ ?

মা ঃ বন্ধন মুক্ত কি না, যা নষ্ট হওয়ার নষ্ট, শুধু ইষ্ট প্রকাশ কি না, কাজেই এখন কি দেখে বল ? বন্ধন যা কাটে, কাটবার যা তাই ত কাটে। ভগবৎপ্রেমের বন্ধন কিন্তু এ বন্ধন নয়, অবন্ধন। আর যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান বল, যা বোঝ, এটা ত আর বোঝাবুঝির ব্যাপার নয়—বুঝা মানে এক বোঝা নামান আর এক বোঝা নেওয়া। মনোবাণীর অগোচর যাহা।

সাধারণ লোকে রাসলীলা, রামলীলা দেখিয়া জাগতিক ভাবের যোগ ছাড়া কি দিয়া গ্রহণ করিবে ? অধিকার কোথায় ? তবে ভগবানের

খেলা হইতেছে কি না, সেই স্মৃতিতে সেই দর্শনে, শ্রবণে অধিকার আসিবার আশা।

এই যে মন, নানাত্ব মানাই তাহার স্বভাব। তাহার ভিতরে যাকে মানলে মানামানির প্রশ্ন নাই, রূপেই বল, অরূপেই বল, সেই মানাটা কোন স্থানে একলক্ষ্য হইলেই হইল। এই এক মানে যেখানে দুইএর প্রশ্ন আসে না। সেই জন্যই একাগ্র। মনের বহু অগ্র। এই যে বহুমানা মনের গমনাগমন, সেইখানে একলক্ষ্যে স্থির হওয়া। ধর একটি বৃক্ষ। সেই বৃক্ষে সর্বাঙ্গেই শাখা প্রশাখা হইয়া যে বীজে গাছ প্রকাশ হইয়াছিল, সেই বীজ দিতে পারে। তাহা হইলে একটা বীজেই অনন্ত রকমারী গাছ, অনন্ত রকমারী শাখা, প্রশাখা, পত্র ইত্যাদি। অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি, অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত অপ্রকাশ, বীজেতে গাছ, গাছেতে বীজ। তাহা হইলে যে কোন স্থানে এক লক্ষ্য হইলেই সেই এক কেন প্রকাশ হইবে না? একেতে অনন্ত, অনন্তে অন্ত, একা অন—অন্ত, যেখানে অন্ত-অনন্তের প্রশ্ন নাই। সেই চাই—যা' —তাই। তোমরা যাহা অন্ত দেখ তাহা অন্ত হয় না। তিনি অন-অন্ত কি না। সর্বরূপে অরূপে স্বয়ংই।

এই গেল কর্মাসক্তি। আবার হয় ভাবাসক্তি। ভাবটাও ত কর্মই, তবে প্রাধান্য থাকে—কখনও কর্মে, কখনও ভাবে। এসব ধরা বড় কঠিন। কাহারো জিজ্ঞাসা—ভাবাসক্তি কি? এক—যেমন আসন, প্রাণায়াম, পূজা, জপ, ধ্যান, ধারণা যে কোন উপলক্ষ্য নিয়া ভাবের আশ্রয়েই বিশেষ থাকিতে ভাল লাগে। যতক্ষণ সে অর্থাৎ ভাব প্রধান লইয়া ভাবে থাকে, আনন্দে গদ্‌গদ্। এখানে ত আর জ্ঞানী নয়, রাস্তায় চলিতেছে। ইহা শুদ্ধ আসক্তি, এই জন্য আগাইয়া যাইতে পারে। এই ভাবের level এর মধ্যেই থাকিতে ভালবাসে। হয়ত বা ঐ আসক্তিতেই দিনের পর দিন বা একটা জন্মই কাটিয়া গেল! কিন্তু ঐখানে দীর্ঘ সময় থাকার দরুণ কিছুটা বদলাইয়া

গিয়াছে, বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু এমন কোন ছোঁয়ায় ভাবের যখন পূর্ণতা আসিবে তখন অগ্রসর হইবে। কোন কোন স্থানে ওঠা নামা আছে। আবার যেখানে ওঠা নামার প্রশ্নও নাই, সেই স্থিতি চাই ত? কর্মের ও ভাবের দুইয়ের মধ্যেই পূর্ণ অঙ্গ না আসিলে আগাইয়া যাইতে পারে না।

৪

প্রশ্ন : প্রারব্ধজনিত শরীর যতক্ষণ, ততক্ষণ অজ্ঞানের লেশ থাকে কি না?

মা : সব জ্বালাইতে পারে—আর লেশ জ্বালাইতে পারে না। হ্যাঁ, কোন স্থানে লেশ থাকে, আবার একটা স্থান আছে যেখানে লেশের প্রশ্নই নাই।

প্রশ্ন : বলা হয় জ্ঞানীর শরীর অন্যের প্রারব্ধ লইয়া অপরের ইচ্ছায় বর্তমান থাকে।

মা : স্ব ইচ্ছা, পর ইচ্ছা, অনিচ্ছা—এই ইচ্ছার বন্ধন নানা ভাবে আলাদা কথা আছেই। যেখানে স্বরূপে স্থিতি সেখানে ইচ্ছা অনিচ্ছা স্পর্শ করিলে কোন না কোন দিকের অধীনতা রহিয়া গেল। ধর না, বিদেহ যেখানে, দেহী দেহ দেখছে। যদি বল শরীর থাকবে না, শরীর কি জ্ঞানের বাধক? যেখানে স্বরূপ প্রকাশ, সেখানে দেহের প্রশ্ন নাই। সেখানে কে বা কিছু কোনটার কথা আসে না।

প্রশ্ন : জ্ঞানে যদি সব জ্বালাতে পারে তবে শরীরও জ্বালান উচিত—কারও এই মত।

মা : নিশ্চয়, শরীর জ্বালায় বই কি, শরীর যা পরিবর্তন হ'য়ে যায়—

তাই জ্বলে যায়। তুমি যা বল্লে। যদি মতের কথা বল,—মত যেখানে সেখানে পদ দিবে, পদে দাঁড় করাইবে। কিন্তু যেখানে স্বরূপ প্রকাশ সেখানে দেহ থাকা না থাকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ নিত্য লীলা কি?

মা ঃ নিত্য বলিতে কি বুঝ?

জনৈক ঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ইহার কোন অবস্থাতেই যাহার বাধ হয় না, তাহাই নিত্য, এইরূপ শুনিয়াছি।

গঙ্গাদিদি ঃ দ্বৈত-অদ্বৈত সবই নিত্য, শুধু দৃষ্টিভঙ্গির ভেদ—যদি দৃষ্টির ভেদ মানা যায় তবে ভেদের মধ্যে অনিত্য আসিয়া পড়িবে।

মা ঃ এ দৃষ্টি ছাড়িয়া দিলে যেখানে চরম পরম সেখানে দ্বৈত অদ্বৈত এরূপ আলাদা করছ কেন? যিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন তিনি দেখেন দুই, আর যিনি সাধন করিতেছেন, দুই আছেই—লক্ষ্য একেতে। ধর না যিনি দ্বৈত, তিনিই অদ্বৈত—জল আর বরফ।

প্রশ্ন ঃ বরফ জল মাত্রই না, অর্থাৎ বরফে অপর কিছু মিশ্রণেরও দরকার হয়।

মা ঃ উপমা সর্বাংশে এক নয়। সেই জন্যে বলা হয়, গলে গলে যে জল তাতেই মাত্র দৃষ্টি। একটি স্থান আছে যেখানে দ্বৈত অদ্বৈতের প্রশ্নের স্থান নাই। যাহার দৃষ্টিভঙ্গি রহিয়াছে সে যখন যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টিতে বলে। কিন্তু যেখানে 'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি,' সেখানে অন্য আর কিছুই দাঁড়ায় না। দ্বৈত আর অদ্বৈত ভাগ করিতেছ তোমার দেহ দৃষ্টিতে। দেহ মানে দেও দেও যে স্থানে।

আর একটি কথা যদি এটা-ওটা পাঁচটার দৃষ্টিতে কোনটায়ই মাত্র 'তৎ' ছাড়া আর কিছু আসে তবে সেখানে অবিদ্যা। যদি বল এক বিষ্ণু,

আর সর্বত্র বিষ্ণু দর্শন না হয়, তবে হইল কি? আবার বল শব্দ ব্রহ্ম—তা হইলে ব্রহ্ম বল, বিষ্ণু বল, শিব বল, ঐইত স্থানে স্থানে যে প্রকারে প্রকাশ প্রয়োজন আছে। আবার সর্ব নাম তাঁর নাম, সর্ব রূপ তাঁর রূপ, সর্বগুণ তাঁর গুণ। অনামী অরূপীও সেই।

এক স্থিতি আছে তিনি রূপ ধরুন বা না ধরুন— যা তাই। এখানে বাক্যের দ্বারা কি প্রকাশ করিবে? আবার কোনও স্থানে প্রকাশও হইতে পারে নিজেকে নিজে। আবার তিনি প্রকাশ হন না— কার কাছে হবেন? রূপ নাই, গুণ নাই, বাক্যের দ্বারা কি বলিবে? যেখানে এর কোনটাই বাদ যায় না সেখানে অদ্বৈত আটকাইবে কোথায়? সেই স্থিতিতে ঐ ভিন্ন আর কিছুই নাই, যা তা, সেখানে কি বলবে না বলবে— বাক্যেতে অপ্রকাশ যে যে স্থিতিতে আছে সেখান হ'তেই কথা বলে কি না। যাই বলুক, তাঁরই কথা তাঁরই গান, তাঁরই কাছে। সেখানে যে কোন কিছুই আটকায় না। যদি আটকায় তবে অজ্ঞানচ রহিয়া গেল— আসলে ত ঐ-ঐ-ঐ। ধর না মাখনের পুতুল বানাইয়াছ, যেখানে ধর সব জায়গায়ই মাখন— আকার, প্রকার, প্রকাশ যাহা। এক মাখন ভাগ করিলে কিন্তু ফাঁক হইবে। অতএব ভাগাভাগির প্রশ্ন শূন্য যেখানে। যে নিত্য লীলা বলিলে ভগবান নিজেকে নিয়া নিজে খেলা করছেন। ভগবান যেখানে তাঁর খেলা ত অনিত্য হইতে পারে না। এই যে সর্বশক্তি সম্পন্ন ভগবান তাঁহার অনন্ত লীলা, অনন্ত খেলা। অনন্তের মধ্যে অন্ত, অন্তের মধ্যে অনন্ত। তিনি স্বয়ং সেই যে স্বয়ং, নিজেকে নিয়া নিজে খেলা চলিতেছে ঐ নিত্য লীলা। সেই স্থানে যেখানে যে প্রকাশ। সব চিন্ময় রাজ্যের ব্যাপার কি না। এখানকার ভাগাভাগিটাও চিন্ময়— অপ্রাকৃত যে। অদ্বৈত যে বলিতেছ, সেত দ্বৈত রাখিয়াই? ওখানে যদি মায়া বল, হ্যাঁ মায়া, যদি বল মায়া নাই— হ্যাঁ, মায়া নাই। কোনটাই বাদ যাইবে না। অদ্বৈতের ধারণা হয় না তাও সত্য, যা ধারণ হবার হয় তাও সত্য—ঐইত। এই যে দুই, দ্বিধা,

এই দ্বিধাটাই ঐখানে না থাকা। মিথ্যাটা মিথ্যা হইয়া যাওয়া। এই যে জীব জগৎ লইয়া অদ্বৈত বললে যদি অদ্বৈত তবে আবার জীব জগৎ কি? এই দিকটায় এ কথা কোথায়? যেখানে শুদ্ধ অদ্বৈত সেখানে দুইএর আর স্থান কোথায়? আবার এ কথা হয় না? যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী। সেই দৃষ্টিতে এখন ভেবে দেখ। হ্যাঁ, তবে যেখান হ'তে যে যা' বল তার সবই কিন্তু ঠিক। কোনটাই আটকাইবে না। মায়া ভাসে বল, না বল—কথার স্থান নাই। যেখানে কথা হচ্ছে, হচ্ছে না, দেখছ, দেখছ না—এখানে দৃষ্টি ভঙ্গি। আবার তৎ যেখানে দৃষ্টির প্রশ্নই নাই। জিজ্ঞাসা হয় অজানা হইতে আবরণ হেতু। স্বরূপে স্থিত না হওয়া পর্যন্ত জিজ্ঞাসা আসা স্বাভাবিক।

ভাসে বলিলে উপর, নীচ, সব কথাই আসে। সেখানে যে কি আছে, কি নাই। যেখানে নাবা ওঠার কথা থাকে সেই স্থিতিকে কি বলিবে? 'দিক রহিল' বলিবে ত? আবার নাবা ওঠা বলিলে এমন স্থান আছে—কোথায় নাবছে? তাঁর কাছেই তিনি নাবছেন। ওঠাও যা, নাবাও তা। যিনি নাবছেন, তিনিই উঠছেন, নাবা ওঠার ক্রিয়াটাও সেই। অবতরণ যদি বল তিনি ত আর খণ্ডিত হইতেছেন না। অগ্নিটা এখানে ওখানে দেখিতেছ, কিন্তু সে যা' তাই, অগ্নিত্ব নিত্য যে হিসাবে ধর। উপমাত সর্বাঙ্গীণ হয় না। যিনি নাবছেন, যেখান হ'তে নাবছেন, আর যেখানে নাবছেন—সবই এক। ঐ ছাড়া আর কিছুই নাই।

প্রশ্ন ঃ যদি জিনিষটা যে রূপ সেরূপই রইল, তবে আবার নাবা ওঠা কেন?

মা ঃ তোমার জাগতিক দিকের একটা দিকের দৃষ্টি বলিয়া একথা। সেই যে চরম পরম, সেখানে এই প্রশ্নই নাই। স্থান বিশেষে নাবা ওঠা আছে—ভগবান ত অবতীর্ণ হন তোমরা বলিয়া থাক। আবার অবতরণের

প্রশ্নই নাই—যেইখানে সেইখানে। তাতে সবই সম্ভব। বোঝা নিয়ে ত আর ধরা যায় না।

লাভ আবার করিবে কি, আছেই ত। যাহা পায়, তাহা আবার যায়। যা' নিত্য আছে তার প্রকাশের জন্যই বিধান, বিভিন্ন রাস্তা। কিন্তু দেখ, রাস্তাও খতম হইয়া যায়। অর্থাৎ যে কল্পনা দ্বারা তোমার কল্পনা দূর হইবে তাহা গ্রহণ কর। অর্থাৎ কল্পনাতীত হইলে, তুমি যা তারই প্রকাশ।

আবার চমৎকার এই, চাওয়াটাই স্বভাব,—বাস্তবিক যে স্বরূপ জ্ঞান, আনন্দ, সেই চাওয়া। খেলার পরে ঘরে ফিরিয়া যাওয়াই স্বভাব। খেলার মাঠও তাঁরই, খেলাও তাঁরই, বন্ধু-বান্ধবও তাঁরই, সব কিছু সেই। অজ্ঞান ত চায় না, অমৃত চাওয়া স্বভাব—মৃত্যু কি আর চাওয়া? জগতের গতি অজ্ঞানের জ্ঞান। এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়—বাড়ী করে মজবুদ, যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়—স্থিতি চায়, তাও সত্য। মিথ্যা যদিও বা কখন বলিয়া ফেলিলে, কিন্তু ভাল লাগে না।

অভাব যেন না থাকে, এই চাওয়াটাই স্বভাব। একটা কিছু দেখিলে —'এটা কি', খোঁজ করা তোমার স্বভাব।

কাপড় একখানা আনিলে, যেন বেশী দিন টিকে, যেন অন্ত না হয়—অনন্ত চাওয়া স্বভাব। তুমি যা' তাই প্রকাশ হওয়ার জন্য তোমার চাওয়াটা স্বভাব। সেখানে নিত্য, সত্য, অনন্ত-জ্ঞান। সেই জন্য তোমার মন অনিত্যে, অসত্যে, অজ্ঞানে, অন্তে ভাল লাগে না। তুমি যা, তার প্রকাশ চাওয়া স্বভাব।

৫

প্রশ্ন ঃ শাস্ত্রে দুটো কথা পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর সংসার করা আর তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর সাক্ষিরূপে অবস্থান করা—কোনটা গ্রহণীয়?

মা ঃ চূড়ালা-শিখিধ্বজের উপাখ্যানের ব্যাপারটা বল দেখি। জ্ঞানের পর সংসারের কাজ করার কথা বলছ?

জনৈক ঃ না, এখানেও অজ্ঞানাভাস আছে। ইহা একটা অবস্থা মাত্র। এখনও চূড়ালা জ্ঞানী নয়।

মা ঃ জ্ঞানে আর সংশয়-সংসার থাকে না, দেহও থাকে না। সংসার থাকে না যেখানে, দেহও থাকে না সেখানে।

প্রশ্ন ঃ দেহ যে থাকে?

মা ঃ কে বললে দেহ থাকে? নাম রূপেরই কোন প্রশ্ন নাই। তাঁর দৃষ্টি আছে বা নাই তারও কোন প্রশ্ন নাই। 'দেও, দেও' আর কার কাছে তার? 'দেও, দেও', এ অভাবটাই ত দেহ। যেহেতু—সংসার নাই, দেহ নাই সেই হেতু সেই কর্মও নাই। অর্থাৎ দেহ, সংসার, কর্মের প্রশ্নই নাই—একেবারে ধোওয়া-মোছা নাই ও নাই। কথা বলাও যা, না বলাও তা। চুপ করে যেখানে, চুপ না করেও সেখানে, যা' তা। বলা না বলার প্রশ্নই নাই। এখন বুঝে নেও। সংসার করবার মত যেখানে দেখ, সেটা কি? হ্যাঁ, গীতায় ত সব সত্য কথা। এখানে ঐ কথা। এ শরীরকে যেখান হইতে যে ধারায় কথা জিজ্ঞাসা করিবে সেখানে সে ভাবেই। সেইজন্য এই শরীরের কি কথা আর কথা নয়। কোন ধারা থাকিলে ধরা আছে। ধরা থাকিলে অধরা। যেখানে ধরা অধরার প্রশ্ন নাই, সেই-ই। যেখান হইতে যা বাজাইয়া লও, শোন। এ শরীরটার কাছে এমত ঐ মতের প্রশ্ন নাই।

প্রশ্ন ঃ মা তাহা হইলে বাজে? (হাসি)

মা ঃ যেখানে কান;—বাজে কাজে বাজে, না কাজে বাজে তোমরা জান। এখানে বাজা না বাজার কোন উত্থাপনই নাই। তোমার মা বাজে না কাজের তা তুমি জান। কারণ মা তোমার, মেয়েও তোমার। বাজে না কাজের, বাপ জানে। (হাসি)

প্রশ্ন ঃ বাপ জানিলে কি আর রক্ষা থাকিবে?

মা ঃ বলার জন্য বলা—এটাও কথা নয়। না-টাও না—এখন কোথায় যাবে? কোথায়টাও কোথায়?

৬

প্রশ্ন ঃ একাংশ ধ্যান হইতে সর্বাংশ হইবে কি করিয়া? ধ্যান ত একাংশেই মাত্র হওয়া সম্ভব। বলা হয় ধ্যানে মন ক্রমশঃ বৃহত্তর বস্তুর ধারণ করে, পরে যখন আর ধারণ করা মনের শক্তির বাহিরে যায়, তখন মন আপনা হইতেই লয় হইয়া যায়। তখন আর ধ্যান নয়, তখন জ্ঞান। এইটা কারও কারও মত। কি করিয়া মনের এই সর্বব্যাপিত্ব হইতে পারে, এটা ধরিতে পারি না।

মা ঃ ধ্যান পেলে ধ্যান হয়। ধ্যান তো হওয়া চাই। আচ্ছা, মন যে লয় হইয়া যায় বলিতেছ, উৎপন্ন কোথা হইতে?

প্রশ্নকর্তা ঃ আত্মা হইতে। শ্রুতিতে আছে, ইহা ছায়ার ন্যায় আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মা ঃ যেখানে উৎপন্ন, সেখানে নষ্টও—এই কি কথা? তা হ'লে আবার উৎপন্ন হবে? এই যে বলছ, মনের সর্বব্যাপিত্ব; এই ব্যাপারটা

ধরিতে পারিতেছ না। ধরিবার জিনিষ নয় বলিয়াই না ধরিতে পারিতেছ না। এ ধরবারও নয়, জিনিষও না। সংসারের বিষয় ভোগ অনুভব কর, আবার যখন এ ধ্যানে সাময়িক একটা সুখ বা আনন্দ অনুভব কর, এটাও অনুভব ত? কিন্তু পূর্বোক্ত অনুভব হইতে খানিকটা আলাদা।

এই যে বললে সমাধি হ'তে নেবে এসে বলা, এখানে নাবা ওঠা রয়েছে, নইলে বল কেন? আবার নামা ওঠার প্রশ্ন নাই, তাও ত আছে। যদি বল সমাধিতে মন থাকে, নইলে ব্যুত্থানে সমাধি অনুভব যতটুকু ততটুকু বলতে পারে, বলে কি করিয়া? তা সে যে মনই হউক, যেমন শুদ্ধ মন। আমি তোমার জায়গা হইতেই বলিতেছি। অনুভব ত রাস্তার কথা। পূর্বোক্ত দুই প্রকার অনুভবের মধ্যে তারতম্য আছে, তথাপি ইহা মনের বিভিন্ন স্থানের কথাই ত। সমাধিও ত বল। আচ্ছা, আর একটা স্থানের কথাও ত আছে, যেখানে নাবা ওঠার প্রশ্নই নাই। কাজেই ঐ স্থানে শরীরেরও প্রশ্ন নাই। এ শরীর, কর্ম আর প্রশ্ন উত্থাপন হইলে সেই নয়। মন যে লয় হয় বল, তখন লয় কোথায় হয়।

প্রশ্নকর্তা ঃ আত্মাতেই লয় হয়।

মা ঃ যেমন নুন গলে লয়, মন তাতে লয়; ব্যাস? কোনও দৃষ্টিতে এরূপও আছে ত বলে—যেখানে লয়ের কথা, সেরূপ যোগী হ'লে আবার পৃথক্ করিয়া বাহির করিয়া আনিতে পারে।

প্রশ্নকর্তা ঃ আত্যন্তিক নাশের কথা হইতেছে।

মা ঃ নাশ কি লয়? না—স, অর্থাৎ সে না, স্ব না যেখানে তাকেই ত নাশ বলছ? যেখানে নাশ নাশ হ'য়ে যায়। মনোনাশকে কি লয় বলছ?

প্রশ্ন ঃ কি করিয়া এটা ধরব?

মা ঃ লাইন ত গুরু দেন। কি ক'রে ধরবে এর লাইন গুরু নির্দেশ করেন। গুরুই সাধনা দেন—করতে করতে ফললাভ স্বয়ং প্রকাশ। অধর

ধরার শক্তি-প্রকাশ ত গুরুতেই। যেখানেই কি করবে এই প্রশ্ন হচ্ছে, বলছ সেখানে ত আর পরিপুষ্টি লাভ হয় নাই। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ না হ'বে, নিরন্তর ক'রে যাওয়া। ফাঁক দিতে নাই, ফাঁকে পাক পড়ে যায়। যেমন বল, তৈলধারাবৎ।

তোমার চেষ্টা থাকবে, নিরন্তর অখণ্ড ধারায় ক'রে যাওয়া। আহার নিদ্রা তোমার হাতে নাই, নাই বা থাকল। তোমার লক্ষ্য থাকবে অখণ্ডের দিকে। দেখ, আহার নিদ্রা প্রত্যেকটাই ত যে সময়ের যাহা অখণ্ডভাবেই চাইছ। ঠিক তেমনই এদিকেও অখণ্ডভাবের চেষ্টা। যখন মনের গতি সেই অখণ্ডের ছোঁয়া লাগবে, যদি একবার সেই ক্ষণকে পেয়ে যাও। ক্ষণের মধ্যে সর্বক্ষণ রয়েছে। সে ক্ষণটার ছোঁওয়া লাগলে তুমি সর্বক্ষণটা পেয়ে যাবে। যেমন ধর না সন্ধিক্ষণ,—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা। যাওয়া আসার সন্ধিতে যে শক্তি আছে তাহার প্রকাশ হয়। এই যে তোমাদের electric light ইত্যাদি যা বল, অর্থাৎ যুক্ত স্থিতির ক্ষণটা আর কি। যে স্থায়িত্বে সেই সত্তার প্রকাশ। সর্বক্ষণই আছে ত, পাচ্ছ না, সেইটে পাওয়া। সেই সন্ধিটা যদি তুমি পাও। কিন্তু সেই ক্ষণ যে কার কখন প্রকাশ হ'বে, বলা যায় না। লেগে থাকা। কাহার কোন ক্ষণ, যে লাইন যে গ্রহণ করছে সেই অনুসারে আর কি। যে যে-ক্ষণে জন্মিয়াছে, সারাটা জীবন তাহার সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত চলছে ত। সেইরূপে সেই ক্ষণটাই তোমার চাই যাতে তুমি এ ধারায় পড়িয়া যাইবে। এ ধারা মানে স্বভাবের ধারা, মহাগতি অর্থাৎ মহাযাত্রা। তা' না হ'লে পূর্ণতা হয় না। সেইজন্য গুরুলাভে পূর্ণতা জন্মে কাহাকে কাহাকে সময় নির্দেশ ক'রে দেন, যেমন সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর অথবা মধ্যরাত্রি। চারিটা সময়ই ত বলেছে। গুরুর নির্দেশ অনুসারে যার যার কর্ম করাই কর্তব্য। গুরুর উপদেশ যার যে ভাবে থাকে। সকলের এক পন্থা নয়। যোগাযোগ অনুসারে কার কোন দিক যে কি ভাবে পূর্ণ

করিয়া আসিতে হইবে সাধারণের জানা ত নাই। গুরুর আদেশই পালনীয়।

সেই ক্ষণটা যদি তোমার ভাবে ও কর্মে ঠিক ঠিক যোগ হয় তখন তাহা প্রকাশ হইতে বাধ্য। তাই গুরুর ধারা ধ'রে থাকবার চেষ্টা। তারপর দেখিবে হইয়া যাইতেছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোন একটা সময় নির্দিষ্ট কর তাঁকে দিব। ধর, যদি সুবিধা—এই আসনে বসব, এই জপ করিব। ক্রমশঃ সময় বা সংখ্যা বাড়াও। রোজ বাড়ান হয় না অবশ্য। নিয়ম কর অমুক তিথিতে বা বারে বাড়াবে, অর্থাৎ এতটা বেশী করব। এমনি ক'রে নিজকে সেখানে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা—যেখানে থাকা সেখানেই লক্ষ্য নিয়ে পড়ে থাকা তাঁকে ধরে। এই চেষ্টার দরুণ এই যে ধারা সে ধারায় যদি তোমার গভীরতা আসে, দীর্ঘ সময় নিয়া আরম্ভ হয়, তোমাকে পরিবর্তিত করিয়া দিতেছে, দেখিবে ইহা তোমার ভোগের বৃদ্ধির দিক কমাইয়া দিতেছে। সঞ্চিত লইয়াই কাজ করিয়া যাইতেছে। এমনও মনে আসিতে পারে কোন মুহূর্তে শরীর চলে যাবে, মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে।

জগতে যেমন নিত্য নূতন সৃষ্টি, মন তাকে নিত্য নূতনভাবে গ্রহণ করছে ত। এইভাবে চলার ফলে দেখতে পাবে বাইরের কথা কমে যাচ্ছে, তুমি অন্তর্মুখীন হয়ে যাচ্ছ। যতই এই চেষ্টা বেড়ে যাচ্ছে ততই তোমার এই দিকটা খুলে যাচ্ছে। এই রকমভাবে যত বাড়াবে ততই দুর্ভোগ কম হ'বে, আর বাড়বে না। কর্মে কর্ম ক্ষয় হয়—এও ত বলে। হ্যাঁ, ভাগ্য অনুসারে অল্প সময়েও হয়। দেখ, শরীরকে খাবার না দিলেও তার খাদ্য গ্রহণ কিন্তু বন্ধ হয় না। বলে, শরীর তখন নিজের মাংস খাইতে আরম্ভ করে। সেইজন্য বাহিরের ভাবে যেমন পুষ্ট থাক তেমন এই ভাবটা নিয়ে যদি আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ কর তখন তোমার ঐ দিকটা পুষ্ট হ'বে। তারপর কখন কোন মুহূর্তে অগ্নি প্রজ্বলিত হ'বে কে জানে। সেইজন্য সেই কথা, সেই ভাব নিয়ে থাকিতে চেষ্টা। ফলে তোমার ধ্যানের পুষ্টি হবে—সর্বক্ষণ

সেই। কারণ মন ত চায় যাহা দিলে সে পুষ্ট হইবে—একমাত্র পরম বস্তু ছাড়া মন পুষ্ট হয় না, তখন তুমি সেই ধারায় পড়িয়া যাইবে।

দেখিবে যতই তোমার ভিতরের গতিতে রস জমা হ'চ্ছে, ততই বাইরের গতিতে আর ভাল লাগছে না। যখন মন এত পরিপুষ্ট যে তাতে কখন সেই অভিন্নত্ব প্রকাশ হ'য়ে যাবে। লয়ের কথা যা বলছ, লক্ষ্যার্থে যদি 'তৎ' বলে থাক তবে লয়ের কথা যা বলছ ঠিক আছে। জড় সমাধি চাই না, মন যেন লয় না হয়, মনটা যে কি, কে, তাহা পাওয়া চাই।

মন লয় হইয়া তৎ আকার, ঐ কি বলছ? এক হয় আর জায়গা পায় না, অর্থাৎ রাস্তা পায় না বলিয়া লয়। আবার ঐ দিকে যে তৎ, সেই যে স্বয়ং প্রকাশ, তাই মনের আলাদা অস্তিত্বের কোন প্রশ্ন নাই। সেই স্বয়ং প্রকাশ, তখন মন লয়, কি অলয়, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার অবসর কোথায়? তুমি যে দিক দিয়া জিজ্ঞাসা করলে। একাংশ নিয়া যে ধ্যান আরম্ভের কথা বললে একাংশের মধ্যেই ত সর্বাংশ রয়েছে, সেইটি প্রকাশ করিবার জন্যই ত গুরুশক্তিযুক্ত আদেশ পালন। সবই একদিকের কথার সামান্য একটু আভাস মাত্র বলা হ'ল।

আবার দেখ, কোন সময় দেখা যায় ধ্যানে বসে হুঁস ছিল না। কারও কারও হয়, একটা নেশার ভাবের আনন্দবোধ, যেন এলিয়ে পড়ে, দীর্ঘ সময় কেটে যায়। উঠে বলে, কি একটা আনন্দে ছিলাম। কিন্তু এ ত জ্ঞান নয়। কাজেই ধ্যানেরও একটা স্থান আছে—আনন্দ বোধ করে, যেন আনন্দে ডুবে ছিল। কে ছিল? মনই ত। এটা কিন্তু কোন জায়গায় কোন স্থলে বিঘ্ন করে। বার বার এই জায়গায় যেয়েই যদি ফিরে ফিরে স্থিত থাকে তবে মূলের স্বাদ কিন্তু পাবে না। বাস্তব ধ্যান যখন হ'বে জাগতিক রসবোধ থাকবে না। বাস্তবিক যখন ব্রহ্মভাবে বা আত্মোপলব্ধির দিক্, সেখানে কোথায় ছিলাম, বা এতক্ষণ ত কিছুই জানি নাই। অজানা ত? এটাও

থাকবে না। মুখে যখন বলতে পারা যায়, কি আনন্দে ছিলাম; এটা রসাস্বাদ, বিঘ্ন। সচেতন থাকা চাই, জাগ্রৎ থাকা চাই। জড় বা যোগনিদ্রা হ'লে চলবে না।

ধ্যানের পর জাগতিক আনন্দ ফিকা ফিকা বোধ হ'বে, আলুনা আর কি। বৈরাগ্য কাকে বলে? জাগতিক প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে যেন বৈরাগ্যের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে, যেন shock লাগছে। তখন অন্তর বাহির জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বৈরাগ্যে জাগতিক বস্তুর উপর বিরক্তি বা উপেক্ষা থাকবে না—গ্রহণ হ'বে না, শরীর নেয় না। বিরক্তি বা ক্রোধ আসবে না। যখন বৈরাগ্য দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন ক্রমশঃ কি হ'বে? (জগৎ) কি, এই প্রশ্ন বিচার আস্‌বে। জগতের মিথ্যাত্ব বোধটা প্রত্যক্ষ প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠবে। জগতের প্রত্যেক জিনিষটা যেন আগুন—ছোঁয়া যায় না। কোন সময়ে ইহাও জাগে।

এখন যা ভোগ কর অনিত্য বোধ হয় না, সুখ বোধ হয়। যতই বৈরাগ্য প্রজ্জ্বলিত হ'বে ভোগের রস মরে যাবে, মৃত্যুর মৃত্যুই হয়, কালের জিনিষ কি না? এখন যে কালের অতীতের দিকে যাচ্ছ, তাই তোমার সংসারী সুখ বোধ জ্বালাইয়া দিতেছে। ফলে জগৎটা কি, এই প্রশ্ন জাগবে। যতক্ষণ সুখবোধ থাকবে ততক্ষণ এটা প্রকাশ হয় না। কালাতীতের দিকে যাচ্ছ ব'লে কালের জিনিষ ধরা দিবে।

যদি নেবে এসে যেমন তেমন করতে পার তবে তোমার বদল হয় নাই। যখন ধ্যান হয় আর বৈরাগ্য জন্মে তখন ঐদিকে হাহাকার লাগবে, ক্ষুধা জাগরণ করে দিবে। আর জাগতিক কোন জিনিষে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হচ্ছে না, তোমার তৃপ্তি লাগছে না, এটা জানবে।

কি বলব বাবা, শরীরের কাছে এসে বলে, আমার মেয়েটা ছেলেটা এ রকম। চোখের সামনে মোটরে উঠে চলে গেল, বাপ মায়ের কি কান্না,

একবার ভ্রূক্ষেপও করলে না। এদের কান্না ঐ সময় তাকে ছুঁলও না। দেখ বাবা, এ রাস্তায়ও ঠিক ঐ রকমই বিষয় ভোগে ছোঁয় না এরূপ স্থান আছে। যাদের যাদের আপন ভাবা হ্ল এ ত সব রক্ত মাংসের পিণ্ড মাত্র, এ দিয়ে কি করব? এই রকম হয়। যেমন জেনে শুনে আগুনে হাত দিতে পারে না, সাপের ঘাড়ে পা দিতে পারে না, ঠিক সেই রকম এদিকে তাকাইয়া মাত্র চলিয়া যাইবে। তখন তোমার ঐ দিকের গতি আসিবে। তারপর যখন বৈরাগ্যের উপরও বৈরাগ্য আসবে তখন বৈরাগ্য অবৈরাগ্যের প্রশ্ন নাই— যা-তা। দেখ এ রকম ত বলে, কারও করতে করতে জ্ঞান হয়। করতে করতে কি জ্ঞান হয়? জ্ঞান কি ক্রিয়াধীন? আবরণ নষ্ট হ'লে যা প্রকাশ আছে তার প্রকাশ। কর্ম্মের যে ফল, যে দিকের ক্রিয়া করে সে দিকের প্রকাশ। নিরাবরণ প্রকাশ হ'ল স্বয়ং যা নিত্য আছে। কার কোন ধারা গুরু জানেন।

প্রশ্ন ঃ কখনও মনে হয় বিষয় মাত্র, কখনও বা জ্ঞান মাত্র। একই বস্তুর দুই সময়ে দুই রকম জ্ঞান হয় কেন?

মা ঃ কারণ তুমি সময়ের অধীন বলে। স্ব-ময় ত আর হও নাই, সেখানেই মীমাংসা। মনে হওয়াটা ভাল, পরমার্থ দিকের। কারণ বৃথা ত কিছুই যায় না। যাহা গ্রহণ কর, তাহা কোন না কোন সময়ে কাজ দিবে। আসল কথা, যেমন জলতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব ইত্যাদি—এইগুলি কি? ফলে সৃষ্টিটা কি? তখন ক্রমে ক্রমে এক একটা তত্ত্বের প্রকাশ জ্ঞানেতে ফুটবে। ফুল ফোটার মত আর কি—গাছেতে ফুল ফল আছে, তাই না প্রকাশ। সে জন্য যে তত্ত্বের প্রকাশ হলে সকল তত্ত্বের মীমাংসা।

বিষয় যে বলে, বিষয় মানে যা'তে বিষ হয়, যাহা ক্ষতি করে, মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়। নির্বিষয় অমৃত, যেখানে বিষের গন্ধ নাই—তাহার প্রকাশ।

প্রশ্ন ঃ ঐ বৈরাগ্যের দাহও ত একটা থেকে গেল?

মা ঃ দাহটা কি নিয়ে হয়? একটা ঘা হয়ে ত? তবে ত প্রদাহ—সে ঘা কিসের? ঘা থাকে তবে ত দাহ হ'বে?—এটা ভাল।—ঘা-টা, যতক্ষণ সেই প্রকাশ না হ'বে। যে জায়গায় জ্বালা হ'লে ভাল হয় সে ত ভাল কথা। বিকারগ্রস্ত হ'লে জ্বালার বোধ নাই—দেখতে পাচ্ছ না দুঃখ শোক তাপে ডুবে পড়ে আছে, এটা ত চাই না। এইরূপ, এই ত সংসার যেখানে নিত্য সংশয়রূপে আছে। বল ত জ্বালা হচ্ছে কেন?

প্রশ্ন ঃ ভগবানও টানে, বিষয়ও টানে—এর জ্বালা।

মা ঃ ছাড়িতে পারি না, ছাড়াইতে সাধ, ঐ যে কথা। এই সাধটা জাগুক না, সাধ জাগলে কোন সময় ছাড়াইতে পারিবে। পাইলে জ্বালা (বিষয়), আর না পাইলে জ্বালা। এই যে পাইলে জ্বালা এটা চাই, বিষয় না পাইয়া বিষয় পাবার ইচ্ছার যে জ্বালা এটা মৃত্যুর দিক, দুঃখের দিক।

প্রশ্ন ঃ পাওয়ার জ্বালার ত নিবৃত্তি নাই, যত পাই ততই চাই। (বিষয় ভোগের পরিণামে জ্বালা)।

মা ঃ এখানে বিষয়ের অভাব ত মূর্তিমান আছে, অভাবের জ্বালা ত থাকবেই। সেইজন্যই বলা হয় অভাবের গতি আর স্বভাবের গতি। অভাবের গতির স্বভাব হইল কখনও পূরণের দিকে। সর্বক্ষণ অভাব জাগরিত রাখাই তার স্বভাব। স্বভাবের গতি হ'ল স্বভাবে স্থির করা, স্বভাবের কর্মের পূর্ণতা লাভ করা। তাই স্বভাবের গতি দিয়া যদি পূর্ণ করিতে চেষ্টা কর, তবে স্বভাবের গতিতে স্বভাবে স্থিত হওয়ার দিকে নিয়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ আর না পাওয়ার জ্বালা? (ভগবৎ অপ্রাপ্তির জ্বালা) বিষয় ভোগ চাই না, কিন্তু এসে যাচ্ছে। ভোগ করে যেতেই হচ্ছে।

মা ঃ আরে, অপ্রাপ্তির জ্বালা ত ভাল। যাহা খেয়েছ, তার উদ্গার আসবেই ত। সাধ করে গয়না পড়েছ, ভার বহন ত করতেই হবে। তবে কি-না, এর ভার পড়ে যায়, পড়ে যাওয়ারই কি-না?

প্রশ্ন ঃ জ্ঞানীর সাময়িক অজ্ঞান হয় কি-না?

মা ঃ জ্ঞানী বলবে আর সাময়িক অজ্ঞান বলবে, এ কথা ত হয় না, বাবা। কোন একটা স্থানে সাময়িক স্থিতি আছে তাহাতে একথা আনতে পার। আসলে জ্ঞান যা' সেখানে এ কথা নয়। তুমি তা'কে যেরূপেই দেখ না কেন, সে যা' তাই। জ্ঞান যা'কে বলবে, অজ্ঞানের প্রশ্ন কোথায়? জ্ঞানকে অজ্ঞানের মত দেখায়, অজ্ঞানের কথা যেখানে। তাই এখানে নাবা ওঠার কথা নিয়ে এস। মুক্ত হ'য়ে গেলে যেমন দেহের প্রশ্ন নাই, তেমন নাবা ওঠারও প্রশ্ন নাই। নাবা ওঠারও স্থান আছে, সত্যি সত্যি আছে।

৭

প্রশ্ন ঃ ক্ষণের মধ্যে সর্বক্ষণ বল, বুঝিতে পারি না।

মা ঃ যে ক্ষণ নিয়ে যে জন্ম নিয়েছে সেটা ভোগ করে যাচ্ছে। আর সাধন করে যে ক্ষণটা পেল সে ক্ষণ তাকে সর্বক্রিয়ার পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ কর্ম পূর্ণ করে দিচ্ছে। ধর না, প্রাকৃত মানে যে এগুলির মধ্যে আছে। গুণ মানে যাহা গুণ কষা যায়, গুণ হয়। কারণ এ স্থান ত নিত্য নয়। কালে প্রাকৃত জগতের যা বোধ, তাহা ক্ষণস্থায়ী বোধ। কারণ এদিকে দেখতে গেলে নষ্ট হয়। বৈরাগ্যে জ্বালাতে পারে, ভাব-ভক্তিতে গলাতে পারে, যা জলবার যা গলবার। আবার যে ক্ষণে গলে না, জ্বলে না —নিত্য। সেটি ধরবার জন্য চেষ্টা আর কি। আরে, এই সেই, ও

আলাদা কোথায় ? যখন ধারায় ধরা পড়ে যাবে। বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত তার নিকট আলাদা কোথায় ? তোমার দেওয়ালের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে জিনিষ আনা (যোগীর দৃষ্টান্তে)। দেওয়াল থেকেও দেওয়াল নাই, না থেকেও দেওয়াল আছে—যেখানে ঐ প্রকাশ। পর্দার ওপারে বস্তু, সামনে পর্দা। পর্দা পূর্বে ছিল না, আগেও থাকবে না,—উপস্থিতও নাই। এই রূপটাও। ধর না, যে যোগে পর্দার আড়াল তার কর্মের বাধা দিতে পারে না এই দেখাটাও সেই প্রকার হয়। আবার যে দেখতে পারে তার কাছে গতি স্থিতি ভিন্ন থেকেও ভিন্ন নাই, ওখানে সবই সম্ভব। আর সব সময় সব কথা বলবার খেয়াল হয় না। এ সব যে চমৎকার রাজ্য এই যে ক্ষণ, বিকৃত ক্ষণ পাচ্ছ, মহাক্ষণে এই স্থিতি অস্থিতি যা কিছু, থেকেও নাই এবং আছে। আবার সেই মহাক্ষণ খণ্ডক্ষণ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হ'বে না।

৮

আজ রাত্রিতে আবার ক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন—

মা ঃ ক্ষণ মানে সময়, কিন্তু তোমাদের এ সময় নয়। সময় মানে স্ব-ময়। যেখানে স্ব ছাড়া আর কথাই নাই।

প্রশ্ন ঃ গতির মধ্যে স্থিতি, স্থিতির মধ্যে গতি, এটা কি ?

মা ঃ বীজ মাটির সঙ্গে যেই যুক্ত হল, অর্থাৎ মিলল, যেই মুহূর্তে যে স্থিতি। এই স্থিতি হ'ল আর অঙ্কুরিত হওয়ার দিকে চলল। চলাটা ত গতি ? গতি মানে এক জায়গায় নাই। আবার জায়গায়ই ত ছিল। আর ছিল মানে আছে। গাছটা যত বড় হ'য়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা জায়গায়ই

আছে—সাময়িকও আছে। আবার পাতাটা বড় হ'য়ে যাচ্ছে, ঝ'রে যাচ্ছে, এক জায়গায় নাই। আছে আর নাই, একটা গাছেই ত। গাছে ফল আছে, তাই দেবে। দেবে মানে দেয়, উপমা ত সর্বাঙ্গীণ হয় না।

আবার ক্ষণের প্রসঙ্গে মা বলিলেন—

মা ঃ সব সময়ই ত ক্ষণ। যেমন একটি গাছে অনন্ত গাছ, অনন্ত পাতা, অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি, তেমন একটি ক্ষণের মধ্যে অনন্ত ক্ষণ, অনন্ত ক্ষণের মধ্যে একটা ক্ষণ। দেখ এখন গতি স্থিতি ঐ ক্ষণেই। তা হ'লে ক্ষণের প্রকাশ কথাটি আসে কেন? আসে এই কারণে, যেমন তোমার যে আলাদা আলাদা ভাব, ভিন্ন বোধে ত? তাই ভিন্ন আছে তোমার কাছে। এই যে তোমার কাছে ভিন্নত্ব রয়েছে, অর্থাৎ তুমি যে সৃষ্ট হয়েছ, সে সময়ে অর্থাৎ যে ক্ষণে সেই অনুযায়ী তোমার প্রকৃতি, তোমার চাওয়া, পাওয়া, পুষ্টি, জিজ্ঞাসা—সব। সেইজন্য তোমার জন্মের ক্ষণ আলাদা, তোমার মায়ের ক্ষণ আলাদা, তোমার পিতার ক্ষণ আলাদা, আলাদা প্রকৃত স্বভাব। তোমাদের যার যার লাইন অনুযায়ী এমন সময় এমন ক্ষণ পেতে হ'বে, যে যোগে তুমি যুক্ত রয়েছ তার প্রকাশ হওয়া অর্থাৎ মহাযোগ প্রকাশ হওয়ার জন্য। মহাযোগ মানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমাতে, তুমি তাহাতে, আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব'লেও কোন প্রশ্ন নাই। আছে নাই, নাই-ও না, আছেও না, তারো আগে, যা' বল তাই! সেই যে রূপেই হউক প্রকাশ হওয়া। যেই ক্ষণটা, সে সময়টা পেলে তুমি নিজেকে জানতে পারবে। তোমার নিজেকে জানা মানে তোমার পিতামাতা যে ক্ষণে প্রকাশ সেটাও পেয়ে যাবে। শুধু পিতামাতা নয়— বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমগ্র। যে ক্ষণের সূত্র ধ'রে এই হয়। নিজেকে জানা ত তোমার শরীরটাই জানা নয়,—যেখানে পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু, পরম পতি, আত্মা যা নিত্য আছে, পরিপূর্ণ প্রকাশ হওয়া। যেমন যেক্ষণে জন্ম হয়েছে, তুমি জান না, আর যে ক্ষণটি

পেলে 'আচ্ছা আমি এই'। যে মুহূর্তে, যে ক্ষণটায় তুমি, 'আচ্ছা আমি' এই ব'লে নিজেকে পেলে সেই মুহূর্তে তুমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পেয়ে গেলে। যেমন একটি বীজ পেয়ে গেলে অনন্তটি গাছ পাওয়া গেল। কাজেই সেই ক্ষণটি পাওয়া যে ক্ষণটি পেলে পাওয়ার বাকীর প্রশ্ন থাকে না।

অভাব আর স্বভাব এক জায়গায়ই—একমাত্র ঐ-ই। অভাবটা স্বভাবটা কি? তিনিই। কেননা একটা বীজই ত সেই গাছ, সেই বীজ, সেই রকমারীটি ঐ-ই ত। অভাব দিয়ে অভাব পূরণ করছ, তাই অভাব যাচ্ছে না এবং অভাববোধও যাচ্ছে না। সেই অভাববোধের যখন জাগরণ হয়, তখনই খাঁটি জিজ্ঞাসা। সেই অভাববোধটা আপনা বোধের অভাব হয় তাই খাঁটি জিজ্ঞাসা আসে, এটি জেনে রেখ। দুই বল, এক বল, অনন্ত বল, যে যা বল সব ঠিক।

৯

মা ঃ এ জীবের কথা বল্লে ব'লে এই কথা বলা হচ্ছে কিন্তু। যদি ঐ দিকের অমুক্ত দেখা থাকে তাহ'লে তিনি মুক্ত কোথায়? দেখাদেখি কোথায় সেখানে? কোন জায়গায় ত দেখাদেখি আছে। মুক্ত-অমুক্তের প্রশ্ন কোথায়?

যেমন তোমার হাত, তোমার পা, তোমার আঙ্গুল, তোমার মাথা—সর্বাঙ্গ নিয়া তুমি একটি জীব, এই ত বললে? আবার যদি তুমি এক জীব না বলিয়া তোমাতে অনন্ত জীব বল—তোমার সমগ্র শরীরে কত জীব, প্রতি লোমকূপে কূপে জীব গণিয়াও শেষ করা যায় না। তুমি বাড়ছ, তুমি কমছ, ইহার প্রত্যেকটা ভাবেই কত জীব! তুমি যে শিশুটি, এখন

বড় শরীর ব'লে তুমি কি সেই শিশুটি নও? তুমি সেই শিশুটি না থাকলে তোমার এই শরীরটাই বা কোথায়? এটা কিন্তু মিথ্যা কথা নয়। ঘরে গেছ, যাচ্ছ, আছ—এক সঙ্গে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সর্বক্ষণ। ধর না তুমি যখন যেই পা বাড়ালে ওখানে যাবে, সেই মুহূর্তে তোমার স্থান ত্যাগ, স্থান গ্রহণ, গতি স্থিতি। একটা গতিরূপে স্থিতি, আর একটা হল পা বাড়ালে। কোথায়? যেখানে ছিলে সেখানে। ধরা কঠিন।

সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হচ্ছে। এই যে সৃষ্টি স্থিতি লয় হচ্ছে তোমার মধ্যে, তোমার অন্ত বার কর। তুমি আছ, তাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে, তোমার মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। অতীত, ভবিষ্যৎ তোমার মধ্যেই—লোক পরলোক ইত্যাদি যা কিছু। সেই তুমি যদি মুক্ত অর্থাৎ তুমি যে মুক্ত তার প্রকাশ, তা হ'লে আর অমুক্তের প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে কি? তুমি আছ, বিশ্বজগৎ আছে—তাই কথা হলত। যেমন ঐ সময়ে কথা হ'ল না, সবটার মধ্যেই সব। তোমাকে রাম ব'লে ডাকা হল। কেউ বললে আমরা ত রাম দেখছি না, আমরা ত কমল দেখি। এ শরীর ত মিথ্যা কথা বলে না, একেবারে খাঁটি সত্য কথা। যেমন রাম সত্য, তেমন কমল সত্য। যেখানে মিথ্যা না দেখার স্থান সেখানে তা'ই যা বল।

একজনের একটা নাম ছিল। সে বললে আমাকে একটা নাম দেও। তখন কি সেই নামে সে বড় কি ছোট একটা কিছু হল? সে নামেও যে প্রীতি এ নামেও সেই প্রীতি। সাময়িক প্রীতি কম বেশী হ'তে পারে, কিন্তু নামের দিক দিয়ে সমানই ত। ঐ নামটা যেমন হয়েছিল, তেমন এ নামটাও হতে পারে ত। তুমি যেমন কমল, সেই রকম তুমি রাম একেবারে খাঁটি সত্য আছ। সেই দিক দিয়ে সেইরূপ সর্বনাম, সর্বরূপ, আবার অরূপও—প্রকাশ অপ্রকাশ অবস্থা বিশেষে—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা' কিছু তোমাতে। নিজকে পাওয়া মানে সব পাওয়া যখন নির্দ্বন্দ্বরূপে। বাস্তবিক একমাত্র

ঐই ত, মুক্ত সে একই।

এ শরীরটা বলে সবটার মধ্যেই সব—এ সব সময়ই ত বলে যেমন শরীরটা এলিয়ে যায়—যাচ্ছি একদিকে, চলে গেলাম আর একদিকে। সে সময় কিন্তু প্রশ্ন উঠে না এদিক ওদিক গেলাম ব'লে, যেমন রাম তোমাকে বল্লাম বলে প্রশ্ন উঠল। সত্যই যে সবটার মধ্যে সব সে ভাবে কথা বলা হ'ল। আবার হয় ত তোমার শিশু অবস্থায় বা বৃদ্ধ অবস্থায় তোমার সঙ্গে কথা বলা যেরূপ সেরূপ বলা হল। সেটাই এখন এ শরীরের বলা বা কথা কথাটা কেমন হয়ে যাচ্ছে। তোমার এত বড় বয়স থাকা সত্ত্বেও তোমার শিশু বয়সের শরীরের সঙ্গে কথা বলা হয়। এখানে কিন্তু মিথ্যা বা ভুল ভ্রান্তির প্রশ্ন নাই। তুমি বললে মাত্র মিথ্যা, ভুল—সেটাও সেই। এক সে-ই, সে-ই।

এখানে প্রশ্নের উত্তরে মা আবার বলিতে লাগিলেন—

মা ঃ এই যে শিশু, বৃদ্ধ ইত্যাদি অবস্থাগুলি ইহাদের অস্তিত্ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই কেবল নয়, একই সময়, একই জায়গায় কিন্তু। যে বলে একই সময়, একই জায়গায় দুটো জিনিষ থাকতে পারে না, সে একও পে'ল না, দুইও পে'ল না। কাজেই অনন্তই বা কোথায়? কোন স্থলে, এক, দুই, অনন্তেরও প্রশ্ন নাই, যেখানে পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নাই—যা' তা'ই। বুঝাবার জন্য বলা ত। আর যে এক পেল সে দুইও পেল, অনন্ত পেল—এক জায়গায় এক সময়েই। এই যে সর্বক্ষণ অভাবটা লেগে আছে তোমাদের সেটা কেন? এই যে না পাওয়াকে পেয়ে বসে আছ সেইটিই এইটি। তোমাদের দৃষ্টিতে এ একদিকের কথা, যেখানে একে সব, সবে এক।

এই যে ভাগবতের কথা সমগ্র কথা। কোন কথাই ত এদিকে নিলে বাদ যায় না। তেমন নিত্য নূতন হচ্ছে হবে, যেখানে যে ভাবের প্রকাশ।

কিছুই সেখানে বাদ নয় ত—খাঁটি সত্য প্রকাশ যেখানে।

প্রশ্নের উত্তরে আবার মা বলিলেন—

মা ঃ তোমার একদিকের দৃষ্টি আছে বলিয়াই প্রশ্ন কর—এটা কি সমগ্রটার অংশ অথবা এক জায়গায়ই সব? এ শরীরের কথা তুমি যা' বল। যেখানে সবেতে সব সেখানে অংশই বল, এক জায়গায়ই বল, এর কোনটারই বাদাবাদের প্রশ্ন নাই, অর্থাৎ কোনটাই বাদ যায় না। তোমরা যখন যে ভাবের কথা যতটুকু বলাচ্ছ তা'ই বলা হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে যতটুকু বাজাচ্ছ, শুনছ। মনে কর না এতে এ শরীরের মত। কোন মতামত নাই বল—একেবারে নাই। আছে বল, যা' বল তা'ই।

১০

আজ সন্ধ্যার সময় হিমাচল প্রদেশের চিফ্ কমিশনার Mr. Mehta সপত্নীক মা'র দর্শনে আসিয়াছিলেন। মা'র নিকট তাঁদের আসা এই প্রথম। মা উপদেশচ্ছলে তাঁদের কয়েকটি কথা বলিলেন—

মা ঃ বিশ্বাস যে হয় না এই বিশ্বাসে স্থিতি। যেখানে 'না' সেখানে 'হ্যাঁ' ও থেকে যায়। 'হ্যাঁ' ও 'না' এর অতীত কে? বিশ্বাস করতেই হয়। মনুষ্যের ভিতর যে বিশ্বাস ভাব আছে তাতেই ভগবানের উপর বিশ্বাস এনে দেয়। তাই মনুষ্য জন্ম বড় দুর্লভ। বিশ্বাস কা'রও নাই একথা বলা যায় না। কোন না কোন দিক নিয়ে বিশ্বাস আছেই।

মনের হুস্ মানে আত্মজ্ঞানের দিক্ আসা স্বাভাবিক। লেখাপড়া শিখবার সময় ছেলে ধমক খায়। ভগবানও মাঝে মাঝে একটু ধমক দেন, এটাই তাঁর করুণা। এই ধমকটা দুনিয়ার দৃষ্টিতে বড় কষ্ট, কিন্তু এতে

উল্টে যায়। এতেই শান্তির দিক্। যা' দুনিয়ার সুখ তা'ই উল্টে যায়, আর যা' পরমসুখ তার প্রতি গতি।

হ্যাঁ এ'ত শ্বাসের ঘর, এ'জন্যই কষ্ট। এখানে দু রকমের যাত্রী। এক ঘুরে বেড়াবার মত যাত্রী—দেশ দেখা, তামাসা দেখবার জন্যই যেন। আর এক স্বভাবের যাত্রা, আপন ঘর পাবার জন্য, অর্থাৎ আপনাকে জানা। ঘুরে বেড়াবার যাত্রায় দুঃখ। যতক্ষণ আপন ঘর না মিলে ততক্ষণ দুঃখ। ভিন্ন রুচি দুঃখ দেয়—দুঃখ দেয় দোষ থেকে, দুই ভাব থেকে। এইজন্যই বলা হয় "দু-নিয়া"।

যেমন সঙ্গ তেমন বিশ্বাস—এই জন্য সৎসঙ্গ। বিশ্বাস মানে আপনাকে মানা। অবিশ্বাস মানে অপরকে মনে করা।

কখনও ভগবৎ কৃপায় প্রাপ্ত হওয়ার দিক্, কখনও দেখা যায় তিনিই ভিতরে ব্যাকুলতা জাগান। কখনও অনায়াসে, কখনও বা কিছু তাড়না—সবই তাঁর করুণা।

সকলেই ভাবে, 'আমি করি'। সব কিন্তু ওখান হতেই চালান হয়, ওখানেই Connection, ঐ Power House—বোঝে লোকে আমি করি। কেমন সুন্দর—গাড়ী ফেল হয়, শত চেষ্টায়ও। এতে কি মনে আসে না —আমার এই চলন, বলন কোথা হতে? যার সহিত যখন যা, ব্যাস্—তার বন্দোবস্ত পাক্কা।

নিত্যসম্বন্ধ। আবার তাঁর খেলার মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ হচ্ছে, ভাঙ্গছে। দেখতে মনে হয়, ভাঙ্গছে, কিন্তু ভাঙ্গে না নিত্যই আছে। আবার কোনও দৃষ্টিতে সম্বন্ধের কথাই নাই। একজনের সঙ্গে শরীরটার দেখা হলে বলল—আপনার সহিত এ নতুন দেখা। এ শরীর বলল নিত্য নতুন, নিত্যই পুরাতন।

দুনিয়ার রোশনি আসে, যায়, ভাঙ্গে। নিত্য যে রোশনি সে কখনও যায় না—যে রোশনিতে এ রোশনি দেখছ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখছ, সে রোশনি তোমাতে নিত্য রয়েছে ব'লে, এ রোশনি দেখছ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বোধ করছ, তোমাতে সে মহাবোধ রয়েছে তাই না? সে মহাজ্ঞান স্বরূপ জ্ঞান নিত্য তোমাতে আছে তবেই না এ জ্ঞানের পরিচয়।

এ শরীরের কাছে কোন সময় এ ভাবেই আসা হয়ে যায়, টেরও পায় না। (মেহতার মা'র নিকট হঠাৎ আসা লক্ষ্য করিয়া এই কথা)।

দেমাক ত বৃক্ষের যেমন শিকড়; শিকড়ে জল দিলে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। কখনও বল দেমাক থেকে যায়। কখন? যখন বাইরের কাজে ঘোর। যখন ঘরে ফিরে আত্মীয় স্বজনের সহিত কথা বল মাথা হাল্কা, আনন্দ। এই জন্যই বলা হয়, দেমাকের কাজ আপনার জন্য, আপনার কাজে ক্লান্তি নাই।

আবার কথা—আপন কাজই ত, কিন্তু বোঝে কই? সমস্ত দুনিয়াই ত আপন, আপনি, আপনার, কিন্তু দেখে পর। নিজের বোধে দুঃখ নাই, পরের বোধেই দুঃখ। দুই বোধেই দুঃখ, দ্বন্দ্ব, লড়াই, মৃত্যু। পিতাজী, কিছু ত কর!

মেহতা—সবই ত তাঁর হাত।

মা ঃ এ কথাটাই সব সময় মনে রেখো, সবই ত তাঁর হাত। তোমার হাতের যন্ত্র—যা করাও। এই ভাবনাটায় বোঝ, 'সব তাঁর'। তবে আপনি হাল্কা। তাঁকে সমর্পণ করলে কি হবে?—আর কেহ নাই, সব আপনাই আপন।

ভক্তিতে গলাও বা জ্ঞানে জ্বালাও—কি গলবে, কি জ্বলবে? যা' গলবার, যা' জ্বলবার—(দোস্‌রা) পর ভাব। তখন কি হবে? আপনাকে পাবে।

গুরুশক্তিতেই সব হয়, গুরু কর। আবার সর্ব নাম তাঁর নাম, সর্ব রূপ তাঁর রূপ—একটা নেও। আবার তাঁর নাম নাই, রূপ নাই—অনামী নিরাকার। নাই আছে তাঁর মধ্যেই সম্ভব। যতক্ষণ গুরু না মিলে,—যে রূপ, যে নাম ভাল লাগে। আর নিত্য প্রার্থনা—তুমি আমার সদ্‌গুরুরূপে প্রকাশ হও। গুরু ত অন্তরে—অন্তরগুরু না মিললে হ'ল না কিন্তু। ইচ্ছা না হলে routine বেঁধে নেও, যেমন ছেলেরা পড়ার সময় করে—duty বেঁধে ফেলে।

যতক্ষণ বলা না আসে—ভাব, কেন আমার এ সব ভাল লাগে! বাইরের দৃষ্টিতে যদি কিছুতে রুচি বা কারও উপর আকর্ষণ থাকে, তবে খেয়াল করা চাই—আরে, আমি এই স্বাদে পড়ে আছি! ভগবান কোথায় নাই ? গৃহস্থ-গৃহস্থাশ্রম, সেও ত একটা দিক্। আশ্রম হিসাবে গ্রহণ প্রয়োজন। তা হলেই ধর্মের দিক্ অনুকূল। তবে যদি কিছু চাও, ভগবান কিছুমাত্রই দেবেন—নাম যশ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। কিন্তু তৃপ্তি নাই। ভগবানের পূরা রাজ—পূরা রাজ না পাওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি নাই। তিনি কিছু দিয়ে অতৃপ্ত করে রাখেন। অতৃপ্তি না হ'লে আগে বাড়ান হয় না। অমৃতের সন্তান মৃত্যুতে সন্তুষ্ট থাকে না। তিনিও রাখেন না, তাই অভাব জাগানও তাঁর স্বভাব। এজন্য ভগবান কিছু দিয়ে ছটফটানি বাড়িয়ে দেন। এটাই আগে এগোবার রাস্তা। যে চলে তার বড় কষ্ট, কিন্তু যে দেখতে জানে, বেশ দেখে এগিয়ে যাচ্ছে। এই যে হাহাকার, এতে দুনিয়ার রস জ্বালিয়ে দেয়। এজন্য তপস্যা। যা' বিঘ্ন করে তার ভিতর থাকে তাপ। যেমন বিগড়ে গেলে জ্বলন হয়, তখনই ত হুস এসে গেল।

১১

মা'র কোন কথায় মীমাংসা পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাবলাম মা'র এই সব কথা লিখে লাভ কি? মাকে জিজ্ঞাসা করলাম। মা বল্লেন—

মা ঃ ওখানে যে মীমাংসা হয় না তাই পেলে। মীমাংসা ত অনেক করে এসেছ। এখন মীমাংসার অমীমাংসায় যেতে হবে ত?—অর্থাৎ মীমাংসা অমীমাংসার পারে যেতে হবে। তোমার এই মনের মীমাংসা যেখানে সেখানে দিক্ থাকিয়া গেল ত। কাজেই বিরোধ থাকে, কেননা এ মীমাংসা এক দিকেরই। তবে মীমাংসা কিসের পাবে?—সমস্ত মতের পূর্ণাঙ্গীন মীমাংসা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে। আবার দেখবে সব মতেরই এক জায়গায় মীমাংসা, কোন বিরোধ নাই। তখন কি হবে?—মীমাংসায় অমীমাংসায় প্রশ্ন তুলবে না হ্যাঁ যা' বল তো।

১২

রামেশ্বরী নেহেরু ঃ জহরলালের ভ্রাতৃবধূ—আজ সন্ধ্যায় মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল—ধ্যান কি অভ্যাসে হয়, না পূর্ব সংস্কার থাকিলে হয়?

মা ঃ দুই ভাবেই হয়—পূর্ব সংস্কার বা উপস্থিত অভ্যাস অথবা দুটোতেই হতে পারে। রোজ অভ্যাস করবে।

দেখ, সংসারে আছে কি? এখানে কিছুই স্থায়ী নয়। সুতরাং চাওয়া তাঁর কাছে। প্রার্থনা করবে—এ যন্ত্র দ্বারা যেন শুদ্ধ কর্ম হয়। প্রতি কাজে তাঁর চিন্তা। চিন্তা যত শুদ্ধ হবে কাজ তত সুন্দর হবে। দুনিয়াত আজ

আছে কাল নাই। কাজেই সেবার ভাব নিয়ে থাক—তুমি এই ভাবে সেবা নিচ্ছ। শান্তি চাও ত তাঁর চিন্তা।

প্রশ্ন ঃ দুনিয়ার শান্তি আসবে কবে?

মা ঃ এখন ত এই রকমই, এ রকমই হবার।

প্রশ্ন ঃ কবে এর অন্ত হবে?

মা ঃ এই তোমাদের চিন্তা এসেছে, কবে অন্ত হবে। এও তাঁরই একটা প্রকাশ।

জগৎ মানে গতি। গতিতে ত স্থিতি নাই। আবাগমন হইতে শান্তি কোথায়? শান্তি ত যেখানে না আসা, না যাওয়া; না গলা, না জ্বালা। তাঁর দিকে উল্টে যাও, তবে শান্তির আশা।

তোমার জপ ধ্যানে তোমার সঙ্গীদের ও কল্যাণ সঙ্গের প্রভাব।

ধ্যানে মন লাগলে, ছেলেদের পড়াতে বসবার মত মারপিট করে অভ্যাস কর। দাওয়াইতে ভাল হয়, ইন্‌জেক্‌সনে ভাল হয়। ইচ্ছা না হ'লেও কর, কষ্ট করিয়া কর।

জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার টানিয়া আনে, দুঃখ দেয়, তবুও চেষ্টা করা। উহাতে শক্তি লাভ হয়, গড়ে অর্থাৎ তৈরী হয়। মনে কব—যত কষ্ট হউক, আমাকে করিতেই হইবে। প্রতিষ্ঠা প্রশংসা দুদিনের, সঙ্গে যাবে না।

ভগবানের দিকে মন না গেলেও লাগাও। এমন ধাক্কা খাবে উল্টে যাবে। এই তাঁর করুণা। বড় কষ্ট হয়, কিন্তু ধাক্কা থেকেই শিক্ষা হয়।

মনের যে অহঙ্কার আছে তাকেই ধমকে বসাও। মন লাগে না লাগে —এতটা পর্যন্ত করবই, এ ত আপন কাজ। এতদিন বন্ধনের কাজ করে এসেছ, তাই ফিরে ফিরে বন্ধনেই যেতে চাও। কিছুদিন চেষ্টা করলে

বুঝবে। আরে, আমি এই নিয়ে পড়ে আছি, যত করবে তত আগে বাড়বে।

অর্পণের দিক্ যেখানে নিত্য আপনাকে অর্পণভাব রাখতে রাখতে কখন অর্পিত হয়ে যাবে। আত্ম-সমর্পণের দিক্ আর কি? ছোটি বাচ্চীকী বাত ইয়াদ রাখ।

১৩

আজ শ্রীকান্তি ভাই মুন্সী আমেদাবাদ হইতে এখানে আসিয়াছে। কে একজনার কথা বলিল—সে আসনে বসে আর তার হাতে নানারূপ দ্রব্যাদি —ফুল, মালা, মিঠাই ইত্যাদি—আপনা হইতে আসিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মা ঢাকার এক মা'র কাহিনী বলিলেন—

মা ঃ এ রকম ত শরীরটায় সাধারণতঃ হয় না। এ শরীরের সামনে ত এ জাতীয় কত কত এসেছে। কিন্তু এবার কি রকম হয়ে গেল। ঐ মা এলে পরেই তার কোলে শোব শোব এই রকম একটা ভাব। কোলে শুয়েই দেখলাম মা'র পেটের কাপড়ে পোটলায় কিছু জিনিষ আছে। সকলে এই মাকে অনুরোধ করতে লাগল, দৈব প্রেরিত বস্তু এনে দেখাতে। কেননা পূর্বে এ রকম অনেককে দেখাতেন। লোকে শুনেছিল, দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর প্রসাদও আপনা হ'তে তাঁর হাতে এসে পড়ে। এ শরীর বলে উঠল, ওখান হতে আসবার আগেই বে'র করে দিতে পারি, কিন্তু —বে'র করব? ঐ মা বলিল—হ্যাঁ। আমি যতবার বলি, ঐ মা বলে হ্যাঁ, আর ভক্তেরাও বলে, হ্যাঁ। তখন ত এই সব কাণ্ড। এ শরীর ত হাতে করে বে'র করল না কিছু, কিন্তু আপনিই যা' হ'বার হ'ল।

ঘটনাটি ঘটে যাবার পর ঐ মা'র এক ভক্ত এ শরীরকে জিজ্ঞাসা করল, —মা, তুমি ত কারও ভাব ভঙ্গ কর না, বিশেযতঃ সকলের সামনে। তবে এ ক্ষেত্রে এ রকম করলে কেন? আমি বললাম—হ্যাঁ, সাধারণতঃ সব সময় ভাব ভঙ্গ ত করে না এ শরীরটা, জানইত তোমরা। কথা এই—এ শরীরে আজ পর্যন্ত যা' যা' হয়ে গিয়েছে, হচ্ছে—সাধারণ হতে সাধারণ আর অসাধারণ হতে অসাধারণ, তোমরা যা' বল—এ শরীরের ত সবই যা' হয়ে যায়। যে দিন ঐ মা এল, তাকে আদরে এ শরীর নিজের আসন দিয়ে বসাল, মালা পড়াল। বেশ সকলেরই আনন্দ হয়েছিল না?—সব রূপেই ত তিনিই। সেদিন ত আর কিছু বলে নাই এ শরীর। তিনি স্ব-ইচ্ছায়ই বল্লেন, তোমরা শুনলে না, 'আমি আবার কাল আসব।' তিনিই আবার এইরূপে প্রকাশ হলেন। কি করবে বল, তিনি যখন যাকে যেরূপে শিক্ষা দিবেন—এ শরীরের ত, যা' হয়ে যায়।

যখন সকলকে প্রণাম করা হ'ত—পোকা, মাকড়, কুকুর, বেড়াল হ'তে সব বস্তুতেই 'তৎ' জ্ঞানে প্রণাম।

যা' হয়ে যায়। আর এক কথা। যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তার কল্যাণ নাই। মিথ্যায় মিথ্যাই মিলে। আবার মিথ্যাও সত্যরূপে পরিণত হয়। নিজে জানেন করছেন মিথ্যা, কিন্তু শিষ্যের সত্য ভাবনা হতে সত্য প্রকাশিত হয়। ফলে শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করে চলে যায়। সত্য সঙ্কল্পে সত্য প্রকাশ স্বাভাবিক। ঐ মা'র ভক্তটিকে বললাম—কতবার ত তোমাদের জিজ্ঞাসা করলাম বে'র করব? তোমরা বললে—হ্যাঁ। কাজেই আর কি বলা।

কত রকম হয়। আর একটি মেয়ের কথা শুন। তার একটু কিছুতেই যেন সমাধি হ'ত কেউ কেউ মনে করত। পড়ে থাকত, হাত পা ঠান্ডা। এ শরীরটার কাছে এসেও এমন হ'ল, যেন সমাধি। মেয়ের মা গ্রাম সম্পর্কে

এ শরীরের দিদিমা হয়। আমাকে বল্ল, নাতিন, এর একটা ব্যবস্থা কর। আমি বুঝতে পারলাম কেন তার এই অবস্থা। কানে কানে বললাম—'শীঘ্রই তোমার স্বামীর পত্র পাবে'। এর পর হতেই মেয়েটি ভাল হয়ে গেল। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল, সকলে ভাবল, না জানি মা কানে কানে কি মন্ত্র দিয়ে গেল। অবশ্য এ অবস্থায় এটাই তার মন্ত্র। স্বামীর খবর না পেয়ে মেয়েটির এরূপ অবস্থা হয়েছিল।

এখানে একটি ছেলের কি হ'ত—কত রকম ভাব, কত দর্শন; প্রণাম করতে গিয়েছে, হয়ত ঘন্টার পর ঘন্টা পড়েই আছে—মাথা তোলে না, চোখে অশ্রু-প্রবাহ। হয়ত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এসে অর্জুনকে গীতার উপদেশ করছেন, এই সব কত কি দর্শন ও শ্রবণ হ'ত, সে বলত।

এ শরীর তাকে বলল—আপন মন যদি সাধনায় বশে না থাকে তখন উল্টা-সিধা অনেক কিছু দেখা বা শোনা হয়। কখনও Spirit বা কোনও শক্তির অধীন হয়ে পড়ে। এতে ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ব্যাকুলতা ত আসেই না, বরং বিশেষ বিঘ্ন। আর এই যে কেহ আসে, কিছু বলে, এতেও নিজের কি রকম ভোগ হয়ে যায়। বেবশ হওয়া ভাল নয়। পরমার্থ চিন্তায় বেবশ না হ'য়ে যা প্রকাশ সেদিকে চেতন থাকা চাই অর্থাৎ স্ব-বশে। বেবশ মানে অজ্ঞান হয়ে পড়া ঠিক নয়।

বুদ্ধদেব—বোধস্বরূপ। যত যত বোধ আর অন্ত, বোধস্বরূপ। সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ, ভাবস্বরূপ। যেরূপ আত্মজ্ঞানীর পরমার্থ স্থিতি সেইরূপ প্রেমের রাস্তায় গিয়েও পরে একটা পরাকাষ্ঠা আছে—প্রেমামৃত অভিন্ন প্রকাশ। এখানে ভাবোন্মাদনার স্থান নাই। নইলে মহাভাব প্রকাশ হ'তে পারে না। দেখ একটা কথা। সমস্ত সাধনার লাইনে সেই যে পরাকাষ্ঠা আছে, সেই চরম কথা যদি না থাকে তা'হলে ঐ ধারায় তুমি নিজে ধরা পড় নাই। প্রেমের পরাকাষ্ঠায় যে মহাভাব সেখানে কিন্তু এসব আসে

না। এ তুলনা দিও না, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা।

ধ্যানে শরীর বোধ থাকে বা না থাকে, দেহাত্মবোধ বিশেষ থাকে বা না থাকে, জাগ্রৎ চাই, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া চাই না। একটা সত্তাবোধ—স্বরূপ লক্ষ্যই হউক, মূর্তি লক্ষ্যই হউক। এই ধ্যানে কি হয়? প্রকাশের দিক্ খোলে—যা নিত্য। হয়ত শরীরে কোন ব্যথা বা দরদ ছিল, ধ্যানের পর দেখ গেল বাঃ, শরীর ঝরঝরে, কোন গ্লানিই নাই। যেন কত সময় গেল, উদ্বেগের কোন প্রশ্নই ছিল না। এটা ভাল। কিন্তু এই যে আনন্দের প্রথম সূত্র নিয়ে পরে ডুবে কোথায় ছিলাম বলতে পারি না, জানি না, এটা ভাল নয়। কিন্তু ঠিক ধ্যানের দিক্, যেখানে যতটুকু স্পর্শ হয় ততটুকুই বাহিরের সবের ভিতরেও যেন আনন্দই আনন্দ।

ধ্যানের মধ্যে এই যে আপনা গায়েব হয়ে যাওয়া, যেন জড়বৎ, পরে উঠে বড় আনন্দে ছিলাম, এই আনন্দ বিঘ্ন। প্রাণশক্তি জড় মনে হওয়া, যেমন গাঢ় নিদ্রার পর আনন্দ বোধ, এখানেই কিন্তু আটকাইয়া থাকে। এটা আসক্তি—এই যে আসক্তি এটা ধ্যানের বিঘ্ন, যদি বার বার একই জায়গায় স্থিত থাকা হয়। এটা দুনিয়ার দৃষ্টিতে অবশ্য আলাদা, মনে হয় বেশ আনন্দদায়ক, উন্নতির দিকে ত বটেই। এক জায়গায় স্থিত বলে বিঘ্ন, আটকাইয়া থাকা আর কি?

ধ্যানে আপনাকে চিন্ময়, আত্মজ্যোতি, আত্মারাম, যার যার গুরুর আদেশে ইষ্টরূপ লক্ষ্যে মনকে স্থিত রাখতে চেষ্টা করা। ছেলেটি বুদ্ধিমান, এই জাতীয় আলোচনা বুঝতে পারল। এর পর হতে তার এই ভাবটার পরিবর্তন হ'ল। বেশ শান্তভাবে এখন ধ্যান ইত্যাদি।

আজ রাত্রিতে আবার ধ্যান, আসন ইত্যাদির প্রসঙ্গ উঠল। মা বলতে লাগলেন—দেখ, এই যে ঘন্টার পর ঘন্টা আসনে কেটে গেল; আসনে মস্ত্। যদি এক ছাড়া অন্য আসনে বসলে ধ্যান না হয় তা'হলে তোমার

আসনে ভোগ হচ্ছে। এটাও বিঘ্ন। জপ ধ্যানে বসবার জন্য প্রথম দিকে এক আসনে দীর্ঘ সময় বসবার চেষ্টা ত করাই উচিত। আসন যখন সিদ্ধের দিক্—কতক্ষণ আসনে ছিলাম এই প্রশ্নই নাই, যতক্ষণ যে আসনে খুসী—শুয়ে, ব'সে, দাঁড়িয়ে বা কাত হয়ে,—যার যে আসন—আপন লক্ষ্য বা ইষ্ট হ'তে সরবার প্রশ্ন না উঠা।

প্রথম হ'তে আরম্ভ করে, আসনে না বসে থাকতেই পারে না। বাইরের কিছু ভাল লাগে না, কতক্ষণে সেই আসনে বসে ইষ্টকে নিয়ে অন্দরে আনন্দে থাকব সেই যে আকর্ষণ, ঐ তোমার স্থির হ'তে আরম্ভ হয়েছে, মঙ্গলের দিক্। এখানে আসনের দিকেই কিন্তু লক্ষ্যটা বিশেষ। তেমন যে আসনে যতক্ষণ যেমন থাক—ইষ্ট যে তোমার কখনও অনিষ্ট করে না—, তাতেই যদি স্থির থাকতে পার, সেই প্রধান, তখন আসন সিদ্ধির দিক্ই আর কি। ওঠা, বসা, চলা বা শরীরের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীতে থাকা একটি ক'রে আসন। শরীর মনের যেমন গতি, আসনও তেমনই। কারও হয়ত গুরুর নির্দেশে বা আসনে বসবার নিয়ম যা' আছে সেই নিয়মে ধ্যান লাগে, অন্যটায় লাগে না। এই ধ্যানাভ্যাসের উপায়। ধ্যানাভ্যাসের প্রারম্ভে কেহ বা হয়ত সাধারণ আসনেই বসে। কিন্তু যখন ঠিক মত ধ্যান বা জপ চলে তখন যেমন আপনা হ'তে উদ্গার এসে যায়, তেমন আপনা হ'তে ঠিক মত আসনে বসিয়ে দেয়। তাই ধ্যান জমলে আপনা আপনি সঙ্গে সঙ্গে আসনও জমে। যেমন tyreএ pump কম থাকলে ডেবে থাকে, আবার pump পুরো হলে বেশ স্বাভাবিক স্থিত হয়ে যায় সেই রকম ধ্যান জমলে শরীরের জড়তা যায়, উঠবার সময় শরীরে কোন ক্লান্তি বা অঙ্গ-ব্যথা বা ধরে থাকা, এটা হয় না।

ঠিক ধ্যানে স্পর্শ হয়। যেমন অগ্নি স্পর্শ হ'লে একটা দাগ থেকে যায় তেমনি এই ছোঁয়াও দাগের মত। এতে কি হয়?—বিঘ্ন হটে যায়।

ফলে বৈরাগ্যে জ্বালায় বা ভক্তিতে গলায়। বিষয় ফিঁকা বোধ হবে, যেন আল্‌গা আল্‌গা। জাগতিক কথা বলতে ভাল লাগে না, নীরস,— ক্রমশঃ কষ্টদায়ক। বিষয়ের দিকে কোন কিছু হারালে বা লোকসান হ'লে মন ব্যাকুল হয়, বিষয় মনকে পাকড়াও করে রেখেছে যে। ইহাই গ্রন্থি। ধ্যানে কি জপে বা পরমার্থ যে কোন ক্রিয়ায় যার যে ক্রিয়ায় যার যে লাইনে এই গ্রন্থি ঢিলা হয়। বিচার আসে, বিষয় কি মালুম হয়ে যায়। প্রথমে বিষয়ে আটক ছিল, আসে ছটফটানি। যখন আলগা হয়, তখন ক্রম, প্রকাশ বিকাশে নানা Stage এর ভিতর দিয়ে এসে তবেই না দেখা যায়— সবটাতেই সব, এক আত্মা বা সকলেরই ঠাকুর, সকলেই দাস বা সকলেরই এক প্রভু— যা'র যে দিক! প্রত্যক্ষ বোধ হয় যেমন আমি আছি, তেমনি সবই আছে। আবার একমাত্র তিনিই— না কিছু আসে, না কিছু যায়। আবার আসেও, যায়ও, ভাষায় সব প্রকাশ কোথায়? যেমন যেমন বিষয় বাসনা হ'তে আলগা হবে। তেমন তেমন ভগবানের দিকে গতি।

ধ্যান যখন হয় তখন আসন আর বাধক নয়, ভোগ নয় অর্থাৎ এই আসনে বসলে ধ্যান লাগবে আর ওতে লাগবে না। এমন কোন কথাই নাই। সিধে বাঁকা যেমন ভাবেই বস না কেন দেখবে আপ্‌নে আপ্‌ আসন হয়ে তোমার শরীরকে ঠিক ভাবে বসিয়ে দিচ্ছে। আবার কোন সময়ে কোনও আসনের অপেক্ষা রাখে না। যে অবস্থায় থাক সেই অবস্থায়ই ধ্যান হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কোন স্থলে এমনও আছে, কোন বিশেষ আসনে —পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদিতে—বসিয়া গেলে মহাযোগে কোন কালেই তার বিক্ষেপ ঘটায় না।

১৪

এখানে ভাগবত-সপ্তাহ শেষ হইয়া গেল। রাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন— "যাহার উদ্দেশ্যে এই সপ্তাহ করা তাহার কল্যাণ হইল তো?" মা ঃ হ্যাঁ! দেখ, ভাল মন্দ যে কাজই করা যায় তাহা এদিকে সাতপুরুষ আর ওদিকে সাত—এই চৌদ্দ পুরুষের উপর ক্রিয়া করে। বলে না তোর চৌদ্দ পুরুষ রসাতলে যাবে। আবার একজন যদি তেমন হয় চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়।

আজকাল তো ভোগের জন্য কত পয়সা উড়িয়ে দেয়। এ দিকের জন্য খরচ করলেই বলে বৃথা ব্যয়। কিন্তু এই যে পাঞ্জাব হতে কোটি কোটি টাকা ফেলে আসতে হল—এ কেন?

তবে এ হবারই কথা। এই রকমই সংযোগ। সংযোগ থাকলে কোথা হতে কে এসে কিভাবে উপস্থিত হয়। দেখ না, এই ভাগবত-সপ্তাহে যার যে ভাগ নেবার। সংযোগ থেকে যায়। ভাল মন্দ সবই সংযোগ থেকেই হয়।

প্রশ্ন ঃ সংযোগে কার্য শুরু হয় অথবা পূর্ণ হয়।

মা ঃ এক তো যোগ নিত্য আছেই। দ্বিতীয়তঃ যেখানে অভাব সংযোগে কিছুটা পূর্ণ হলো। আবার কারও শুরু হলো—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। কোন কোন অংশে পূর্ণ হওয়া, আবার কোন কোন অংশে শুরু হওয়া।

এক তো মিলবার ছিল, পূর্ণ হ'ল; আর যেটা হবার তার শুরু; আর আছেই তো। কোন কোন জায়গায় আরম্ভ আর খতম। যেমন জন্ম পূরণ করার জন্য জন্ম আর খতম এক জায়গায়!

যতক্ষণ পূর্ণ প্রকাশ না হয়, ততক্ষণ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—কার্যে সংযোগ থেকেই যায়। থেকে যায় কি, আছেই ত। বিয়োগ কখনও হয়

না, হয়ে ছিলোও না, হবেও না।

প্রশ্ন ঃ এই সব কথা শুনতে বলতে বেশ লাগে, অনুভবে আসে না যে।

মা ঃ এই সব কথা শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে ঐ দিকের রাস্তা খোলে। জান, যেমন পাথরে জল পড়ে পড়ে ছিদ্র হয়, আবার হয়ত কোন সময় বন্যা এসে পড়ে, প্রকাশ হয়ে যায়।

গ্রন্থপাঠ, সৎকথা, কীর্তন, সব তাঁকে নিয়াই—তাঁর পাঠ, তাঁর কথা, তাঁর কীর্তন।

তিনটাই অভেদ। অভেদ হয়েও তিন আকার, কারণ গ্রহণ পৃথক্ পৃথক্ —যার যেটা।

আসলে ভগবানই তো। তাঁর দিকে যাবার জন্য এক এক রাস্তা। কোন রাস্তা কারও জন্য—আপন অধিকারে রুচি।

মনে কর বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ। এর মধ্যে কেহ কেহ বিলকুল ডুবে যায়। যেমন কেহ কেহ কীর্তনে আবেশে মগ্ন হয়, সেইরূপ এই বেদান্ত পাঠেও এমন মগ্ন হয় যা হয়ত কীর্তনে হয় না। সে যে লাইনে চলছে সেই লাইনের পাঠ বা যা কিছু তাতেই মগ্ন।

প্রথমে শ্রবণ, তার পর মনন। অবশেষে নিজ নিজ কর্মরূপে প্রকাশ। সেই জন্য প্রথম শুন, তার পর বেদান্ত, কীর্তন, যার যে লাইনে নিয়ে যাবে।

দেখ না বলে—আরে, কীর্তনে আবার কি আছে। পরে যখন শুনল, কীর্তনই ভাল লেগে গেল।

এই জন্য শ্রবণই প্রথম চাই, পরে মনন। তার পর কর্মে বিশেষ প্রকাশ। সৎ কথা শোনা তো ভাল যদি তিনি দোষ দর্শন না করান। দোষ দর্শনে সকলেরই বিঘ্ন হয়। সমতা রেখে যা বলে তাতে ফল হয়। কেন না যেখানে অসৎ দৃষ্টির কথা নাই সেটাই সৎসঙ্গ।

বৈষ্ণব কাকে বলে? যেখানে সর্বত্র সেই বিষ্ণু। শাক্ত কে? যে এক মাকেই দেখে। সর্ব ভাব এক জায়গা হইতেই স্ফুরিত— কার নিন্দা, কার হিংসা, সমতাই ত।

তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি স্বামী, তুমিই সব। সর্ব নাম তোমারই নাম, সর্ব গুণ তোমারই গুণ, সর্ব রূপ তোমারই রূপ। আবার সেই অরূপে নিরাকারে, যে লাইনে চলবে। আবার বলে না শৈবের যে পরমশিব—সেই ব্রহ্ম। আর আত্ম-দৃষ্টিতে এক আত্মা। বিরোধ ত আসেই না। বিন্দুমাত্র ভেদদৃষ্টিতেও সেই স্থিতি কোথায়?

তাই যে লাইন লও—ঐ 'বেদান্ত ত ভেদ অভেদের যাহা অন্ত' সাধনায় চলিবার সময় এক দিক্ দেখ; পরে আর কি? ভেদের অন্ত। সাধনায়ই ভেদ, ফলে ভেদ কোথায়?

১৫

একটি পাঞ্জাবী মাই আজ সন্ধ্যায় মা'র কাছে আসিয়াছিল। মা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

মা ঃ রোজ ভগবানের নাম কর তো?

উত্তর ঃ হ্যাঁ মা, কিন্তু মন স্থির হয় না যে?

মা ঃ চেষ্টা কর।

পাঃ মাঃ ছেলেরা বড় উৎপাত করে। এমনি সময় যদি কিছু না-ও করে, যেই দেখে তাদের মা পূজায় বসেছে অমনি তো গোল আরম্ভ করবেই।

মা ঃ আরে; সমুদ্রে ছোট বড় কত ঢেউ আসে, তার মধ্যেই ডুব দেওয়া।

পাঃ মা ঃ মা, বড় ক্রোধ হয়।

মা ঃ ক্রোধ ভাল নয়।

পাঃ মা ঃ পারি না যে।

মা ঃ এক কাজ কর, যেদিন এ রকম ক্রোধ হবে, সেদিন দেখবে খাবার মধ্যে সব চাইতে স্বাদিষ্ট বস্তু কি আছে। ঐ বস্তুটা আর সেদিন খাবে না। কেন না অপরাধ হয়েছে। কেমন, মনে থাকবে তো?

পাঃ মা ঃ হ্যাঁ মা।

১৬ [ক]

সেবাজী ঃ যার কর্মানুযায়ী আবার পুনর্জন্ম হইয়া গিয়াছে তারও কি শ্রাদ্ধের ফল প্রাপ্তি হয়?

মা ঃ হ্যাঁ। এক গল্প শুন—

এক পণ্ডিত আর এক ফকির। দুজনায় ভারী মিত্রতা। একদিন পণ্ডিত ভারি সুন্দর কাঁঠালের গন্ধ অনুভব করিতে লাগিল— এ যেন নিজে কাঁঠাল খাইলে যেমন একটা ভরপুর গন্ধ সেই রকম। কোথা হইতে এই কাঁঠালের গন্ধ? এখন তো কাঁঠালের সময়ও নয়। বারমেসে কাঁঠাল যদি হয়। পণ্ডিত সমস্ত বাগান খুঁজিয়া দেখিল, কোথায়ও কাঁঠাল নাই।

বন্ধু ফকিরকে বলিল। ফকির বলিল, "চল আমরা নদীর ঐ পারে যাই।" নৌকায় দুজনায় নদীর পরপারে এক গ্রামে গিয়া দেখে, একজনা শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর ঐ শ্রাদ্ধে একটা কাঁঠাল দেওয়া হইয়াছে। ফকির বলিল— "এই তোমার পূর্বজন্মের পুত্র বুড়ো বয়সে তোমারই শ্রাদ্ধ করিতেছে। তুমি খুব কাঁঠাল ভালবাসিতে। তাই তোমার পুত্র অনেক

খুঁজিয়া একটি বারমেসে কাঁঠাল তোমার শ্রাদ্ধে দিয়াছে।”

প্রশ্ন ঃ যার কেহ নাই, শ্রাদ্ধ হয় না, তার কি গতি?

মা ঃ আপনার যোগ্যতা অনুসারে যদি পরমপদের দিকে যাবার চেষ্টা করে, যেমন করে তেমন গতি।

পুত্রের কর্তব্য পিতার শ্রাদ্ধ করা। তাহাতে পিতার গতির সহায়ক হয়। যার পুত্র নাই, তার জন্য অপর কেহ করে; যেমন স্বামী করে স্ত্রীর জন্য, ইত্যাদি। যে বিবাহ করে নাই— তার সাহারায় পড়ে থাক তিনি যা করেন। ভগবানই টেনে নিবেন। এক কথা মনে রাখা। একমাত্র ভগবানই ত আছেন—স্ত্রী, পুত্র, পতি ইত্যাদি না হলে উদ্ধার হবে না, এ কোন কথাই নয়।

যিনি সৃষ্টি করেছেন তার ব্যবস্থা পাক্কা। মনে রাখবে— তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু। ঘাবড়াবার কারণ নাই।

সন্ন্যাসী যারা ঘর থেকে বাহির হয় তাদের ফিকির থাকে কি? ফিকির থাকলে কি ফকির হতে পারে? বিষয়ের মধ্যেই এই সব কথা। আবাগমন হইতে ছুটি হইলে আর কি?— শ্রাদ্ধ করে বা না করে।

যে নিজে সাধন করিতে পারে না, তার পুত্রাদিতে যা করে তাতে সাহারা পায়। পিতাই খোদ পুত্র। আরে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করবার চেষ্টা।

একটা গল্প শোন—

এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ঠিক হয় গঙ্গাতীরে শব দাহ করান হইবে। গঙ্গা অনেকটা দূরে ছিল। রাত্রিকাল, শব বহনকারীরা অনেকক্ষণ শব বহন করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টিই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক কোন এক জায়গায় শব নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। কখন তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঐখানে এক বৃদ্ধা ছিল, অত্যন্ত

শোচনীয় অবস্থা। তার ভাবনা—হায়, যদি কোন প্রকারে গঙ্গাতটে গিয়া মরিতে পারিতাম।

শব বহনকারীরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে এই ফাঁকে উঠিয়া কোন প্রকারে শবকে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজেই সেই খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল। একে রাত্রিকাল, তাতে আবার ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাতারাতি সকলে শ্মশানে গিয়ে শব দাহ করবার জন্য বহনকারীরা খেয়াল করিল না, তাহারা বৃদ্ধাকে লইয়া চলিল। গঙ্গাতটে পৌঁছিতেই বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। সকলের যখন খেয়াল হইল তখন পূর্ব শবের খোঁজ পড়িল। ভাঙ্গিতে কোথায় শব ফেলিয়া দিয়াছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল উহা কোথায় পচিয়া গলিয়া রহিয়াছে।

যার গঙ্গাপ্রাপ্তি ছিল, সে এই ভাবেই পাইল; যার ছিল না তার জন্য সকল চেষ্টাই বিফল। যার যেখানে যাহা প্রাপ্তি ভগবান সংযোগ করে রেখে দেন।

বিশেষ কথা,—কর্ম নিজেই প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার। দেখা করবার কারও উপর ভার না দেওয়া, আপন হাতে করা। অন্যকে দিয়া করাইলে কর্মের হিস্যা তার মধ্যেও চলে যায়। এইজন্য কিছু কর তো নিজের হাতে, দেখ তো স্ব-চক্ষে, শোন ত স্ব-কর্ণে। কারও উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়।

মনে রাখবে—যে কর্ম নিয়াছি তাহা পূর্ণরূপে করব। অবশ্য মায়া কখন কি করে বলা যায় না, তথাপি নিজের চেষ্টা।

এক হয় ভুল হয়ে গেল বা অসমর্থ। সে তো আলাদা কথা। আপনার ত্রুটি না থাকে, দৈবযোগে অন্য রকম হয়ে গেলে নিজের মনে শান্তি থাকে, অনুশোচনা থাকে না—আমি তো কোন ত্রুটি করি নাই। কর্মে পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য থাকে।

এইজন্য সাধন-মার্গে যাহারা চলিয়াছে সর্বদা খেয়াল—আমার ত্রুটি না থাকে, সমস্ত—কর্মের মধ্যে চেষ্টা। এতে কর্ম ক্ষয় হয়। মনে ক'রো—কর্মরূপে তুমি আমার কাছে। কর্মকে পুরো করা। যে কর্ম নিয়াছি তাহা পূর্ণ করতেই হবে, আমার কর্তব্য। তখন ভগবানই ঐ কর্ম পুরা করে দেন।

এজন্য চোখ দিয়াছেন—একমাত্র তুমিই আছ, হাত দিয়া তাঁর সেবা। পা দিয়া তাঁর পরিক্রমা; মন যেন সারাদিন তাঁর সেবা করে, তাঁর সেবক; ভজন কর, তাঁরই আহুতি।

শয্যাতাগের সময় ভাব না—তুমিই যন্ত্ররূপে বা তোমার যন্ত্র। এই যন্ত্র দিয়া যেন সারাদিন শুভকর্ম হয়। সমস্ত কর্ম তোমার সেবা এবং সেবায় লাগে। মনে সৎ-চিন্তাধারা। ভগবানের নাম করা আর প্রণাম।

রাত্রে শয্যা গ্রহণের সময় প্রার্থনা—সারাদিন যা করালে তোমার চরণে সমর্পণ। আর তন্ন তন্ন করে সারাদিনের কর্ম দেখা। যদি ভুল থাকে, প্রার্থনা—ক্ষমা কর, আর যেন ভুল না হয়। সব কার্যই যেন শুদ্ধ হয়। নাম করা, প্রণাম করা মনে মনে হইলেও তাঁকে ধ্যান ক'রে তাঁর পায়ে মাথা। অবশেষে—আমার দেহ মন সবই তোমার পায়ে অর্পণ। এই ভাবে শুয়ে পড়া।

নিত্য নিত্য অর্পণ ভাবে থাকতে থাকতে কে জানে কখন অর্পণ হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়, তাঁর দয়ায়। এইজন্য সর্বদা অর্পণ বুদ্ধি রাখতেই হবে।

১৬ [খ]

কেশব সেনের পৌত্রী মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। সে বলিল আমি ধ্যানে বসি। সাকার তো চাই না, নিরাকারই বা কি করে আসে। কিন্তু দেখি কোন কোন সময় ধ্যানে কি সব রূপ ভেসে উঠে।

মা ঃ যে রূপ আসে তাই ধ্যান কর, দেখ ভগবান কোন রূপে

প্রকাশ হন। সকলের জন্য সকল রূপ নয়। কারও রাম, কারও শিব, কারও পার্বতী, কারও বা নিরাকার। নিরাকার তো আছেই, কিন্তু স্বয়ং যে আকারে ঐ আমার রাস্তা দেখাবে। সুতরাং যে এসে গেছে তন্ন তন্ন ক'রে তাঁর ধ্যান করা।

এই রকম কর—প্রথমে আসনে ব'সে মূর্তি ধ্যান, তারপর মূর্তি আসনে স্থাপন ক'রে প্রণাম, তারপর জপ। তারপর আবার ক'রে তাঁকে হৃদয়ে স্থাপন ক'রে উঠে পড়া। সংক্ষেপে এই কর না, যদি তোমার সেই ব্রহ্ম ধ্যান না আসে।

ভাব থাকবে—আমার যা মঙ্গল তিনি করবেন, করছেন সর্বদাই।

ভাববে—তিনি আমার সহায়তার জন্য এইরূপে প্রকাশ হয়েছেন। তিনি আকারও, নিরাকারও। তাঁর ভিতর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তিনি। এইজন্য বলা হয়—সদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু, জগদ্‌গুরু সদ্‌গুরু।

তোমার জন্যই এই কথা। সকলের জন্য সকল কথা নয়। যতই তাঁর ধ্যান করবে ততই এগুতে পারবে। আকার রূপে এসে গেছে তাও তুমি, আবার নিরাকারও তুমি—দেখ কি এসে যায়।

১৭

মা ঃ অহেতুক কৃপা ?—নিশ্চয়ই, কৃপা ত অহেতুকই। কাজ করলে ফল পেতে। পিতার সেবা করলে, সেবায় সুখী হয়ে তোমাকে একটা দান করে দিলেন, এটা কর্মের ফল। কর পাও। আর স্বভাবতঃ যে পিতা পুত্রের নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে, সেটা কোন কর্মের অপেক্ষা ত রাখে না। পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু—সবই ত সে। কাজেই হেতু কোথায় ?

তাঁর, তিনি যে ভাবে আকর্ষণ ক'রে নিবেন নিজকে প্রকাশ করবেন বলে। তোমাদের যে ইচ্ছা জাগরণ তাঁকে পাবার জন্য সেই ইচ্ছাটি দিল কে? সেই কর্মটি দিল কে?

তাহা হইলে ভেবে দেখ, তাঁর থেকেই সব আসছে। কোন শক্তি তোমাতে, কোন পটুতা তোমাতে, তুমিই বা কোথা হ'তে তাঁকে পাবার জন্য, আবরণ নষ্ট করার জন্য? যত ইতি সবই ত তাঁর নিকট হ'তে আসে। তবেই তুমি তোমাকে পাবার চেষ্টা কর। একটা নিঃশ্বাসও কি তোমার অধীন? তোমাকে যতটুকু কর্তা বোধে তিনি রেখেছেন সেই কর্তা ভাবটি যদি—আমি ভগবানকে পাবার চেষ্টা করব—এটা বোঝ, তবে তোমার লাভ। আর এই কর্তাটুকু ভগবান দূরে আছেন, দূর বুদ্ধি—এই ভাবটা নিজের বাসনায় যতটা লাগাবে সেইটিই অকর্ম। তাঁহারই প্রকাশ সবেতে বিচার রাখা। যেখানে ভগবান বলে মানলে, ঈশ্বর বলে মানলে, সেখানে দয়া, কৃপা, করুণা, প্রার্থনা সবই যে যে রূপে তুমি স্থিত হ'বে সেই সেই আকারে তিনি প্রকাশ হ'বেন। যেমন দীন হ'লে দীন-দয়ালের প্রকাশ হ'ল।

যদি বল, তিনি করেন না, আবার করেনও, তাঁকে কর্তা বানাচ্ছ তিনি ত অকর্তা। তুমি নিজে কর্তৃত্বাভিমানে আছ, তাই তাঁকে কর্তা বলছ।

হ্যাঁ, তাঁকে যাই বল তাই তিনি। আবার দেখ না, যেখানে 'তৎ' কোন কর্মে, কার কাছে কর্তা হবেন? তিনি স্বয়ং। তিনি পা নাই চলেন, চক্ষু নাই দেখেন, কান নাই শোনেন, মুখ নাই খান, সেই যে বল না, সে-ই।

সাধক যখন বিগ্রহ-পূজা আরম্ভ করে ক্রমোন্নতিতে এক অবস্থায় ইহা হয়। 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফূরে।' এও আমার ঠাকুরের মধ্যে সমস্ত ঠাকুর আছেন। আমার ঠাকুরের মধ্যে সকলের ঠাকুর এবং সব আছে আর সকলের ঠাকুরের মধ্যে আমার ঠাকুর রয়েছেন এবং সব

রয়েছে। আমার মধ্যেও এই ঠাকুর রয়েছেন ত, আর সকলের মধ্যেও এই ঠাকুরই ত? জলে, স্থলে, গাছে, পাতায়, লতায়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার ঠাকুর আছেন। আবার এই যে আকার প্রকার দেখা যাচ্ছে, এই আকার, এই রূপেতে কে? আমার ঠাকুরই ত, আর ত কেউ নয়? ছোট থেকে ছোট, বড় হ'তে বড়।

তোমাদের নানা সংস্কার অনুসারে এক এক ঠাকুর যার যার তার তার আলাদা। যার যতটা ভাব তার ততটা লাভ ত। যতটা উন্নত হ'বে ততটা তার ইষ্টমূর্তিতে বিকাশ প্রকাশ পাবে সেই সেই অনুসারে। এক কালে আলাদা থাকবে না, ঠাকুর ধরা দিবে অনন্ত রূপেতে। নিজ সংস্কার বলে যখন প্রকাশ সর্ব—হবে। আবার সর্বেতে যখন নিজের সংস্কার ধরা পড়বে। সেও একটি দিকের কথা। নিজেকেও আলাদা বাদ দিতে পাচ্ছ না।

এই যে নানারূপ পশু, পাখী, মানুষ ইত্যাদি সকল, এই সকলগুলি কি? আকার, প্রকার, প্রকাশটা কি? রূপগুলি যে বদলিয়ে যায় সেইগুলিই বা কি? আস্তে আস্তে যেহেতু তার ঠাকুর আর সেই ভাবে বিভোর, তৎভাবে থাকে কি না—সর্ব রূপেতে আমার ঠাকুর প্রকাশিত। বালুকাকণাও বাদ যায় না। জলে, স্থলে, মানুষে, উদ্ভিদে, পশুপক্ষীতে মাত্র সেই ঠাকুর বনেছে। এক এক জনের এদিকটাও খুলে যায়। সকলের এক রকম হ'য়ে প্রকাশ হয় না। অনন্ত কিনা, কাজেই কার যে কোন দিক্ দিয়া গতি ধরে সম্পূর্ণ প্রকাশ হ'বে সেটা সাধারণের অগোচর।

ভাগবত ব্যাখ্যা কালে গাছ, লতা, পাতা, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর ইত্যাদি ভগবানের বিরাট শরীরের কথা ঐ যে শোনালে, দেখ একটা সময়ে এটা আসে, এই সর্বটা, বিরাট শরীরের কথাটাও, একটা সময়ে এটা কিন্তু আসতেই হ'বে।

তিনি রূপে অনন্ত কি না, অন-অন্ত কিনা, কোন সংখ্যা দিতে পারে

না। অতএব অনন্ত রূপ তাঁর, যত ইতিরূপ সৃষ্টি হ'চ্ছে, লয় হ'চ্ছে আমার সেই ভগবানের। এই এই ভাবেতে বিশেষ ভাবে যত বিস্তার হ'বে ততই অসংখ্য রূপেতে স্থিতি আসবে। অসংখ্যেতে নানা আকার প্রকার, নানা রূপের প্রকাশে অন্তহীন, সংখ্যাহীন এবং অন্ত ও সংখ্যা। সেই স্থিতিতে সাধকের যখন প্রবেশ হয় তখন রূপের যে পরিবর্তন, ভাবের যে পরিবর্তন, এটার মধ্যে দৃষ্টি পড়ে। বিচার জাগরণ হয়, অর্থাৎ বিচার রূপেতে যে তিনি তার প্রকাশ হয়। সুকৌশল বলে যে কথাটা আছে না—সকলের যে চিন্তার ধারা জগৎমুখী—সেই চিন্তার ধারাটা ফিরে সুকৌশলে অর্থাৎ সেই স্বয়ং কৌশল রূপেতে যে বলেছেন তার প্রকাশ হয়। তখনই আচ্ছা এই যে পরিবর্তনশীল জগৎ নিত্যই বদলে যাচ্ছে, নাই হ'য়ে যাচ্ছে, সেই নাই রূপেতে কে? নাইটা যেমন আছে আবার যখন যেরূপের প্রকাশটা সেটা না হ'লে পাবে কি করে? অন্তহীন রাজ্য, যেখানে তুমি নাই বলে দেখতে পাচ্ছ, নাই রূপটাও সত্য, তাঁরই একরূপ। যেখানে চিন্ময় রাজ্য—যখন যেরূপ নিত্য রয়েছে। কাজেই একজায়গায়, নাইও আছেও যুগপৎ, নাইও না আছেও না, আরও চল।

আচ্ছা, তা হ'লে আমার ঠাকুর জল আর বরফ যেমন আছে। আমার ঠাকুরের কোন রূপ নাই, গুণ নাই, কোন প্রকাশের প্রশ্ন নাই। সেই স্থিতিতে যখন নিজেকে পেল। ঠাকুর পাওয়া, নিজেকে পাওয়া মানে ভগবানই ত আপন, এ আমার নিজস্ব, নিজের। আর আত্মাই ত একমাত্র। তখন ইহার মধ্যে সময়োপযোগী ঋষিদের যেমন মন্ত্র দর্শন হ'ত তার ভিতর স্থানো-পযোগী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের যেমন প্রকাশ, মন্ত্রের স্ফুরণ এবং বেদের পূর্ণাঙ্গ যেখানে, যেটা প্রকাশ সেটা স্থানে স্থানে যার যার কর্ম ভাব অনুসারে প্রকাশ হ'তে বাধ্য হয়। যখন রূপ অরূপের আকার সাধকের কাছে প্রকাশ হ'ল সর্বাঙ্গীণ ভাবেই ত। তাতে ভাবের যে রূপ, শব্দ ব্রহ্মের যে যোগ—নানা জাতীয় ভাষা, অন্তহীন ভাষা, শব্দব্রহ্ম রূপেতেও। অনন্ত শব্দের

আকার, প্রকার প্রকাশের দিকগুলি তার কাছে মূর্ত হ'য়ে প্রকাশ হওয়া ত —সমস্ত আকার সাদৃশ্য হ'য়ে প্রকাশ যেখানে। হ্যাঁ, আকারশূন্য, আকার যে শূন্য এইরূপ— জগৎ শূন্য রূপ প্রকাশ হ'য়ে মহাশূন্যে যায়। কারণ এই যে জগতের মধ্যে শূন্য দেখতে পাচ্ছ এটা প্রাকৃতিক রূপ ত, কাজেই এই শূন্যটাও একটা রূপই। এই শূন্য হ'তে মহাশূন্যে যেতে হ'বে।

বোধ আসবে— যে বোধ তোমার জগৎ বোধে দেহ মন প্লাবিত করে এতকাল তাহাতে ভাসিয়ে বেঁধে রেখেছিল, সেই বোধগুলি বিশ্ববোধে পরিণত— বোধ-দেবরূপে প্রকাশ হ'লেন। বোধ-স্বরূপ— সর্ববোধ 'স্বরূপ' যেখানে এসে গেল, স্বরূপেতে কি হ'লেন, ভাব। রূপ অরূপের বোধ অসংখ্য রূপেতে যেখানে প্রকাশ, যখন সমগ্র নির্মূল। আকার, প্রকার প্রকাশ রূপের স্থান চ্যুত হ'য়ে অরূপের স্থিতিতে গেলেন, তখন কি বলবে?—পরমাত্মাই ত। জীবাত্মা যেখানে পর পর সেই সমগ্র বন্ধনরূপে সেই আবরণ মুক্ত কিনা— পরমাত্মা স্বরূপ। যেখানে স্বরূপ স্থিত—।

দেখ আর একটা কথা। যে যে লাইন ধরে চলে না। কারও কারও বেদান্ত লাইনে চলতে চলতেও ঋষিপন্থা স্ফুরিত। আবার কাহারও কাহারও বিগ্রহাদির মধ্য দিয়াও ভজন পূজন যোগ ইত্যাদি লক্ষ্য করে চলার দিক্ দিয়ে যেয়েও ঋষিপন্থা স্ফুরিত হ'তে পারে। আকাশ-বাণী ইত্যাদি যা বল না, সে সব বাণী শব্দ রূপেতে সম্পূর্ণ ভাষা ভাব যোজনা হ'য়ে প্রকাশ হ'তে হ'তে সেই বাণীতে নিজেতে অভিন্নত্বের দিক— স্বয়ং তিনি এই রূপেতে প্রকাশ। যে যে লাইনেই চলুক না কেন ঋষি-পন্থা ইত্যাদি সব কখন যে কোন আকারে, প্রকারে, প্রকাশে কাহার স্ফুরিত হ'বে। এমনই স্থান সাধারণের ধরা কঠিন।

আচ্ছা, এইস্থানে যে যে লাইন দিয়ে চলল— ঐ যে বলা হ'য়েছিল

মূর্ত রূপেতে, সেই মূর্ত রূপেতে কি ?— না, অমূর্ত আত্মরূপেতেও তিনি। আচ্ছা, তাহ'লে অমূর্ত আত্মরূপেতেও তিনি, মূর্ত রূপেতেও তিনি। যখন কেহ সহজভাবে বেদান্ত লাইনে আত্মস্থ। জলই যে বরফ সেটাও যাইতে পারে বিগ্রহের দিকটা। তখন দেখে সমস্ত বিগ্রহ— জলেতে বরফরূপে, চিন্ময়রূপে তিনি। বরফে কি আছে?— জলই আছে। অতএব 'সর্ব' এই যে আবরণ রূপেতে, পর্দা রূপেতে, সে বরফেরই stage by stage থাকে না, হাল্কা বরফ, কঠিন বরফ। আবার যেখানে বিশুদ্ধ সেখানে কিন্তু stage by stage এর কোন প্রশ্ন নাই। বরফ যদি গলবার দিক, বরফ হ'য়েও আছে ত, হ'তে পারে ত। অতএব বরফ রূপেতে যে আছে, সে জন্যই স্বয়ং, নিত্য অনিত্যের প্রশ্ন কোথায় ?

তা'হলে তোমরা যে বল না দ্বৈতাদ্বৈত, এখানে দ্বৈতও বটে অদ্বৈতও বটে। যেমন তুমি পিতা, পুত্র, পতি। পতি না হ'লে পুত্র কোথায়, পুত্র না হ'লে পিতা কোথায় ? তাহ'লে কোনটাও কম ক'রে না। উচ্চস্তর এবং নিম্নস্তরের কথা সেখানে আছেই। যেটাই বলবে সম্পূর্ণ। উপমা ত সর্বাঙ্গীণ হয় না, যতটুকু বুঝিয়া লওয়া। অতএব জল ও বরফের নিত্যত্ব। তাই তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। যেখানে সাকার অর্থাৎ বরফের দিক্‌টা— নানা আকার, প্রকার, প্রকাশ চিন্ময় বিগ্রহ রূপেতে। এক এক দিক দিয়ে এক এক রূপ বিশেষ লক্ষ্য করে।

যেখানে সম্প্রদায়,— স্বয়ং ভগবান আপনাকে আপনাতে প্রদান করছেন, জীবের জীবত্ব চিনবার দিক। সে-ই—জল বরফ। বরফেতে কি ? জলই। যেখানে দ্বৈতাদ্বৈত,— দ্বৈতও বটে অর্থাৎ রূপ আছে, রূপ নাই, এদিকটা বোলে নিলে।

আবার এই যে দ্বৈতও বটে, অদ্বৈতও বটে, এ ভাষায় ভাসে কোথায় ? এরূপ স্থান ত আছে। ভেদও বটে অভেদও বটে। আর সত্যি

কথা তিনি ভেদরূপেও, অভেদরূপেও। এদিক দিয়েও জগৎ দৃষ্টিতে দেখ না, ভেদ ত মানছই। নিজেকে পাবার জন্য যেখানে চেষ্টা করছ ভেদ দৃষ্টি ত বটেই, নিজে আলাদা করে মানছ জগৎ দৃষ্টিতে। এদিক্ দিয়ে ভেদ ত পেয়েই যাচ্ছ। হ্যাঁ, জগৎ ত নাশের দিক, সত্যি কথা— স্ব না, সে না। নিত্য থাকছে না। এই রূপটাই বা কে, ভাব। আচ্ছা, যায় কি, আসে কি? —গতি দেখ না, সমুদ্রের দিকে স্বয়ং স্ব মুদ্রারূপে। এই যে তরঙ্গ, জলেরই ত ঢেউ, জলেতেই ত লয়। আর জলই ত ঢেউতে। তারই সব অঙ্গ ত ঐ জলে তরঙ্গ। জল— বরফ, ঢেউ হবারও মূলে কি? — এটাও ত একটা স্থানের কথা, ভেবে দেখ। উপমা সর্বাঙ্গীণ হয় না। তবে জগৎ দৃষ্টিতে দেখলে ত, আসলে কি পেলে, দেখ। যেখানে তুমি সাকার রূপেতে পেলে, নিরাকার রূপে পেলে। আবার তাকেই এই চিন্তায় ধরা যায় না, সেটাও তুমি পাবেই।

ইহার ভিতরে যে সকাম সগুণ রূপেতে প্রকাশিত নিত্য যিনি আছেন। আবার নিরাকার নির্গুণ— গুণ অগুণের কোন প্রশ্নই নাই, শুদ্ধ অদ্বৈত। তোমরা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম বল না। শুদ্ধাদ্বৈত যেখানে সেখানে কোন রূপ, গুণ, ভাব, অভাব কোন প্রশ্ন দাঁড়ায় না। যদি বল এইটাই তিনি, এটাও তিনি, তবে ও'র মধ্যে রয়ে গেলে 'ও' আলাদা মেনে নিলে। সে, ও আর কোন প্রশ্ন নাই। সেই স্থিতিতে একমাত্র। যেখানে নির্গুণ ব্রহ্ম, গুণাগুণের প্রশ্ন নাই সেখানে একমাত্র আত্মা। দেখ, যেখানে সগুণ, সাকার, রূপেতে মানছে। একাগ্র সেই আকার রূপেতে, এখানে আর অরূপের কথা দাঁড়াবে না— এই একটা স্থিতি। সেখানে সগুণও বটে, নির্গুণও বটে, সেখানেও একটা স্থিতি। চিন্তা ক'রে বাহির করা যায় না— সেই যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সেও একটা স্থিতি। আবার যে বৈদিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির দিক দিয়ে এল এই যে বলা হ'ল সব সেই স্থিতিতে সেই সেখানে পূর্ণ, পূর্ণের থেকে পূর্ণ গেলেও পূর্ণই থাকে। বাদ দিয়ে

কিন্তু নয় সম্পূর্ণ নয়, বাদাবাদী তাঁর মধ্যেই। যে লাইনেই যে চলুক রকমারী ভিন্ন মাত্র। সবটার মধ্যেই মন্ত্র আছে, ভাব আছে, ত্যাগ আছে, গ্রহণ আছে, পাবে কি?— সেই নিজেকেই ত। নিজ কে?— প্রভু দাস, পূর্ণ অংশ, আত্মা যে, যে লাইনে চল স্বয়ং তাঁকেই পাওয়া নিজেকে পাওয়া।

দেখ, স্বয়ং ভগবান যেখানে মানলে সেখানে ভগবৎ শক্তি। ভগবতী-ভগবান— স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ হিসাবে দেখছ ত। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের প্রশ্ন ত থাকে না। সে স্থানও ত আছে, আবার আলাদা আলাদা ক'রে পাওয়া যায় সে স্থানও আছে। কুমারী কাহারো অধীন নয়— সে স্বয়ং সেই ঐ শক্তিরূপিণী। শক্তিই যেখানে মানলে সেখানে কি, না সত্তা রূপেতে। স্বরূপা এবং অরূপা, শুধু শক্তিই তাঁর এক রূপ, এও কিন্তু। যেখানে ভাব আর ক্রিয়ার প্রকাশ সেখানেই রূপের......প্রকাশ—এও। আবার শক্তি-রূপেই যদি বলি স্বয়ং ভগবতী, তাঁর যে অনন্ত শক্তির প্রকাশ রয়েছে। আবার মহাশক্তি যাহা মূল, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। বৃক্ষের মত, শাখা, প্রশাখা মূল হইতে সেরূপ শাখা প্রশাখা...কত দেবতা দেবী, সেই শক্তির নানা প্রকাশ। শিবের শিবত্ব, নির্বিকার সব, মানে মৃত্যুর মৃত্যু যেখানে, সেখানে অমৃত, নাম শিব। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যেখানটায় পাচ্ছ, সৃষ্টি রূপেতে সেই হ'চ্ছে, স্থিতি রূপেতে সেই স্বয়ং মহাবিষ্ণুর দিক, যা বল। আলাদা আলাদা স্থান হিসাবে স্বয়ং সেই সেইরূপ, প্রকাশ নানা ভাবে এবং অরূপে। একেতে অন্য সবই; বিভিন্নেতে সেই এক দেখ। যেমন একরূপ দেখলে অন্যরূপ দেখতে পাওনা। কিন্তু এক এক রূপেতেই সর্ব, সর্ব রূপেতেই সেই এক। শূন্যেতে পূর্ণ, পূর্ণেতে সেই শূন্য। রকমারী দিক— মূল, সেই ত প্রকাশ স্থূল। অন-অন্ত— এক এক দিক দিয়ে বলতে গেলেও অন্য কোথায় হ'বে। যতটুকু ততটুকু অন্তেরও দিক। সত্তারূপে কি? সেই আত্মা পরমাত্মা যা' বল। ভগবান যেখানে মানলে, ভগবৎ শক্তি মানলে, ঈশ্বর, ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য ইত্যাদি ত তিনিই। আচ্ছা, তা'হলে ভগবান অকর্তা। কেন না তিনি

ত কোন ক্রিয়া করেন না। কার্য করেন তবেই না তার কর্তা। সর্ব কার্য কারণ রূপেতে যিনি স্বয়ং, কার্য কারণের কর্তা অকর্তার প্রশ্ন কোথায়? অতএব তিনি এখানে অকর্তা। তাঁহার মায়া যেখানে, ঐশ্বর্য, ঐশ্বরীয় শক্তির বিকাশ প্রকাশ সেখানে, যন্ত্র রূপেতে সেখানে সেই প্রকাশটি কে?—সেই ত হ্যাঁ। চল, অচল, তোমাদের যে একদেশ দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে আবরণ রূপেতে। কর্তা অকর্তা রূপেতে তোমরা যা বলছ—তোমরা কর্তা অকর্তা রূপেতে যেখানে নিবদ্ধ বলেছ সেই দৃষ্টিতে ভিন্ন আসা স্বাভাবিক—যা বল তাই। অতএব সেই ভাবেতে সেরূপ দেখাটা। দৃষ্টি সৃষ্টির ভঙ্গিতে।

আবরণ পর্দা যতক্ষণ, ততক্ষণ এই যে এদিক দেখা, শোনা—এইটা নষ্ট না হ'লে ঐ প্রকাশ কোথায়? অতএব নাশ, নাশে যা এত সব দিক রূপেতে আছেন সেই তিনি। আচ্ছা, এই যে নানা সম্প্রদায়, নিজেকে তিনি প্রদান করবেন বলে সুন্দর এক একটা ধারায় আছেন তাহার ভিতরে কথা হ'ল এই—তিনি স্বয়ং সর্বরূপে, অরূপে, নানা ভাবে প্রকাশিত। রাস্তারূপেতে যার যে সংস্কার সেই অনুসারে পন্থা অবলম্বন ক'রে তিনিই তাঁকে আকর্ষণ করছেন। নানা দিক—সম্প্রদায় রূপে দাঁড়িয়ে। যদি কোথায়ও কোন স্থানে তোমাদের বিরোধ হয় বলে যা বলেছ যাহা তোমাদের সংশয়। এ শরীর ত কিছুই বাদ দেয় না। এক এক সম্প্রদায়ে যেখানে গেলে তার সবটাই প্রকাশ হ'বে। অতএব এক একটি দিক দিয়ে অর্থাৎ সম্প্রদায় দিয়ে আলাদা বলে তোমরা মনে যে দ্বন্দ্ব অনুভব করছ, ইহাত হ'তে পারে যে লাইন দিয়ে যে পূর্ণাঙ্গীণ প্রকাশ তিনি সেই সম্প্রদায়ে যা বলে গিয়েছেন ঐখানে গেলে হ'তে পারে বাকীটা আপনিই প্রকাশ হ'য়ে যাবে। সম্প্রদায়ে এও ত হ'তে পারে।

এই যে বল্লে, এটা ত রাস্তা, একটা স্থিতি। হ্যাঁ এ ত সত্য কথা,

এতটুকুই যদি প্রকাশ থাকে তা'হলে ত হ'ল না। কারণ বিরোধ ভঞ্জন, সেই রূপ প্রকাশটা চাই ত। যেখানে নির্বিরোধ পূর্ণাঙ্গীণ প্রকাশ। সেটা না হ'লে ততটুকু মাত্র প্রকাশ হ'লে ত হ'ল না। যে প্রকাশে কারও সঙ্গে বিরোধ থাকে না। সম্পূর্ণ যত ইতি মত, পথ-সম-অগ্র। সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ যেখানে। বিরোধ ত আর স্থিতি নয়। হ্যাঁ এক নিষ্ঠায়—ইষ্ট নিষ্ঠার জন্য যার যার লাইনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ বিচারে চলা উচিত।

কর্মফলের দিক দিয়েও দেখনা যে দিকে যে ভাবে অখণ্ড লক্ষ্যে অখণ্ড কর্ম, সেখানে কে হচ্ছেন প্রকাশ? সেই অখণ্ডই ত। অথচ কর্ম মাত্রেই সেই অখণ্ড স্বয়ং প্রকাশ আছে যার তাহারই জন্য, চেষ্টা জীব স্বভাবতঃ করে যাচ্ছে। স্বভাবেই স্বভাবের কর্ম, স্বভাবেই স্বভাবের কর্মের টান। স্বভাব, স্ব, স্বয়ং আত্মা বল, যা' বল, তিনিই আমিই।

১৮

প্রশ্ন ঃ যখন সমাধিতে চিত্ত থাকে তখন উহাতে কোন চমৎকার প্রকাশ হয় কি না? যদি হয় তবে ধ্যেয় বস্তু হইতে চ্যুত হওয়া হইল কি না? আর উহার মূল কারণ কি?

মা ঃ সমাধি মানে সমাধান—

প্রশ্ন ঃ সমাধান কোন প্রশ্নের হয়, সমাধি পৃথক্ বস্তু।

মা ঃ এ শরীরে শাস্ত্রের ভাষায় কথা হয় না। এ শরীর জল, মাটি, হাওয়া, এসব সাধারণ বস্তু লইয়াই কথা বলে। যে সমঝদার এই টুটী ফুটী ভাষায় বুঝিয়া লয়। সমাধান বলিতে যেখানে রূপ, অরূপ, ভাব, অভাব সব কিছুর সমাধান। এক প্রশ্নের সমাধান আর যেখানে প্রশ্নোত্তরের প্রশ্ন উঠে না ঐ সমাধান— উহাই সমাধি।

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ। সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প আর নির্বিকল্প।

মা ঃ এক হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক সত্তাতে পরিণত হওয়া, আর হয় সত্তারও কথা নাই।

প্রশ্ন ঃ সত্তারও কথা নাই! তবে উহা কি?

মা ঃ সংকল্প বিকল্প থাকিলে সবিকল্পও নয়। সবিকল্প সত্তাবোধ। যেখানে সত্তারও প্রশ্ন নাই—কি যে আছে, আবার কি যে নাই! ঐ স্থানে ভাষায় ব্যক্ত কতটুকু বল? ঐ নির্বিকল্প। এখানে চমৎকার দাঁড়ায় কোথায়?

প্রশ্ন ঃ চমৎকার অর্থাৎ অলৌকিক বস্তু যাহা সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। মনের অবশ্যই বিষয় আছে। মন মানিলে মনের কল্পনাই মনের বিষয়। মন হইতে পৃথক্ কোন বস্তু ত আছে—চিৎ, পূর্ণ যাহা বল। ঐ বস্তু ছাড়া মনের যাহা অবলম্বন তাহাই চমৎকার।

মা ঃ চমৎকার কে দেখে?

প্রশ্ন ঃ মন।

মা ঃ মন না থাকলে ত চমৎকার দর্শন হয় না। সুতরাং নির্বিকল্পে দর্শন কিরূপ?

প্রশ্ন ঃ আমার বিচারে আসে দুই প্রকার সমাধিতেই মন থাকে। শাস্ত্রে বলে নির্বিকল্প সমাধিতে মন থাকে না। অবশ্য এই স্থূল মন ত থাকেই না, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে লীন থাকে ইহা মানিতেই হইবে। নতুবা ব্যুত্থানে অনুভব হয় কি করিয়া? অর্থাৎ ব্যুত্থানে উহা স্মরণ হয় কি না? যদি হয় তবে সূক্ষ্মরূপে মন থাকে বলিয়াই মানিতে হইবে।

মা ঃ কেহ কেহ বলে লেশ থাকে। লেশ না থাকিলে শরীরের প্রকাশ কি করিয়া? এ শরীরের এত ত কথা—সব জ্বালাইতে পারে আর এই লেশটুকু জ্বালাইতে পারে না? যেখানে অনুভূতি সে ত মনেই। মন

যেখানে সেখানে চমৎকার।

প্রশ্ন ঃ যদি লেশ চলিয়া যায় তবে শরীর থাকে কি করিয়া? কি অবস্থায় লেশ চলিয়া যায়? প্রারব্ধ অবস্থায়, কি প্রারব্ধ অন্তে?

মা ঃ পিতাজীর কি মত? হ্যাঁ, কেহ কেহ বলে এই মন নয়। এ শরীরের ত সেই কথা, সব জ্বালায় আর প্রারব্ধ জ্বালাইতে পারে না?

প্রশ্ন ঃ প্রারব্ধ জ্বালাইলে শরীর থাকে কি করিয়া?

মা ঃ তবে কি শরীর যতক্ষণ ততক্ষণ প্রারব্ধ আছে এবং মনও থাকা উচিত? হ্যাঁ, এ শরীর যদি মান প্রারব্ধ ত মানতেই হবে। আর মনও তুমি যেভাবে বললে মানা উচিত। শরীর মানে পরিবর্তন যা সরে যায়। যেখানে মৃত্যুর মৃত্যু বলিয়া কথা সেখানে কি আর শরীরের প্রশ্ন দাঁড়ায়?

প্রশ্ন ঃ যখন চমৎকার দেখা যায় তখন মুখ্য স্থান হইতে চ্যুত হওয়া হইল কি না?

মা ঃ আসল স্থানে পৌঁছিলে চমৎকার, চ্যুত হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্নই নাই। বিদেহ মুক্তি কাহাকে বলে?

প্রশ্ন ঃ এই শরীর ত্যাগ হইলে আর শরীর ধারণ না করা।

মা ঃ আচ্ছা, শরীরই কি বাধক? পতন হয় কি তা' হ'লে?

প্রশ্ন ঃ না, নির্বিকল্প সমাধির ফলোদ্দেশ্য জ্ঞানাদেশ।

মা ঃ সমাধিকেও এক অবস্থা বলে। অবস্থা হইতে সবই হইতে পারে। যে যে স্থিতিতে থাকে সেখানকার জ্ঞান ত হবেই।

প্রশ্ন ঃ তাহা হইলে ধ্যেয় হইতে চ্যুত হওয়াই হইল।

মা ঃ ধ্যেয়ের প্রকাশ, ধ্যেয়রূপে প্রকাশ হইলে আর চ্যুত কি? অর্থাৎ ধ্যেয় যদি স্বয়ং প্রকাশ হয় তবে আর চ্যুত কোথায়?

প্রশ্ন ঃ ঐ চমৎকার বাসনা মূলক নয় কি?

মা ঃ যার বীজ তারই প্রকাশ; নইলে হয় কি করিয়া?

প্রশ্ন ঃ পুকুরে তরঙ্গ। তরঙ্গ জলের স্বভাব নয়—বায়ুতে তরঙ্গ—কি করিয়া নির্বাসনা হইবে?

মা ঃ বীজ যতক্ষণ ভাজা না হইবে ততক্ষণ অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে। আচ্ছা, তোমার মতে স্বরূপ জ্ঞানে শরীর থাকে কি না?

প্রশ্ন ঃ আমি ত বলিব থাকা উচিত।

মা ঃ হ্যাঁ, কেহ বলে ত লেশ লইয়া?

প্রশ্ন ঃ আচার্যের উপদেশ জ্ঞান হইতে না অজ্ঞান হইতে?

মা ঃ অজ্ঞান ত মানা উচিত নয়—যেখানে তোমার স্বরূপজ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ্য।

প্রশ্ন ঃ এইজন্য আমার মনে হয় সর্ব কর্ম নাশ না হওয়া উচিত।

মা ঃ যেমন বিজুলী পাখা switch off হইলেও চলিতে থাকে।

প্রশ্ন ঃ এই দৃষ্টান্তে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সর্বথা নাশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবিদ্যা সর্বথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে কি?

মা ঃ Connection চলিয়া গিয়াছে। যাহা আসিয়া গিয়াছে—তাহাই প্রারব্ধ।

প্রশ্ন ঃ তাহা হইলে ঐ যে প্রারব্ধ তাহা কর্মফল দিতে পারে কি না? আমার ত মনে হয় উহা নষ্ট না হওয়া উচিত।

মা ঃ জ্ঞানী যে উপদেশ দেয়, তাহা কি প্রারব্ধ পর্যন্ত, কি তারও আগের?

প্রশ্ন ঃ উহার আগের নয়। উহার আগে উপদেশ অবতারী শরীর দ্বারা। জ্ঞানীর প্রারব্ধ লইয়া উপদেশ।

মা ঃ যেখানে জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ সেখানে কর্মের অপেক্ষা রাখিয়া কি স্বয়ং প্রকাশ?

প্রশ্ন ঃ এক স্বরূপ জ্ঞান আর এক বৃত্তি জ্ঞান। জ্ঞানীর বৃত্তি লইয়া—উহা প্রারব্ধ ভোগের জন্য।

মা ঃ তাহা হইলে তোমার কথায় বালকের পড়িতে পড়িতে যেমন জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় ইহাও ত জ্ঞানেরই বৃদ্ধি? তবে ত ইহাকেও সেই জ্ঞানী বলা যাইতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ স্বরূপ জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ, কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান বিষয় লইয়া। স্বরূপাত্মক জ্ঞান লইয়া জ্ঞানী বলা যায় না, বৃত্তিজ্ঞান লইয়াই জ্ঞানী বলা হয়, কেননা স্বরূপ জ্ঞান ত সকলেরই আছে।

মা ঃ যেখানে স্বরূপ জ্ঞান, একি কোথাও স্থিত?

প্রশ্ন ঃ সে স্বরূপে স্থিত।

মা ঃ হ্যাঁ, বাবা, তুমি যা' বললে সকলেই স্বরূপ জ্ঞানে স্থিত। হ্যাঁ, তাইত।

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ, তবে সকলের বোধ নাই। বৃত্তির জ্ঞান যাহার প্রকাশ হয় সেই জ্ঞানী। জিজ্ঞাসুর ভাবনা হইতে উপদেশ হইতে পারে।

মা ঃ হ্যাঁ, স্বয়ং স্বরূপ নিত্য প্রকাশ যেখানে সেখানের কথা এখানে আর আসে কি করিয়া? যেখানে ক্রম বিকাশে জ্ঞান লাভ—তুমি যা বললে বৃত্তিজ্ঞানে স্থিত।

শব্দ, যুক্তি, ভাষা যাহা আসে তাহা মনের। আর এক কথা—যেখানে এ বাণী, ভাষায় যাহা আসে না। এ শরীর যে যাহা বলে মানিয়া লয়, কেননা যে যে সিঁড়িতে চড়িয়াছে সে তেমনই দেখে। যে যাহা বলে—উঁচু নীচু—এই শরীরের সেই সেই বরাবর। সেইজন্য প্রারব্ধ ছাড়া শরীর থাকে

বা থাকে না, যে যা যেখানের কথা বলে সবই ঠিক। বাক্‌বাণীর পারে—যেখানে প্রকাশ অপ্রকাশ স্থিতি অস্থিতি, স্থান অস্থান—কিছুই টিকে না। এক ত লৌকিক বস্তুর স্বরূপই বলা যায় না, অলৌকিক বস্তুর স্বরূপ ত আরও দূরের কথা। লীন বলিয়াও কথা আছে। আবার লীন বলিয়া যেখানে সেখান হইতেও কোন যোগী তুলিয়া লইতে পারে—এও কথা আছে ত, তোমরাই বলিয়া থাক ত? কিন্তু এ শরীর যে জায়গার কথা বলিতেছে সেখানে একথাও নাই, নাই ও নাই। বিচার যুক্তিতে বলা যাইতে পারে লেশ থাকে, কিন্তু এ শরীর এমন জায়গার কথা বলে যেখানে লেশের কোন প্রশ্নই নাই।

প্রশ্ন ঃ তখন শরীর থাকে কি না?

মা ঃ ঐ স্থিতিতে যদি শরীর বাধক হয় তবে ঐ স্থিতিই নয়। ঐ অবস্থাতে শরীর থাকে কি না থাকে তাহার প্রশ্নই আসিতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ ঐখানে প্রশ্নোত্তর হয় কি না?

মা ঃ হ্যাঁ, যেখানে শরীরী প্রশ্ন। যাহার শিষ্য দৃষ্টি আছে, গুরুদৃষ্টি আছে সেখানে প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন ঃ তবে গুরুশিষ্য এই সব কথা নিরর্থক।

মা ঃ উপদেষ্টা যেখানে স্থিত, সেই পর্যন্তই শিষ্যের গতি। যদি সেও অজ্ঞানী প্রশ্নও অজ্ঞানীর তবে জ্ঞান প্রকাশের আশা কি করিয়া? হ্যাঁ, যে কথা স্বরূপের দিক্, মঙ্গল কল্যাণ স্বাভাবিক। আচ্ছা, বাবা, বল ত জগতের গুরু যিনি আচার্য, সেখানকার প্রশ্ন উত্তর লক্ষ্য স্বরূপ প্রকাশ—এ ত' স্বাভাবিক, হবেই, আছেই, মিথ্যা কোথায়? আর এক কথা, আচ্ছা বল, প্রশ্নোত্তর কে কাকে করছে? যে স্থিতিতে সে দেখছে মাত্র প্রশ্নোত্তর। যে উত্তর দিচ্ছে বলিয়া বল—এ কি ব্যষ্টি। কাকে উত্তর? কে দিচ্ছে উত্তর? উত্তর কি? কেউ কে সেখানে? যেখানে স্বয়ং প্রকাশ নয় বৃত্তি

জ্ঞান যেখানে। এ মানা কঠিন— মানামানির ব্যাপার কিনা। যেখানে মানামানির প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না বল সেখানে কি আর বলাবলি।

পিতাজী, ঐ যে জিজ্ঞাসা করলে তোমার অনুভব বল, এ কথা তুমি যখন বল তখন ত অনুভব করনেওয়ালা রহিয়া গেল। তাহাতে ত এ কথা আসে না কিন্তু এমন আরও আছে যেখানে গুরু শিষ্যে কি করিয়া দিতেছে এই প্রশ্নই হয় না। এই শরীর থাকে না, এই প্রশ্নও থাকে না। এ শরীর ও শরীরের প্রশ্নও থাকে না। এরও পরে যাহা বাক্-বাণীতে প্রকাশ হইতে পারে না। তুমি বাক্যের দ্বারা শব্দের দ্বারা যাহা লইয়া আসিবে তাহা দৃষ্টি সৃষ্টি নিয়া আসিবে। পিতাজী, এইছা হ্যায়— এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। এক দ্বিতীয় যেখানে তারও প্রশ্ন থাকবে না স্বরূপে। দুই হইয়াছে বিচারে আসিয়া। যেমন তোমরা বল— পা নাই চলে চোখ নাই দেখে।

এ শরীরের কথা— এই যে কেহ বিচার দৃষ্টিতে, শরীর দৃষ্টিতে, শিষ্য দৃষ্টিতে বলে সে ত ঐ বিচার দৃষ্টিতে নিতে পারে। কারণ যে যে-চশমা পরিয়াছে সেই চশমায় তাহাই ত দেখিবে। এ শরীর বলে, যে যে-রকমই বলুক, ঐ বিচার দৃষ্টিতে আসছে লেশ আর প্রারব্ধ। আর যেখানে ঐ প্রকাশ সেখানে একথা আসে না। এখানে বিচারেরও কোন প্রশ্ন নাই। এই বিচার, এই দৃষ্টির উপরও আছে যাহার উপর এই সব কিছুই টিকে না। পিতাজী, এইছাই হ্যায়—বাণী, ভাষা, কোন বিচারেরই এখানে স্থান নাই। নাই আছে বলিলেও যে ভাষা আনা হয়, সেই ভাষাও ভাষা। এইজন্য বলে, এখানে বাক্-বাণী, ভাষার কথা নাই। ইহা সত্য—সম্‌ঝা পিতাজী?

এখানে মা'র উত্তর গুলো যেন প্রায় কেটে যাওয়া। অর্থাৎ প্রশ্ন একদিকের আর মা'র উত্তর গুলো আরে আরে। মা বল্লেন—প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব পাইবে না, ইহার মধ্য হইতেই যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইতে হইবে।

১৯

কাশীধাম
২৫।১০।৪৮

প্রশ্ন ঃ এখানে যে যজ্ঞ হইতেছে এই যজ্ঞের ফল কি? ইহার ফল কে পাবে?

মা ঃ এখানকার যজ্ঞের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়াছি—মানুষ, পশু, বৃক্ষ, লতা, পাতা, যত ইতি ব্রহ্মাণ্ডের সকলের যিনি ইষ্ট অর্থাৎ যিনি কাহারও অনিষ্ট করেন না তাঁর প্রীতির জন্য। তা হ'লেই ফলটা কে পাবে বল? এটা কোনও একাজ ওকাজের জন্য এমন নয়।

আকাশে মেঘ হলে কি হয়—বর্ষণ হয়। পায় কে? সকলেই। ভগবৎ প্রীতির যে কামনা—যেমন গেড়ো লেগে আছে সেটা খুলতে যাওয়াও ত বন্ধন—সেই রকম। যে কামনায় কামনা ক্ষয় হয়ে যায়। কেন ধ্যান কর? কেন স্বরূপে স্থিতির চেষ্টা, এ কামনা কেন? তাঁর প্রকাশের জন্য।

যে কামনায় তোমাকে আরও বন্ধ করবে তা' ত গ্রহণীয় নয়। সেই বৃত্তিকে নির্বাসন করতে হ'লে তোমাকে কি নিতে হবে?—ঐ। কারণ তোমার যা আছে তাই দিয়েই ত তোমাকে পেতে হবে।

কাশীধাম
২৬।১০।৪৮

আজ মা ঝুঁসী রওনা হইয়া গেলেন। বেনারস স্টেশনে নিম্নলিখিত কথাগুলি হইল।

প্রশ্ন ঃ শোনা গিয়াছে যোগী যোগবলে মানুষের আয়ু ২।৩ মাস বড়জোর বাড়াইয়া দিতে পারেন। সাধারণ যোগীর যোগশক্তি ইহার অধিক

কার্যকরী হইতে পারে না।

মা ঃ হ্যাঁ, এই স্থানের এই কথাই। আবার ২।১ মাস বাড়ান গেলেও বাড়াইবার ক্রমটা রহিয়া গেল।

এক হয় যেমন অন্যের আয়ুদ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করা। আবার অন্যের আয়ু না লইয়াও আয়ু আরও অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এরূপ শক্তিশালী যোগীও আছে। সৃষ্টির দিক্ খোলা যেখানে সেখানে ত ভিন্ন কথা আছেই।

প্রশ্ন ঃ তাহা হইলে ত এই শরীরটাকেই অমর করা যাইতে পারে?

মা ঃ সবই সম্ভব যে ওখানে।

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ, তাঁকে যদি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বলিয়া মানা হয়—তাহা হইলে তাঁর পক্ষে আর অসম্ভব কি? কিন্তু শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ ত একটাও পাওয়া যায় না। হনুমান ইত্যাদিকে অমর বলা হয়, কিন্তু শুনা যায় তাদেরও যোগবলে শরীর বদলাতে হয়।

মা ঃ সেখানে সবই সম্ভব, সবই অসম্ভব। এটা ওটা হ'ল না এত জীব জগতের দিকের কথা আছেই। একভাবে শরীর রাখবার হ'লে তাও রাখতে পারে এবং আছে। এদিকেও দেখ না— শরীর হ'তে শরীর হওয়া, গাছ হ'তে গাছ হওয়া ইত্যাদি। কোন স্থলে হওয়া না হওয়া। এই সবটাই যেখানে আছে এবং প্রকাশিত হয় হবে—সেখানে কি নাই কি আছে? আবার তুমি যেখানে বল্লে পাওয়া যায় না তাহার কারণ এই যে যেখানে বাস্তব প্রকাশের কথা আছে, যতটুকু ততটুকু সেখানে ত এই সব প্রত্যক্ষ।

প্রশ্ন ঃ তোমার মুখেই শুনিয়াছি—এক জীবেরই নাকি অনেক দেহ থাকে। হয়ত সে কোন দেহে যোগ করিতেছে আবার অন্য দেহে ভোগ করিতেছে একই সময়ে। যোগীর পক্ষে ইহা সম্ভব, কিন্তু যে অজ্ঞান জীব

তার পক্ষে ইহা সম্ভব কিরূপে?

মা ঃ হ্যাঁ, যোগ শক্তিতে এই প্রকাশ। অজ্ঞান জীবের ত ইহা করা সম্ভবপর হয় না। দেখ, তুমি ফুলের কুড়িটাই দেখিলে, কিন্তু ঐ কুড়ির মধ্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলটি, ফলটি, বীজ, গাছ। প্রকাশের অপেক্ষা তোমার দৃষ্টিভঙ্গি একদিকের মাত্র। সর্বদিকে দেখ—যোগীটি, জীবটি কে? তোমার শরীরটাই বালক ছিল, যুবা হইল, বৃদ্ধ হইবে। বালকত্ব, যুবকত্ব, বৃদ্ধত্ব সবই তোমার মধ্যে। নইলে আসিল কোথা হইতে? দেখ না বলে, তোমার বাল্যকালের চেহারাটা এইরূপ ছিল। সুতরাং তোমার ঐ চেহারাটা এখনও মজুদ, নইলে বলে কি করিয়া? সেইরূপ তোমার সর্ব অবস্থার শরীর সর্বদা মজুদ। যা' হয়েছিল, এখন হচ্ছে আবার হবে—এটা যেখানে সেখানে এ কথা।

প্রতি মুহূর্তেই কাল গ্রাস করিতেছে—বাল্য গেল, যৌবন আসিল, একে অপরকে গ্রাস করিতেছে। প্রাকৃত দৃষ্টির সম্মুখে এটা ধরা পড়ে না। পরিবর্তনটা সামান্যই মাত্র ধরিতে পারে—সৃষ্টি স্থিতি লয় এক জায়গায়। সবটাই অনন্ত। অনন্ত আর অন্ত একই। মালার মধ্যে সূতাটি এক, ফুলের মধ্যে ফাঁক। ফাঁক হইতেই অভাব দুঃখ। ফাঁক পূরণই অভাব মুক্ত।

শায়পুর
৩।১২।৪৮

প্রশ্ন ঃ জ্ঞান লাভ গুরুশক্তি সাপেক্ষ বা নিরপেক্ষ।

মা ঃ একটা কথা কিন্তু খেয়াল রাখবে—গুরুশক্তির ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির গ্রহণ। এই যে ইচ্ছাশক্তি সেটাও বলা যেতে পারে গুরুশক্তি থেকেই। তা' হলে স্বয়ংই প্রকাশ দু'দিকেই। স্বয়ং কে? প্রকাশ ত তিনিই একমাত্র। তা' হ'লে পুরুষকার বলে যে কথা হয় আলাদা করা কেন?

হ্যাঁ, হ'তে পারে অন্তর্গুরুর আশ্রয় বলে। কেহ গুরু নামটা বাদ দিতে চায়। কারণ পুরুষকার নিজের কর্মের উপরে বিশ্বাস যার প্রকাশ। যদি ভাল করে বলাও হয়, তবে যিনি পুরুষকারে তীব্র ইচ্ছার ক্রিয়া করছেন সেইরূপেতে তিনি স্বয়ং প্রকাশ বিশেষ রূপে। তা' হলেই বা আর কোন দিকে আপত্তি উঠিবার কারণ থাকে কি? এই সবই ত সাধারণ ভাবে যাহারা বলবে, প্রশ্ন তুলবে মনের নিয়মিত গতির কথা। আর, সেখানে যে সবই সম্ভব।

পুরুষকারেও যে গতি তাতেও ঐ শক্তিরই ত ক্রিয়া। সেই গুরুশক্তি তাহার ভিতর দিয়াও বিশেষ কাজ প্রকাশ করিতে পারে ত? বহিঃশব্দের প্রয়োজন হইল না। কাহারও বহিঃশব্দের অপেক্ষা থাকিতে পারে আবার কাহারও বহিঃশব্দ ভেদ করে অন্তরে প্রকাশিত হতে পারে না কি? এত আবরণ নষ্ট হতে পারে আর এটা হতে পারে না? গুরুর উপদেশ অন্তরে ক্রিয়া করিল।

একবার যখন গুরুধারণ হয় সাধারণতঃ ছেলেদের দেখা যায়, বার বার বলে দিতে হয়, আবার একবার বললেও স্মরণ থাকে। কোন কোন ছেলের সব বিষয় না বললেও পড়ার ধারায় তার ভিতর স্ফুরিত হয়ে ধরা পড়ে দেখ না কি? ঐরূপ চতুর ছেলেও হয় না কি?

যেমন সকলেই উপাসনা করে একসঙ্গে অনেকেই দীক্ষা নিয়ে। দুই একজন যেন একা সমভাবে আশ্রয় লাভ করেও বেশী উন্নত হয়ে যায় জগৎগুরু রূপেও ত। পূর্ব পূর্ব জন্মের উপদেশ এই সময়ে স্ফুরণ মেনে নেওয়া যেতে পারে। আবার তাহার উপাসনার সময়ের মহাযোগে বিশেষ প্রকাশ, ইহা হতে পারে না কি? কাহার কোন মুহূর্তে প্রকাশ। কাহাকেও তীব্র উপাসক দেখা যায় ত! যোগ যাহা আছে, যোগের যে চেষ্টা তিনি স্বয়ং প্রকাশ হবেন বলেই নয় কি?

কত ছেলে কলেজে পড়ে, First আর কটি হয়, একই Professor এর ত যোগাযোগ। কোন্ মুহূর্তে কাহার যোগাযোগ হবে বলা যায় না। যেমন প্রথম দিক্ দিয়ে ফেল করে গেল, কিন্তু শেষ রক্ষাই রক্ষা। প্রথম দিকেই তাকে বিচার করে শেষ করা যায় না পরমার্থ ক্ষেত্রে—শেষ রক্ষাই ত প্রথমও রক্ষা।

আরে মন্ত্রটা কি? মন্ত্রটাত ঐ 'তুমি', 'আমি' যে বোধে রয়েছ সেই অহংকার যুক্ত হয়ে ত, আর স্বয়ং হয়েছেন ঐ—শব্দরূপে। দেখনা, সেই শব্দগুলির কি সুন্দর যোজনা মহাবাক্য রূপেতে। যেমন অখণ্ড বাঁধে আছ বলে মনে কর, এখানে মনের ব্যাপার ত? তাহা হতেই ত ঐ দু'চার টুকরা অক্ষর যোজনা যে শব্দ তাহা বলা মাত্রই জ্ঞান। সেই যে অক্ষর সেই অক্ষর পুরুষের সঙ্গে কেমন যুক্ত। ঐ দেখ এখন শব্দব্রহ্ম—শব্দ মাত্রে আত্মস্থিতি। দেখ বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু, সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু। এই টুকরা আগুনের টুকরা আর কি—সেই যে জ্ঞানস্বরূপ।

ধর না যে বন্ধনে ধরেছিল অখণ্ড মনে 'আমি', 'তুমি' নিয়ে আবার ঐ শব্দেই উদ্ঘাটিত করল সেই শব্দযোজনা যুক্তই। শব্দ দ্বারাই'ত নিঃশব্দে, ঐ যে অখণ্ডরূপেরই প্রকাশ। আরে, ঐখানে সবই সম্ভব নয় কি, জ্ঞান অজ্ঞানের পার যেখানে?

যতক্ষণ সেই জ্ঞানে স্থিতি না হয়, তরঙ্গ ও শব্দের মধ্যে সকলেই আছ। এক শব্দ বাইরে এনে দেয়, এক শব্দ অন্তর্মুখ করে দেয়। এই যে বাইরে এনে দেয় এর মধ্যেও অন্তর্মুখের সঙ্গে যোগ রয়েছে। সেই জন্য সেই অন্তর্মুখে যে যোগ রয়েছে তাহা কোন শুভ মুহূর্তে মহান যোগে যুক্ত হয়ে সেই মহাপ্রকাশ অর্থাৎ যা তা। যেমন স্বয়ং প্রকাশ তেমন ইহাও আবার সম্ভব নয় কি? ইহাও প্রকাশ। যেমন স্বয়ং কোন স্থানে বহিঃশব্দ বিনাও স্বয়ং প্রকাশ মানতে আপত্তি কি? কোন স্থানে অপেক্ষা রাখে,

কোন স্থানে অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু সাধারণতঃ জীবজগতে আপেক্ষিকই। যেখানে থাকে না পূর্ব পূর্ব জন্মে শোনা ও সংস্কার আছে তাহাও হ'তে পারেই জীব জগতে। আবার পূর্ব পূর্ব জন্মে শোনা ও সংস্কার না হয়েও হতে পারে কোথায়, ভাববার বিষয় নয় কি? স্বয়ং প্রকাশ যেখানে বাধে কোথায়? রকমারী ত নিজদের রকমারী, দৃষ্টি বোধে দেখা ও বলা।

২০

প্রশ্ন ঃ বিচার সাগরে বলা হইয়াছে, এক রাজার ভর্জু নামক মন্ত্রীর চক্ষুদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও বিপরীত ভাবনা দূর হয় নাই। সেইরূপ মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু যাহার বুদ্ধিতে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা দোষ থাকে তাহার দুষ্ট অপরোক্ষ জ্ঞান মোক্ষফলের জনক হয় না। বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতিবন্ধকের প্রশ্ন কোথায়, উপদেশের অপেক্ষা কি?

মা ঃ এক হয় নিরাবরণ প্রকাশ, আর হয় আবরণের সম্ভাবনা রাখিয়া প্রকাশ, কারণ আছেই ত। কোন সময়ে যখন এই শরীরে সাধন ও উপাসনার খেলাগুলি প্রকাশ হইত, তখন পরিষ্কার নানারূপ দেখা যাইত।

আচ্ছা ধর না, এই মনে কর যেমন একটা পর্দা—যেন জ্বলিয়া গেল, গলিয়া গেল—আবরণ মুক্ত দেখা গেল কিছু সময়ের জন্য। আবার যেন সেইটি নেই সেই জায়গায় আবরিত হল। কিন্তু হল কি?—অজ্ঞানের দিক্‌টা শিথিল হ'লে জ্ঞানের দিক্‌টা প্রধান হ'ল, অর্থাৎ পূর্বের আবরণের সঙ্গে বন্ধনটা শিথিল হয়ে রইল। এই অবস্থায় আসে যেন জ্ঞানলাভ, এইরূপ, স্থিতিও আসে কিন্তু। কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ সেই যে স্থিতি তাহা

কোথায়? এই খানেই হঠাৎ গুরুশক্তিতে ঐ পর্দা একেবারে গলিয়া বা জ্বলিয়া গেল—যেমন 'দশমস্ত্বমসি'। এই যে প্রকাশ এখানে পুনরাবরণের প্রশ্ন দাঁড়ায় না—ঐ যে স্বয়ংপ্রকাশ। বিদ্যুৎ চমকে প্রকাশ, আর দিনের প্রকাশ আছেই ত।

প্রশ্ন ঃ যা শাস্ত্রে নাই তা' সম্ভব হয় কি করিয়া?

মা ঃ এই যে তোমার জন্ম কর্ম শাস্ত্রীয় ব্যাপারই ত। সে যে অনন্ত। সে অনন্ত তোমাতে যে যোগে যাগেই কর্মাদি ঘটে বা ঘটবে—যে আকারই ধারণ করুন না কেন—শাস্ত্র হিসাবে তুমি না পেতে পার,—শাস্ত্রও অনন্ত ত। বাঃ, তাঁর রাজ্যের কি সুন্দর বিধান। জাননা নূতন ধারায় মনোরাজ্যে যখন তাহার ঝাকি অনুভব, মনে হয় বড় মধুর, বড় আনন্দদায়ক, কিন্তু নিত্য নূতনও যে।

দেখ একটা কথা—অন্তে অনন্ত, অনন্তে অন্ত; খণ্ডে অখণ্ড, অখণ্ডে খণ্ড —সেই যে মহান ধারা যখন ধরা। আচ্ছা, তোমাকেই ত তুমি ধরবে। মনোরাজ্যের ব্যাপারই কেবল নয়, নূতন ধারায় নিত্য নব নব রূপ যেখানে। অখণ্ড ধারায় যোগের মহাযোগ স্বাভাবিক।

দেখ শাস্ত্রে কিন্তু সব কথা আছে, আবার নাইও। মনে কর রেলে দেরাদুন হইতে রওনা হ'লে। চলার পথে দৃষ্টিতে এল বড় বড় স্টেশন, নগর, গ্রামগুলি। সেইরূপ লেখা হ'ল। কিন্তু এক স্টেশন হ'তে অপর স্টেশনের অন্তরালে যা রইল সবই কি তন্ন তন্ন ক'রে লেখা হ'ল? সে হিসাবে ত সব নাই। গাছপালা, জীবজন্তু, ক্ষুদ্র পিপীলিকাটিও কতই ত—লেখা কি হ'তে পারে? অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত স্থিতি, অনন্ত তার বিচিত্র গতি, স্থিতির প্রকাশ সর্বক্ষণই হচ্ছে। হ্যাঁ, তবে সাধকের কাছে যা প্রকাশ, লেখায় তা'র সবটা প্রকাশ হতে পারে না। আর এক কথা ত আছেই, "বাক্য মনের অগোচর।" বলা যায় যা, তাই বলা হয়। যা বলা যায় না

তা'ত 'যা তাই।' কোন কোন স্থান যে ধারা প্রকাশ করল তাতো এর মধ্যেরই। যেখানে সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ সেখানে 'শাস্ত্রে ছিল না,' সেকথা ত টিকে কি? রাস্তায় যে প্রধান প্রধান স্থানের ব্যাপারগুলি প্রকাশ আছে ব'লে মনে কর, শাস্ত্রে ত আছেই। আর যে গুলি নাই বলে মনে হয় তা'ওত আছে। আপনা-আপনি সাধকের স্থিতি অনুযায়ী সব কিছুই প্রকাশ পায়। পূর্ণাঙ্গীণ প্রকাশ যেখানে সেখানে প্রধান অপ্রধানের প্রশ্ন থাকে না। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইলে তার কাছে পূর্ণাঙ্গীণ প্রকাশ হইতে বাধ্য। যদি বলা হয় ইহা ত শাস্ত্রে নাই তবে সে গন্তব্য স্থানের কথা কোথায়? শুধু 'না' ও 'হ্যাঁ' রাস্তায় তো আছেই। কারণ অনন্ত রাস্তা। সেখানে সীমা হ'তে পারে না। শাস্ত্রে নাই এই হিসাবে। যেখানে অনন্ত সেখানে রাস্তাও অনন্ত, রাস্তার প্রকাশও অনন্ত। আরে তোমরা বল না, যত মুনি তত মত। আলাদা মত না হইলে মুনিই হল না।

আচ্ছা, এই ত গেল এদিকের কথা। এখন কথা হচ্ছে—যেখানে এই কথা বলা চলে সেথা 'সবই সম্ভব', সেখানে কোন শাস্ত্রে বা গ্রন্থে পেলে না বলে প্রকাশ হ'তে পারে না বা হয় নাই বলা চলে না। কেন না প্রকাশ যা আছে তারই প্রকাশের জন্য ত আকুলি বিকুলি। যা নাই,—হ'তে পারে না, হয় না, তার জন্য হাহাকার—কি করে হতে পারে?

কেহ বলেন—রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা—কারও নাম নিলে হবে না, বলতে হবে একমাত্র মা। তাও—আবার সকল মা নয় তাদের নির্দিষ্ট যে মা। কেহ আবার বলেন, কোন নামেই ভগবৎ প্রাপ্তি হতে পারে না—করতে হবে শুধু বিচার। মনে যে প্রশ্ন উঠবে বিচার ক'রে সমাধান করবে। নিজে সমাধান করতে না পারলে অন্যের সাহায্য নেবে, সে যেই হউক। কিন্তু এখানে গুরু শিষ্যের কোন সম্বন্ধ থাকবে না। গুরু আবার কে, সবই এক।

এই প্রসঙ্গে মা প্রশ্ন করলেন—বাবা, এই যে তুমি উপদেশ দিলে,

এ যা'রা গ্রহণ করবে, তা'রা কি তোমাকে গুরু ক'রে নিল না?

উ ঃ না, প্রশ্ন সমাধান হইয়া গেলে সবই আবার এক লেবেলে।

মা ঃ হ্যাঁ, এ রকমও শুনা যায়, সন্ন্যাস দেওয়ার পর গুরু শিষ্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে—উদ্দেশ্য দেখান গুরু-শিষ্যে ভেদ নাই, সবই এক।

কোন স্থানে এমন হয়, গুরু বলে নিজকে মনেই করতে পারে না, আর অপর কাহাকেও গুরু বলে স্বীকার করতে পারে না। আবার এমন একটা স্থিতি আছে, শিষ্য আর গুরু বলিয়া আলাদা করিয়া মানবার দিক্ই থাকে না। কোন স্থানে এমনও প্রকাশ হয়। জগতে তাহার উপদেশে তাহাকে গুরু মেনেই ত ক্রিয়া হচ্ছে। আর তা'কে পাওয়ার জন্য যে অনন্ত মত অনন্ত নাম আছে, যে কোন মতই এই কথার মধ্যে পৌঁছে যায়।

মনে যে প্রশ্ন উঠবে তাতে মন একাগ্র করতে পারলে গ্রন্থি ভেদ হ'তে পারে। কাজেই কোন মতেরই বিরোধ নাই এখানে। আর ঐ যে এক level-এর কথা হ'ল তা'ও ঠিক। সংসারে কত ব্যাপারেই ত একে অন্যের সাহায্য নেয়, তাই বলে কি সকলেই গুরু নাকি? এক হিসাবে গুরুও বলতে পার যেখান থেকে যতটুকু। গুরু ত ঐ, যে শিক্ষায় স্বপ্রকাশের দিক্।

মনে কর কেহ অন্ধকারে পথ চলিয়াছে। সামনে এক কুকুর চীৎকার করে উঠল। কারণ কি? টর্চ ফেলে দেখা গেল সামনেই বিষাক্ত ভীষণ সাপ। সেই ব্যক্তি সাবধানে রক্ষা পেল। এখানে এই কুকুরকেও এই বিষয়ে গুরু বলা হবে নাকি? হ্যাঁ, বলতে পার সে ত আর জ্ঞান দেবার জন্য চীৎকার করে নাই। কিন্তু যিনি দেবার তিনি এইরূপে।

২১

নিজেই—গ্রহণ ত্যাগের প্রশ্ন নাই। কোন কালে হয়েছিল, যে গ্রহণ হবে, ত্যাগ হবে? জন্মই হয় নাই। যে দিকে নিবে—এটা হয় নাই এ যেমন সত্য নামরূপ ফেলে দেও এটা যেমন সত্য আবার অক্ষর যার ক্ষরণ হয় না—নামরূপ। মূলে কিন্তু ঐ সত্য। ভুল-রূপটা যে ভুল-ভাঙ্গাও সে। আবার ভুল শোধনের কোন প্রশ্নই নাই। জায়গা ত ঐ একটিই। ঐটি লক্ষ্য রেখেই ভুলের ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া—বুঝবার জন্য এ জাতীয় কথা সব।

সদ্‌গ্রন্থাদিতে যদি এটা ব্যসনে পরিণত না হয় ঐ দিকটা ধরবার অনুকূল হয়। যতক্ষণ পড়ার মধ্যে নিজের ভিতরের সঙ্গে অর্থাৎ নিজের না মিলবে ততক্ষণ হয় না। এইজন্য বীজটা শুধু হাতে নিলেই হয় না, গাছ, ফল দেখাও পূর্ণ প্রকাশ চাই। আবার যেখানে প্রকাশ অপ্রকাশের কথা নাই— দেখাও, হও, আছে। কোন স্থানে সাময়িক যেমন একটা ঝাকি দর্শন, যেমন স্ফুলিঙ্গ এমন একটা স্থিতি আছে। বুঝতে পারা যায় না তবু স্বরূপ কি না, কি যেন একটা কি। অনন্ত স্থান ত। দাহিকা শক্তি ত পূর্ণ—একই। কিন্তু ঝাকি রকমারীটার স্ফুলিঙ্গে সম্পূর্ণটা কোথায়? যেখানে সেখানে ত তাই।

প্রাকৃত জাগরণের প্রশ্ন। কিন্তু যা পাওয়ার পরে আর পাওয়ার প্রশ্ন থাকে না। যেমন প্রাকৃত জগৎটা দেখা যাচ্ছে সেটা আলাদা—আবার আলাদার প্রশ্ন নাই ত, সে স্থানও ত আছে।

যা কিছু করা হচ্ছে মৃত্যুরূপে পরিবর্তন যা হচ্ছে। বাদটা বাদ দিতে পারবে না। মৃত্যুরূপে তুমি—চাওয়া রূপে তুমি, গতি রূপে তুমি, স্থিতি রূপে তুমি, বিশেষ রূপে, নির্বিশেষ রূপে তুমিই। (আবার) অনন্ত অন্তহীন।

প্রাকৃত সাজে তুমিই ফিরছ।

যেখানে থেকে কথা হয়—আমি বাদ দিচ্ছি না। নিজেই নিজেতে। রূপে অরূপে এক। তোমারই যে অপরূপ সেটা এই উপস্থিত স্থিতিতে থাকলে হবে না। ছাদ পেটবার সময় একটা নিয়ম আছে। যে পেটানয় ছাদটা বসবে। সময় ধর না। সেইরূপ যে কাজে তোমার জানা। (উপমা সর্বাঙ্গীণ হয় না, যেটুকু হয় ধরে নিও) তুমি এই মেনে বসে আছ; এটা তোমার রূপ।—ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপ অরূপ কোথায়? তাই ভেবে দেখ কাকে পাবে? তোমার যে সম্পূর্ণ রূপ সেটা বোধে আনতে হবে। বোধে আনলেও চলবে না, বোধ অবোধের পারে যেতে হবে। যা তাই প্রকাশ চাই। তাই বিচার রেখে রেখে বার বার মনকে জানান—তোমার জাগরণের জন্য—রয়েছে জপ ধ্যান, এই জাতীয় সব কিছু। যাত্রায় যেন আমি শিথিলে পা না বাড়াই। চেষ্টা আর কি? সেজন্যই তার ভিতর মেখে থাকার চেষ্টা। ওতপ্রোত ভাবে থাকা তবে নিজের সঙ্গেই নিজে মেখে থাকা। অনুপায় রূপে যেমন হাহাকার আছে, উপায় রূপেও তুমিই রয়েছ সেইটি প্রকাশের জন্য ঝর ঝরা ভাবে মাথায় বিচার রেখে চলা।

বৃক্ষের গোড়ায় জল দেওয়া—এই গোড়াই ত মাথা—যে মাথায় তোমার বিচার বুদ্ধি সব সময় খেলছে, জপ, ধ্যান, পাঠ এই সব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া—আবার একটা আছে, বাঁধা হওয়া অর্থাৎ বদ্ধ হওয়া, সেই দিকটা দেখে চলা। বদ্ধ হওয়া বাঁধা অর্থাৎ গতিরোধ যাতে করে সেই দিকটা লক্ষ্য রেখে চলা, নিজের দিকে নিজ অবাধ গতিতে চলা। "তুমি" নেও আর "আমি" নেও, যা নিবে সেই— তুমিই— আমিই। কেন দেখে চলা? দেখা রূপে তুমি, কেন রূপে তুমি; কেন তুমিই। যে দিকে যা প্রকাশ, অ-প্রকাশ সে "তুমি" যে, "আমিই" যে। না, হ্যাঁ, রূপেও যে তুমিই— সেই। পূর্ণাঙ্গীণ রূপ ধরা পড়বে তোমাতে, যেখানে অর্থাৎ যেখানে নিজেই নিজে—সেজন্যই দেখা চলার কথা। যেখানে সীমাবদ্ধ

দেখছ ওখানেও সীমাও অসীমেরই প্রকাশ। তাহার যে মূল সত্তা তুমিই। সেই প্রকাশ না হলে পরিপূর্ণ কোথায়। পূর্ণ পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ যা বল। পূর্ণ অপূর্ণের প্রশ্ন সেখানে আর কোথায়?

২২

মা ঃ দান কর, সেবা কর, প্রণাম কর, নিজেই বুঝতে পারবে কি ভাব নিয়ে করা হচ্ছে। ভাব রাখা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সেখান থেকেই প্রকাশ হবে। কখনও মনে করবে না, আরে আমি এই সব কুকর্মে লিপ্ত রয়েছি, আমার কিছুই হবে না। সব সময়, সব অবস্থায় ভগবৎ রাস্তায় চলবার জন্য তৈরী হয়ে থাকবে। কে জানে কখন তোমার ঐ দান সেবা অথবা প্রণাম হয়ে যাবে। সবই যে সম্ভব।

দীক্ষার কথা। যার থেকে দীক্ষা নেওয়া তিনি যতদূর পৌঁছেছেন ততটা সংযোগ করে দেবেন। যেমন ভগবৎ-কথা শোন—বক্তার যতটা শক্তি সেই সঙ্গে তোমাকে যুক্ত করে দেয়। এক হয় সৎকথার ফল, আর যে বলে তার শক্তি—এই দুই-ই পায়। গ্রহীতা তেমন শক্তিশালী হলে, উপদেশ মাত্র জ্ঞান।

মন্ত্রদীক্ষা, স্পর্শ দীক্ষা, দৃষ্টি দ্বারা দীক্ষা, উপদেশ দ্বারা দীক্ষা। মহান পুরুষের স্পর্শের ফল হয়। যার যেমন ভাব থাকে তদনুযায়ী তার লাভ হয়। আর হয় বিশেষ কৃপা, এতে বিশেষ শক্তিলাভ হয়। আবার স্পর্শ করেছেন, কিন্তু শক্তিপাত হয় নাই— যিনি শক্তিশালী, তিনি control করে নিতে পারেন। দেওয়া নেওয়া তাঁর ইচ্ছা।

উপদেশ দ্বারা দীক্ষা, যে উপদেশে নির্গ্রন্থি হয়ে যায়। এরূপ হয়ত তৎক্ষণাৎ দীক্ষার কাজ হল।

মন্ত্রদীক্ষা কানে দেয়, শক্তি যতটা ততটাই দেবে। শক্তিশালী হয় ত স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে বা দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যেখানে লক্ষ্যের স্থান সেখানেই পৌঁছে দেবে। এতটা শক্তি না থাকে, যার যতটা শক্তি, যেখানে সে পৌঁছেছে ততদূরে নিয়ে যেতে পারে। গুরুর যা ধন তাইত শিষ্যকে দিতে পারে। যাকে মন্ত্র দিয়েছে যতক্ষণ আসল গন্তব্যস্থানে পৌঁছান হয় নাই, রাস্তায় আছে, গুরু যদি অগ্রসর না হয় শিষ্য আর আগে যেতে পারে না। এই জন্য শিষ্যকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ গুরু অগ্রগামী না হয়। যিনি ভগবানকে পাবার চেষ্টা করছেন আর এর মধ্যেই দীক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন, তাঁর ঐ স্থানেই থাকতে হবে।

আবার শিষ্য গুরুর আগেও পৌঁছে যেতে পারে। পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী দীক্ষা নিয়ে নিজের অন্তঃশক্তি এত বেড়ে যায় যে গুরুর আগে চলে যেতে পারে। দীক্ষা যে নিল তার শুধু এতটাই পাবার বাকী ছিল। যে গুরুর নিকট দীক্ষা নিল তার উপরই যদি সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে হয়, তবে গুরুর সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যকে চলতে হবে। আর যেখানে আমার গুরু জগৎগুরু, জগৎগুরু আমার গুরু—জগৎ মানে গতি, আর যে বদ্ধ সেই জীব। জীব আর জগৎ থেকে উদ্ধার করে—আমি কে? আমি দাস, আমি আত্মা, আমি অংশ, যার যে লাইন।

আমার গুরু কি করে জগৎগুরু হলেন? গুরুর স্থান ত। যেমন রসুইয়া কে? নির্দিষ্ট কারও নাম ত নয়, যে রান্না করতে পারে। এইরূপ জগৎগুরুর যে স্থিতি তার প্রকাশ। এইজন্য ব্যক্তির কথা নয়—এইত জগৎগুরু। গুরুশক্তি প্রকাশ হতে পারে যেখানে 'আমি কে' এর প্রকাশ। এই শক্তি যে দিতে পারে সেই জগৎগুরু। গাঢ় অন্ধকার থেকে যিনি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারেন, ঐইত গুরু। আমার গুরু হরেক রূপে প্রত্যেকের নিকট আছে। আর প্রত্যেকের গুরু আমারই গুরু—দেখ গুরু

কিন্তু একই হয়ে গেল।

যার অনুষ্ঠান ক্রিয়াদি চলছে সে রাস্তায়, আত্মস্থ হয়েছে একথা নয়। এখনও চেষ্টা করছে। এ 'গুরু' কোথায়? ক্রিয়াতীত ত নয়। ইষ্ট গোষ্ঠী বলে না— জগতের সবার ইষ্ট? আমার ইষ্ট, আমার ইষ্ট জগতের ইষ্ট। গুরু ত সাধারণ কথা নয়, যে ভব-সাগর থেকে উদ্ধার করতে পারে। কেহ কোথা হ'তে দীক্ষা নিয়েছে— ঐ যে বলা হল অতটা শক্তিশালী নয়, তবে ত তার অতটা পর্যন্তই এসে থাকতে হবে। এমন কোন সংযোগ হ'তে পারে— নিজের ব্যাকুলতা হতে বা পূর্ব সংস্কার হতে, অথবা এসব কিছুই নয়, মহান কৃপা পেয়েছে— এইরূপ কোন স্থান পাওয়া যায় ত— উপদেশ, স্পর্শ, দৃষ্টি বা মন্ত্র যে কোন উপায়েই সংযোগ হয়ে গেলে শক্তিপাত হয়, তখন এগিয়ে যাওয়া যায়। যেমন বন্যা এসে গেলে এ গাছটাকে বাঁচান হবে বা ওটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হবে এমন কোন কথা থাকে না, সব এক সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এরূপ বিচারের প্রশ্ন নাই। এখানে নিজের মধ্যেই নিজে।

আবার উপদেশ নাই, দৃষ্টি নাই, স্পর্শ নাই, মন্ত্র নাই— যার শক্তিপাত হয়েছে সে হয়ত তখনই বুঝতে পারে, আবার বহু পরেও বুঝতে পারে। যেখান হতে শক্তিপাত হয়, বন্যায় যেমন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনই সব ভাসিয়ে নেয়। এখানে স্বভাব— আপনার মধ্যে আপন করে নেওয়া। তখন অপরের নিকট হতে দীক্ষা নিয়েছে— এখান হ'তে নেয় নাই, একথা আর টিকে না। তাঁরই না? তিনিই না? তাই বন্যা যেমন সমান ভাবে ভাসিয়ে নেয় সেইরূপ ঐ মহান ব্যক্তি স্বাভাবিক রীতিতে আপনাকে আপন করে নেয়। এখানে 'তেরা', 'মেরা' নেই। স্ব— স্বপ্রকাশ, স্বই একমাত্র। যেমন মা লিষ্ট দেন না, 'সন্তানের জন্য এত এত করেছি'— আপনারই ত, সেইরূপ এখানে একথা হয় না—এতটা শক্তিপাত করা হয়েছে।

একজন এক গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়েছে, পরে তার এক মহাত্মার দর্শন হয়েছে। তার নিকটও সে যাতায়াত করে, তাকেও ভাল লেগেছে। গুরু শুনে চটে গেলেন— আরে, আমি বাগ লাগিয়েছি আর তুই অপরকে দিয়ে খাওয়াচ্ছিস্? শিষ্য উত্তর করেন— এই মহাত্মার নিকট যাতায়াতে আমার গুরুনিষ্ঠা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু গুরু সেটা বুঝল না। জগৎ আর জগৎ-অতীত যে তার নিকট সবাই বরাবর। সম-স্বময়। তাঁর নিকট আসে বা না আসে সমভাবে ভাসিয়ে নেয়। এই জন্য বলা হয়েছিল— এর অপর গুরু, একথা নয় সমভাবে শক্তিপাত হয়। আর একথাও বলার নয় যে,— ওকে এতটা শক্তিমান করা হয়েছে। যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হলে এ প্রশ্ন হয় না, এটিকে শুষ্ক করা হবে আর ওটিকে নয়। স্বাভাবিক উপদেশ, স্পর্শ, দৃষ্টি বা মন্ত্রের দ্বারা ঐ যে দীক্ষা এটা হয়েই যায়। এখানে 'তেরা', 'মেরা' কিছুই থাকে না। এক হয় control, আর হয় সমান রীতিতে প্রদান— সব তাঁর হাতে।

২৩

প্রশ্ন ঃ যত মত তত নাম, না এক মত এক নাম?

মা ঃ তোমার কি মত বলত বাবা।

জনৈক ঃ মত ও পথ। তবে সব পথ এক জায়গায়ই যায়।

মা ঃ বলাবলিটা পথে দাঁড়াইয়াই, যার যার ঘরে সে আছে। এক রাস্তা সকলের জন্য নয়। এক ঘরের পাঁচটি ছেলে, রুচি ভিন্ন। দেখনা, কারও বেদান্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত। সেই জন্য পথ একটা বলা যায় না। আসলে সত্যলাভের যে ইচ্ছা তার গড়নটা আলাদা হবে, কিন্তু যেতে হবে সত্যের দুয়ার দিয়ে।

প্রশ্ন ঃ তবে মতও কি ভিন্ন?

মা ঃ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছ এক গুরু তার অনেক শিষ্য। একমতে আনতে চেষ্টা করছ ত? কিন্তু মঠ স্থাপন হ'ল কয়টা?—আপন আপন মত বিসর্জন দিয়েও। বাবা, তুমি যেটা বলছ অতি সত্যকথা। কোথায়?—যেখানে সমস্তটা তাকে বিসর্জন দিয়ে যার যেটা ফুটল। —কি ফুটল? সেই ফুটল, তিনিই ফুটলেন।

প্রশ্ন ঃ আমার মত ত ধার করা মত, পাঁচ জনার কাছে শুনে শুনে বলা।

মা ঃ এই মতটা তুমি কি হিসাবে নিয়েছ। এ শরীর এ দিক্ দিয়ে নিচ্ছে —ঋষি-মুনিরা যে গতি, ধারা, দিয়েছেন সেইটা। জাগতিক হিসাবে অনন্ত মত থাকে, তাতে কাজ হবে না। গুরু যে মত দেন তাই নিতে হবে, সেই ধারায় গিয়ে সমুদ্রে পড়তে হবে।

প্রশ্ন ঃ শেষ পর্যন্ত সকলে সমুদ্রে গিয়াই পড়িবে ত? তাহলে যেখানে লক্ষ্য আলাদা আলাদা রয়েছে, যেমন বৈষ্ণবের সালোক্যাদি বৈদান্তিকের আত্মস্বরূপ স্থিতি ইত্যাদি,—এসব শেষকালে এক সমুদ্রেই পড়বে কেমন করে?

জনৈক ঃ যার নাম চালভাজা তারই নাম মুড়ি।

মা ঃ চালভাজা আর মুড়ি একই হলে নাম দুটো কেন? সেইজন্য কোন না কোন অংশে ভিন্ন। কিন্তু মূলে চাল। তোমারও রইল, আমারও রইল, কি বল বাবা! (হাসি) যেখানে মত নিয়ে, পথ নিয়ে কথা—পথের কথা পথের মধ্যে।

প্রশ্ন ঃ যত মত তত পথের পর আর বক্তৃতা থাকে না।

মা ঃ 'থাকে না' টা ওর মধ্যে থাকে। না থাকলে উঠছে কেন? যেমন বলে আমরা ও সম্প্রদায়ের, যেখানে মত আর বলাবলি নেই, সেখানে মূলে সেই। সে-ই এই নানা আকারে। যেখানে অনন্ত আর এক

বলবে সেখানে দৃষ্টির কথা। একটি বীজ পুতলে। গাছ হল। অনন্ত ফুল, অনন্ত পাতা, অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি। মূলে কিন্তু একটি।

যত মত আছে, তার পথও আছে। যতক্ষণ একপথে চলছ ততক্ষণের জন্য একপথ। আচ্ছা, এ'ত গেল, তুমি কি বলছিলে বাবা, শেষকালে কি করে পড়বে?—শেষ থাকলে কাল আছে, আর কাল থাকলে অকাল আছে। এই শেষ আর কালের যেখানে প্রশ্ন থাকবে না সেখানে মিলবে।

জনৈক ঃ যতক্ষণ বলা কহা যায় ততক্ষণ একটু গোল থাকে তা' হলে?

মা ঃ হ্যাঁ যে বলে কয়, যার বলা আছে— জাগতিক বলা, প্রাকৃতিক বলা— সে কালের মধ্যে। কিন্তু ঐখানেত বলার প্রশ্ন নাই। তাই বলে তুমি জগৎগুরু আচার্যকে একথা বলতে পার না। যে জগৎগুরু এই জগতের মত তার কথা নয়।

প্রশ্ন ঃ সাংসারিক সুখ আর ঐশ্বরিক সুখ এ দুটা বুঝিয়ে বলুন।

মা ঃ ঐশ্বরিক সুখ, তোমরা যে বল না 'পরমসুখদং'— কেবল সুখই তার স্বরূপ।

প্রশ্ন ঃ কেন সংসারেও ত সুখ আছে।

মা ঃ তবে আর বলছ কেন?

প্রশ্ন ঃ এই সাংসারিক— সুখের পিছনে দৌড়ায় কেন?

মা ঃ তুমি এই সুখ পাচ্ছ তাই জিজ্ঞাসা করছি, কিন্তু ভগবান করুণাময় কিনা, তিনি জানিয়ে দেন এই সুখ, সুখ নয়— জ্বালা জাগিয়ে দেন। এটা ভগবৎ ভাবের অভাব। এই যে জগতের সুখটা এটা ত ভগবানের নানা রূপ। আরে, ত্যাগী ত্যাগী বল, সর্বস্ব ত ত্যাগ করে বসে আছে। সর্বস্ব কি?— ভগবান। সেই ত্যাগ করে ত মহাত্যাগী হয়ে বসে আছে। (হাস্য)

অভাব জাগরণ হওয়া স্বাভাবিক। বিদেশে কত সুখসুবিধার মধ্যে থেকেও মনে হয় কতক্ষণে বাড়ী যাব। সুখ হয়েও অসুখ, আমার হয়েও আমার নয়—এটা জানিয়ে দেন। বলে না, ঢুস খেলে হুস হয়, ধাক্কা খেলে শিক্ষা হয়।

এই যে জগতের সুখরূপে তিনি প্রকাশ রয়েছেন এতে তৃপ্তি নাই। এখানে অভাবরূপেও তিনি সঙ্গে রয়েছেন। এই সুখ যাহা ভগবৎ সুখের কণামাত্র তাই ছাড়া যায় না, আর আসল যেখানে মূল, যেখানে গেলে নিজেকে পাওয়া হয়, সেই যে পরমানন্দ, যা পেলে আর পাওয়ার বাকী থাকে না, অভাব আর জাগরণ হয় না, বুকের জ্বালা শান্ত হয়।

এই ধাক্কা দিয়ে—এতটুকু নিয়ে সুখী থেকো না, পূর্ণ হও, পূর্ণাঙ্গীণ হয়ে আমাকে পাও।

২৪

প্রশ্ন ঃ জগৎ ভিন্ন তিনি নয়, তবে জগৎকে রাখার জন্য আগ্রহ কেন?

মা ঃ আগ্রহ ত নয়, জগৎ আছে কি নাই, তার প্রশ্নই নাই।

প্রশ্ন ঃ কারও কারও মতে মুনি ঋষিরা যাহারা ব্রহ্মকে পাইয়া জগৎ হারাইয়াছে তাহাদের বলে অপূর্ণ দৃষ্টি। আর এদের মতে এই নামই থাকবে এই রূপই থাকবে,—এ যেন সোনার পাথর বাটি।

মা ঃ তাদের সঙ্গে অভিন্নত্ব ত হয় নাই—নিজকে আলাদা রাখিয়াই ত জগৎ উদ্ধারের কথা হইতেছে। (জগৎ উদ্ধারের কোন প্রসঙ্গে) যে বাড়ী আছে তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, একটি নূতন রাজ্য স্থাপন

করিব। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই তৎ মেনে তিনি তাকে বদলাচ্ছেন, এটা বলা যেতে পারে।

এই যে জগৎ যদি এইভাবেই থাকে তবে জগৎদৃষ্টি। আর জগতের কথা বল্লে আমার কি এলো গেলো? জগৎকে আলাদা করে উড়িয়ে দেবার প্রশ্নই নাই। জগৎ আছে কি নাই তারও প্রশ্ন নাই।

এই যে বলে ভেদরূপেও তিনি অভেদ রূপেও তিনি—যেমন জল আর বরফ। জলটাকে যখন বরফ বল্লে—স্থান আর আকার যেখানে প্রকাশ —সেখানে আকারটাও ঐ ধর না কেন? বাষ্পরূপ জলীয় রূপ ধরবেই না।

প্রশ্ন ঃ পরিণামবাদ পর্যন্ত ভেদও বটে অভেদও বটে।

জনৈক ঃ জগৎজ্ঞান বহুত্বের জ্ঞান, আর ব্রহ্মজ্ঞান একত্বের জ্ঞান—দুই একস্থানে থাকে কি করিয়া?

প্রশ্ন ঃ ব্রহ্মের একত্ব বহুত্বের বিরোধী নয়। সাধারণতঃ চারিটি ভূমির কথা হয়ঃ—

(১) কেবল মাত্র জগৎ বা বহুত্ব ভাসে—অজ্ঞানীর ভূমি।
(২) কখনও জগৎ অর্থাৎ বহুত্ব ভাসে কখনও একত্ব বা ব্রহ্ম ভাসে— এইটি যোগের নির্বিকল্প সমাধি ভূমি।
(৩) ব্রহ্মের কোলে জগৎ ভাসছে।

মা ঃ ভাসছে কথাটা রইল ত?

প্রশ্ন ঃ জগৎ নাই এইরূপে ভাসছে। আলো যদি অন্ধকারকে লইয়াই গেল তবে আর অন্ধকারকে দেখে কি করিয়া? ব্রহ্ম সকলেরই সাধক কারও বাধক নয়। যেটা চৈতন্য সেটাই ঘট। উহাদের মতে ঘটও থাকে আবার চৈতন্যও থাকে। আমি বলব, ঘটও বা চৈতন্যও তাই।

মা ঃ তুমি বলছ ঐ আকারে?

প্রশ্ন ঃ আমি যে আকারের মূল দেখিতেছি। আমার ছেলেই রাম সাজিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ জ্ঞান না থাকলে জীবন্মুক্ত সিদ্ধ হয় না। কেননা জগৎ ব্যবহার তাহা হইলে তাহার নিকট নিষিদ্ধ হইয়া গেল। আগুন জল সবই ব্রহ্ম। তবে সে জল না খাইয়া আগুনও খাইতে পারে।

কারও কারও মতে যতক্ষণ এটা দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ পূর্ণ অবস্থা নয়। এর উপরের অবস্থাও আছে যেখানে দ্বৈত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন অদ্বৈত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা। এটাই মনে কর পূর্বের বলা চতুর্থ ভূমি। (এসব যোগের সপ্তভূমির ভূমিকা নয়)।

আমার মতে তৃতীয় ভূমিটাই শ্রেষ্ঠ—অদ্বৈতের কোলে দ্বৈত খেলে। অর্থাৎ এই ভূমিতে দ্বৈতে অদ্বৈত, অদ্বৈতে দ্বৈত। জীবন্মুক্ত হেসে খেলে বেড়িয়েও তার মুক্ত জ্ঞান পূর্ণভাবেই থাকে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' আর 'নেতি নেতি' এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। এই ভূমিতে খণ্ড অখণ্ড এক জায়গায়। কিন্তু দুয়ের মধ্যে পত্র পুষ্পের ভেদ থাকা সত্ত্বেও যে একই বৃক্ষ—এইরূপ অখণ্ডের মধ্যে খণ্ডের ভেদ আমি মানি না। আমার এই বুঝাটায় ভুল আছে কি?

মা ঃ যে যেখান হইতে যাহা বলিতেছে সবই ঠিক। ধ্যানেতেই হউক বা সমাধিতেই হউক এমন একটা স্থিতি আছে যেখানে এক ছাড়া দুই দেখবার দিকই নাই। দুইয়ের যে ব্যবহারটা তার গতি হয় না! যেখানে গতি থাকিয়াও গতি নাই সেখানকার কথা কিন্তু। গতির স্থান কোথায়? যেখানে ব্যবহার দেখা যায় তখন হয়ত কেহ বলবে—নেবে এসে ব্যবহার করছেন। এম, এ, পাশ করে ক, খ পড়লে কি এম, এ, পাশ চলে গেল? কিন্তু এমন একটা জায়গা আছে যেখানে আর দ্বিতীয় কিছুই ভাসে না। গঙ্গায় ডুব দিয়ে এলে সর্বাঙ্গ ভিজে যাবে।

এক সত্তায় স্থিতি হলে সেখানে আর চ্যুতিই হয় না। এই স্থিতির অপরিপক্কাবস্থায় এক একবার চ্যুতি হয়, আবার যেন তাকে সেই অবস্থায় টেনে নেয়। এখানে দুটো দিক আছে, কিন্তু অবস্থা চমৎকার—এটা অজ্ঞানের স্থিতি নয়, তার আগের অবস্থা—ভাবের অবস্থা। ভাবে গেল এল—ডুবছে ভাসছে। তারপর দিল ফেলে, একেবারে জড় পাথর। এই পাথর স্পর্শ না ক'রে যদি এই একস্থিতিতে আসে—যদি টানাটানি থাকে, তবে পরিপক্কাবস্থা নয়, কিন্তু চমৎকার অবস্থা। যেমন একটা ঠান্ডা জায়গা আছে, বাইরে এলে গরম লাগে। এর পর পরিপক্ক—ডুবিয়া গেল। ডুবিয়া যাওয়ার পর যে ব্যবহার তা তুমি দেখেছ। কিন্তু সে যায় না খায় না দেখে না।

প্রশ্ন ঃ এইত গোঁজামিল দিলে—খায় আবার খায় না, যায় আবার যায় না—এ কি রকম?

মা ঃ যখন ডুবে গেল—স্থিত হতে হবে। বাহির ভিতর এক হয়ে গেল। আমি খাচ্ছি তোমার মত, যাই তোমার মত। খায় আর খায় না বললে যদি বিরোধ থাকে তবে টুকরা জ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানী। বাধবে কোথায়? বাধলে খণ্ড হবে। তাই বলে কোন প্রশ্ন নাই। তবে কথা কি ঘুম আর সমাধি কার যে কোন অংশটা ধরা কঠিন। সোনা আর পিতল কতকটা এক রকমই। সোনা ধরলে যে তাই হয়ে যাবে।

যিনি ব্রহ্মভূমিতে আছেন তিনি খুঁটিনাটি দেখেন কি করে? তোমার দৃষ্টি আছে বলে তুমি বিরোধ দেখ। জ্ঞানী অজ্ঞানীর প্রশ্ন নাই। জ্ঞানী বললেও নিজকে একজায়গায় দাঁড় করান হল। নিজেকে পাওয়া কি ভাবে? —সর্বাঙ্গীণ ভাবে। যা তুমি ছিলে, কথাটা পুরা নয়—আছই, তুমি যা তার প্রকাশ হওয়া। যে লাইনে যে ভাবে যে যা কিছু বলে। তোমরাও যেমন বল না, পা নাই চলে, চোখ নাই দেখে—যদি কোন খানে কোন রকমে, আকারে প্রকারে, যার মধ্যে, তার মধ্যে, 'হ্যাঁ'র মধ্যে 'না'র মধ্যে

বাধে তবে পূর্ণ নয়। যে যেখান হতে কথা বলে ঐখানে ঐরূপই দেখায়, কারণ খান রয়েছে সময় রয়েছে। এ শরীর গোজামিল দেয় না, সত্যিই বলে, সব ঠিক যেখান হতে যে যা বলে।

প্রশ্ন ঃ যে যা বলে সবই যদি ঠিক হয়, মনে কর কেহ বিশ্বনাথ দর্শনের নিমিত্ত দুর্গাবাড়ী গিয়ে বলে 'এই বিশ্বনাথ' তাও কি ঠিক?

মা ঃ কোন স্থান হতে বলতে পারা যায়, হ্যাঁ এই বিশ্বনাথ। কেন না তখন তাই হয়ে যাবে। যতদিনের যেখানকার বিশ্বনাথ তারই প্রকাশ হবে। সবার মধ্যে সব যে। আবার এও বলা যেতে পারে—না এ দুর্গাবাড়ী, বিশ্বনাথ অন্যত্র। সব রকমই বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ শঙ্কর ত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তবে তিনি কেন পূর্বপক্ষ নিরাশ করতে গেলেন, সকলের কথাই যদি ঠিক হয়।

মা ঃ যেখান হতে যা করবার প্রয়োজন হয় বাদ যায় না কিছু। গাছের আগাতে গাছের শিকড় আছে, কারণ বীজ আছেই সব জায়গায়—বিরোধ নাই।

২৫

বেদান্ত আর ভক্তি দুটো পৃথক বাদ, এ বলায়—

মা ঃ বাদ যেখানে সেখানেই ত বাদ রইল। ভেদ অভেদের অন্ত যেখানে সে স্থানটা কোথায়? কেহ কেহ বলেন রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব পাক্কা বেদান্ত—রাধা ছাড়া কৃষ্ণ নাই, কৃষ্ণ ছাড়া রাধা নাই— দুইয়ে এক, একে দুই।

প্রশ্ন ঃ নিত্যলীলা দুই মেনে বলছে।

মা ঃ দুই মেনে বলছে সেও একেই— কেউ কেউ এটা নেয়।

প্রশ্ন ঃ ধাম, লীলা, পরিকর— এ সব কি?

মা ঃ তা'রা বলে এই লীলার মধ্যেও অদ্বৈত বাদ যায় না। লীলার আস্বাদ রস, আর বেদান্তে 'দুই' এর কোন প্রশ্নই নাই। ভক্তিবাদীদের দুই দেখা গেলেও তবুও একই। ঐ চশমা না পড়লে ধরা যায় না। ঐখান হইতে ঐরূপই দেখায়।

গুরু দীক্ষা দেবার সময় উপদেশ করলেন—রাধাকৃষ্ণের সেবাপূজা কর। তুমি সেবক, দাস, তিনি, প্রভু, এইভাবে সেবা করতে করতে সংস্কার আসিয়া পড়ে— (১) এ ঠাকুর ঘর, শুদ্ধ পবিত্রভাবে রাখিতে হইবে ঠাকুরকে পূজা ভোগ নিবেদন করিতে হইবে, আরতি করিতে হইবে ইত্যাদি। এই সেবা করিতে করিতে বিচার আসে, আমার ঠাকুর কি এইটুকু মাত্র! তিনি কি মাত্র ঠাকুরঘরেই আছেন, তার বাইরে আর কোথায়ও কি নাই? তাঁর সেবাপূজা করিতে গেলে তাঁর যে সব এটা এসে যায়। এ যেন সংক্রামক ব্যাধির মত। কে একজন বলিয়াছিল, আনন্দময়ী মা'র কাছে যাইও না, তার কাছে বসন্তের Germ আছে। (হাসি)। একনিষ্ঠতার দরুণ ভিতর হইতে বিচার আসে, —সে ভাবটা কর্মের বাহিরে প্রকাশ। তারই আলোটা আসে, সেই শক্তিটা এসে যায়, তা'ই বিচার দিক্‌টা ফোটে।

(২) তারপর এমন হয়— পূজার বাসন মাজতে বসে দেখতে পেল ঠাকুর। শুয়ে থেকে শয্যার কাছে দাঁড়িয়ে ঠাকুর। দেখ ঠাকুর কিন্তু মনে রয়েছেন ঠাকুর ঘরে, আর ক্রমশঃ তাঁকে এখানে ওখানে দেখতে পাচ্ছে। পরে আর স্থান অস্থান নাই, যে দিক দৃষ্টি, গাছে ঠাকুর বসে আছেন, জলে দাঁড়িয়ে আছেন, পশুপাখিতে ঠাকুর দেখছে। এখনও কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকে ফাঁকে দেখছে।

(৩) এর পর ঠাকুর যে আর পিছনই ছাড়ে না, যেখানে যাও,

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গেই—অনুভবেও।

(৪) তারপর কি হয়—গাছের আকার প্রকার প্রকাশটাও। পূর্বে ছিল সব বস্তুর মধ্যেই ঠাকুর, এখন আর মধ্যে নয়—ঠাকুরই ঠাকুর। গাছ, পাতা, জল, স্থল—ঠাকুরই ঠাকুর। তখন তার প্রকাশটা কি থাকে?—আকারে, প্রকারে, প্রকাশে যা' কিছু ঠাকুরই, আর ত কিছু নয়। এমন হইতে পারে এই একটি অবস্থাই কেহ বা শরীর কাটিয়ে যেতে পারে।

(৫) সবই যখন ঠাকুরই ঠাকুর— এই যে দেহখানিও ঠাকুর—তিনি, এক সত্তা। এই অবস্থায় যেখানে ধ্যানস্থিত তখন হাত দিয়া আর সেবাপূজা হইতেছে না, একমাত্র তিনিই যে,— নিজে আর পৃথক্ নয়। বেদান্ত কি বলবে?— এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। আবার সেই স্থান থেকেও কাহারও প্রভু দাস, তিনি পূর্ণ নিজে অংশ, আর সেই একাত্মা। যদি ব্রহ্মকে বলা হয় 'কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি'— আপত্তি কি? অভিন্ন অভেদই সব তো। এই পেয়ে আবার— বল না, অবগাহন স্নান।

(৬) এই পেয়ে আবার সেবা পূজা করেন। সেবা পূজা নিয়ে রইলেন —তিনি প্রভু, আমি দাস। মহাবীর বলেছিল, আমি আর তিনি এক। কিন্তু তিনি পূর্ণ আমি অংশ, তিনি প্রভু আমি দাস। এখানে পূর্ণ পেল, দাস পেল। এক আত্মস্বরূপ যেখানে—'তিনি প্রভু, আমি দাস' নিয়ে যদি থাকে, আপত্তি কি? প্রথম ছিল রাস্তায়, পাওয়ার দিকে। প্রকাশের পর তিনি সেবা করছেন। এই পেয়ে সেবাই সেবা— এ'কে মুক্তি বল, পরাভক্তি বল, যা' বল।

আচার্য শিক্ষা দিচ্ছেন। তার জপ করলেও যা, না করলেও তা। বাধে কোথায়? বলবে জগৎগুরু, আর দেখবে দোষ?

প্রশ্ন ঃ যখন একত্ব বোধ হয়ে গেল, তখন আবার কিসের অভাব যে তাকে খণ্ড পূজা করতে হবে?

মা ঃ এখানে অভাব নাই।

প্রশ্ন ঃ তবে এটা সেবা পূজাও নয়?

মা ঃ যা' বল তা'ই। কথা আছে না, শুকদেব মুক্ত, তবে আবার ভাগবত শোনাতে গেলেন কেন? এর জবাব কি? যে অভাবে প্রথম সেবা পূজা ক'রে যাচ্ছিলেন সে অভাবের স্থান কোথায়।

বেদান্তী 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে যাচ্ছে— সত্যই ত ফুলটা দেখছে, দুদিন পরেই মাটি হয়ে যাচ্ছে। তবে ত সত্যই একমাত্র। পরিবর্তন ত পরিবর্তন হয়ে যাবেই। নামরূপের দিক দিয়েও কেহ বলবে— সর্বনাম তোমার নাম, সর্বরূপ তোমার রূপ। এখানে ত নামরূপটাও সত্য। আবার বলবে, পরিণাম বদ্ধ যেখানে সেখানে ত জগৎ। বিচার করতে করতে এক সত্তায় স্থিত হলেন।— একমাত্র সমুদ্রই, জলই, নিজকে আলাদা ক'রে দেখতে পাচ্ছেন। না ঐ যে বলা হয়েছিল অবগাহন স্নান। বাইরে ভিতরে যদি কোথাও এক চুলও শুকনা থাকে তবে অবগাহন স্নান হ'ল না। যেমন সিদ্ধ হ'লে আর অঙ্কুর গজাবে না। সিদ্ধ হবার পর তুমি যা' বানাও, কিন্তু সৃষ্টির বীজ আর নাই। এই সৃষ্টির বীজ যেখানে থাকবে না সেখানে যে আকার প্রকার সে ত ঐই। দেখ ভক্তি দ্বারা বা বেদান্ত বিচার দ্বারা সেই জিনিষই ত হইয়া গেল। এই হইয়া যাওয়া কি পাথর হইয়া যাওয়া?— তা' ত নয়। তা'ই আকার প্রকার প্রকাশ তাই ত।

যে যে পথে চলবে তার ত একটা প্রকাশ থাকবেই, কিন্তু পাবে ত একটা জিনিষই, যা পেলে আর অমীমাংসায় থাকবে না। পাবে কি আছেই ত— নিত্য সত্য। উপলব্ধি বা অনুভব বল্লে আলাদা থাকে। কোন স্থানে এ কথাটা টিকে, কোন স্থানে টিকে না। যা নিত্য, তাই বলা হয় আছেই। আবরণ বা পর্দা যেটা বলা হয় সেটা গতি। গতিটা পরিবর্তন হয়ে যায়, বদলে যায়। আবার বদলে যায় না— ব্যবহারের মধ্যে অব্যবহার। তার

কাছে দুই নাই—কে খায়, কাকে খায়? ঐ স্থিতিতে বাদ বিবাদ কোথায়? যদি বলা হয় চলছে বলে সেই স্থানে থাকে না—কি বলছি, কাকে বলছি, সে কে? এটা যখন এসে গেল। এক জনাকে বুঝাতে গিয়ে বুঝতে পারলে, ঐখানটা সে বুঝতে পারছে না। এটা বুঝতে পারলে বলে কি তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে? বুঝতে পারাটা আর বুঝতে না পারাটা দুইই পেলে। জগৎ-দৃষ্টিতে নিবদ্ধ থাকলে বদ্ধ। কিন্তু 'তৎ' দৃষ্টিতে অজ্ঞানের জ্ঞান, জ্ঞানের জ্ঞান সমগ্রটা তোমার নিকট প্রকাশিত।—যেখানে জ্ঞান অজ্ঞানের আলাদা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। এখনও এই খাওয়া দাওয়ার ব্যবহারগুলি তাহার নিকট অব্যবহারের ব্যবহার। এখানে পূজা থাকল, না থাকল আপত্তি কি? জানা অজানা সমগ্রটা তার ভিতরে এসে গেল কিনা। কিন্তু এই স্থানটি বুঝা কঠিন। কোনও একটা দিক্ বা স্থিতি বুঝতে সহজ। স্থিতি অস্থিতির সেখানে প্রশ্ন নাই, অথচ অনবস্থা দোষ নাই। কিন্তু একটুও টান থাকলে আর হ'ল না। নকল বিক্রয় করে বড়লোক হতে পার। নকল কেনে কেন? তার মত বলে, এই চমৎকার। কিন্তু ব্যবহারে গিয়ে ধরা পড়বে। তখন আবার আসলের খোঁজ পড়বে।

যেখানে এক আত্মা পেল, একমাত্র হ'ল তখন আমার যে মূর্তি তিনিই ঐ রূপেতে। সত্তাটা পেয়ে তখন ঐ রূপেতে। আমার ঠাকুরই আত্মা, ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাই—ঐ যে ঠাকুর আমি পূজা করেছিলাম। ডুব দিয়ে স্নান করার পর জলই ঐ আকারে ভক্তের দিকে প্রভুকে পেয়ে প্রকৃত সেবক হ'ল। 'এই নয়', 'এই নয়' করে আর 'এই তুমি', 'এই তুমি' করে একই পেল। এদিক দিয়েও এই পাওয়া, ঐ দিক দিয়েও এই পাওয়া। যিনি শক্তির আশ্রয় নিয়ে যাবেন, কি শিবের মূর্তি নিয়ে যাবেন, পাবেন এক শক্তি, এক শিব। আর বেদান্তের দিক দিয়ে ঐ বরফই জল, আকার নাই নিরাকার। আর আমার ঠাকুরই ব্রহ্ম—যার যার রাস্তা, যে ভাবে যাওয়া। সমত্ব একত্ব আসতে হবে, স্থিত হ'তে হবে। এর পর যদি বলে

আমি মুক্তি বাদ দেই বা ঠাকুর পূজা বাদ দেই, তখন বাদ দিলেও কোনটা বাদ যায় না—বাদ অবাদের সেখানে স্থান নাই কিনা। কথা হ'তে পারে একই লাইনে যায় না কেন? তিনি অনন্তরূপে প্রকাশ—সেই ত। তখন আর কেন নাই। ঝগড়া রাস্তায়। কার সঙ্গে লড়বে? রাস্তায়ই লড়াই।

২৬

প্রশ্ন ঃ পূর্বজন্মের কথা মনে থাকে না কেন।

মা ঃ অজ্ঞান, জ্ঞান নাই, আবৃত আছ বলে।

প্রশ্ন ঃ আবরণই বা হয় কেন? মৃত্যুর পরও মন থাকেই, কেননা সংস্কার থাকে মনে। আর সংস্কারগুলি যখন থেকেই যায়, আজকের কথা কালকের কথা মনে থাকে—জন্মান্তরের কথা ভুল হবে কেন?

মা ঃ ভুলের রাজ্যে এসে সব ভুল হয়ে যায়। এটা যে ভুলেরই জায়গা।

প্রশ্ন ঃ এতটা ভুল হয়ে যাবে, একটুও ত মনে থাক।

মা ঃ তোমরাই ত বল, বুদ্ধ ৫০০ জন্মের কথা বলেছেন। ছেলেবেলা থেকে এখন পর্যন্ত তোমার যা বয়স হয়েছে— এই জন্মের এই সমস্ত কথা মনে করতে পার? প্রতি পলে তোমার মৃত্যু হচ্ছে তোমার জানা নেই— এখন তোমার বাল্য নাই, শৈশব নাই, যৌবন নাই। ছোট ছেলে জন্মাবার পর হতেই আপনা আপনি দুধ খেতে লাগলো। আর খেতে আনন্দ, খেলে পেট ভরে যায়— এতে পূর্বজন্মের পুরা প্রমাণ দিচ্ছে। ছোট ছেলের খেয়ে যে এই আনন্দ— আরাম হতো— এখনও ত তাই হচ্ছে। কিন্তু কথা এই মনে থাকছে না।

প্রশ্ন ঃ সংস্কার কেমন থাকে?

মা ঃ অভ্যাস যোগ। ভগবানের জন্য চেষ্টা করে যাও, মৃত্যু সময় আপনা হতে স্মরণ এসে যাবে। জীব যে বদ্ধ; জগৎ-গতি। এই জীব জগতের মধ্যে যা প্রকাশ এক তারই প্রকাশ পলে পলে যে তোমার মৃত্যু হচ্ছে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের যে প্রকাশ হচ্ছে এইরূপে দেহান্ত করে প্রমাণিত করছে—ভুল জগতে যখন বিচরণ করছ তখন ভুলতেই হবে।

সংস্কার—যেমন মন্দির সংস্কার অর্থাৎ যা ছিল তারই প্রকাশ। আর এক কথা, তোমার মনে থাক বা না থাক সমস্তটারই একটা ছাপ থেকে যায়। একেই বলে সংস্কার। যার যোগ্যতা আছে, দেখতে পারলে দেখতে পাবে পূর্বজন্মের এই ছাপ বা সংস্কার। যে জ্ঞানী সে কত জন্মের সংস্কার দেখতে পারে। নিজের লক্ষ জন্মই বা দেখলে কিন্তু যেখানে অনুলোম বিলোম প্রকাশ সেখানে কি দেখবে?

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে গাছপালা কীটপতঙ্গ যেখানে যা কিছু আছে তাদের জন্ম তোমারই জন্ম; তাদের মৃত্যু তোমারই মৃত্যু। যেখানে তোমার মধ্যে সব, সবের মধ্যে তুমি—এখানে এক 'ঐ'ইত।

যদি পাঁচ জন্ম দেখতে পার এখানে সংখ্যা দৃষ্টি। তোমার পূর্বজন্মের history এ'ত তোমার দেশ কাল গতির মধ্যে স্রেফ আপনার জন্মই দেখছ, কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যে নানা স্থিতি রয়েছে তার ত প্রকাশ নেই, 'নানা' তুমি যে দেখছ এই নানা মিটবে কি করে? নানার মধ্যে আপনাকে পেলে। কে?—ঐ একমাত্র। যতক্ষণ এর প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত boundary রয়ে গিয়েছে। Boundary মানে অজ্ঞান, কাজেই ভুল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ঈশ্বরকোটিতে যাবার কথা বলছেন?

মা ঃ ঈশ্বরকোটিতে যাওয়ার কথা হয় না। যতক্ষণ আবরণ থাকে ততক্ষণ হয় না। ঈশ্বরকোটি কি সাধন কোটি এটার ভাগ করে তোমরা নাও।

প্রশ্ন ঃ যে আত্মস্থিত তার ত জগৎ ভুল হবেই।

মা ঃ ভুলের রাজ্যে ভুল। যখন দেহ ব'ল তোমার আকারটাই হলো 'দেও দেও'। দেও মানে অভাব আছে। অভাব যেখানে সেখানে ভ্রান্তি, অজ্ঞান। যেখানে ভ্রম আর অজ্ঞান সেখানে ত ভুল থাকবেই। এর মধ্যে নিজেকে পাওয়ার দিকে যখন সাধনা কর, বা কৃপা পেয়ে যখন সাধনা হয় —সাধনামাত্রেই কৃপা—তখন কত স্তর পার হ'য়ে দেখতে পাও আমি ত সমগ্ররূপে। আমি আছি তবেই না গাছপালা যত ইতি। যত রূপ হয়েছে সে ত আমিই। যেখানে আমিই সেখানে আমার প্রকার প্রকাশ এই দেও দেওটা। এই রূপেই অনন্ত। এই দেহটার আকারেই অনন্তভাব, অনন্ত প্রকাশ। এই যে আর সব আকার রয়েছে সবই ত অনন্ত। তাহলে আমিও অনন্ত। তখন দেখতে পায় যতগুলি আকার প্রকার প্রকাশ রয়েছে সেটাও আমিই—নিত্যই আছি। এত গেল আমি নিত্যই আছি। এত গেল আমি নানারূপে। আমি ত অনন্তরূপে, আর এই যে রূপ রয়েছে তাঁর অনন্তরূপ প্রকাশ। এই অনন্তগুলিও আমার মধ্যে অনন্ত প্রকার রয়েছে—আমিই সকল আকার এই সবের। যে আলাদা দিক্‌গুলি রয়েছে সেই সকলের দিক্‌টাও আবার অনন্ত প্রকারে আমাতে। এই রকম প্রকাশ যখন প্রত্যক্ষ,—অনন্তের দিক্‌টাও যখন সমগ্রভাবে প্রকাশ হলো তখন একের দিক্‌টাও আসতে বাধ্যই। এক আর অনন্ত আলাদা কোথায়? একের মধ্যে অনন্ত, অনন্তের মধ্যে এক।

কাজেই তোমার ৫০০ জন্ম যে পেলে সংখ্যাবদ্ধ। আরও তো কত রইল। সেই সবের মধ্যে যখন পেলে অনন্তরূপে তুমি, আবার অনন্তরূপে ঠাকুর রয়েছে। এই যে অনন্ত আর অন্ত এই তত্ত্বটা যার পূর্ণাঙ্গীণভাবে প্রকাশ হবে, তখন অনন্তে অন্ত, অন্তে অনন্ত। এখন সাকার নিরাকারের সমাধান কর। দেখ একটা কথা, ব্যক্তিগত যেখানে আবরণ থাকে এটা না

হলে খেলাটা চলে না। যেখানে ভুলটা হবে এখানে আবরণ ঢাকা না দিয়ে নিলে খেলা হয় না। সুতরাং এটা থাকা স্বাভাবিক। এজন্য জগৎ—সৃষ্টি দৃষ্টি। জীব মানে ত বদ্ধ, বদ্ধ মানেই আবরণ, সেখানেই ভুল যা জিজ্ঞাসা করলে।

পূর্বজন্ম যদি বল, একটা প্রকাশ হয়—আমি কখন ছিলাম না? পূর্ব পর ত তোমরা বলছ কালের মধ্যে সময় নিবদ্ধ। সেখানে ত কাল অকালের প্রশ্ন নাই, সেখানে ত দিনরাত পূর্ব পরের প্রশ্ন নাই যতক্ষণ কালের অধীন ততক্ষণ জন্ম মৃত্যু। নইলে পূনর্জন্ম বলে কথা নেই। একটা আছে, পূর্বজন্মের স্মৃতি আসবেই আসবে। কিন্তু আবার পূর্ব পর? আমি ত সদাই আছি।

প্রশ্ন ঃ অদ্বৈত পথে চললে তার বিভূতি আসবে কি?

মা ঃ অদ্বৈত স্থিতি—সাধকের কথা যদি বল তবে অদ্বৈতের রাস্তায় যে চলেছে সে বিভূতি এলেও নিবে না। আর সাকার সগুণ পথে যে চলেছে সে বিভূতি এলে 'তৎ' ভাবে নিবে। সাধক মাত্রেই বিভূতি আসতে হবে, কেননা কর্মের ফল। বিভূতি মানে বিভুই নানা রূপের প্রকাশ ত। সেইজন্যই আসা স্বাভাবিক, আসবেই। সাধকের মধ্যে বিভূতি আসা-পাওয়াটা চাই না, কেননা সেখানে নিবদ্ধ হয়ে পড়বে।

অদ্বৈত পথের সাধক দ্বৈত নিবে না। সগুণ পথের সাধক অদ্বৈতটাও নিবে না, কিন্তু আগে চলতে চলতে বিভূতি কি তা বুঝে যাবে। নির্গুণ যে বলে তার মধ্যেও কথা আছে। এরও প্রকাশ হয়ে যাওয়া চাই। এইজন্য সাকার কি, নিরাকার কি তার সমাধান হয়ে যাওয়া। যেখানে এক রকমের স্থিতি মাত্র নানাটা চলে গিয়েছে—স্বয়ং প্রকাশ তা এখানে নয়। অদ্বৈত পথে চলতে চলতে বিবেক বৈরাগ্য দ্বারা এক আত্মার প্রকাশ চাই। আলাদা আলাদা সব জ্বালিয়ে এক হয়ে গেল, ঐখানে স্থিতি এসে গেল। কেউ

কেউ হয়ত বলবে এই অদ্বৈত স্থিতি। জগৎ পরিবর্তন— এর মধ্যে যে গতি, স্থিতি, নানা, এই সমস্তই চলে গিয়ে এক। এখানে নানা থাকেই না। এখানে এক ব্রহ্ম, এক আত্মা কে?— একে অদ্বৈত স্থিতি বলে।

আর এক কথা— চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, সবই চিন্ময়। আকার প্রকার প্রকাশ সবই চৈতন্যময়। অপ্রাকৃত আর কি! যেখানে পর পর নাই—ঐই একমাত্র—তাঁরই বিগ্রহ। জগৎ-দৃষ্টিতে যে তোমার 'নানা' এখানে সেইরূপ নানা নেই। বিভূতি—বিভু, যা একমাত্র তিনিই স্বয়ং বিগ্রহ;—তিনিই নানার মধ্যে বিভূতিরূপে একমাত্র। যেমন জলে বরফ, বরফে জল। জল না থাকলে বরফের আকার এল কোথা হতে? জলেতে বরফ হওয়ার ভাব যদি না থাকে তবে বরফ হয় কি প্রকারে? অতএব সমগ্র তাতে, তিনি সমগ্রতে— সেই যে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—অদ্বৈত নিত্য সেবক, নিত্য দাস। মানে অনিত্যতা নেই। আকার প্রকার রূপে ঐ। যিনি নিরাকারের রাস্তায় যাবেন যদি তাঁর এক অদ্বৈত— এখানে স্থিতি থাকলো আর লীলাক্ষেত্রটা না পেলো তবে হলো না। দ্বৈত কি তার সমাধান হলো না। এক এক দিকের কথা ত। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ পেতে হবে।— নিজেকে ফিরে পেতে হবে। গাছের একটি কলম পেলে, ঐ কলম থেকে গাছ হলো। বিশাল বৃক্ষ তারই মধ্যে নিবদ্ধ থাকলো। কিন্তু ঐ গাছ হ'তেই আবার কলম পাওয়া যাবে, তখন নিজেকে ফিরে পাওয়া হলো। উপমা সর্বাঙ্গীণ হয় না, অনুকূল অঙ্গ নিতে হয়। সবটার মধ্যেই যে সে এক আর একের মধ্যেই যে সব, যুগপৎ এই প্রকাশটা হয়ে আছেও, নাইও, আছেও না, নাইও, না, কি রকম? বীজের মধ্যে দেখলে একটি বীজ গাছপালা বা অন্য কোন আকার প্রকার কিছুই নাই, আবার গাছটি হলো তার মধ্যে পাতা, ফুল, ফল, গাছ— অনন্ত দিক্। যখন একটি বীজ মাত্র তখন কিছুই নাই, কাজেই নাই। আবার যখন গাছ—তখন আছে। নাই যে ছিল না এটাও ত ঠিক। অতএব নাইও না, যেহেতু 'যা' দেখা গেল এটা আছে।

কি রকম?—অনন্তরূপে আর একরূপে। আছেও না, যেহেতু নাই ছিল। ভাষা কোথায়? বল না—সৎ, অসৎ, না সৎ, না অসৎ। যেখানে অদ্বৈত বল না অথবা নিজেকে নিয়ে নিজেই লীলা খেলাটা। ঐ যে বলা হলো সমস্তটা জ্বলে এক হয়ে গেল, যেন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না এক হয়ে যে গেল এখানে একটা অন্ধকার আছে। স্বয়ং প্রকাশ ত নয়, চিন্ময় রাজ্যও আসে নাই। এখান হ'তে কখন যে উত্থিত হবে বলা যায় না।

চিন্ময় যদি এসে যায় এখানে বিগ্রহ আসবে 'তৎ' হিসাবে। জগৎ দৃষ্টিতে যেটা ছিল দুঃখ সেটা চিন্ময়েতে হন বিরহ অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে রহ। এই বিরহটা অনন্ত, নব নব প্রকাশ। ভগবানের কল্পনা মাত্রেতে সৃষ্টি। সৃষ্টিটা কি?—তিনি স্বয়ং সেই। তবে আলাদা পর পর কেন? পর পর নয়—বিন্দুতে সিন্ধু রয়েছে কি করে? এক হয়ে যখন তিনিই বিগ্রহরূপে প্রকাশ হলেন—রাধাকৃষ্ণ—এটা নিত্যই আছে। কোথায়?—বৃন্দাবনে। যার হৃদয়গ্রন্থি খুলে গিয়েছে তার একমাত্র বৃন্দাবনই, এই যে জিনিষটা তুমি লীলারূপে পেলে এটা অনন্ত। এই অনন্তটা কোথায় হবে? জগতের যত ইতি এটা কি বাদ দিয়ে? পরমহংসদেব বলেছেন মা নাচছে। বৈষ্ণব কে?—সর্বত্র বিষ্ণুদর্শন। জগতের boundary মোহ। এজন্য নানা শক্তি—এটা মোহ এটা প্রাকৃত। এটা অপ্রাকৃত এটা তোমরা ভাগ করছো। কিন্তু সমগ্রটাই তাঁর লীলা। সমগ্রটার মধ্যে তাঁকে পাওয়া। অপ্রাকৃত পর পর নাই। Boundary'-র মধ্যে যে থাকবে তার হৃদয়টা বৃন্দাবন হবে না। যখন পেলো একমাত্র বৃন্দাবন, একমাত্র শিব, একমাত্র অদ্বৈত; তবেই হলো জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর খেলা। এটা আর এটা নয়—প্রকৃতিটাও তাঁরই। স্থিতি এসে গেলে প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত, কোন কথা নেই। যেখানে একমাত্র চৈতন্যময় প্রকাশ হচ্ছে যেখানে কেহ অদ্বৈত স্থিতি নিয়ে গেল, কেহ লীলার প্রকাশটা নিল। তিনি বিগ্রহরূপেতেও নয়। সমগ্র মানে সম অগ্র। সব অগ্রেই যে সমতা আছে সেটা যদি প্রকাশ না হয়, জগৎ দৃষ্টিতে

দেখবে তবে অদ্বৈত নয়। আর যখন অদ্বৈত নেবে, ফিরিয়ে পাওয়া কি? জগতে শোক তাপে যে আচ্ছন্ন ছিল— আচ্ছন্ন মানে, আচ্ছাদন— এটা চলে গিয়ে একমাত্র 'তৎ'। বিগ্রহ এসে গেলে সবটার মধ্যে—গতিরূপে, স্থিতি রূপে একমাত্র সে। প্রতিবিম্বরূপে কে?— সেই একমাত্র। এখানে দুঃখ কষ্ট কে দেবে? তোমার সমগ্র জিনিষটা একত্ব হয়ে যা আছে— তার প্রকাশ হলো। যে দুঃখে আজ দুঃখিত ছিলে সেটা হলো তার বিরহ। জাগতিক দুঃখ অভাবে, আর ভগবানের জন্য বিরহ স্বভাবে।

সে সাকার সগুণ নিয়ে চলছিল তার কি হলো? প্রথমেতে তার নিজের মূর্তিটুকুই। তারপর চলতে চলতে কি হয়—আমার ঠাকুর কি এইটুকুই। রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা— সবের মধ্যে আমারই ঠাকুর। আমার ঠাকুরই নানা রূপে, এর পরে সকলের মধ্যে আমার ঠাকুর। আমার ঠাকুরের মধ্যে সকলে। এই চলার মধ্যে বহু স্তর বহু স্থান আছে। এক জায়গার কথা বলা হচ্ছে। প্রথমতঃ আমার ঠাকুরের মত আর কেউই নয়। প্রথমে এটা না হলে নিষ্ঠা হয় না। ক্রমশঃ ঠাকুরের উপর যখন নিষ্ঠা শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তখন আমার ঠাকুরই ঐ। ভক্তি শ্রদ্ধায় তাকে এত ছোট রাখতে দিতে চায় না। সাধকের দীনভাব, ভক্তিভাব বেড়ে চলে। চরমে ত সবের মধ্যেই সে তাঁর মধ্যেই সব। একের মধ্যেই সেই বিগ্রহটিকে ফিরে পেলো। বীজের থেকে গাছ হলো আবার গাছ থেকে সেই বীজটি ফিরে পেলো।

দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ। নিজকে পেয়ে স্বরূপ প্রকাশের পর এখন যদি সে ঐ ঠাকুরের সেবা পূজা নিয়ে থাকে— নিজের পূজা নিজেই করে, এ তার লীলা।

প্রশ্ন ঃ কার লীলা?

মা ঃ লীলা ত ভগবানের। লীলা আবার কারও হয়?

২৭

মা ঃ স্বপ্নে মন্ত্র পেলো—একজন দর্শন দিয়ে মন্ত্রটা দিয়ে গেল বা মন্ত্রটাই দর্শন হলো। জাগবার পর মন্ত্রের ঐ অনুভূতিটাই শুধু রয়ে গেল। অর্থাৎ জাগ্রতভাবেও ঐ ভাবটা রয়ে গেল। ফলে তার হলো কি? না, বহুদিনের সমস্যা মীমাংসা হয়ে গেল; নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেল। এইভাবেই সে চলতে লাগলো দীক্ষা নেবার আর তার ইচ্ছাই নাই। এই অবস্থায়ও কি তার স্থূলভাবে আবার দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন আছে?

প্রশ্ন ঃ অধিকারী ভেদে প্রয়োজন অপ্রয়োজন।

মা ঃ তাহলে সকলের জন্য সবটা না। আমি একজনার কথা বলছি। নামটা নাই বল্লাম। সে বিরজাহোম করে সন্ন্যাস নিল, দণ্ড নিল। কিন্তু কোনও অনুভূতি হলো না। নিতান্ত নিরাশ হয়ে শেষে দণ্ড ত্যাগ করলো। নাস্তিকের মতই যেন হয়ে গেল। এতটা হতাশা এসে গেল যে শরীর তোলবারও আর ইচ্ছা নাই। এই সময়ে হঠাৎ একদিন তার দর্শন হলো, অনুভূতি পেলো—আমার মধ্যেই সব। নৈরাশ্য চলে গেলো। সব দুঃখের অবসান হলো।

পূর্বের ঐ সন্ন্যাস গ্রহণ কর্মাদি বাদ দিয়ে যদি শেষের অনুভূতিটাই পায় তাহলে তার আর দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রইল কি? অবশ্য এ রকমও হয় যে স্বপ্নে মন্ত্র পেলো—আবার দীক্ষাও নিল।

এই শরীরের কাছে অনেকে এসে বলে—তুমি বললে দীক্ষা নি। তুমি হ্যাঁ বল ত নিব, না বল ত নিব না। এই রকম বলে ত?—সব একরকম বলা হয় না। কাউকে হয়ত বলা হলো যতক্ষণ ভিতর থেকে না আসে ততক্ষণ আর দীক্ষা নিও না; যা স্বপ্নে পেয়েছ এইটাই করে যাও। অপরকে হয়ত বলা হল—আবার অন্য কাহারো নিকট হ'তে দীক্ষা নেও, যার

প্রতি তোমার শ্রদ্ধা হয়।

প্রশ্ন ঃ দীক্ষাটাও ত সূক্ষ্মের ব্যাপার, শুধু শব্দমাত্র না। আর স্বপ্নে যে দীক্ষাটা পেলো সেটাও স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মেরই ব্যাপার। তবে আবার স্থূলে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন কি রইল?

মা ঃ দীক্ষার ফলে বাইরে ভিতরে তখনই স্ফুরণ হয়। তোমার ভিতরে সমগ্রটাই রয়েছে। শুধু প্রকাশের জন্য, বাহির ভিতর এক করবার জন্য, স্থূলে হয়ত কেউ কৃপা করে গেল! দীক্ষা পেয়ে সাধনায় কেউ হয়ত সিদ্ধ হয়, কেউ বা কিছুই পেলো না, মরে গেল।

তোমার শরীরে জাগতিক জাগরণের দিক থেকে বলা হয়—স্থূলেতে দীক্ষা পেলে যেমন তৃপ্তি স্বপ্নেও যদি সেইরূপ পায়। যদি প্রকাশ হয় সেই তৃপ্তি—আমার দীক্ষার আর প্রয়োজন নাই। তখন বাইরে পেলেও যেমন কাজের হলো স্বপ্নে পেয়েও তেমন কাজই হলো। এক্ষেত্রে আর বাইরের দীক্ষার প্রয়োজন কেন?

প্রশ্ন ঃ অর্থাৎ নিজে তৃপ্ত হলেই হলো।

মা ঃ না, শুধু তৃপ্তি না। ভিতরে এমন ছোঁয়া থাকে তা থেকেই বুঝতে পারে—আমার আর দরকার নাই। এক্ষেত্রে যদি ইচ্ছা হয়, বিশেষ ব্যক্তি যদি কেহ থাকে ত তাকে জিজ্ঞাসা করেও বুঝে নিতে পারে! অবশ্য ব্যক্তিটি এমন হওয়া চাই যে নিরপেক্ষ থাকে, যাহা খাঁটি তাই বলে। ব্যক্তি চিনে নেওয়াও কঠিন। সাধারণতঃ কোনও কোনও জায়গায় দেখা যায় বাইরে শোনা যায় বেশ উঁচু। কিন্তু যিনি গ্রহীতা তিনি যদি একবার খাঁটি সোনা হয়ে ওঠেন তবে তিনিই সময়ে বুঝে নেবেন!

যে শক্তি সঞ্চারিত হলে দীক্ষা সেই শক্তি সঞ্চারিত হলেই হলো, গুরুশক্তির প্রকাশটা স্বপ্নেই হোক বা বাহ্যেই হোক। ভিতরে খাঁটি প্রকাশ হলে তখন আর বাইরের অভাব থাকে না।

প্রশ্ন ঃ এর লক্ষণ কি?

মা ঃ যারা ভিতরে পায়, ভিতরে পেয়েও হয়ত অভাব ছিল, পরে মিটে গেল। যেমন যেমন যোগাযোগ। যেমন কারো প্রকাশটা ভিতরে ছিল না, হয়ে গেল। আবার আস্তে আস্তে ভিতরে ফোটা, সেটাও সম্ভব। আবার হয়ত পাওয়া মাত্রই হলো না, দীর্ঘ জীবন গেলেও হলো না। আবার দেখ দীক্ষামাত্রই তার পরিবর্তন হয়ে গেল। দীক্ষার ফলটা প্রকাশ পেলো। এ হ'লে ত কথাই নাই। যে ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাচ্ছে প্রকাশ হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রেও ভিতরে ক্রিয়া হয়েই যাচ্ছে।

জপ সমর্পণ সম্বন্ধে মা বলিতেছেন—"জপ করে অর্পণ করতে হয়। অর্পণ না করে যদি নিজের কাছেই রাখা হয়—ভাল জিনিষটার বোধ না থাকায় তার দ্বারা সেই জিনিষটা নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন ছোট ছেলের কাছে বহুমূল্য রত্ন থাকলে সে বুঝতে না পেরে ধনটি হয়ত ফেলে দিল। তবে নিজের কাছে রাখলেও কতকটা ফল হবে, রক্ষার ফলটা পূর্ণাঙ্গীণ ভাবে পাবে না। পাত্রের মধ্যে থাকলে যেমনটা হবে, তোমার কাছে থাকলে সম্পূর্ণ ফলটা পেলে যেমন হয়, তা হলো না। এইজন্যই অর্পণ করে দেওয়া।

ছেলে একটা জিনিষ পেলে মা'র কাছে এনে দেয়; সে ত জানে না এ কি জিনিষ। মা জিনিষটা দেখে বুঝেন—আরে, এত অমূল্য বস্তু। তাই তিনি তখন ছেলের হাত থেকে তুলে নিয়ে রেখে দেন। ছেলে যখন বড় হলো, বুঝতে শিখলো, তখন বস্তুটা আবার তাকে ফিরিয়ে দেন, বলে দেন—তোর জিনিষটা আমি তুলে রেখেছিলাম। এখন নে।

যখন অধিকারী হলো, এস্থলে না বুঝার দিকটা পূর্ণ হয়ে এসেছে। বয়স আর জ্ঞান হওয়ায় জানার দিক্‌টা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলো। অর্পণ করতে করতে আস্তে আস্তে প্রকাশ হ'তে লাগলো— নাম নামী কি? আমি কে? নিজেকে পাওয়াটা কি? এটা যখন প্রকাশ হলো, জপে

পরিপূর্ণতা এলো। কোন মুহূর্তে যে এটা হবে জানা যায় না, তাই করেই যাওয়া।

অনন্ত সাধনা, অনন্ত অনুভূতি, অনন্ত প্রকাশ, আবার অব্যক্ত; যে যে লাইনে চলে যায় জপ করে। অনন্ত বললাম কেন? গাছের পাতা অনন্ত, আবার পাতার একটা সাধারণ আকার থাকলেও আকারের মধ্যে অনন্ত পরিবর্তন। এদিকেও অনন্ত। পরে অন্তে যখন প্রকাশ হবে তখনই অন্ত। আর তখনই অনন্ত মাঝে বলে তার প্রকাশ। যেমন বীজটি ঠিকই আছে, শাখা প্রশাখা ঠিকই আছে, আবার সবটাই কিন্তু অনন্ত। এইরূপ সাধনার দিক্ দিয়া সবই অনন্ত। এই সংখ্যা জপ করতে করতে কোন মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠবে। আগুনটা সব জায়গাতেই আছে, কেবল ঘসা, কোন মুহূর্তে ঠিক হবে জানা নাই। তাই উন্মুখ হয়ে থাকা। কোনও যোগী হয়ত বলতে পারে যে এত জপের পর প্রকাশ হবে।

কাজেই জপ কর। এটাও মা'র নিকট রাখার মত অক্ষুন্নভাবে রক্ষিত হবে। কোন মুহূর্তে প্রকাশ হবে—একেতে অনন্ত, অনন্ততে এক। কখন যে জপের সংখ্যা পূর্ণ হবে? তখন কি পাবে? নাম নামী অভিন্ন পাবে। তোমার অর্পণ যা কিছু ফিরে পাবে।

প্রশ্ন ঃ জপটা গুরুকে অর্পণ না করে নিজের কাছে রাখলে কি সেটা নষ্ট হয়ে যাবে?

মা ঃ গুরু যদি অর্পণ না করবার আদেশ দেন তবে অর্পণ না হলেও সেটা গুরুর হাতেই রইল। তাঁর আদেশ কিনা? তিনি হয়ত নিজের কাছে রেখে পূর্ণ করতেন এখন শিষ্যের কাছে রেখেই পূর্ণ করবেন। কোথায় রেখে পূর্ণ হবে তিনিই জানেন।

আবার কিছুই কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় না। অনবরত যতটা জপ করে গেলে একদিনে ফলটা ত পাবে। কিন্তু আবার নষ্টও হয়— যেমন

ভুলচুক ন্যায় অন্যায়— কোনটাই বাদ দিলে চলবে না।

দেখা যায় নিষ্ঠা নিয়ম জপ তপ করে কিছুই হলো না। গভীর নৈরাশ্যে সব ছেড়ে দিল। দুঃখের বেদনায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করলো। এখানে উন্মুখতা এতটা হলো, কর্মটা ছেড়ে দিল, কিন্তু ধ্যানটা যদি কাহারও একমুখী হলো—তখনই প্রকাশ।

২৮

প্রশ্ন ঃ মা, একটা প্রশ্ন করব? উত্তর কিন্তু আমি যে ভাবে বুঝতে পারি সেই ভাবে দিতে হবে।

মা ঃ বেশ ত, যদি এসে যায়।

প্রশ্ন ঃ জ্ঞান হইয়া গেলে আর কি স্মৃতি থাকে, আমি কোন কালে অজ্ঞান ছিলাম?

মা ঃ যখন জ্ঞান হয়, হওয়ামাত্র নিত্যত্ব প্রকাশ। ঐ যে আলোর তলে অন্ধকারটা বলে কি করে? আলোতেই ত। অন্ধকারটা কি? কে? যে দিকের কথা। কিন্তু অন্ধকার বললে আলো বুঝায় না আর আলো বললে অন্ধকার নয়—এ কথা নয় কিন্তু।

একটা দিকের কথা—বাঃ, আমি কখন অজ্ঞানী ছিলাম?—পরিষ্কার। এই যে ছিলাম, হলাম—এটাই ভুল। আছেই ত—এটাই হল সত্য। অবিনাশী কখনও নাশ হয় নাই, হবেও না। আচ্ছা, বর্ণ পরিচয়ের পূর্বে অবস্থাটা স্মরণে আসে ত? অথবা I.A., B.A. পড়ার সময় Matric পড়ার সময়ের ভাবটা মনে আন্‌তে পার কি? এই সবগুলিই যে আলাদা নয়, 'সে'ই যে। ঐ স্বয়ংপ্রকাশ কি না, এখন বুঝ। এটাও সেটাও—এ কথা নয় কিন্তু।

একটা সময় আসে যেমন সূর্যোদয়ের মত বাদল সরে গিয়ে প্রকাশ। যখন জ্ঞান হয়—আমি ত সদাই 'যা', 'তা'। সমগ্রটা পরিষ্কার হয় কি না, তাই কোন কালেই অজ্ঞানী নয়। কখন সৃষ্টি, কখন স্থিতি, কখন লয়? কোন পার্থক্যের প্রশ্ন থাকে না।

❁ ❁ ❁

পূর্ব আলোচনা হওয়ার পর খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ বসিয়া আছেন। ভূপেন বলিল, মা কীর্তন করিব?

মা ঃ হ্যাঁ, খালি বসে থাকার চাইতে একটা কিছু করা ভাল।

প্রশ্ন ঃ মন তো খালি থাকতে পারে না, মা?

মা ঃ হরি কথা হরি চিন্তন ছাড়া থাকাই মনকে খালি রাখার কথা আর উহাই বৃথা, ব্যথা। কারণ মন ত একেবারে খালি থাকে না, কিছুতে লেগে থাকবেই। যা' তা'য় লেগে থাকা তাই হয় বৃথা। সেই জন্যই বৃথা কথা না বলা।

মনের ত একটা আশ্রয় চাই-ই। এ মনটি কারও না কারও কোলে। তাই নিরাশ্রয়ের গতিটাই ত তাকে দেওয়া চাই—স্বয়ংই আশ্রয় যে ধরবার জন্য। 'সে'ই যে সকলে। সকল মানে কল রূপেতেও তিনি অর্থাৎ স্বক্রিয়ায় যেখানে স্বক্রিয়, প্রকাশের দিকে—জপ, ধ্যান, কীর্তন ইত্যাদি।

মনটা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে সে শান্তি পায় না। তিনি (মন) কুলে কুলে একুল, ওকুল, দুকুলে বেড়ান, ছোট্ট শিশু কিনা। যখন একুল ওকুল দুকুল ভেসে যায়, তখনই ত ব্যস। এই যে একুল ওকুল দুকুলে বেড়ায়—খাদ্য চায়, পায় না। মনকে যে খাদ্য দিলে সে এক জায়গায় থাকে যদি সেই সুখাদ্য দেও, পূর্ণ ভোজন দেও, তখনই সে স্বয়ং পূর্ণ হয়ে—পূর্ণ শিশু মায়ের কোলে। 'মা'তেই বল, 'ম্যায়' তেই বল, 'মে'-তেই বল—ভিন্ন হলেও অভিন্ন, অভিন্ন হলেও ভিন্ন। অর্থাৎ সমাহিত বা

সমাধি যেখানে যা' বল, সেই যে তা' তেই—রসস্বরূপ, সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ যা' বল। 'স্ব' রূপে, 'স্ব' এ আর কি।

❁ ❁ ❁

প্রশ্ন ঃ মা, কিছু বলুন।

মা ঃ বাবা, এখানে ত জান, এসে গেল ত এসে গেল।

প্রশ্ন ঃ তবে আমিই জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, অদ্বৈত বোধ না হলে প্রমাণ হয় না, অথচ ইহা বোধের অতীত। তাহা হইলে এই অদ্বৈত তত্ত্ব সিদ্ধ হয় কি করিয়া? ফলে 'এ' ত কল্পনার জিনিষ মাত্র।

মা ঃ মুস্কিল হচ্ছে, বক্তা যিনি বলছেন আচার্য, তাকে ত' তোমার মধ্যে নিয়ে এলে।

প্রশ্ন ঃ কি রকম?

জনৈক ঃ আচ্ছা, আমি বলছি। ততক্ষণই বলা যায়, যতক্ষণ বৃত্তির মধ্যে থাকে—সুখ দুঃখ যা'ই কেন হউক না। কিন্তু এই সুখটা যদি নিরাধার সুখ হয়, তখন কি?—প্রেম।

মা ঃ কর্মটা বলেছে কেন?—সৃষ্টি করে বলে। কিন্তু যার সঙ্গে এমন টান হলে আর কর্ম সৃষ্টি করে না তা'কেই বলে প্রেম। সেটা প্রেম বলা হয়েছে কেন? যার পরে আর সৃষ্টি, স্থিতি বা দুঃখের প্রশ্ন থাকে না। কাম সৃষ্টি করে, তা'ই মোহ। তাই বলে ভগবৎ টান হলে প্রেম, আর জাগতিক টান হলে কাম। পর অপর যেখানে নাই—তারপর আর রইল না—তা'ই প্রেম বল, জ্ঞান বল। যেখানে গতির দিক শান্ত হ'য়ে গেল।

প্রেম হ'তে স্বপ্রকাশ জিনিষটা আসবে। জ্ঞান যেখানে স্বরূপ—স্বয়ং যে প্রকাশ, এসে যাবে। প্রেম ভক্তিরসের দিকে যাও, প্রকাশটা কি? স্বরূপ

প্রকাশ, এখানে ত আর প্রশ্ন থাকে না। তুমি হয়ত বলবে, এই যে স্বয়ং প্রকাশ, এখান হ'তে বলে কি করে? অদ্বৈত তত্ত্ব প্রকাশ করে কি করে?

আচ্ছা, তুমি প্রফেসর, পাশ করেছ। তুমি সেটা কোন জায়গা থেকে বল? তুমি সবটাই কি বলতে পার—এম-এ পাশের সবটা?

প্রশ্ন ঃ সবটা ত আর বলা যায় না, আংশিক প্রকাশ করতে পারি।

মা ঃ সমগ্রটা পারছ না। এই যে বইখানা পড়েছ, সমগ্রটা পড়েছ। কিন্তু বলা হচ্ছে অন্যের মত — যাকে বলছ তাকে সমগ্রটা বলতে পারছ না। কিন্তু কিছু লক্ষণ আছে যা'তে তোমার বিদ্যার একটা দিক্ প্রকাশ পাচ্ছে। ব্রহ্মজ্ঞানীর বেলায় কল্পনার জিনিষটা পাচ্ছ না। বুঝতে হবে সেটা স্বয়ং প্রকাশ, সেখানে ত বুদ্ধি বাক্য দ্বারা প্রকাশ হতে পারে না। তার লক্ষণ যা' প্রকাশ, তার মুখ থেকে যা' শুনছ, সবটা বুঝতে পারছ না, কিন্তু লক্ষণটা ধরতে পারছ।

স্বাভাবিক যে প্রকাশ আছে তার প্রকাশটা। সেই জন্য একটা কথা হয়, যিনি প্রফেসর নন, তিনি কিভাবে বুঝবেন প্রফেসর কোথা হতে কেমন বল্‌ছেন, একজন বিলাত হ'তে ফিরে এসে বর্ণনা করছেন, শ্রোতার একটা ধারণা হচ্ছে বটে, কিন্তু নিজে বিলাত না যাওয়া পর্যন্ত ঠিক ঠিক বুঝা কঠিন। বুঝা না বুঝা ত জগতের কথা। কিন্তু যেখানে যা' তা' সেখানে কি দিয়ে ধরবে?

প্রশ্ন ঃ তবে উপদেশ কি করে হবে?

মা ঃ যতটুকু বুঝবে ততটুকু বলবে, রাস্তার খবর কিনা, দিতে পারে। জলের উপরে রাখলে, ডুবে গেল? ভিতরে গিয়ে কি হল? যিনি বাইরে থেকে দেখছেন, তিনি বলবেন ডুবে গেল। যেমন খুব ধ্যান লেগেছে দেখেও বলা হয়, ইনি জাগতিক ভাবে নেই। কারণ ধ্যান হলে যে লক্ষণ তাই বলছ। তাকে জিজ্ঞাসা করলে জগতের দিকের কথা, তিনি কিন্তু

অন্তর্জগতের কথাটা বিশেষ করে বলছেন। তুমি লক্ষণটা পেলে, ভাষাটাও পেলে, কিন্তু তিনি কি পাচ্ছেন তা তুমি না খেলে পাবে না। সেদিকে বলবার যতটুকু ততটুকু বলবেন—বাক্যের দ্বারা যতটুকু সম্ভব। কিন্তু যিনি ডুবে গেলেন, তিনি কিছু বললেন না। তাঁর নিকট কিছু নাই, তবে আর কি বলবেন? কিছু থাকলে কিছু বলতেন।

প্রশ্ন ঃ রাস্তার কথা ত বলছেন।

মা ঃ তবে ত তুমি বলবে, যিনি বলছেন তিনি রাস্তায়। কিন্তু বাবা তিনি কিছু বলেন না, তিনি যা' তা'। তবে যে বলেন, এই বলাটা তোমাদের মত বলা নয়। তোমরা দেখছ বলছেন, তিনি কিন্তু কিছু বলেন না। তোমার কাছে কিছু আছে বলে তুমি কিছু দেখছ। তিনি কারও বাড়ী যান না, খান না, চলেন না, বলেন না এটা সত্য কথা। যা' আছে ঐ আছে। তিনি হয়ে গেলেও হন না, করলেও করেন না। যে বলছে, খায়, বলে, দেখে, শোনে, তাকে বলতে দাও। কিছু নাই ত, কিছু কি করে?

প্রশ্ন ঃ ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রহ্মই হয়ে যায়। তখন জানা শুনা কিছুই থাকে না। তবে জানে কি?

মা ঃ ওটা বাক্ বাণীর বিষয় নয়। একটা ব্যাপার কি বাবা, জানাটা যে বলে, নিজেকে জানা। তুমি এখন অজানাটা বোধ কর কিনা, ঐখানে ত জানা অজানার প্রশ্ন নাই। জানি কথাটা আসে না। জানি মানে জো হ্যায়, সো হ্যায়—স্ব প্রকাশ। আমি জানি বললে আমি হতে দ্বিতীয় থাকে। আর প্রকাশ যে সর্বদাই আছে, অপ্রকাশ ত নাই-ই, বাদল হটান আর কি। ঢাকা না ভেঙ্গে ফেলে, বাতি ত জ্বলছেই। যিনি জানা না জানার মধ্যে তার দৃষ্টিতে জানা না জানা। যার কাছে দৃষ্টি সৃষ্টি বলেছে তার কাছেই যাওয়া আসা। তিনি ত যা' 'তা'।

ব্যাখ্যা

এক

এই বাণীটিতে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে (১) ধ্যানজ দর্শন ও প্রকৃত দর্শন, (২) ব্রহ্মের নিরংশতা, (৩) স্বরূপজ্ঞান ও ক্রম (৪) মনোনাশ ও দেহে অবস্থান, (৫) জীবন্মুক্তি ও মনের আঁশ, (৬) স্বীকার ও অস্বীকারের পারে যাওয়া (৭) স্বরূপস্থের অভিনয় কি প্রকার, ও (৮) মৌনতত্ত্ব—এই কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান প্রবন্ধে এই কয়েকটি তত্ত্ব সম্বন্ধে মা'র উপদেশের মর্ম কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

১ — ধ্যানজ দর্শন ও প্রকৃত দর্শন

মা'র পরিভাষাতে দর্শনের দুইটি অবস্থা আছে— একটিতে ছোঁয়ামাত্র হয়; দ্বিতীয়টিতে স্থিতি হয়। যে দর্শনে স্থিতি হয় না তাহা প্রকৃত দর্শন নহে, ছোঁয়া অর্থাৎ আভাস; সুতরাং ধ্যানজ দর্শন; দর্শনের আভাস মাত্র। আভাসের দ্বারা জীবনের ধারাতে পরিবর্তন সংঘটিত হয় না, কিন্তু আনন্দ হয়, অর্থাৎ বিষয়ের রস গ্রহণ হয়। প্রকৃত দর্শনের কথা ভাষা দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না।

পরিবর্তন কি? Conversion অর্থাৎ একটি অস্থায়ী অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির ফলে স্থিতিভাবের আবির্ভাব। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। মা বলেন, "স্থিতিতে রস নাই।" শাস্ত্র বলেন, সমাধির চারিটি অন্তরায়—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও সুখস্বাদ বা রসাস্বাদ (দ্রষ্টব্য—

বেদান্তসার)। গৌড়পাদ বলিয়াছেন (মাণ্ডূক্যকারিকা ২। ৪৪-৪৫) যে, লয় অবস্থায় চিত্তকে সম্বোধিত করা উচিত অর্থাৎ জাগাইয়া রাখা উচিত। তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ লয় অবস্থার উদয় হয়। ইহা একটি মূঢ় ভাব—কতটা নিদ্রার মতন ইহা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া ইহাকে দূর করা উচিত। বিক্ষেপ অবস্থাতে চিত্তকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। চিত্তের বিক্ষেপের বহু কারণ আছে। পতঞ্জলি যোগসূত্রে (১।৩০-৩১) এই সকল কারণের মধ্যে কয়েকটির আলোচনা করিয়াছেন। এই সব কারণের প্রভাবে চিত্ত একাগ্র হইতে পারে না। রজোগুণের প্রাধান্যই বিক্ষেপের মূল কারণ জানিতে হইবে। কষায় শব্দে কেহ মনে করেন (যেমন শঙ্করাচার্য) রাগ, দ্বেষ ও মোহ নামক দোষ। আবার কেহ কেহ মনে করেন (যেমন মধুসূদন সরস্বতী ও সদানন্দ) স্তব্ধ ভাব। চিত্তে কষায়-অবস্থার উদয় হইলে বিজ্ঞান অথবা বিবেক জ্ঞানের দ্বারা উহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আচার্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন যে, চিত্ত যদি কোন প্রকারে শান্ত হয় তাহা হইলে উহাকে চালনা করা উচিত নহে। সমাধিতে চিত্তের একাগ্রতার ফলে সুখ লাভ হয়, কিন্তু আচার্য বলিয়াছেন, "নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র।" ঐ অবস্থায় সুখের আস্বাদ গ্রহণ করা অনুচিত, কারণ উহা ভোগের অন্তর্গত। প্রজ্ঞা অবলম্বন পূর্বক সাধকের পক্ষে নিঃসঙ্গ থাকাই আবশ্যক। এইরূপ করিতে পারিলে চিত্ত নিশ্চল হইয়া "একীভূত" হয়; অর্থাৎ চিৎস্বরূপ সত্তাতে স্থিতি লাভ করে। এইজন্য রসাস্বাদও স্থিতির বিঘ্ন। ইহার পর আচার্য বলিয়াছেন, "যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ। অনিঙ্গন-মনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা।" লয়, বিক্ষেপ, চলন ও আভাসন অথবা বিষয়াকার প্রতিভাস—এইগুলি না থাকিলে চিত্তই ব্রহ্ম জানিতে হইবে। চিত্তের এই নিরাভাস অথবা অনাভাস অবস্থাই নির্বিকল্প দশা। ইহার নাম চিন্তাশূন্য অবস্থা। লঙ্কাবতার সূত্র মতে ইহাই বিহার বা বুদ্ধভূমি। এই অবস্থায় বৈকল্পিক মনোবিজ্ঞান থাকে না। আচার্য গৌড়পাদ ইহাকে অকথ্য

উত্তম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (কারিকা ৩।৪৭)। যে সুখাস্বাদ বা রসাস্বাদকে তিনি হেয় কোটিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন উহা সমাধির অন্তরায়, কারণ উহা বিষয়-রস। উহা ভোগের অন্তর্গত। মাও বলিয়াছেন, "স্থিতি হইলে বিষয়-রস এইভাবে গ্রহণ করিতে পারিতে না।"

দীর্ঘকাল অষ্টাঙ্গের সহিত নির্বিকল্প সমাধির অভ্যাস হইতে যে নিপুণতা চিত্তে উদিত হয় তাহার প্রভাবে অত্যন্ত তপ্ত লৌহখণ্ডে ক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় অথবা তৈলহীন দীপ কলিকার ন্যায় প্রত্যগ্-অভিন্ন পরমাত্মা বস্তুতে চিত্তবৃত্তির যে লয় হয় তাহা প্রকৃত লয় নহে। কিন্তু আলস্য প্রযুক্ত চিত্ত মূর্চ্ছাবস্থার ন্যায় বাহ্য বিষয় গ্রহণে উন্মুখ থাকে না ও ঐ সময়ে প্রত্যগাত্মার স্বরূপের প্রকাশও হয় না। ঐ অবস্থায় এক প্রকার স্তব্ধ ভাবের ন্যায় জাড্য ভাবের উদয় হয়। উহাই প্রকৃত লয় এবং উহাই সমাধির অন্তরায়।

অখণ্ড বস্তু গ্রহণের জন্য অন্তর্মুখে প্রবৃত্ত চিত্তবৃত্তি চিৎকে অবলম্বন না করিয়া যদি পুনরায় বাহ্য বিষয়ে গ্রহণের জন্য প্রবৃত্ত হয় তবে উহার নাম হয় বিক্ষেপ। রাগাদি তিন প্রকার—বাহ্য, আভ্যন্তর ও কেবল বাসনাত্মক। পুত্র, কন্যা, ঐশ্বর্য, কীর্তি প্রভৃতি বিষয়ে যে অনুরক্ততা তাহার নাম বাহ্য রাগ। মনোময় কল্পনারাজ্য লইয়া খেলা করা আভ্যন্তর রাগের পরিচায়ক। তৃতীয় প্রকার রাগ বৃত্তিরূপ নহে, সংস্কাররূপ মাত্র। বহু জন্মের অভ্যস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর রাগাদির অনুভব জনিত সংস্কারবশতঃ কলুষীকৃত চিত্ত শ্রবণাদি দ্বারা অতি কষ্টে অন্তর্মুখ হইলেও চৈতন্য গ্রহণ করিতে না পারাতে মধ্য অবস্থাতেই স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। যেমন কোন লোক রাজদর্শনের জন্য বহির্গত হইয়া রাজমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেও দ্বারপালের নিরোধবশতঃ স্তব্ধীভূত হয় অর্থাৎ তাহার অগ্রগতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, ঠিক সেই প্রকার বাহ্য বিষয় ত্যাগ করিয়া অখণ্ড বস্তু গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেও

রাগাদি সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া চিত্তে যে স্তব্ধীভূত অবস্থা উৎপাদন করে তাহার জন্য অখণ্ড বস্তুর গ্রহণ হয় না। ইহারই নাম কষায়। ইহা সমাধির বিঘ্নস্বরূপ।

হঠযোগিগণ বলেন, যোগের আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি— এই চারিটি অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থাতে কিঞ্চিৎ গ্রন্থিভেদ হইলেই আনন্দের অনুভব হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় গ্রন্থিভেদ আরও অধিক হয় বলিয়া আনন্দের মাত্রাও অধিক অনুভূত হয়। ইহার নাম পরমানন্দ। ইহার পর তৃতীয় গ্রন্থিভেদ হইলে চিত্তানন্দের উদয় হয়। এই তিন প্রকার আনন্দ ত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতে হয়। এই সকল আনন্দে ক্রম আছে কারণ এইগুলি পরিমিত। তাই ইহাও এক প্রকার বিষয়-রস। ইহার পর হয় সহজানন্দ। তাহা স্বাভাবিক আত্মসুখ। তখন চিত্ত একীভূত হয়। ইহারই নাম রাজযোগ। বিষয়-রস তখন থাকে না। ভোগের অতীত স্বরূপানন্দে স্থিতি হয় (দ্রষ্টব্য—হঠযোগ প্রদীপিকা ৪।৬৯-৭৭)। পতঞ্জলির উপদিষ্ট সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেও সানন্দ সমাধির অবস্থায় আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অতিক্রম করিতে না পারিলে অস্মিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। তাহার পর ক্রমশঃ বিবেকখ্যাতির ফলে স্বরূপে স্থিতি হয়। প্রাচীন বৌদ্ধগণ বলিতেন কামে কলঙ্কিত জগতের কলুষ-চিত্তকে সাধনা দ্বারা নিষ্কাম জ্যোতির্ময় রূপ-চিত্তে পরিণত করা যায়। রূপ-চিত্তই ধ্যান-চিত্ত। এই ধ্যান-চিত্তে প্রথমে ধ্যানের অঙ্গরূপে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা থাকে। ক্রমশঃ এইগুলিকে অপসারণ করিতে পারিলে অন্তিম অবস্থায় শুধু একাগ্রতা মাত্রই থাকে। তখন একটিমাত্র অবলম্বনে চিত্ত নিশ্চল হয়। এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় অন্তিম অবস্থায় সুখ অর্থাৎ রসাস্বাদও ত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়, নতুবা একত্ব লাভ হয় না। পঞ্চম ধ্যান-চিত্তে সুখ থাকে না। তখন উপেক্ষা থাকে এবং একাগ্রতা থাকে।

একাগ্রতার পূর্ণাবস্থার নামই অপর্ণা। ইহাই পূর্ণ সমাধির অবস্থা। তখন চিত্ত জাগ্রৎ থাকে, কিন্তু বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়। বহিরিন্দ্রিয় আপন আপন আলম্বনের সঙ্গে মিলিত হইলেও মনস্কারের অর্থাৎ মনোযোগের অভাবে স্পর্শ হয় না। ইহারই নাম একাগ্রতা। ইহাতে চিত্তের সমাধান হয় বলিয়া ইহা পদার্থের ঠিক ঠিক স্বভাব জানিতে পারে। এইভাবে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় ও উহা দ্বারা তৃষ্ণা-ক্ষয় হয়। বৌদ্ধগণ স্পষ্টই বলেন যে রূপ-ধ্যানের নাম শমথ। ইহাতে চিত্ত শুদ্ধ, শক্তিশালী ও তীক্ষ্ণ হয়। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান যাহা কিছু ঐ চিত্তে ভাসিয়া উঠে, তাহাকেই অনিত্য দুঃখময় ও শূন্যরূপে দর্শন করিতে হয়। ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান। পরে উহা হইতে চিত্তকে ফিরাইয়া নির্বাণে লাগাইতে হয়। এতদূর পর্যন্ত চেষ্টা করিলে প্রকৃত শান্তি কি তাহার স্বরূপ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু এই শান্তাবস্থার প্রতিও তৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে নির্বাণ-আলম্বন গ্রহণ হয় না। তখন ঐ তৃষ্ণার ফলে রূপ-লোকে অর্থাৎ উচ্চ উচ্চ দেবলোকে দিব্য জন্ম লাভ হয় মাত্র। সুতরাং রসাস্বাদ যে একান্তই বর্জনীয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এবার আমরা মা'র বাণীর তাৎপর্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিব। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ধ্যানজ দর্শন প্রকৃত দর্শন নয়, উহা আভাসমাত্র বা স্পর্শমাত্র। যে সাধকের ধ্যানজ দর্শন হয় তাহাতে অংশ আছে, কিন্তু ব্রহ্মে অংশ নাই। সাধকের আংশিক ভাব আছে বলিয়া তাহার দর্শনও আংশিক বলিয়া বর্ণিত হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্ম নিরংশ, অখণ্ড। তাহার দর্শনও অখণ্ড— তাহাতে আংশিকতা নাই। তিনি পূর্ণ। পূর্ণের দর্শনও পূর্ণ। তাহারই নাম স্থিতি। অতএব স্থিতি = দর্শন, দর্শন = স্থিতি। ব্রহ্মের আংশিক দর্শন হয় না, তবে সাধক অপূর্ণ অবস্থাতে যে দর্শন লাভ করে তাহা প্রকৃত দর্শন নহে বলিয়া আভাস। ধ্যানে উহাই উপলব্ধ হয়। উহা দ্বারা জীবনের পরিবর্তন সংঘটিত হয় না, স্থিতিও হয় না। প্রকৃত দর্শন হইলে নিজের ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ হয়।

২ — ব্রহ্মের নিরংশতা

ব্রহ্ম নিরংশ—তাহাতে অংশ নাই। সাধকের আংশিক ভাব আছে বলিয়া তাহার ব্রহ্মদর্শনকে আংশিক দর্শন বলা হয়। বস্তুত ব্রহ্মের আংশিক দর্শন হয় না। বস্তু পূর্ণ, দর্শনও পূর্ণ, তাহাই স্থিতি। যতক্ষণ স্থিতি না হয় ততক্ষণ অংশাংশিভাব মানা হয়। মা বলেন, "যদি অংশ তবে অংশ বলিতে পার, কিন্তু ব্রহ্মে কি অংশ আছে? তোমার আংশিক ভাব আছে বলিয়া স্পর্শ। কিন্তু তিনি পূর্ণ—যা' তাই।" যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ মানা না মানার প্রশ্ন উঠে, ততক্ষণ অংশ কল্পনা করা চলে। কিন্তু মনের অতীত অখণ্ড স্বরূপে মানা না মানার প্রশ্ন নাই। তাহাই পূর্ণ, তাহাই স্বভাব, তাহাই স্থিতি। সেখানে মন নাই, শক্তি নাই, অর্থাৎ তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে কিছুই নাই, কিন্তু অপৃথক্ ভাবে সবই আছে। বস্তুতঃ থাকা না থাকার, অথবা পৃথক্ অপৃথকের কোন প্রসঙ্গই নাই। তাই সেখানে স্পর্শ নাই। উহাই প্রকৃত নির্বিকল্প সমাধান। প্রকৃত দর্শন সেই মহাসত্যের স্বপ্রকাশ প্রকাশ মাত্র। হিন্দু ধর্মের বৈদিক ও তান্ত্রিক দর্শনে, খ্রীষ্ট ধর্মে সুফীদের মধ্যে, mysticদের মধ্যে, সর্বত্রই এই দুইটি দৃষ্টি প্রচলিত আছে। সমন্বয় স্থলে বলা যায় অধিকার ভেদে দুইটিই সত্য। বৌদ্ধগণও প্রকারান্তরে এই বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। তবে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যাবতীয় কল্পনার উপশমই সত্য প্রতিষ্ঠার সম্যক নিদর্শন। উহাই স্বরূপ লাভ।

সংসার বহু প্রকার—দ্বৈত সংসার পশুর, অদ্বৈত সংসার শিবের। অবিদ্যাকৃত ভেদের উন্মীলনই দ্বৈত সংসার। বিদ্যারূপে অভেদ গ্রহণপূর্বক অদ্বৈত সংসারের আবির্ভাব হয়। একই সময়ে অবিদ্যা ও বিদ্যার উন্মেষ থাকিলে যে ভেদাভেদের স্ফূর্তি হয়—তাহা পরম শিবের সংসার। বলা বাহুল্য উহাও একপ্রকার সংসারই বলিতে হইবে। ইহার পর যে অবস্থা আছে তাহা সংসার-কলঙ্ক দ্বারা অস্পৃষ্ট—শুদ্ধ অন্তর্মুখ বিশ্রামই এই

অবস্থার স্বরূপ। এই অবস্থার পারিভাষিক নাম বিন্দু। কেহ কেহ ইহাকে অনুত্তর ধাম বলিয়া বর্ণনা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এইটি মহাবিশ্রান্তিপদ। তথাপি এখানে সংসার না থাকিলেও তিন প্রকারের সংসারেরই অনুসন্ধান কিঞ্চিৎ পরিমাণে রহিয়াছে। এইজন্য ইহারও অতীত একটি অবস্থা স্বীকার করা হয়। ঐটির নাম পরমব্যোম অথবা নিষ্কল মহাবিন্দু। চারিটি আম্নায় অতিক্রম করিয়া পঞ্চ আম্নায়ে উহাতে স্থিতি লাভ হয়। সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রৎ, তুরীয় ও তুরীয়াতীত এই পাঁচটি দশার মধ্যে ভেদ সংসার, অভেদ সংসার, মিশ্র সংসার, সংসার-বিশ্রান্তি ও সর্বাতীত মহাবিন্দু দশা অন্তর্ভুক্ত। ঠিক সেই প্রকার পূর্বোক্ত ভেদ সংসার প্রভৃতি পাঁচটি দশাতে সুষুপ্তি আদি পাঁচটি দশা অন্তর্গত আছে জানিতে হইবে। এই পাঁচটি লইয়া যে ব্যাপক অখণ্ড স্বরূপ বিরাজমান তাহারই নাম পূর্ণত্ব। মাতৃকাচক্রবিবেকের টীকাতে পঞ্চম স্বরূপটিকে 'পরমব্যোম' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাতুলসিদ্ধ পদ্ধতির টীকাতে উহাকে 'পরম আকাশ' বলা হইয়াছে। মোটকথা, পূর্ণত্বের মধ্যে সব কিছুরই অন্তর্নিবেশ রহিয়াছে জানিতে হইবে।

৩ — স্বরূপ জ্ঞান ও ক্রম

মা বলিয়াছেন স্বরূপ জ্ঞানে ক্রম ও নানাত্ব নাই। ক্রম কালগত ধর্ম, নানাত্ব প্রধানতঃ দেশগত ধর্ম। স্বরূপ জ্ঞানে একভাব মাত্র বি্যমান, তাহাতে পর পর ভাব নাই। তাই সেখানে ত্রিকাল ভেদ নাই। তাহা নিত্য বর্তমান ও স্বয়ং প্রকাশ। নানাত্ব নাই বলতে বুঝিতে হইবে—অনন্ত বৈচিত্র্য যা'কিছু মানা হয় সবই সেখানে একে পর্যবসিত। যেন সব একেরই নানা রূপ মাত্র। তাই বাস্তবিক পক্ষে নানা অথবা আলাদা আলাদা বলিয়া তখন কিছুই থাকে না। তখন অনন্তরূপে একই বিরাজ করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে নানা নাই বলিয়া অর্থাৎ নানাত্বের ভান হয় না বলিয়া উহাকে একও বলা যায় না। শুধু আছে বলা চলে। কিন্তু গভীর ভাবে দেখিতে গেলে

আছে বা নাই কিছুই বলা চলে না। জাগতিক ভাষায় সৎ বা অসৎ বলিতে যাহা বুঝায় উহা তাহার অতীত। উহাই নির্বিকল্প পরমপদ। উদয়নাচার্য আত্মতত্ত্ববিবেকে বলিয়াছেন, "যত্র অদ্বৈতমপি ন বিকল্প্যতে" ইত্যাদি। সেখানে চরম বেদান্তের উপসংহার হয়। উহাই পূর্ণত্ব।

পাতঞ্জল যোগদর্শনের আচার্যগণ বলেন যে বিবেকজ জ্ঞানই পরিপূর্ণ জ্ঞান। ইহা একই ক্ষণে ক্রমহীন ভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। এই মহাজ্ঞানে সব কিছুই প্রতি-ভাসমান হয়। এই জ্ঞানে ক্রম নাই। ইহা দ্বিতীয় উপদেষ্টা পুরুষের উপদেশ হইতে উৎপন্ন হয় না, নিজের প্রতিভা হইতে আপনা আপনি উদ্ভূত হয়। একমাত্র এই জ্ঞানই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বলিয়া ইহাকে তারকজ্ঞান বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই বিশুদ্ধ জ্ঞান কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। ইহা শাস্ত্রবাক্য ও গুরু বাক্যেরও অপেক্ষা রাখে না। ব্যাসদেব বলেন যে পর পর বহুক্ষণের সমষ্টিকে ক্রম বলা হয়। বর্তমানই যখন একমাত্র ক্ষণ তখন বস্তুতঃ পর পর বহুক্ষণের সম্ভাবনা কোথায়। ক্ষণের সমষ্টি বাস্তবিক না থাকিলেও বহির্মুখ মানবের বুদ্ধিতে উহার প্রতীতি অস্বীকার করা যায় না। এইজন্য যোগীর মতে কাল বাস্তব পদার্থ নহে, বৌদ্ধ পদার্থ মাত্র। কালের জ্ঞানেতেই ক্রমের প্রকাশ হয়। উহাই ব্যাবহারিক জগতের জ্ঞান। ক্ষণের জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন সর্ব বিষয়ক জ্ঞান; উহাতে ক্রম থাকিতেই পারে না। কাশ্মীরীয় শৈবআগমেও এই ক্রমহীন প্রতিভার কথা আছে,—"যা চৈষা প্রতিভা তৎতৎপদার্থ ক্রমরূষিতা। অক্রমানন্ত-চিদ্‌রূপঃ প্রমাতা স মহেশ্বরঃ।।" অভিনব গুপ্ত বলেন, পদার্থের ক্রমটি দেশ ও কালের বিচিত্র সন্নিবেশ হইতে উদ্ভূত। ইহা ভগবানের স্বাতন্ত্র্য রূপা দেশশক্তি ও কালশক্তি দ্বারা কল্পিত হয়। দর্পণ যেমন প্রতিবিম্ব দ্বারা রঞ্জিত হয় তদ্রূপ স্বচ্ছ প্রতিভাও এই ক্রমের দ্বারা রঞ্জিত বলিয়া

মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বপ্রকাশ-রূপ প্রতিভাতে ক্রম নাই। ইহা সর্বদাই অন্তর্মুখ থাকে বলিয়া ইহাতে ভেদ থাকে না, এবং ইহা চিৎস্বরূপ। যাহাকে আমরা প্রমাণ বলি তাহা বহির্মুখ প্রকাশরূপী বিজ্ঞান মাত্র। প্রতিভা স্বপ্রকাশ বলিয়া প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ উহা প্রমাণের অধীন নহে।

'ত্রিপুরারহস্যের' জ্ঞানখণ্ডেও প্রতিভার আলোচনা আছে। ইহাই পূর্ণস্বরূপ মহাশক্তি শ্রীমাতার পরমরূপ—ইহাতে সমস্ত জগৎ দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় উৎপন্ন, অবস্থিত এবং লীনরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অজ্ঞানীর নিকট ইহা জগদাকারে ভাসে ও যোগীর নিকট নির্বিকার আত্মস্বরূপে ভাসে। তাহাতে দৃশ্য দ্বৈতভাব থাকে না—দেহ প্রভৃতি দৃশ্যের আভাসমাত্রও চিৎস্বরূপ আত্মাতে থাকে না। উহাতে একমাত্র অহং অখণ্ড ও অদ্বয় দ্রষ্টারূপে বিরাজ করে। উহা ক্রমহীন মহাজ্ঞান।

বুদ্ধদেব যখন সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়াছিলেন তখন এই ক্রমহীন মহাজ্ঞানই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটু একটু করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে এই জ্ঞান আবির্ভূত হয় না। যখন প্রকাশ হয় তখন একসঙ্গে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞানেরই প্রকাশ হয়। জৈনদের আগমেও এই ক্রমহীন কেবল জ্ঞান, কেবল দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সুতরাং মা যে স্বরূপজ্ঞানে ক্রম নাই বলিয়াছেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন মন থাকা পর্যন্ত অনন্ত অনুভব থাকে। ধ্যানাদি অবস্থায় আপন আপন অধিকার অনুসারে হৃদয়-দর্পণে ইহাই ফুটিয়া বাহির হয়। এই প্রকাশের মধ্যে ক্রম আছে, কারণ ইহার মূলে মনের ক্রিয়া রহিয়াছে। কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ অবস্থায় উহা থাকে না।

শৈব পরমার্থসারে আছে, ভগবানের অনুগ্রহ শক্তি অত্যন্ত তীব্র ভাবে সঞ্চারিত হইলে অর্থাৎ পশু বা জীবের হৃদয় কমলে ঐ শক্তি

অবতীর্ণ হইলে সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে পরমার্থ মার্গ প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে। তখন কোন বাধাই থাকে না। শ্রীকুলতন্ত্রে আছে—

হেলয়া ক্রীড়য়া বাপি আদরাদ্ বাপি তত্ত্ববিৎ।
যস্য সম্পাতয়েৎ দৃষ্টিং স মুক্তস্তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে।।

অনুগ্রহ শক্তি হৃদয়কে বিদ্ধ করিলে মহাজ্ঞানের রহস্য হঠাৎ অর্থাৎ ক্রমশূন্য ভাবে হৃদয়কে আক্রমণ করে, যাহার প্রভাবে সাধক ক্ষণমাত্রে পরমেশ্বর ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪ — মনোনাশ ও দেহাবস্থান

মা বলেন—মনের নাশ হইলেও শরীর থাকিতে পারে। দেহ ত জ্ঞানের বাধক নয়। জগদ্‌গুরু অথবা জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহে থাকিয়াই উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মন নাই, ত্রিপুটী নাই, তাই তাঁহারা জ্ঞান দিয়া জীবকে উদ্ধার করিতে পারেন। আবার এমন স্থানও আছে যেখানে দেহ থাকা না থাকার প্রশ্নই উঠে না।

তত্ত্বশুদ্ধিকার আচার্য জ্ঞানঘন বলেন যে ব্রহ্মভাবের সাক্ষাৎকার হইলে কেহ বিদ্যাগুরু হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম অপরোক্ষ একরস। উহাতে পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র। ভ্রান্তপুরুষ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতে পারে না। উপাসনা দ্বারা সোপাধিক ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা গুরুর আসনে উপবেশন করা যায় না। শব্দ প্রমাণ হইতে উদ্ভূত অপরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তবেই আচার্য গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে; প্রমাণের দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিলে তাহাতে অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অজ্ঞান দগ্ধ হয়। তবে কিছুকাল উহা দগ্ধ পটের ন্যায় বন্ধের

আকারে ভাসমান হয়। অবিদ্যা ও উহার কার্য দগ্ধ হইলে কার্যকরণকে দগ্ধই দেখিতে পাওয়া যায়; আত্মরূপে দর্শন করা হয় না। এইজন্য অবিদ্যা জন্য জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি অবস্থার সম্বন্ধ জ্ঞানীর হয় না। তাই যিনি বিদ্বান ও মুক্ত একমাত্র তিনিই আচার্য হইতে পারেন। যদিও তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয় তথাপি তিনি যে জীব নহেন তাহা নিশ্চিত। 'জীব' শব্দ ঐখানে দগ্ধ পটের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়াছে জানিতে হইবে।

৫ — জীবন্মুক্তি ও মনের আঁশ

কেহ কেহ বলেন, জীবন্মুক্তদিগেরও পূর্ণভাবে মনোনাশ হয় না। যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ মনের একটু আঁশ তাহার সঙ্গে লাগিয়াই থাকে। এইটুকু না থাকিলে ইহাদের মতে দেহ থাকিতে পারিত না, দেহপাত হইয়া যাইত। শাস্ত্রগ্রন্থে এইটি অবিদ্যা লেশ সংক্রান্ত প্রশ্ন। এই অবিদ্যা লেশকেই মা প্রকারান্তরে মনের আঁশ বলিয়াছেন। মা বলেন, মনের আঁশ অবস্থাবিশেষে থাকে ইহা সত্য, কিন্তু এমন অবস্থাও আছে যেখানে তাহা থাকে না, অথবা থাকা না থাকার প্রশ্নই উঠে না। তীব্র জ্ঞানে আঁশও দগ্ধ হইয়া যায়।

এ সম্বন্ধে বেদান্তের আচার্যগণের মধ্যেও নানা প্রকার উক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। আচার্য শঙ্করের মতে জীবন্মুক্তিতে প্রারব্ধ থাকে। জীবন্মুক্তি সিদ্ধাবস্থা, সাধক অবস্থা নহে। কারণ জ্ঞান পূর্ণ হইয়া গেলে সে অবস্থাকে সাধক অবস্থা বলা চলে না। আচার্য জ্ঞানঘন বলেন, প্রারব্ধ কর্ম বেগক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত থাকে। সংস্কারবশতঃ অথবা অজ্ঞানের লেশবশতঃ দেহ ইন্দ্রিয়াদির প্রতিভাস হয়। মণ্ডন মিশ্র শঙ্কর মত স্বীকার করেন না। সাধারণতঃ বলা হয় শর অথবা বাণ একবার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে তাহাকে

আর রোধ করা যায় না। কিন্তু শর ত্যাগের পূর্বে প্রয়োজন হইলে শরকে নিরুদ্ধ রাখা যায়। প্রারব্ধ কর্ম মুক্তশরের ন্যায়। একমাত্র ভোগ ভিন্ন উহাকে কাটাইবার উপায় নাই। মণ্ডন বলেন যে মুক্ত শরকেও রোধ করা যায় যদি মধ্যে প্রাচীর উঠান যায়, অথবা অন্য শর প্রয়োগ করা যায়। তাঁহার মতে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সাধক কোটির অন্তর্গত, সিদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। জীবন্মুক্তের দেহপাত হইলে সদ্যোমুক্তি হয়, তৎপূর্বে নহে। সেই জন্য মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত অবিদ্যা-সংস্কার থাকে। তবে তাহাতে আর ভোগ বা বন্ধন ঘটে না। প্রারব্ধ স্বফল দান করে; সত্যজ্ঞানকে নাশ করে না। জ্ঞান হইতে সঞ্চিত ও অনাগত কর্মের নাশ হয় ও মুক্তি হয়। প্রারব্ধ থাকিলেও ক্ষতি নাই। সর্বজ্ঞাত্ম মুনি বলেন, বাস্তবিক জীবন্মুক্তি বলিয়া কোন অবস্থা নাই। উহা অর্থবাদ মাত্র। সাধকের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য জীবন্মুক্তির উপদেশ দেওয়া হয়। বেদান্ত পরিভাষাকারের মতে জীবন্মুক্তি মুক্তিই নয়। কারণ মুক্তির কারণ বিদ্যা ঐ স্থানে পূর্ণ নহে। সাধন সমাপ্ত হইয়াছে ও মুক্তি আসন্ন, এইজন্য ঐ অবস্থাকে মুক্তি বলা হয়। বেদান্তীদের মধ্যে কাহারও কাহারও এমন মতও আছে যে জীবন্মুক্তের কোন কর্মই নাই, এমন কি প্রারব্ধও নাই। জীবন্মুক্তি সিদ্ধাবস্থা। কর্ম থাকিলে উহাকে সাধন অবস্থা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

৬ — স্বীকার অস্বীকারের পারে যাওয়া

মা বলেন, ধ্যান ধারণাদি সাধন মানার আবশ্যকতা হয় স্বীকার-অস্বীকার আছে বলিয়া। কেহ কিছু মানে, কিছু মানে না। অপর কেহ তদ্রূপ অন্য কিছু মানে, কিন্তু সেও আবার অপর কিছু মানে না। এই মানা ও না মানা রূপ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিকোণ আছে বলিয়া ধ্যান-ধারণাদির

আবশ্যকতার প্রশ্ন উঠে। যাহার যে প্রকার প্রকৃতি—সংস্কার, রুচি, শিক্ষা, যোগ্যতা প্রভৃতি বর্তমান সে তদনুরূপ ভাবেই সত্যকে স্বীকার করে, বিপরীত ভাবে স্বীকার করিতে পারে না। কারণ তাহার ত ব্যাপক দৃষ্টি নাই। এই সব লোকের দৃষ্টিও পরিচ্ছিন্ন, বিশ্বাসও পরিচ্ছিন্ন। ইহাই অধিকারভেদের মূল কারণ। ইহার একমাত্র মূল সর্বত্র মনের প্রভাব। যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ এই গণ্ডীবদ্ধ ভাব অনিবার্য। কিন্তু সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য, এই গণ্ডীর বন্ধন ভগ্ন করিয়া নির্মল সত্যের মুক্ত আকাশে বিচরণ করা অথবা স্থিতি নেওয়া। সকল সাধকেরই ইহা চরম লক্ষ্য। সেখানে আর মানা না মানার প্রশ্ন উঠে না। পূর্ণ সত্য স্বয়ং-প্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়। মা'র ভাষাতে ইহারই নাম স্বীকার-অস্বীকারের পারে যাওয়া।

৭ — স্বরূপস্থ পুরুষের অভিনয় কি প্রকার

কেহ কেহ মনে করেন—আত্মজ্ঞানের ফলে স্বরূপস্থিতি লাভ হইলে মনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। তাই সে স্থলে ব্যবহার চলে না। স্বরূপস্থ পুরুষকে ব্যবহার ভূমিতে আসিতে হইলে একটু নামিতে হয়, অর্থাৎ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়াও তখন মনের সাহায্যে প্রয়োজনানুরূপ বা ইচ্ছানুরূপ ভাব গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। মা বলেন, আত্মস্বরূপে স্থিতি হইলে নামা উঠার কোন প্রশ্নই থাকে না; কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তখন একমাত্র নিজেকে লইয়াই নিজের খেলা চলে। দ্বিতীয় থাকে না বলিয়া ব্যবহার থাকে না। তবে এমন অবস্থাও আছে যেখানে মন থাকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় অস্তিত্ব থাকে। আত্মা তাহাদের সান্নিধ্য ছাড়িয়া সমাধিস্থ হয়, পরে ব্যুত্থিত হইয়া বহির্মুখ মনকে গ্রহণ করিয়া জগৎকে দেখিতে পায়। ইহা কিন্তু প্রকৃত স্থিতির কথা নহে।

৭ (ক) — সংশয় ও আলোচনা

দুইটি অবস্থা আছে—একটি সন্দেহযুক্ত আর একটি সন্দেহহীন। দ্বিতীয় অবস্থাতে শঙ্কাও নাই সমাধানও নাই। প্রথম অবস্থাতে দৃষ্টিতে পরদা আছে বলিয়া সন্দেহ উঠে। সন্দেহ লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করিতে হয়, এবং আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ পরদা সরিয়া যায়। তখন প্রকৃত দৃষ্টি খোলে। ইহাই জ্ঞান-দৃষ্টি। ইহা দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন হয়। ইহা বাস্তবিক পক্ষে দৃষ্টি নহে, কারণ দৃশ্য ও দৃষ্টি তখন দ্রষ্টা হইতে পৃথক্ থাকে না। তবুও ইহাকে দৃষ্টি বলা হয়। তাই মা ইহার নাম দিয়াছেন 'দৃষ্টিহীন দৃষ্টি'। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "ঐ অবস্থায় আলাদা দৃষ্টির স্থান কোথায়?" সন্দেহকারী অবশ্য আলাদা দৃষ্টি নিয়াই প্রশ্ন করিবে। ইহা স্বাভাবিক, এবং ইহার সার্থকতাও আছে। কিন্তু যিনি উত্তর দিতেছেন সেখানে আলাদা দৃষ্টির অস্তিত্বই নাই। অজ্ঞান দৃষ্টিতে দৃষ্টির সঙ্গে পৃথক্ ভাবে সৃষ্টি ভাসে। কারণ তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয় আলাদা। জ্ঞান দৃষ্টিতে দৃষ্টি ও সৃষ্টি অভিন্ন বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকে না। জ্ঞান ও জ্ঞেয় তখন অভিন্ন। ইহারই নাম সংশয়হীন অবস্থা, যাহার কথা শাস্ত্রে হৃদয়গ্রন্থিভেদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

> ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।

তথাপি এই প্রশ্নোত্তরের রূপ আলোচনার উপকারিতা আছে। একদিন ইহার প্রভাবে জ্ঞানদৃষ্টির আবরণ সরিয়া যাইতে পারে।

এই যে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভিন্নতার কথা বলা হইল ইহাই Cosmic sense বা জ্ঞানদৃষ্টির প্রাণস্বরূপ। Edward Carpenter বলিয়াছেন— "The Perception seems to be one in which all the

senses unite into one sense, in which you become the object" অর্থাৎ তখন বিভিন্ন জ্ঞানের ধারা মিলিত হইয়া একটি জ্ঞানশক্তি রূপে পরিণত হয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় তাহার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এক হইয়া প্রকাশিত হয়। তখন জ্ঞাতা যেন স্বয়ং জ্ঞেয় হইয়া যায়—জ্ঞেয় যেন আর আলাদা থাকে না। পতঞ্জলি 'অর্থমাত্রনির্ভাস' বলিয়া এই তত্ত্বটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের knowledge by identity কতকটা অদ্বৈত জ্ঞানেরই সূচনা করে।

৮ — মৌনতত্ত্ব

মনের গতি দুই দিকে হয়—বহির্মুখে বিষয়ের দিকে অথবা অন্তর্মুখে ভগবানের দিকে চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে মৌনাবলম্বন তাহাকে ঐ কার্যে সাহায্য করে। বাক্ সংযম করার সঙ্গে সঙ্গেই মনের ক্রিয়াবোধ হয় না। প্রথম প্রথম ক্রিয়া থাকে—তখন কথা বলার প্রবৃত্তিও থাকে। কিন্তু অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ মনের গভীরতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে উহার ক্রিয়োন্মুখ ভাব শিথিল হইয়া আসে। তখন স্বভাবতঃই কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে না। তখন ভগবানের উপর সর্ববিষয়ে একটা নির্ভর ভাবের উদয় হয়। ইহারই নাম চিন্তাহীন অবস্থা। গীতাতেও শ্রীভগবান্ "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" এই উপদেশই দিয়াছেন, অর্থাৎ মনকে আত্মাতে স্থিত রাখিয়া চিন্তা বর্জন করিবে। মনকে ভগবানে সংলগ্ন করিলে তাহার প্রভাবে মন পবিত্র হয় এবং জাগ্রৎ হইয়া উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহও বিশুদ্ধি লাভ করে। বিষয় চিন্তাতে যেমন শক্তির ক্ষয় হয় তদ্রূপ ভগবৎ চিন্তাতে শক্তির উপচয় হয়। বাক্ সংযম করিয়া বিষয় চিন্তা করা উচিত নহে। ঐরূপ স্থলে কথা বলা বরং ভাল। বলপূর্বক বাক্‌রোধ করিলে বিষয় চিন্তা থাকে বলিয়া ইন্দ্রিয়ে আঘাত আসিয়া রোগ জন্মাইতে পারে।

মনের গতি সত্যই অন্তর্মুখ হইলে ভগবৎ চিন্তার প্রবাহ খুলিয়া যায়। তখন কথা বলার প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছাও হয় না। ইহারও পরাবস্থায় প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বোধও থাকে না।

মৌনে বিঘ্ননাশ হয়, যোগ বৃদ্ধি হয় এবং সাধকের যোগক্ষেম সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাহার যখন যাহা আবশ্যক হয় তাহা আপনি আসিয়া যায়। তাহার জন্য অন্যদিকে মন দিবার প্রয়োজন থাকে না। ইহার পর মন থাকা, না থাকা, অথবা কথা বলা, না বলা, সবই সমান হয়—উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

কিন্তু মৌনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। ইহা দ্বারা অন্যান্য সাধনের ন্যায় অজ্ঞানের আবরণ কাটিবার পক্ষে সাহায্য হয়। জ্ঞান স্বপ্রকাশ; উহা কাহারও প্রভাবে উদ্ভূত হয় না—উহা আপন স্বভাবে আপনি ফুটিয়া উঠে। কাহারও কাহারও মৌন-সাধনার ফলে শরীরে স্থিরতা আসে। কিন্তু উহা মৌন ধারণের প্রকৃত ফল নহে। মনের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কোন ফলই প্রকৃত সিদ্ধিরূপে গণ্য হইতে পারে না। তবে উহাও একেবারে বৃথা যায় না। জগতে কোন কর্মই ব্যর্থ নহে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পাঁচ প্রকার মৌনের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সকল মৌনের নাম—(১) বাচিক মৌন অর্থাৎ কথা না বলা, (২) সমাধি মৌন অর্থাৎ চক্ষু নিমীলন করা ও কিছু না দেখা, (৩) কাষ্ঠ মৌন অর্থাৎ বলপূর্বক মন ও ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে আনা। এই তিন প্রকার মৌন তাপসদের জন্য জানিতে হইবে। (৪) সুষুপ্ত মৌন অর্থাৎ যে অবস্থায় বাণী ও ইন্দ্রিয় আপন আপন নির্দিষ্ট কার্য করিয়া যায় অথচ আত্মা হইতে কোন পদার্থের ভেদজ্ঞান থাকে না, ও (৫) আত্মাতে জাগরণ, ইহাই শ্রেষ্ঠ মৌন। যে দর্শনে আত্মাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কিছুই প্রতীত হয় না তাহাই তুরীয়াতীত অবস্থা। ইহাই মৌনের পরম আদর্শ। চতুর্থ ও

পঞ্চম এই দুই প্রকার মৌন জ্ঞানীদের হইয়া থাকে। মা'র উপদিষ্ট বাক্যের সহিত বশিষ্ঠ রামায়ণের উপদিষ্ট মৌনতত্ত্ব মিলাইয়া আলোচনা করিলে মৌনের প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

দুই

১ — হঠযোগ

শাস্ত্রে বহু প্রকার যোগ প্রণালীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। হঠযোগ এই সকল বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রণালী। সাধারণতঃ রাজযোগ ও হঠযোগ এই দুই প্রকার যোগ সাধনের মধ্যে হঠযোগকে রাজযোগের 'সোপান' বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। চিত্তের বৃত্তির উপশম অর্থাৎ উন্মনী অবস্থা লাভ রাজযোগ সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। তদ্রূপ প্রাণের ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বায়ুর গতিরোধ হঠযোগ সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। মন ও প্রাণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া মনের নিরোধ সম্পন্ন হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণের নিরোধও সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে প্রাণের নিরোধ করিতে পারিলে ঐ চেষ্টার ফলে মনোবৃত্তি আপনি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। মোট কথা, প্রাণ অথবা মন যাহাকে আশ্রয় করিয়াই নিরোধের ক্রিয়া সম্পন্ন হউক না কেন উহার ফলে প্রাণ ও মন উভয়েরই উপশম সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু সাধকের আধারগত ভেদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য উভয় প্রণালীর চরম ফল এক হইলেও সকল অধিকারীর পক্ষেই উভয় প্রণালী সমরূপে উপযোগী হয় না। যে সাধক অপেক্ষাকৃত স্থূল

ভূমিতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রাণ ও উহার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকৌশল ব্যতীত মনকে নিরোধ করা সহজ নহে। কিন্তু জন্মান্তরের সাধনার ফলে অথবা স্বভাবসিদ্ধ উৎকর্ষ বশতঃ কিঞ্চিৎ উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত আছে, তাহার পক্ষে মনের বৃত্তি উপশমের জন্য নিম্নস্তরের ক্রিয়া-কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক হয় না। যাঁহারা দেহতত্ত্বের সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা জানেন প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষের অতি সন্নিহিত। অন্নময় কোষ হইতে মনোময় কোষ প্রাণময় কোষের তুলনায় কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। সুতরাং স্থূল দেহে অভিমানশীল জীবের পক্ষে প্রাণকে অবলম্বন করিয়া অথবা দেহ সংক্রান্ত মুদ্রাদি অবলম্বন করিয়া সাধন পথে উঠিবার চেষ্টা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। স্থূল দেহাভিমানী জীবের পক্ষে প্রথম অবস্থাতেই মনোময় স্তর অবলম্বন করা তত সহজ নহে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রাক্তন কর্মসংস্কারের এবং প্রকৃতি বৈচিত্র্যের প্রভাববশতঃ অনেকের পক্ষে প্রাণের স্তরকে উপেক্ষা করিয়া মনের স্তর অবলম্বন করিয়াই সাধন করা সহজ হইয়া থাকে।

যাহাকে প্রচলিত ভাষায় রাজযোগ বলিয়া বর্ণনা করা হয় শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে তাহার নামান্তর অমনস্ক, উন্মনী, অদ্বৈত, তুরীয়, মনোন্মনী* ইত্যাদি পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য হঠযোগ প্রদীপিকা ৪।৩-৪)। আত্মা ও মনের ক্ষয় বশতঃ উভয়ের সামরস্য এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমভাব, ইহারই নাম সমাধি। যথার্থ রাজযোগ ইহাকেই বলে।

হঠযোগের উপকারিতা আছে কি নাই ইহা অনেকের মনেই স্বভাবতঃ

* যোগতারাবলীতে (১৭-১৮) আছে যে মনোন্মনী অবস্থায় নেত্রে উন্মেষ থাকে না, বায়ুতে রেচক পূরক ভাব থাকে না এবং মনে সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না। হঠযোগ প্রদীপিকাতে আছে (২।৪২) যে প্রাণ বায়ু সুষুম্না মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তক পর্যন্ত সঞ্চরণ করিলে মন স্থির হয়। মনের এই সুস্থির অবস্থাই মনোন্মনী। উন্মনী ইহারই নামান্তর মাত্র।

উদিত হয়। শাস্ত্রানুসারে ইহার উত্তর এই— উপকারিতা আছে ইহাও সত্য, আবার নাই ইহাও সত্য। বস্তুতঃ হঠযোগ বলিতে সবিশেষ প্রযত্ন দ্বারা অর্থাৎ জোর করিয়া যে যোগ করা যায় তাহাই বুঝায়। 'হঠ' শব্দে বল প্রয়োগ বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং যখন সাধক কোন বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া সেই বিষয়কে ধারণা করিতে অথবা আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হন তখন এক হিসাবে তিনি হঠযোগের আশ্রয় লইয়াছেন, ইহা বলা যায়। পারিভাষিক অর্থে হঠযোগ যাহা বুঝায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে জোর করিয়া বা বলপূর্বক যোগ সাধন করাকে হঠযোগ বলা হইয়া থাকে। হঠযোগের উপকারিতা আছে কি নাই বুঝিতে হইলে কৃত্রিম উপায়ের সার্থকতা আছে কিনা তাহা বুঝা আবশ্যক হয়। অকৃত্রিম বা সহজ উপায় স্বভাবের গতিকে অনুসরণ করে। কিন্তু দৈহিক, প্রাণগত অথবা মানসিক সংস্কার বা বিকার বশতঃ যাহার পক্ষে সেই স্বভাবের ধারাকে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে তাহার পক্ষে উহা প্রাপ্ত হইবার জন্য কৃত্রিম উপায়েরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। যোগভাষ্যকার বলিয়াছেন "চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ" অর্থাৎ চিত্তে দুইটি প্রবাহ বিদ্যমান আছে—একটি প্রবাহ বহির্মুখ, সংসার-সুখ, দুঃখ-বন্ধনের অভিমুখ এবং অপর একটি প্রবাহ কৈবল্যমুখ, অন্তর্মুখ মুক্তি ও নিবৃত্তির অভিমুখ। বহির্মুখ প্রবাহটি দেহধারী বদ্ধজীবের পক্ষে প্রকটভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তঃ প্রবাহটি তাহার মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে ফল্গু স্রোতের ন্যায় বহিতে থাকে। সংসারাসক্ত জীবকে কৈবল্যের পথে অগ্রসর হইতে হইলে ঐ অন্তঃ-প্রবাহেরই আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। উহা আশ্রয় করিতে না পারিলে পরমপদে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ একমাত্র ঐ প্রবাহই পরমার্থ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে। সুতরাং সাধারণ জীব ঐ গুপ্ত প্রবাহের সন্ধান পায় না বলিয়া স্বাভাবিকভাবে অন্তর্মুখ জীবন যাপন করিতে সুযোগ

পায় না। মহাপুরুষগণ দেহধারী হইলেও তাঁদের মধ্যে অন্তঃপ্রবাহ পূর্ণভাবে জাগ্রত এবং ঐ প্রবাহেই তাঁহারা সঞ্চালিত হন। তাঁহাদের মধ্যেও মৃদুভাবে বহির্গতি থাকে বটে, কিন্তু উহার বল অত্যন্ত কম। তাঁহারা নিজেদের অন্তঃপ্রবাহের সঙ্গে পূর্ণ পরিচিত বলিয়া অন্য জীবেও অন্তঃপ্রবাহের পূর্ণ সন্ধান রাখিয়া থাকেন। অন্য সাধকের পক্ষে অন্তঃপ্রবাহে প্রবেশ করিবার উপদেশ একমাত্র তাঁহারাই দিতে পারেন। এই উপদেশের অন্তর্গতভাবে কৌশলের সহিত কৃত্রিম সাধন-ভজনের নির্দেশ আছে বুঝিতে হইবে। এই সকল কৃত্রিম উপায়ের অভ্যাস সাধকের প্রযত্ন-সাপেক্ষ। এই প্রযত্ন নানা প্রকারের হইতে পারে। কিন্তু সবই কৃত্রিম চেষ্টার অভিনয় মাত্র। তবে ইহা নিরর্থক নহে। এই সকল কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে করিতে গুরূপদিষ্ট কৌশলের প্রভাবে জীব বা সাধক স্বভাবের গতিটি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন আর শাস্ত্র অথবা গুরুর উপদেশের অপেক্ষা থাকে না এবং নিজের অন্তর হইতেও কোন বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। স্বভাবের ধারাতে পড়িলে স্বভাব নিজেই সাধককে যথাযথভাবে সঞ্চালিত করে।

কিন্তু পূর্বোক্ত কৌশলটি না পাইলে অথবা পাইয়াও তাহা অনুসরণ করিতে না পারিলে কৃত্রিম উপায় কৃত্রিমই থাকিয়া যায়। উহা স্বভাবের গতিকে প্রাপ্ত হইতে পারে না।

কৃত্রিম উপায়কে মা 'করার' পথ বলিয়াছেন এবং স্বভাবের গতিকে তিনি 'হওয়ার' পথ বলিয়াছেন। করার স্বাভাবিক পরিণতিই হওয়াতে। করিতে করিতে যদি হইতে না পারা যায় তাহা হইলে সে করার কোন সার্থকতা নাই। সুতরাং হঠযোগ বা তজ্জাতীয় অন্যান্য কৃত্রিম যোগসাধন কৃত্রিম হইলেও বৃথা নহে, যদি উহা দ্বারা স্বভাবের গতি খুলিয়া যায়। কিন্তু তাহা না খুলিলে উহা পণ্ডশ্রম মাত্র। এমন কি, অবস্থা বিশেষে অপকারকও হইতে পারে। কারণ যে কৃত্রিম ক্রিয়া সত্তার সহজ গতিকে

ধরিতে না পারে তাহা বিকৃতির কারণ না হইয়া পারে না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে হঠযোগের উপকারিতা আছে ইহাও সত্য, আবার ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে উপকারিতা নাই, বরং অপকারিতা আছে, ইহাও সত্য।

মা বলিয়াছেন যেটি স্বভাবের গতি সেইটি ভগবন্মুখী গতি এবং সেই গতির প্রাপ্তি হইলেই হঠযোগের অভ্যাস প্রকৃতপক্ষে যোগপদবাচ্য হইতে পারে। তাহা না হইলে উহা দৈহিক ব্যায়াম মাত্র। উহা ভোগেরই অন্তর্গত। পূর্বে যে কৌশলটির কথা বলা হইল বস্তুতঃ উহাই স্পর্শমণি। উহারই স্পর্শে কৃত্রিম উপায়ে ও দীর্ঘকাল, নৈরন্তর্য ও সৎকারের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অকৃত্রিম স্বভাব-গতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

২ — প্রাণের গতি

প্রাণের গতি অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী বা বিষয়মুখী, দুই-ই হইতে পারে। তাঁহার দিকে গতি হইলে সাধন-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার বিনা চেষ্টায়ই সিদ্ধ হয়—বিনা চেষ্টায় প্রাণের সংযম আয়ত্ত হয়, বিনা চেষ্টায় হৃদয়গ্রন্থি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য গ্রন্থি খুলিয়া যায়, বিনা চেষ্টায় সুন্দর ও সর্বাঙ্গ সম্পন্ন ভাবে আসন সিদ্ধি ঘটে এবং মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া কার্য করিতে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না। এই সব স্বাভাবিক ভাবে আয়ত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন প্রাণের গতি বাহিরের দিকে ধাবিত হয় অথবা পূর্ব সংস্কার বশতঃ বহির্মুখী থাকে, তখন ভিতরের কাজ করিতে গেলে চেষ্টা করিতে হয়। কারণ গতি বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যক্তিগত পুরুষকার ভিন্ন ফললাভের আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সব সময় কার্যটি ঠিক ভাবে সিদ্ধ হয় না। ক্রিয়াকে মা সাধারণতঃ সামান্য ও বিশেষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

করিয়াছেন। স্বভাবের বেগে যে ক্রিয়া হয় তাহাকে মা বিশেষ ক্রিয়া নাম দিয়াছেন এবং চেষ্টা দ্বারা যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহার নাম দিয়াছেন সামান্য ক্রিয়া। সাধন ব্যাপারে অধিকাংশ মনুষ্যের পক্ষে মন ও দেহ সাধারণতঃ বিরুদ্ধ থাকে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ", অর্থাৎ বিধাতা ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্য অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ দুইটি স্রোতে সংঘর্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মন ভগবৎ অভিমুখে চলিতে চাহিলেও দেহ ও ইন্দ্রিয় তাহাকে সেইভাবে চলিতে দেয় না— তাহার গতিমার্গে বাধা প্রদান করে। এই বাধা অপসারণ করিবার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সব সময় মা যাহাকে বিশেষ বা স্বাভাবিক ক্রিয়া বলিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেহ মনের মত না হইলে অর্থাৎ মনের অনুরূপ গতি সম্পন্ন না হইলে ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরোধ প্রবল থাকে বলিয়া ভগবদ্ রস ফুটিতে পায় না। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান "divided self" বলিয়া এই অন্তঃ-সংঘর্ষের বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতএব প্রাণের গতিটি অন্তর্মুখ না হইলে অধ্যাত্ম সাধনার ফল ঠিক ঠিক লাভ করা যায় না।

চেষ্টা করিয়া কিছু করা বলিতে 'জোর করিয়া করা' ইহাই বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ করা বলিতে সর্বত্রই তাহাই; অভ্যাসও তাহাই। করা ও অভ্যাস স্বভাবের ধারার অন্তর্গত নহে। উহা হওয়ার ধারা নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু উহারও সার্থকতা আছে। কারণ করিতে করিতে স্বভাবের গতি লাভ করা যায়। যতক্ষণ উহা না পাওয়া যায় ততক্ষণ উহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম হয় না, ততক্ষণ সাধন নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বভাবের ধারাতে প্রাণের গতি চালিত হইলে যেখানে থাকিলে যখন যাহা প্রকাশ হইবার তাহা তখন আপনিই হইয়া থাকে। করার পথে

মনের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু করিতে করিতে স্বভাবের ধারাতে গেলে মনের পরিবর্তন আপনি সিদ্ধ হয়। তখন মন নিজের খাদ্য পায় বলিয়া তাহার ভগবন্মুখী গতি লাভ হয়। কিন্তু করার ধারাতে যতক্ষণ মন ভগবন্মুখী না হয় ততক্ষণ শরীরের খাদ্যই আহৃত হয় মাত্র। তাই ইহার ফল বাহ্য ব্যায়াম ও জগতের দিকে গতি।

৩ — উপযুক্ত শিক্ষক বা পরমপদের ডাক্তার

প্রাণের গতির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শিক্ষক যোগ্য কি অযোগ্য তাহা নির্ভর করে তিনি শিষ্যের প্রাণের গতি বুঝিয়া তাহাকে চালাইতে পারেন কিনা তাহার উপর। উপযুক্ত শিক্ষক কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলেন না। যাহাকে চালাইতে হইবে, তাহার যোগ্যতা, রুচি, সংস্কার প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া তাহাকে চালনা করেন। এইজন্য অবস্থা অনুসারে প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি তাহাকে অগ্রসর করিয়া চালনা করেন। কখনও তাহাকে প্রয়োজন অনুসারে অগ্রসর হইতে না দিয়া পেছনে টানিয়া নেন। উভয়ই শিষ্যের মঙ্গলের জন্য। তিনি ভবনদীর কাণ্ডারী, শিষ্যের জীবনরূপী নৌকার সঞ্চালক তিনি। তিনিই কর্ণধার। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিসম্পন্ন অন্তর্যামী। তিনি শিষ্যের কল্যাণের জন্য যখন যে দিকে প্রয়োজন হয়, তখন সেই দিকেই নৌকাকে সঞ্চালন করিয়া থাকেন। মা বলিয়াছেন—গুরু পরমপদের ডাক্তার। তাঁহাতে শিষ্যের প্রতি স্থানের প্রতি ব্যাপার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে।

তাঁহার স্বভাবের স্পর্শ প্রাপ্ত হইতে না পারিলে জীবনের গতি অনুকূল হয় না। যতক্ষণ স্বভাবের গতি প্রাপ্ত না হওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত

আয়াস ও প্রয়াস উভয়ই থাকে। কিন্তু এই গতির প্রকাশ হইলে স্পর্শমাত্র টানিয়া নেয়—কর্মের প্রয়োজন হয় না, যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না, অধিকার সম্পদের প্রয়োজন হয় না, কোন প্রকার বল বৈভবের প্রয়োজন হয় না। যাহা কিছু আবশ্যক হয় গতিই করিয়া নেয় এবং করাইয়া নেয়। কিন্তু যতদিন স্বভাবের স্পর্শ না পাওয়া যায় ততদিন চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কৌশল আছে, অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সবই তাঁহার সেবাতে লাগাইয়া দিতে হয়। সব নিয়াই তাঁহার সাধনা। অবশ্য স্বভাবের গতি লাভ করিলে ইহার সার্থকতা থাকে না। জপ, ধ্যান, নাম, স্মরণ, কীর্তন, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি সবই ইহারই অন্তর্গত। চেষ্টার সার্থকতা এই—ঠিক ভাবে তীব্র চেষ্টা করিতে পারিলে স্বভাবের গতি পাওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় 'অহং' থাকে, কিন্তু সেটি শুদ্ধ 'অহং'। কারণ উহা ভগবানের দিকে যুক্ত হওয়ার অনুকূল কার্য করিয়া থাকে। উহাতে প্রতিষ্ঠার কোন অবকাশ থাকে না; থাকিলে ঐ অহংটি শুদ্ধ অহং না থাকিয়া অহঙ্কাররূপে পরিণত হয়। উহা হেয়।

৪ — নিষ্কাম কর্মযোগ

কর্ম দুইভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে—ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রেরিত হইয়া অথবা 'তৎ' জ্ঞানে সেবার ইচ্ছাদ্বারা প্রেরিত হইয়া। প্রথম প্রকারের কর্ম কর্মভোগ, কারণ এই স্থলে কর্মকর্তাকে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মফল ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিতেই হয়। কারণ কর্মানুষ্ঠানের সময় কর্তার মনে উহার জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। দ্বিতীয় প্রকার কর্মই কর্মযোগ। এই স্থলে প্রেরণা আসে 'তৎ' জ্ঞানে সেবার ভাব হইতে, অর্থাৎ 'তুমি যাহা করাও করাইয়া লও, এ শরীর তোমার যন্ত্র, তুমি যেমন চালাও ইহাকে সেই

ভাবেই চালাইয়া লও।' এই ভাবে কর্মটি নিষ্পন্ন হইলে ঐ কর্মটি মুক্তির দিকে টানিয়া নেয়। কারণ উহা যুক্ত হইয়া কর্ম, উহাতে শোক, তাপ, দুঃখ প্রভৃতির অবসরই থাকে না—অথচ কার্যটি পূর্ণ স্বরূপেই অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে কোন অংশে ত্রুটি থাকে না। গীতাতেও শ্রীভগবান অর্জুনকে "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি" বলিয়া এই প্রকার কর্ম করিবার জন্যই উপদেশ দিয়াছিলেন। এই কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে নিজের সামর্থ্য অনুসারে এবং জ্ঞান অনুসারে কোথায়ও কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে। এই প্রকার কর্ম করিতে হইলে সর্বদা নিজের ত্রুটির দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। যথাশক্তি ত্রুটিহীন ভাবে যতটুকু কর্মই করা হউক না কেন সবই তাঁহার গ্রাহ্য হয়। উপেক্ষার সহিত কর্ম তিনি গ্রহণ করেন না। 'সেবা যেন সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়', সেবকের এই ভাবটি না থাকিলে সেব্যের বা সেবা পাত্রের প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। আর একটি কথা এই—কর্মের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না দিয়া তাঁহারই উপর সমস্ত অর্পণ করিতে হয়। দেহ, মন, প্রাণ অর্পণ করিয়া একান্তভাবে সেবা করিতে হয়। পরে যা' হইবার তাহাই হইবে এবং তাহাতেও 'তুমি এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ' ইহা জানিয়া চিত্তকে প্রসন্ন রাখিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুখ দুঃখ প্রভৃতি চিন্তার সঙ্গে কর্মফলের যেন সম্বন্ধ না থাকে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ ফলের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই কোন না কোন প্রকারে মন কলঙ্কিত হইয়া যাইবে।

৫ — ভগবৎপ্রাপ্তির বাসনা বাসনা নহে

মা বলিয়াছেন ভগবৎ প্রাপ্তি-বাসনা বাসনার মধ্যে গণ্য নহে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাসনা বাসনা হইলেও মুক্তির কারণ হয় বলিয়া এবং আত্মস্বরূপে স্থিতির প্রয়োজক হয় বলিয়া বাসনার মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য নহে।

শাস্ত্রে বাসনার প্রকার ভেদ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহাদের সারাংশ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আচার্যগণ বাসনাকে শুদ্ধ ও মলিন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। মলিন বাসনা জন্মের হেতু, কিন্তু শুদ্ধ বাসনা জন্মের নাশক। মলিন বাসনা ঘনীভূত অজ্ঞান ও অহঙ্কারে পুষ্ট হয়। উহা মায়িক দেহের অঙ্কুর স্বরূপ। উহা হইতেই অনন্ত বৈচিত্র্যময় সংসার ধারা আবির্ভূত হয়। কিন্তু শুদ্ধ বাসনা পুনর্জন্মের অঙ্কুর রূপে আত্মপ্রকাশ করে না। উহা ভৃষ্ট বীজের ন্যায় বিদ্যমান থাকে। আপাত দৃষ্টিতে ভৃষ্ট বীজকে যেমন বীজ বলিয়াই মনে হয় কিন্তু তাহাতে অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি থাকে না বলিয়া তাহাকে প্রকৃত বীজ বলা যায় না, শুদ্ধ বাসনাও ঠিক সেই প্রকার। দেহ সংরক্ষণের জন্য উহার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু উহা দ্বারা সংসারের বিকাশ অথবা চিত্তের বহির্মুখ গতির প্রসার হয় না। শাস্ত্রে উহাকে 'জ্ঞাতজ্ঞেয়' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপ জ্ঞেয় তত্ত্ব শুদ্ধ বাসনার প্রভাবে যথাসময়ে হৃদয়ে স্বপ্রকাশ ভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। গীতাতে যে দৈব ও আসুর সম্পদের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে আসুর সম্পদ মলিন বাসনা এবং দৈব সম্পদ্ শুদ্ধ বাসনা, ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রাক্তন বহু জন্মের বাসনার ফলে বর্তমান জন্মে অন্যের উপদেশ ব্যতিরেকেই অহঙ্কার, মমকার এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি মলিন বাসনা উদ্ভূত হয়। তদ্রূপ প্রথম বোধ তত্ত্ববিচার হইতে উদ্ভূত হইলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত তত্ত্ব ভাবনা করিতে পারিলে তাহার ফলে বর্তমান জন্মে বাক্য ও যুক্তি পরামর্শ ব্যতীতও তত্ত্বের স্ফুরণ হয়। ঐ প্রকার বোধের অনুবৃত্তির সহিত তৎতৎ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারকে শুদ্ধ বাসনা বলা হয়। শুদ্ধ বাসনার একমাত্র প্রয়োজন দেহ ও জীবন যাত্রার ধারা রক্ষা করা। উহা হইতে আসুর সম্পদ্ উৎপন্ন হয় না এবং জন্মান্তরের হেতুভূত ধর্মাধর্মও আবির্ভূত হয় না। দগ্ধ বীজ যেমন অন্নভোগ বা শস্য নিষ্পত্তির প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না, শুদ্ধ বাসনাও তদ্রূপ সংসারের উদ্ভব অথবা বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। মলিন বাসনা

নানা প্রকার। লোকৈষণা, শাস্ত্রৈষণা প্রভৃতি ইহারই অন্তর্গত। শাস্ত্রে চিন্মাত্র বাসনা বলিয়া একপ্রকার বাসনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—উহা মন ও বুদ্ধি সমন্বিত এবং মন বুদ্ধি হইতে মুক্ত, দুই প্রকারেরই হইতে পারে। যে বাসনাতে বুদ্ধি কর্তারূপে থাকিয়া মনকে করণরূপে রক্ষা করে তাহার নাম ধ্যান। কিন্তু যে বাসনায় বুদ্ধির কর্তৃত্ব এবং মনের করণত্ব কিছুই থাকে না তাহার নামান্তর সমাধি। ধ্যানরূপ বাসনাকে ত্যাগ করিয়া সমাধিরূপ বাসনাকে গ্রহণ করিবার কথা শাস্ত্রে আছে। দীর্ঘকাল এই দ্বিতীয় প্রকার মনোবুদ্ধিরহিত চিন্মাত্র বাসনা অনুস্যূত থাকিলে সকল প্রকার প্রযত্ন আপনা আপনি শিথিল হইয়া যায়। তাহার পর ত্যাগের প্রযত্নও আপনা আপনি নিবৃত্ত হয়। তখন শুদ্ধ বাসনাও ক্ষীণ হইয়া যায়। এই অবস্থাতে মন বাসনাহীন হয়। ইহাই মুক্তভাব। দেহাবস্থায় ইহা হইলে ইহারই নাম দেওয়া হয় জীবন্মুক্তি। বাসনা না থাকিলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার থাকিতে পারে। শাস্ত্রকার উদ্দালকের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন। মানস ব্যবহারও থাকিতে পারে। বিনা যত্নে স্বয়ং উপনীত বস্তুকে রাগহীন বুদ্ধির ব্যাপার জীবন্মুক্তের মানস ব্যবহার বলিয়া জানিতে হইবে। মলিন ও অসৎ বাসনা স্বভাব-সিদ্ধ আসুর সম্পদ্। ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও দুর্বাসনা। কিন্তু শুদ্ধ বাসনা বা সৎ বাসনা শাস্ত্র সম্মত ও দৈব সম্পদ্। পুরুষের স্বীয় প্রযত্নের দ্বারা যে সৎ বাসনার আধান হয় তাহারই প্রভাবে মলিন বাসনা ক্ষীণ হয়। মা যাহাকে ভগবৎ বাসনা বলিয়াছেন তাহাই শুদ্ধ বাসনার নামান্তর।

৬ — মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি

মা বলিয়াছেন,...“যাঁহাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বল, সেখানে স্থিতি হইলে অর্থাৎ তোমার এই গতিটা ঐ কেন্দ্রস্থ হইলে সেই জাতীয় কথা বাহির

হইবে।” শাস্ত্রমতে মন্ত্রসাক্ষাৎকারকে ঋষির লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—“ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ”। জ্ঞানের পরোক্ষ অপরোক্ষ দুইটি অবস্থা আছে। জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যে প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তাহা অপগত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান স্বীয় বিষয়কে অপরোক্ষ অনুভূতিরূপে ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু সাধনার প্রভাবে অথবা ভগবৎ কৃপায় এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে জ্ঞান অপরোক্ষরূপে পরিণত হয়। তখন তাহার নাম হয় সাক্ষাৎকার। জ্ঞানের উপরে যে মূল আবরণ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পরোক্ষ জ্ঞানের ঊর্ধ্বে উত্থিত হওয়ার সামর্থ্য কাহারও নাই। অজ্ঞান বা মূল আবরণ প্রভাবে আমাদের দেহ ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রাণের গতিধারা সবই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সাধনার উদ্দেশ্য এই সকল বিকার দূর করিয়া —দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাভাবিক গতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। স্বাভাবিক গতি গুপ্ত ভাবে এখানেও যে না আছে তাহা নহে কিন্তু সেই গুপ্ত গতিকে প্রকট গতিরূপে লাভ করাই সাধনার প্রকৃষ্ট পরিণাম। ইহারই নাম স্বভাবের গতি। এই গতিতে আকৃষ্ট হইয়া ইহারই ধারায় সঞ্চরণ করিতে পারিলে জ্ঞানের যাবতীয় আবরণ কাটিয়া যায়। সমগ্র বিশ্ব তখন করস্থিত আমলকের ন্যায় অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এই ত্রিপুটী ভঙ্গ হইয়া এক অপরোক্ষ মহাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। মন্ত্র সাক্ষাৎকার এই মহাজ্ঞানেরই একটি প্রকার ভেদ মাত্র। ইহাই ঋষি অবস্থা। স্বভাবে স্থিত হইলে যে কেন্দ্রে যে প্রকার কার্য হওয়া আবশ্যক তাহা আপনা আপনিই হইয়া থাকে। তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। অজ্ঞান বা আবরণ অবস্থায়ই চেষ্টার প্রয়োজন হয় এবং তখনই উপদেশের অপেক্ষা থাকে।

৭ — অন্তর্গুরু

মা অন্তর্গুরু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যিনি সর্বদা মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া মনুষ্যের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়কে যথাবৎ প্রেরণ করিয়া থাকেন তিনিই অন্তর্গুরু। ইনি সর্বদাই কার্য করিয়া থাকেন এবং সকলের হৃদয়েই কার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল সময় সকলে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রাণের গতির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের দেহে যে নানা কেন্দ্র আছে সেকথাও পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রাণের গতি বিভিন্ন কেন্দ্রে গেলে ঐ সকল কেন্দ্রের উপযোগী কর্ম আপনা আপনি নিষ্পন্ন হয়। ঐ সকল কেন্দ্র সাধারণ মনুষ্যের ত দূরের কথা, বিশিষ্ট পুরুষেরও জ্ঞানের অগোচর। যিনি প্রাণের এই গতিকে বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়া যান তিনিই অন্তর্গুরু। তিনি সর্বজ্ঞ বলিয়া কোন কেন্দ্রই তাঁহার অজ্ঞাত নহে। যে কেন্দ্রে গতি হয় সেই কেন্দ্রের ক্রিয়া স্বভাবতঃই স্ফুরিত হয়। যে দেহকে আশ্রয় করিয়া এই সকল ক্রিয়া ফুটিয়া উঠে সেই দেহের অভিমানী জীব এই সকল ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানে না। না জানিলেও স্বভাবের বশে এই সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে—অজানা আসন, মুদ্রা, মন্ত্রস্ফুরণ প্রভৃতি এইভাবে ঘটিয়া থাকে। এইভাবে অজ্ঞানীর মুখেও বড় বড় জ্ঞানের কথা বাহির হইয়া থাকে, প্রশ্ন করিলে উত্তর পাওয়া যায়, তত্ত্বসকল ফুটিয়া উঠে, নানা প্রকার মূর্তি প্রকাশিত হয়—অনেক কিছু হইয়া থাকে, অনেক কিছু হইতেও পারে। মা বলেন, "শুধু জবাব নয়, সেই তত্ত্বটা পাইয়া যাওয়া, সেই দর্শন, এই অজানিত ভাবের জবাব পাওয়া।" আবার জ্ঞাত ভাবেও পাওয়া যায়; মন্ত্র, তত্ত্ব, গুরু, ইষ্ট সব কিছু প্রয়োজন অনুসারে প্রকাশিত হয়। জপ ও ধ্যানের সময় গুরু বলিয়া বুঝাইয়া দেন কোনটি কি এবং তাহার সার্থকতা কি। বস্তুতঃ এই সকলই অন্তর্গুরুরই রহস্য লীলা। অর্থাৎ স্বভাবের গতিতে

পড়িলে এই সব প্রত্যেকেরই হইতে পারে, কারণ অন্তর্যামী রূপে সর্ববুদ্ধি সঞ্চালক শ্রীভগবান সকলের হৃদয়েই বাস করিতেছেন।

৮ — দুইটি দিক্—ক্রিয়ার ও মনের

অন্তর্গুরু সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই ক্রিয়া ও মনের দুইটি পৃথক্ দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। দিক্ দুইটি সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। তবে দুইটির মধ্যে সব সময়ে প্রাধান্যের তারতম্য হয়— কখনও ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে, কখনও মনের প্রাধান্য থাকে। ইহা মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যখন আপনা আপনি স্বভাবের গতিতে আসন প্রভৃতি অজানিত ভাবে হইতে থাকে তখন বুঝিতে হইবে ঐটি ক্রিয়াপ্রধান দিক্। আবার যখন মন্ত্রাদির স্ফুরণ হয় তখন বুঝিতে হইবে ঐটি মনঃপ্রধান দিক্। স্বভাবের গতি হইতে দুইটির আবির্ভাব হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশ, কাল প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে কখনও কাহারও ক্রিয়ার দিক্ প্রধান হয়, কাহারও মনের দিক্ প্রধান হয়। ভিতর হইতে যিনি চালনা করিতেছেন তিনি অন্তর্গুরু। বাহির হইতে যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিতেছেন তিনিও স্বরূপতঃ তাহাই। গুরু ভিতরেও যিনি বাহিরেও তিনি— অখণ্ড অদ্বৈত। শুধু বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও পরিভাষার প্রয়োগ হইয়া থাকে মাত্র।

তিন

১ — কর্ম ছাড়া থাকা যায় না

মা বলিয়াছেন, "কর্ম ছাড়া ত আর থাকা যায় না যতক্ষণ সেই স্থিতি না আসে।" 'সেই স্থিতি' বলিতে আত্মদর্শনের পর যে স্বরূপস্থিতি হয় তাহাই মা লক্ষ্য করিয়াছেন। যতক্ষণ স্বরূপ স্থিতির উদয় না হয়, এমন কি যতক্ষণ আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্ম ত্যাগ করার উপায় নাই। কর্ম করিতেই হইবে, 'করিব না' বলিয়া মনে করিলেও বাধ্য হইয়া করিতেই হইবে, না করিয়া উপায় নাই। প্রকৃতি কর্মরূপা— দেহ, প্রাণ, মন প্রভৃতি প্রকৃতিরই কার্যবিশেষ। সুতরাং যতদিন আত্মার দেহপ্রাণাদিতে অভিমানমূলক সম্বন্ধ বিগলিত না হইবে ততদিন কর্ম হইতে অব্যাহতি লাভের কোন উপায় নাই। তবে কর্মের অনেক প্রকারভেদ আছে তাহা সত্য। যাহার যে প্রকার অধিকার প্রকৃতির রাজ্যে তাহার জন্য সেই প্রকার কর্মের ব্যবস্থা আছে। সকাম কর্মের ত কথাই নাই, নিষ্কাম কর্মও অভাবের কর্ম বলিয়া আত্মদর্শনের পূর্বের অবস্থার অন্তর্গত জানিতে হইবে। তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান, যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, উপাসনা, ভজন, সাধন, অন্তর্যাগ, বহির্যাগ, জ্ঞানমার্গের অনুশীলন, নৈতিক জীবনেই উৎকর্ষ সাধন, লৌকিক কর্ম— সবই কর্মের অন্তর্গত। এই সকল কর্ম বহু বৈচিত্র্যসম্পন্ন, ইহাদের অনুষ্ঠানে পার্থক্য আছে, অধিকারে ভেদ আছে এবং লক্ষ্যও অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয়; তথাপি সকল প্রকার কর্মই মূলতঃ একই অবস্থার অর্থাৎ অপরোক্ষ আত্মদর্শনের অভাবের সূচনা করে। এমন কি, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত নিষ্কাম কর্মও স্বভাবের অলঙ্ঘ্য নিয়মের ফল প্রসব করে ও সে ফল কর্মকর্তাকে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়।

চিত্তশুদ্ধি বা ভগবৎ প্রসন্নতা নিষ্কাম কর্মের ফল। আত্মদর্শন না হওয়া পর্যন্ত স্বরূপ স্থিতির অভাব বশতঃ আপ্তকাম ভাব বা পূর্ণতা আসিতে পারে না। তাই ফলের দিকে লক্ষ্য না থাকিলেও জাগতিক কার্যকারণ নীতির প্রভাবে ফলের উদয় ও কর্তার সহিত তাহার যোগ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

সাধারণ সকাম কর্মের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার মূলে ত মলিন বাসনা নিহিত থাকেই। ঐহিক বা পারত্রিক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অতিবড় পূণ্যকর্মও সকাম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মলিন বাসনার স্পর্শ হইতে তাহাও মুক্ত নহে। গুরুর উপর নির্ভর করিয়া নির্বিচারে তাঁহার আজ্ঞা পালন করা—ইহাও সকাম কর্ম। তবে এই ক্ষেত্রে কামনা বা বাসনা বিশুদ্ধ। গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যে আন্তরিক বাসনা তাহা বাসনা হইলেও মন্দ নহে। সুধীগণ তাহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। এক হিসাবে এই জাতীয় কর্মকে নিষ্কামও বলা চলে। কেহ কেহ তাহা বলিয়াও থাকেন। বৈষ্ণবাচার্যগণ যেমন বলিয়া থাকেন যে ভগবৎ স্বরূপে প্রাকৃত বা হেয় গুণ নাই, তাই তাঁহাকে শ্রুতি নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু তাঁহাতে যে মোটেই কোন গুণ নাই, তাঁহাদের মতে নির্গুণ শব্দের ইহা তাৎপর্য নহে। অপ্রাকৃত অনন্ত কল্যাণগুণ নিত্যই তাঁহাতে আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে যে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে তিনি যাবতীয় হেয় গুণ হইতে নির্মুক্ত। তদ্রূপ চিত্তে ক্ষুদ্র কামনা বা হেয় বাসনা না থাকিলে এক হিসাবে উহাকে নিষ্কাম বলা চলে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উহাকে নিষ্কাম বলা সঙ্গত হয় না।

কেহ কেহ মনে করেন আত্মদর্শন না হইলে নিষ্কাম কর্ম হয় না— এই মত সত্য নহে। মা এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। কারণ আত্মদর্শন হইলে কর্ম থাকে না। দ্বন্দ্ব ভিন্ন কর্ম হয় না—আত্মদর্শন হইলে দ্বন্দ্বাতীত

পদে স্থিতি হয়। তখন আত্মা হইতে ভিন্ন কিছুই দৃষ্ট হয় না, সবই তখন আত্মরূপে প্রতিভাত হয়। তখন দ্বন্দ্বও নাই, কর্মও নাই। যখন একমাত্র আত্মাই থাকে—গুরু, আমি, প্রীতি, কর্ম, এই সব আত্মা হইতে ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয় না, তখন কর্মের কথা কি ভাবে উঠিবে? যে অবস্থায় এই সব পৃথক্ পৃথক্ থাকে তখন বুঝিতে হইবে প্রকৃত আত্মদর্শন হয় নাই। মা বলেন, এ সব কর্ম "বাসনা ক্ষয়ের চেষ্টায় বাহ্য কর্ম।" আত্মদর্শনের পূর্বের যন্ত্রবৎ কর্ম হয়, তখন কর্মের গতি চলতিমুখ অর্থাৎ অভাব পূরণের দিক্ জানিতে হইবে। আত্মদর্শনের পর স্থিতি হইলে ঐ ভাবটা থাকে না। তাই যন্ত্রবৎ কর্মও তখন হয় না। কারণ উহা অনাবিল মুক্ত অবস্থা।

২ — নিষ্কাম কর্মের লক্ষণ

নিষ্কাম কর্মের লক্ষণ আছে। সাধারণতঃ অনেক সময় যে কর্ম নিষ্কাম বলিয়া ধারণা করা যায় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বাস্তবিক পক্ষে তাহা নিষ্কাম কর্ম নহে। মা বলেন, গ্রন্থি মুক্ত না হইলে ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম হয় না। গ্রন্থি মুক্ত হইলে সুখ-দুঃখ, স্তুতি-নিন্দা বা মান-অপমান কিছুই নিজেকে স্পর্শ করে না। স্বভাবের স্রোতে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে চিত্তে কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না। প্রতিষ্ঠাহীন কর্ম নিষ্কাম কর্ম— তাহাতে নিজের নাম ও যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং অন্য কোন প্রকার ফলের অভিলাষও থাকে না। ক্ষুদ্র অহং-ভাব লুপ্ত না হইলে এই আকাঙ্ক্ষা দূর হয় না। একটা ভাল কাজ হয়ত আমি করিয়াছি, অথচ লোকে জানে যে তাহা আমি করি নাই, অন্যে করিয়াছে অথবা আমি করিয়াছি বলিয়া প্রচার করিতেছে— এই স্থলে আমার চিত্ত এই সব জানিয়াও যদি ক্ষুব্ধ না হয় বা নির্বিকার থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমার গ্রন্থি মুক্ত হইয়াছে। ইহা নিষ্কাম

ভাবের লক্ষণ।

নিষ্কাম কর্মে আমার দেহটি হয় তাঁহার হাতের যন্ত্র—তিনি উহাকে যেমন চালান উহা তেমনি চলে। আমি যেন সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র। অর্থাৎ আমি শুধু দেখিয়া যাই দেহ কেমন চলিতেছে—আমি যে উহার চালক নহি তাহা বেশ বোধে থাকে। শুধু তাহাই নয়—দেহ যে ভাবেই চলুক আমি তাতে বিচলিত হই না। বিচলিত হইলে আর সাক্ষিভাব থাকিল কই? এই দেখাতে ভিতরে একটা নির্মল আনন্দ বা প্রসন্নতাময় ভাবের স্ফুরণ থাকে। ইহাই গীতার বর্ণিত 'যোগস্থ' কর্ম। এই স্থলে দুইটি দিক বিচারণীয় মনে হয়—

(ক) দেহের সঞ্চালক যে আমি নহি, এ বোধ জাগরুক আছে। তাই দেহের ক্রিয়াতে মমতা নাই, কর্তৃত্ব বোধও নাই।

(খ) দেহ ছাড়া ঐ ভাবে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলাফলও আমার দেখিবার বিষয় নহে, এ বোধ আছে। সেইজন্য সিদ্ধি-অসিদ্ধি, ভাল-মন্দ, বা স্তুতিনিন্দাতে সমবোধ থাকে। বস্তুতঃ এই সমস্তই যোগস্থ কর্মের 'যোগ' জানিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায়, কর্মে যেমন মমতা নাই তেমনি তাহার ফলাফলেও মমত্ব নাই। এস্থলে ভাল লাগা না লাগার প্রশ্নই নাই। ব্যক্তিগত ভোগ-বাসনা-নাই বলিয়া এরূপ হয়।

এখানে একটি প্রশ্নের উদয় হয়— নিষ্কাম কর্ম যোগ্য আধারে যথাসময়ে আপনিই স্ফুরিত হয়, গুরু তাহার জন্য শিষ্যকে আদেশ দেন কেন? প্রয়োজনই বা কি? কর্মের মূলে থাকে প্রেরণারূপে কর্তব্যবোধ অথবা রাগ। সঙ্গ বা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ রাগত্যাগেরই নামান্তর। সুতরাং ইহা যে রাগমূলক কর্ম নহে তাহা বুঝা যায়। গুরুর আদেশ বা শাস্ত্রের অনুশাসন বা মহাজনের উপদেশ হইতে কর্মের করণীয়তা বোধ জন্মে। ঐ বোধই কর্ম করার অনুকূল হয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে— এই শিষ্য

সাক্ষিমাত্র কি প্রকারে হইল? করণীয়তা বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে কোন না কোন প্রকারে কর্তৃত্ব তাহাকে অবশ্যই স্পর্শ করিবে। ইহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে শিষ্য স্বাধীন বলিয়া কিঞ্চিৎ পৌরুষ তাহাতে অবশ্যই আছে। জীব মাত্রেই উহা থাকে— বদ্ধাবস্থাতেও উহা সম্যক্ অবগত হয় না। যাহার আবরণ যত বেশী তাহার স্বাতন্ত্র্য তত কম; কিন্তু কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য তাহারও আছে। তাহা না থাকিলে গুরু তাহাকে আজ্ঞা করিতেন না— জড় পদার্থকে কর্মে নিয়োগ করা যায় না। এই স্বাতন্ত্র্যই অধিকারভেদে ইচ্ছা বা কৃতিরূপে জীবহৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করে। গুরু শিষ্যকে মুখ্য কর্তা হইতে বলিতেছেন না, নিমিত্ত মাত্র বা যন্ত্র মাত্র হইতে বলিতেছেন। তিনি স্বয়ং কর্তা, যাহা করিবার তিনিই করিবেন। কিন্তু জীবকে, শিষ্যকে, গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার যন্ত্র হইতে হইবে— তবে ত তাঁহার শক্তি ঐ যন্ত্র আশ্রয় করিয়া কার্য করিবে। শিষ্য স্বাধীন বলিয়া যদি স্বীয় ইচ্ছা গুরুর ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত না করে তাহা হইলে আর শিষ্যের যোগস্থ কর্ম হইতে পারে না। গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই, কিন্তু শিষ্য তাঁহার ইচ্ছার মিলন না করাতে গুরুর সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে না ও বিশ্ববিধানের সঙ্গে সমভাবে তাল রক্ষা করিতে পারে না। যতদিন মোহ ও কর্তৃত্বাভিমান প্রবল থাকে ততদিন এই প্রকার আত্মার্পণ ও যোগ সম্ভবপর হয় না। গুরু যাহা চান শিষ্যও যদি নিজের ইচ্ছাকে তাহার অনুকূল করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে কৃতি বা প্রযত্ন দ্বারা তাহাকে পুষ্ট করিতে উন্মুখ হয় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, গুরু তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার দেহাদি নিজের যন্ত্ররূপে চালনা করিতেছেন। সে তখন সাক্ষী হইয়া এই নিজ দেহের সকল ক্রিয়াকে লীলাভিনয় বা ভগবদিচ্ছার পূর্তিরূপে দেখিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইতে থাকে। ইহাই নিষ্কাম কর্ম ও তাহার আনুষঙ্গিক আনন্দের রহস্য।

জাগতিক দৃষ্টিতে এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিচারণীয় আছে।

জাগতিক গুরুর আদেশ যদি ন্যায় বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে শিষ্যের পক্ষে উহা পালনীয় অথবা উপেক্ষণীয় কি না, ইহাই প্রশ্ন। শিষ্য যদি জাগতিক গুরুতেও প্রকৃত গুরুভাব স্থাপন করিতে পারে তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান সহজ। শিষ্যের পক্ষে গুরুর বিচার চলে না— "আজ্ঞা গুরূণাম্-বিচারণীয়া।" সুতরাং শিষ্য নির্বিচারে ঐ আজ্ঞা পালন করিতে উদ্যত হইবে। যদি ঐ কার্য অনুচিত হয় তখন উহার অনুষ্ঠান বাধা প্রাপ্ত হইবে, ইহাই ঐশ্বরিক নিয়ম। এ স্থলে শিষ্যের আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত অপরাধ হইল না, অথচ অন্যায় কার্যেরও আচরণ হইল না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ঠিক গুরু বোধ না থাকে সে স্থানে আদেশের ঔচিত্য বিষয়ে বিচার উত্থিত হয় বলিয়া স্বীয় বিচার-শক্তি দ্বারাই কর্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। কারণ ঐ স্থলে ঠিক গুরু বোধ নাই বলিয়া সদ্‌বিচার দ্বারা চলাতে গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় না। এই জন্যই সাধারণ অধিকারীর জন্য শাস্ত্র বা গুরুবাক্যের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়। ঋষিগণও তাই বলেন— "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।" শাস্ত্রকে ঠিক ঠিক ভগবদ্‌বাক্য বা গুরুবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলে যুক্তির প্রয়োজনই হয় না।

মা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাহার বিশ্লেষণ হইতে এই গভীর সত্যটি পাওয়া যায়। বাবা ভোলানাথ অনেক সময় তাঁহাকে অনেক কিছু করিতে বলিতেন— উহা মা ব্যবহার-ভূমিতে গুরু আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ঐ সম্বন্ধে কখনই তাঁহার চিত্তে বিচার উঠিত না— উহা পালন করিবার চেষ্টাও তিনি করিতেন। ন্যায় অন্যায়ের বিচার তিনি করিতেন না কিন্তু যখন ঐ আদেশ পালন না করার হইত তখন তাঁহার শরীর এলাইয়া পড়িত এবং বাবা ভোলানাথও তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিয়া নিতেন।

কখনও কখনও নিজের অন্তঃকরণ হইতেও সূক্ষ্ম বাসনা উদিত হইয়া অনুষ্ঠিত কর্মে প্রেরণা দিতে পারে। এ স্থলে ঐ অন্তঃস্থিত ভাবকে

গুরু আজ্ঞা রূপে গ্রহণ করিয়া উহার প্রেরণার অনুসরণ করা উচিত মনে হয় না। কথিত আছে—

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।

অর্থাৎ সন্দিগ্ধ বিষয়ে হৃদয়ের প্রবৃত্তিই সজ্জনের পক্ষে প্রমাণরূপে গণ্য হয়। ইহা সত্য। তবে ইহা সন্ত বা সাধুজনের পক্ষে প্রযোজ্য। সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা সত্য নহে। ইচ্ছার উদয় পূর্ব সংস্কার বশতঃ হইলেও ঐ ইচ্ছাকে কৃতিতে ও ক্রিয়াতে পরিণত করা সঙ্গত নহে। সেই জন্য সংযমের আবশ্যকতা আছে। ইচ্ছা হইলেও কৃতি যেন না হয়, কৃতি হইলেও চেষ্টা যেন না হয় ইহাই সংযমের লক্ষ্য। যতক্ষণ নিজের কর্তৃত্ববোধ আছে ততক্ষণ প্রত্যেকেরই এ সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে এবং তাহা অনুভব করা উচিত। যে যোগস্থ তাহার মনে ইচ্ছার উদয় হইলেও উহা কৃতিতে পরিণত হইবে না; কৃতি আসিলেও চেষ্টা পর্যন্ত উহার বিকাশ হইবে না, অন্তর্যামী পুরুষই বাধা দিবেন।

৩ — আপ্তকামের ক্রিয়া কর্ম নহে

আপ্তকামের ক্রিয়া বাস্তবিকপক্ষে কর্ম নহে। উহা স্বাতন্ত্র্যের বিলাস বা লীলা মাত্র। ঐ ক্রিয়া নিষ্কাম কর্ম মধ্যেও পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। নিষ্কাম কর্মের সময় যে স্বভাবের স্রোত বহিতে থাকে তাহাতে আত্মা দ্রষ্টারূপে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ইহা প্রকৃত দ্রষ্টার ভাব নহে, কারণ ইহার মধ্যে একটি শান্ত ও স্নিগ্ধ আনন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ অবস্থায় সর্বস্থলেই এবং সকল প্রকার ক্রিয়াতেই একটি গভীর রসের অনুভূতি হয়। তখন সাধক তাহার ইষ্ট অথবা গুরুর তৃপ্তিতে নিজে তৃপ্তি

বোধ করিয়া থাকে এবং আনন্দে নিজে আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। ইহা নিজস্ব বোধের কর্ম বলিয়া সাধারণ সকল প্রকার কর্ম হইতেই বিলক্ষণ। তথাপি ইহা কর্ম মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। কারণ তখনও চিত্তে বাসনা বিদ্যমান রহিয়াছে। বাসনা না থাকিলে পূর্বোক্ত আনন্দের আস্বাদন পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না। তবে ইহা আনন্দ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে গণ্ডীবদ্ধ আনন্দ, অবাধিত, অকুণ্ঠিত ভূমানন্দ নহে। আত্মদর্শন হইলে একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান থাকেন। তখন আদেশ উপদেশ পথপ্রদর্শন প্রভৃতি আর থাকে না। আত্মদর্শনের পর কাহারও বাসনা থাকিতে পারে না। সেইজন্য স্বরূপস্থিতি হইলে ভোক্তৃভোগ্য ভাবের অভাব হয় বলিয়া ভোগ্য অথবা রসাস্বাদ কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। আত্মদর্শীর কর্ম থাকে না বলিয়া পরতন্ত্রতা থাকে না। তাই তাঁহার যখন যে রূপের খেয়াল হয় তখন তিনি আপন ভাবে সেই রূপের সহিতই খেলা করিতে পারেন। আত্মবিৎ যে রূপের সঙ্গেই খেলা করুন না কেন উহা যে তাঁহার নিজ রূপই ইহা বুঝিতে পারেন। যে ভাবে ও যে রূপেই তিনি খেলা করুন সর্বভাবেই উহা নিজেকে নিয়াই নিজের খেলা। তখন তিনি এক ও অভিন্ন, ভিন্ন থাকিয়াও অভিন্ন ও অভিন্ন থাকিয়াও ভিন্নবৎ। উহাই 'তৎ স্ব'। ঐ খেলাতে তাঁহার স্বরূপস্থিতির নিষ্ক্রিয়ত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। উৎপলাচার্য বলিয়াছেন—

ইতি বা যস্য সংবিত্তিঃ ক্রীড়াত্বেনাখিলং জগৎ।
স পশ্যন্ সততং যুক্তঃ জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ।।

আত্মদর্শী মহাপুরুষ সমগ্র জগৎকে ক্রীড়া বা লীলারূপে দর্শন করিয়া থাকেন ও সর্বদা যুক্ত থাকেন। তিনি জীবন ধারণ করিলেও, রূপধারী হইলেও, মুক্ত পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ তাই। আত্মদর্শনের পূর্বে এই দৃষ্টি জন্মে না।

আত্মদর্শন না হওয়া পর্যন্ত অভাব পূরণের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং প্রকৃতির নিয়মে তাহা পূর্ণও হইয়া থাকে। আত্মদর্শন হইলে অভাব থাকে

না বলিয়া অভাবের পূরণও থাকে না, তাই কর্মেরও সম্ভাবনা থাকে না। লোকদৃষ্টিতে উহা কর্ম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহা কর্ম নহে, উহা চৈতন্য শক্তির বিলাস মাত্র।

৪ — ভগবানের নিত্য যোগ

ভগবানের সহিত জীবের নিত্যই যোগ রহিয়াছে। কিন্তু সংসারাসক্ত বহির্মুখ জীব তাহা বুঝিতে পারে না। আত্মবিস্মৃতি বা অজ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। প্রকৃত কর্ম তাহারই নাম, যাহার দ্বারা স্বভাবসিদ্ধ যোগ প্রকাশিত হয় বা জ্ঞানের উদয় হয়। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে সে কর্ম বৃথা কর্ম তাহা অকর্ম মধ্যে গণ্য। তাহার নাম কর্মভোগ। কর্ম ও অকর্মের ইহাই পার্থক্য জানিতে হইবে। কর্ম দ্বারা নূতন করিয়া যোগ স্থাপন হয় না—যাহা অব্যক্তভাবে আছে তাহারই অভিব্যক্তি হয় মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে এই যে যোগের প্রকাশ ইহাই আত্মদর্শনের সূত্রপাত, স্বরূপস্থিতি ইহারই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

৫ — কর্ম হইতেই কর্ম ত্যাগ

মা বলেন, এমন অবস্থা আছে যখন কর্মের জন্যই কর্ম অনুষ্ঠিত, কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নহে—এমন কি কর্তব্যবোধের প্রেরণাতেও নহে। এই স্থলে কর্মকর্তার রতি একমাত্র কর্মেই নিবদ্ধ, লৌকিক বা অলৌকিক কোন প্রয়োজন সাধনের দিকে আকৃষ্ট নহে। এই স্থলে কর্মের প্রীতির জন্যই যেন কর্ম করা হয়—কর্মকে সাধন করিয়া উহার সাধ্যরূপ দ্বিতীয় কোনও লক্ষ্য কর্মীর থাকে না। প্রকৃতরূপে এই ক্ষেত্রে ভগবানই কর্মরূপ ধারণ করিয়া কর্মীর নিকট প্রকাশিত হন। তাই কর্ম করিতে করিতে

আপনিই কর্ম কাটিয়া যায়। কর্মী কর্ম মাত্রে অনুরক্ত হইয়া অবশের ন্যায় কর্ম করে। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে লোকহিত বা বিশ্বকল্যাণও এই জাতীয় কর্মীর লক্ষ্য নহে। প্রশ্ন হইতে পারে—এই কর্ম আপন হইতেই কাটিয়া যায় কি প্রকারে? ইহার রহস্য আছে। যে কোন প্রকারেই হউক চিত্ত একাগ্র হইলেই জ্ঞানের উদয় অবশ্যম্ভাবী। মূঢ়, ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় জ্ঞানের উদয় হয় না, যোগাবস্থারও প্রকাশ হয় না। কিন্তু একাগ্র অবস্থায় স্বভাবতঃই একাগ্রতার প্রভাবে ইতস্ততঃ ছড়ান তেজঃ ঘনীভূত হয় বলিয়া অন্তর অতর্কিত ভাবে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে। তখন হৃদয়-গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং যাবতীয় কর্মের ক্ষয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। মহাসত্তা সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে — আমরা এক-লক্ষ্য হইতে পারি না বলিয়া তাহার উপলব্ধি পাই না। যখন একমাত্র কর্মেই লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে তখন একাগ্রতার প্রভাবে কর্মত্যাগ সম্ভবপর। এই অবস্থায় অপকর্মের সম্ভাবনা থাকে না। মা বলেন—যে কোন প্রকারে এককে ধরিতে পারিলে কর্ম কাটিতে বাধ্য। তিনি ত এক—যখন তিনি কর্মরূপে প্রকাশিত হন তখন কর্ম কাটে, যখন তিনি বিষয়রূপে প্রকাশিত হন তখন বিষয় কাটে— তিনি প্রকাশিত হইলে তিনিই থাকেন, আর সব মিলাইয়া যায়। তখন দেখা যায় তিনিই আমি, তাঁহাতে আমাতে নিত্যযোগ।

৬ — সগুণ, সাকার, সক্রিয় কি?

মা বলেন, সগুণ মানে স্ব-গুণ, সাকার মানে স্ব-আকার, সক্রিয় মানে স্ব-ক্রিয়া। অর্থাৎ গুণরূপে স্বয়ং, আকার রূপে স্বয়ং, ক্রিয়া রূপে স্বয়ং। একমাত্র স্বয়ংই যেখানে প্রকাশমান সেখানে সবই সেই নিত্যসিদ্ধ। তিনি অকর্তা হইয়াও সব করেন, সব করিয়াও অকর্তা থাকেন। ঐশ্বরিক

প্রকাশের ইহাই বৈশিষ্ট্য। তিনি অকর্তা—একমাত্র তিনিই ত আছেন, দ্বিতীয় কেহ ত নাই কাহার উপর কর্তা হইবেন?

৭ - চিন্ময় অপ্রাকৃত লীলা

শ্রীভগবানের সকল লীলাই অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। মা বলেন, চিন্ময় লক্ষ্য না থাকিলে ঐ সকল লীলা দর্শন কাহারও ভাগ্যে হয় না। ঐ সকল লীলার অভিনয় অনুকরণরূপে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের রসাস্বাদনের জন্য প্রাকৃত জগতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহার দর্শনেও অধিকার ভেদ আছে। শৃঙ্গার রসের লীলা, বিশেষতঃ রাসলীলা, মাধুর্যময় বলিয়া শ্রেষ্ঠ লীলা হইলেও সকলের পক্ষে দর্শনীয় নহে। কাহারও কাহারও চিত্তে ঐ সকল লীলা দর্শনে বা শ্রবণে জাগতিক ভাবের উদয় হয়। এরূপ স্থলে ঐ সকল লোকের লীলা দর্শনের যোগ্যতা নাই বুঝিতে হইবে। তবে উহা যে সাক্ষাৎ ভগবৎ লীলা তাহা স্মরণ থাকিলে চিত্ত নির্মল থাকে ও লীলা দর্শনের অধিকার জন্মিতে পারে। ভগবানের বাল্যলীলা ত অতি মধুর। কিন্তু তাহা দর্শনেও নিজের বাৎসল্যের পাত্রস্বরূপ পরিচিত বালকটির কথাই মনে পড়ে। সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের কথা চিন্ময় লক্ষ্য না থাকিলে মনে পড়ে না।

৮ — মনের লক্ষ্য ও স্বভাব

মনের একমাত্র লক্ষ্য আনন্দ— স্থায়ী আনন্দ। উহার জন্যই মন মর্কটের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিরন্তর ধাবিত হইতেছে। কিন্তু বিষয় হইতে যে আনন্দের আস্বাদন লাভ করে তাহা সর্বদা থাকে না। আস্বাদনের পরক্ষণেই ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন আবার নূতন করিয়া আনন্দলাভের জন্য সে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হয়। ইহাই তাহার চঞ্চলতার

মূল কারণ। মন সেই জন্য সর্বদা অতৃপ্ত। অমৃতের পিপাসা জল হইতে নিবৃত্ত হয় না। মা বলেন, মনকে শান্ত করিতে হইলে তাহাকে এই অমৃতের সন্ধান, স্থায়ী আনন্দের স্পর্শ, দিতে হইবে। নিত্য বস্তুর সঙ্গে যোগলাভ করিলে সে অনিত্য বিষয়ের পশ্চাতে অশান্ত ও উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইয়া বৃথা কষ্টভোগ করিবে কেন? তখন সে সমাহিত হইয়া আত্মস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করিবে।

মনের স্বভাবই এই— নানাত্বের কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়া সেই কল্পিত নানার সঙ্গে খেলা করা। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু **একই** আছে, নানা নাই। সেই **এক**কে জানিলে সর্বত্র সর্বদা তাহাকে দেখা যায়, তাহাকে নিয়াই থাকা হয়— তখন আর নানাত্বের ইন্দ্রজাল দ্রষ্টাকে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করিতে পারে না। তখন আর মানামানির প্রশ্নই উঠে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন— "যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ।" মন যে দিকেই যাক না কেন, সে দিকেই সেই এককেই দেখিতে পায় ও তাহাতে ডুবিয়া যায়। এদিকে ওদিকে ছুটাছুটির শক্তি হারাইয়া ফেলে। তখন সর্বত্র সে নিজ জননীকে দেখিতে পায় ও তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত অমৃত রস পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। বিশ্ব তখন মধুময় হইয়া যায়— আকাশ বাতাস অনল সলিল শত্রু মিত্র সবই **একের-ই** লীলাবিলাসিত বিভিন্ন মূর্তি বলিয়া তাহার নিকট প্রতিভাত হয়।

এই এক সর্বদা সর্বত্রই আছে। কিন্তু যখন যাহার নিকট যেখানে উহা ভাসিয়া উঠে তখন সেইখানেই তাহার মন শান্ত হইয়া যায়। যখন যেখানে লক্ষ্য হয় তখন সেখানেই উহা ধরা পড়ে। দেশগত বা কালগত ভেদের কারণ ধারক মনের যোগ্যতার তারতম্য। কিন্তু একবার ধরা পড়িলে আর যোগ্যতার প্রশ্ন থাকে না। তখন দেখা যায় ঐ **একই** আছে— উহাই ছিল, উহাই থাকিবে। আর যাহা কিছু সবই মনের ছলনা। অনন্ত বা নানার

মধ্যেও ঐ একই ভাসমান। ঐ একই সত্তাই নানারূপে নানাভাবে নানা সময়ে নানাস্থানে প্রকাশ পাইতেছে। মনের একাগ্রতার ফলে এক প্রকাশিত হইলে মন থাকে না, মনের কল্পিত নানাও থাকে না—অথবা সবই থাকে, একেরই লীলাময় আত্মপ্রকাশ রূপে। তখন দেখা যায় সেই একই সর্ববীজ —শুধু সর্ববীজ নহে, সর্বাত্মক। তাহা হইতেই সব হয়—বস্তুতঃ তাহাই সব। ইহাই জ্ঞানের স্বরূপ। তখন প্রকাশ অপ্রকাশ, স্থিতি গতি, অনন্ত প্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম, ঐ মহান্ ঐক্যের মধ্যে সমন্বয় প্রাপ্ত হয়। ঐ ঐক্য সূত্রই আত্মা—সেই এক সত্তা—নিজেই নিজে—'তৎ স্ব'। মা বলেন— একই অনন্ত, অনন্তই এক। প্রসিদ্ধ সুফী কবি মালিক মহম্মদ জায়সী তাঁহার 'পদুমাবতী' নামক রূপক কাব্যে বলিয়াছেন—

আপুহি গুরু সো আপহি চেলা,
আপুহি সব ঔ আপু অকেলা।।
আপুহি মীচ জিয়ন পুনি,
আপুহি তন মন সোই।
আপুহি আপু করে সো চাহৈ,
কহাঁ সো দূসর কোই।।

অর্থাৎ এই দৃষ্টি খুলিয়া গেলে দেখা যায় যে নিজেই গুরু, নিজেই শিষ্য—কোন ভেদ নাই, নিজেই সব বা অনন্ত এবং নিজেই একেলা বা একমাত্র অদ্বয়—কোন ভেদ নাই। নিজেই মৃত্যু ও নিজেই জীবন বা অমৃত,—মৃত্যু ও অমৃত সেই একেরই প্রকাশ মাত্র। দেহ মন প্রভৃতি সবই সেই একই—নিজেই। তখন নিজেই নিজে—যাহা খেয়াল হয় তাহাই করা হয়, দ্বিতীয় কোথা হইতে আসিবে? একমাত্র স্ব—দ্বিতীয় বা পরের কোন স্থান নাই। ইহাই মহাস্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি।

বস্তুতঃ অন্তও ত অন্ত না, তাই সান্তও অনন্ত। সীমার মধ্যে অসীম

আত্মপ্রকাশ করিলে সীমাও যে অসীম তাহা ধারণা হয়। মা বলেন—"তিনি সর্বরূপে স্বয়ংই। দ্বিতীয়ের স্থানই নাই। লক্ষ্য স্থির না হইলে অনন্ত মনে হয়, কিন্তু স্থির হইলে দেখা যায় অনন্তও একই।

৯ — সর্ব কর্মই মুক্ত

মা বলেন, বস্তুতঃ একমাত্র নিত্যবস্তুই আছে। যাহার সে নিত্য দর্শনের শক্তি নাই সে দেখে নানা ও অনিত্য—অনন্ত রকমের নানা। কালের ধারাতে দেখিতে গেলে ইহাই পরিবর্তন ও জগতের স্বভাব। কিন্তু পরিবর্তন ত থাকে না—জগতের বাহ্যক্রিয়াও থাকে না, সাধনার ক্রিয়াও থাকে না। যাহা থাকিবার তাহাই থাকে—যাহা সদাই আছে, তাহাই থাকে। তাই সবই বস্তুতঃ তৎ বা মুক্ত।

কর্ম মুক্ত বলিয়া সকলেই নিত্য মুক্ত—কোন বন্ধনই থাকে না। যা কিছু ব্যথা তাহা সাময়িক।

১০ — ভাবাসক্তি ও কর্মাসক্তি

ভাব ও কর্ম, দুইটি দিক্। কিন্তু দুইএ পরস্পর সম্বন্ধ আছে। ভাবেও কর্ম আছে কারণ বাস্তবিক পক্ষে ভাবও কর্মই। আবার কর্মেও ভাব আছে। তবে যখন যেটার প্রাধান্য হয় তদনুসারে নাম দেওয়া হয়। ভাবাসক্তিস্থলে ভাব প্রধান—তখন হৃদয় ভাববশতঃ আনন্দে গদগদ হয়। কিন্তু এ আনন্দের মূল্য নাই। ইহা আবদ্ধ করিয়া রাখে—সম্পূর্ণ জীবনটাই ইহার প্রভাবে বদ্ধ হইতে পারে। বন্ধন হইলেও আনন্দের এমনই মোহ যে এ বন্ধন, বন্ধন বলিয়া মনে হয় না। দীর্ঘকাল এক ভাবে থাকাতে উহাই স্বভাবের মত মনে হয়—তখন মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারে না,

ভাবাতীতে যাইতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে ভাবটা খণ্ড, পূর্ণ নহে। ভাবটি যদি পূর্ণাঙ্গ হইত তাহা হইলে উহা মানুষকে আবদ্ধ করিত না। যে কোন ভাব পূর্ণ হইলেই সরিয়া যায় ও পথ ছাড়িয়া দেয়—কাহারও অগ্রগতির পথরোধ করে না। ভাবের পূর্ণতা তাঁহার স্পর্শ ভিন্ন হয় না। পূর্ণের স্পর্শেই পূর্ণতা আসে। কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ভাবের পূর্ণতা আসে, তখন তাহার পক্ষে গতিরোধ আর থাকে না।

কর্ম সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম। পূর্ণতা আসিলে কর্মও আর বন্ধনের হেতু হয় না, স্বভাবের গতিতে বাধা দেয় না! কর্ম ও ভাব উভয় স্থলেই পূর্ণতার বন্ধন কাটিয়া যায়।

চার

১ — স্বরূপস্থিতি ও প্রারব্ধ কর্ম

সাধারণতঃ বলা হয়, জ্ঞানের উদয় হইলে সঞ্চিত কর্ম দগ্ধ হয় এবং ক্রিয়মাণ কর্ম কর্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের খণ্ডন হয় না—উহা একমাত্র ভোগের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ভোগ পূর্ণ হইলে প্রারব্ধ কর্ম থাকে না বলিয়া তজ্জনিত দেহও থাকে না। দেহ পতিত হইলে মনুষ্য বিদেহ কৈবল্য লাভ করে। ইহাই বেদান্তাদি শাস্ত্রের সাধারণ সিদ্ধান্ত।

মা বলেন, "স্ব-ইচ্ছা, পর-ইচ্ছা, অনিচ্ছা—এই ইচ্ছার বন্ধন নানাভাবে আলাদা কথা আছেই।" এই স্থানে মা বেদান্তের প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। বেদান্তে আছে—"ইচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারব্ধং

ত্রিবিধং স্মৃতম্” (পঞ্চদশী ৭-১৫২)। কোন প্রারব্ধ ভোগের ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া ভোগ করায়, কোন প্রারব্ধ ভোগের ইচ্ছা না থাকিলেও ভোগ করায় এবং এমন প্রারব্ধও আছে যাহা অন্যের ইচ্ছা দ্বারা ভোগ করায়। অপথ্যসেবী রোগী যে অপথ্যসেবনে ইচ্ছা করে তাহা ‘অপথ্যসেবন রোগবৃদ্ধির এবং জীবননাশের কারণ’ ইহা জানা সত্ত্বেও করিয়া থাকে। তাহার প্রারব্ধ কর্মই তাহার চিত্তে ঐ জাতীয় কর্ম করার ইচ্ছা উৎপাদন করে—‘চুরি করা অন্যায় ও করিলে দণ্ডভোগ অবশ্যম্ভাবী’ ইহা জানা সত্ত্বেও চোরের চৌর্যপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তাহার প্রারব্ধ কর্মই তাহাকে ঐ প্রকার কার্যে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা জন্মায়। লম্পট পুরুষ লাম্পট্যের ফলে শূলে আরোপিত হইবে ইহা জানিয়াও স্বেচ্ছাপূর্বক ব্যভিচারে রত হয়—এই স্থলেও ইচ্ছার মূলে তাহার প্রারব্ধ কর্ম রহিয়াছে জানিতে হইবে। তিন প্রকার প্রারব্ধের মধ্যে এই ইচ্ছাপ্রারব্ধ অতি ভীষণ। বিশিষ্ট আচার্যগণ বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরও ইহা বারণ করিতে পারেন না।*

গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন—“যে প্রারব্ধ কর্ম দ্বারা তাহার দেহ রচিত হইয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।” এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিলে কোন ফললাভ করা যায় না।

---

* শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য স্বামী এইরূপ মত পোষণ করেন। ইহা এক প্রকার অর্থবাদ বাক্যের মত মনে করিতে হইবে। কারণ পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন পরমেশ্বরের ইচ্ছা অপ্রতিহত। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী ‘ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু’তে শ্রীভগবানকে ‘ভক্ত প্রারব্ধবিধ্বংসী’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইলে তাহার অত্যুৎকট প্রারব্ধও খণ্ডিত হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। যাহা হউক, ইচ্ছা-প্রারব্ধ যে সাধারণ কোন উপায় দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে না, বিদ্যারণ্য স্বামীর তাহাই তাৎপর্য।

পুরাণাদিতে বর্ণিত রাজা নল এবং যুধিষ্ঠিরের জীবন বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে তীব্র প্রারব্ধ অথবা অবশ্যম্ভাবী ভাব সহজে রোধ করা যায় না। নল ও যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়ার পরিণাম অনিষ্টজনক জানিয়াও উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং রামচন্দ্র সুবর্ণ মৃগ অসম্ভব জানিয়াও উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অনিচ্ছা-প্রারব্ধ ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার। অনেক সময় নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও প্রারব্ধ বশতঃ বাধ্য হইয়া ভোগ করিতে হয় অথবা অভিনব কর্মে রত হইতে হয়।

স্বেচ্ছা ও অনিচ্ছা এই উভয় প্রারব্ধ হইতেই পরেচ্ছা প্রারব্ধ পৃথক্। এ স্থলে নিজের ব্যক্তিগত ভোগেচ্ছা থাকা এবং না থাকার কোন প্রশ্ন উঠে না—শুধু অন্যের ইচ্ছাতে, অন্যের প্রীতির জন্য বাধ্য হইয়া, সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রানুসারে ইহা পরেচ্ছা-প্রারব্ধের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই বিচার-ধারা অনুসারে প্রারব্ধ বশতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরও ইচ্ছা থাকিতে পারে এবং তাহার ফলে ভোগ থাকাও অসম্ভব নহে। তবে ঐ ইচ্ছা ভর্জিত বীজের ন্যায় জানিতে হইবে। ভর্জিত বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ ঐ ইচ্ছা হইতেও উৎকট ব্যসন জন্মায় না।

সুখ এবং দুঃখের নিমিত্তকারণ প্রারব্ধ কর্ম, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহার বেগ চারি প্রকার বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। এই চারিটি বেগের নাম যথাক্রমে তীব্র, মধ্য, মন্দ ও সুপ্ত, এইভাবে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—অনুভূতি প্রকাশ ৪।৭৪—৭৮)। যখন বেগ তীব্রতম তখন ঐ প্রারব্ধের ভোগের সময় জীবন্মুক্ত পুরুষও পশু প্রভৃতির ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন। তীব্র প্রারব্ধ স্বেচ্ছাতীব্র, পরেচ্ছা-তীব্র এবং অনিচ্ছা তীব্র ভেদে তিন প্রকার জানিতে হইবে। পৌরাণিক সাহিত্যে

ইহার প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। স্বেচ্ছা-তীব্র প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত সৌভরি। সৌভরি মুনি সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত জলের মধ্যে গাঢ় সমাধিতে মগ্ন ছিলেন, পরে যথাসময়ে উত্থিত হইয়া মৎস্য শাবকগণের পরস্পর ক্রীড়া দর্শন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার চিত্তে ঐ প্রকার ক্রীড়ার ভাব জাগিয়া উঠে। কারণ ঐ সময়ে তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রীতি আচ্ছন্ন ছিল। তখন জল হইতে উত্থিত হইয়া রাজা মান্ধাতার ৫০টি কন্যাকে বিবাহ করেন এবং নিজের অসাধারণ বেগশক্তি-প্রভাবে কায়ব্যূহ রচনা করিয়া ৫০টি পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ পূর্বক পঞ্চাশটি কন্যার সহিত বিহারে মগ্ন হন। চন্দ্র গুরুর শাপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পুনর্বার গুরুর কৃপায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষ ভেদে তাঁহাকে ক্রমশঃ ক্ষয় ও উপচয় উভয়ই উপলব্ধি করিতে হয়। মাণ্ডব্য ঋষি সমাধিকালেই শূলে আরোপিত হ'ন ও ব্যথিত হইয়া প্রারব্ধ কর্মের ফল অনুভব করেন। ইঁহাদের বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

মধ্যবেগ প্রারব্ধও স্বেচ্ছাদি ভেদে তিন প্রকার। স্বেচ্ছা-প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত রাজপদে অভিষিক্ত রাজা অজাতশত্রু। তিনি রাজ্য ভোগ করিতেন, ইহা সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মচৈতন্যের স্মৃতিতে ডুবিয়া থাকিতেন। পরেচ্ছা প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত রাজা শিখিধ্বজ। তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও রাণী চূড়ালার ইচ্ছায় রাজকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। অনিচ্ছা-প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত ভগীরথ। তিনি মুক্ত শ্বেত হস্তী হইতে মাল্য প্রাপ্তির ফলে অপরের রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

মন্দবেগ প্রারব্ধও তিন প্রকার। তন্মধ্যে কবি প্রভৃতি ঋষভের নয়টি পুত্র স্বেচ্ছা-প্রারব্ধ ভোগের দৃষ্টান্ত। ইঁহারা সকলেই যোগী ছিলেন, তাই

রাজোচিত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিয়া আত্মানুসন্ধানে রত হইয়াছিলেন। পরেচ্ছা প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত ধ্রুব। তিনি নারদের ইঙ্গিতে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া তাহার ফলে আত্মসুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অনিচ্ছা-প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত বামদেব প্রভৃতি ঋষি। ইহারা মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সুপ্তবেগ প্রারব্ধের মধ্যে পরেচ্ছা ও অনিচ্ছার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি বিন্ধ্য পর্বত, যাঁহার প্রারব্ধবেগ অগস্ত্য মুনির ইচ্ছাতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি স্বয়ং পৃথিবী, যাঁহার প্রারব্ধ ভোগ আবির্ভাব কাল হইতেই সুপ্ত রহিয়াছে।

এই যে চতুর্থ প্রকার জীবন্মুক্তগণের কথা বলা হইল ইঁহাদের প্রারব্ধ-বেগ সুপ্ত বলিয়া ইঁহারা অবারিত ভাবে নিরবচ্ছিন্ন নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা বিদেহমুক্ত না হইলেও বিদেহমুক্তের ন্যায় দ্বৈতহীন।

সুতরাং পূর্বোক্ত বিবরণ অনুসারে প্রারব্ধ কর্ম দ্বাদশ প্রকারের জানিতে হইবে।

মা ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা প্রভৃতি যাবতীয় প্রারব্ধের বিভাগই স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য এই যে জীবের এমন একটি স্থিতিও আছে যেখানে প্রারব্ধ কর্মও সঞ্চিত কর্মের ন্যায় জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রারব্ধ না থাকিলে যদি তজ্জন্য দেহ না থাকে তাহাতেও কোন আপত্তি নাই। কারণ যে মহাজ্ঞানের প্রভাবে প্রারব্ধ পর্যন্ত খণ্ডিত হইয়া যায়, তাহার শক্তিতেই দেহ আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়, এমন কি উহার সম্পূর্ণ রূপান্তর সঙ্ঘটিত হয়। ইহাকেই এক হিসাবে দেহের নাশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মা বলেন, এটিও স্বরূপের প্রকাশের স্থিতি নহে। যে স্থিতিতে স্বরূপের প্রকাশ

অনবচ্ছিন্ন তাহাতে দেহের অস্তিত্বের প্রশ্নই ওঠে না। শুদ্ধ বা পরিবর্তিত দেহও ত দেহ। সেখানেও দেহবোধের প্রশ্ন রহিয়াছে। কিন্তু যথার্থ স্বরূপ প্রকাশে দেহ আছে কি নাই, সে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কারণ ঐ স্থানে থাকা ও না থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

জ্ঞানের তীব্রতার তারতম্য অনুসারে প্রারব্ধের সত্তা ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মনে হয়, প্রচলিত সিদ্ধান্ত কোন একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জ্ঞান অত্যন্ত তীব্র এবং উৎকট হইলে তাহার তেজে প্রারব্ধ কর্মও যে বিধ্বস্ত হইতে পারে তাহা গীতাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কারণ উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে সুসমিদ্ধ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্মকেই ভস্ম করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, প্রারব্ধও সকল কর্মের অন্তর্গত। সঞ্চিত কর্ম যে অবিদ্যা অথবা অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে প্রারব্ধ কর্মের উপজীব্য সেই একই অজ্ঞান। অজ্ঞানের একদিক্ হইতে সঞ্চিত কর্মের উদ্ভব হয় এবং অপর দিক্ হইতে জন্ম, আয়ু, এবং ভোগের নিয়ামক প্রারব্ধের উদয় হয়। প্রথমটি অজ্ঞানের আবরণাংশ এবং দ্বিতীয়টি উহার বিক্ষেপাংশ। প্রচলিত মতে অজ্ঞানের আবরণাংশ কাটিবার সঙ্গেই মুক্তির পূর্বাভাস জাগিয়া উঠে। প্রারব্ধ কর্ম জীবন্মুক্তের ভোগের নিমিত্তরূপে বিদ্যমান থাকে। প্রারব্ধ থাকিলেও এই মতে উহা হইতে জীবন্মুক্তির কোন বাধা জন্মে না।*

জীবন্মুক্তি কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শন হইতে আবির্ভূত হয় না। কারণ বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলেও বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বরূপপ্রকাশ সম্ভবপর হয় না। দেহ প্রারব্ধ কর্মের ফল, উহা বিদ্যমান

---

* সিদ্ধাচার্যগণ অর্থাৎ রসায়ন-সিদ্ধ, নাথমার্গে সিদ্ধিপ্রাপ্ত অথবা অন্যপ্রকার কায়-সিদ্ধগণ জীবন্মুক্তির যে আদর্শ স্বীকার করেন তাহাতে প্রারব্ধের কোন স্থান নাই। ইহা প্রচলিত বেদান্ত মত নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

থাকিলেও মনোময় কোষ এবং প্রাণময় কোষ সম্যক প্রকারে বিশুদ্ধ হইলে জীবন্মুক্তির উদয় অপরিহার্য।

তান্ত্রিক আচার্যগণ বলেন, পৌরুষ জ্ঞান এবং বৌদ্ধ জ্ঞান ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার। তদ্রূপ অজ্ঞানও পৌরুষ ও বৌদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। জীব অথবা পশু অনাদিকাল হইতে পৌরুষ অজ্ঞানে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যদিও অদ্বৈত মতে এই অজ্ঞান স্বেচ্ছা-গৃহীত তিরোধান শক্তির খেলা, তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছামূলক অনুগ্রহ শক্তির ব্যাপার না ঘটিবে ততক্ষণ ইহা নিবৃত্ত হইতে পারে না। সদ্‌গুরু যথাবিধি দীক্ষার দ্বারা এই অনুগ্রহ শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন। তাহার ফলে পশু অথবা জীবের পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। জীবের ব্যক্তিগত সাধনা অথবা অন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বনের দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। ইহা একমাত্র গুরুকৃপা সাপেক্ষ, কিন্তু পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও, অর্থাৎ পশুত্ব স্বরূপতঃ নিবৃত্ত হইলেও, সাধক নিজেকে 'শিবোঽহং' ভাবে অনুভব করিতে পারে না—অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে না। কারণ পশুত্ব নিবৃত্ত হইলেও পশুত্ব নিবৃত্তির অনুভূতি চিত্ত অথবা বুদ্ধি নির্মল না হওয়া পর্যন্ত হইতে পারে না। তাহার জন্য যথাবিধি সাধনা আবশ্যক। এই সাধনার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়। বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন জীব যে বস্তুতঃই শিবরূপী তাহা সে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে, ইহাই জীবন্মুক্তি। তখনও প্রারব্ধ কর্ম থাকে এবং তাহার ফলস্বরূপ ভোগাভাসও থাকে। ভোগের নিবৃত্তি এবং প্রারব্ধ নিবৃত্তি সম্পন্ন হইলে পৌরুষ জ্ঞানের উদয় হয় এবং সাধক শিবভাবে স্বরূপ-স্থিতি লাভ করে।

বেদান্ত মত ও তান্ত্রিক মত উভয় স্থানেই জীবন্মুক্তির বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত মতে তত্ত্বজ্ঞানের পরে চিত্তের পরিকর্ম ও

বাসনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবন্মুক্তি হয় না, কিন্তু বিদেহ মুক্তি অবধারিত, কারণ জীবন্মুক্তি না হইলেও দেহান্তে কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী। তান্ত্রিক মতে দীক্ষার দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও অর্থাৎ পশুভাব কাটিয়া গেলেও জীবন্মুক্তির উদয় হয় না। কারণ পশুভাবের নিবৃত্তির অনুভব দেহাবস্থান কালে বুদ্ধিক্ষেত্রেই সম্ভবপর। বুদ্ধি মার্জিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ অনুভবের উদয় হইতে পারে না। এই জন্য দীক্ষার মহত্ব সত্ত্বেও জীবন্মুক্তির জন্য সাধনা আবশ্যক হয়।

২ — পূর্ণ সত্যে দ্বৈতাদ্বৈতের বিভাগ নাই

পূর্ণ সত্যে কল্পনার স্থান নাই। যতক্ষণ দেহদৃষ্টি আছে ততক্ষণ গণ্ডীবদ্ধ ভাব আছে বলিয়া মন কার্য করে এবং কল্পনার উদয় হয়। এই পূর্ণ সত্যকে মা তাঁহার অনুপম ভাষাতে "চরম পরম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে বাহির হইতে এই সম্বন্ধে আলোচনা করে সে দ্বৈত ভূমিতে থাকিয়া অদ্বৈতের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে। অদ্বৈতের প্রসঙ্গ করিলেও তাহার লক্ষ্য দ্বৈতেই থাকে। দেহাত্মবোধ হইতে মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে অদ্বৈতের সাধক তাহার লক্ষ্য থাকে **একে** নিবদ্ধ। সে বহুর মধ্যে **এককেই** দেখিতে চেষ্টা করে—বহুর মধ্যে **এক** অনুস্যূত রহিয়াছে সেই **একই** তাহার লক্ষ্য। সে দেখিতে পায় একই অনন্তরূপে অনন্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে অনন্ত বা নানা তাহার বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াও বস্তুতঃ একই। কারণ তাহার দৃষ্টিতে ভঙ্গি নাই। তাই সেখানে দ্বৈতাদ্বৈতের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু জগতের জীব সাধারণতঃ দ্বৈত ভূমিতে থাকে বলিয়া তাহাদের দৃষ্টিতে ভঙ্গি আছে। তাই তাহাদের যখন যেখানে যে প্রকার দৃষ্টি থাকে তখন সেখানে সেই প্রকার দৃশ্য দর্শন হয়—সর্বব্যাপক শাশ্বত একের দর্শন-লাভ ঘটে

না—অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না।

সর্বত্র 'তৎ'কে দেখা ইহাই ব্রহ্ম দৃষ্টি। যদি কোন দৃষ্টিতে 'তৎ' ছাড়া অন্য কিছু ভাসে বা প্রতীত হয়, তবে জানিতে হইবে সেখানে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের খেলা রহিয়াছে। নাম রূপ গুণ সবই সেই একের, শুধু তাহাই নহে, সবই সেই একই। বস্তুতঃ একমাত্র সেই একই আছে তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ-রূপে আপনাতে আপনি প্রকাশমান, দ্বিতীয়ের ভান নাই। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। দ্বিতীয়ের ভান থাকিলেই বুঝিতে হইবে অজ্ঞান আছে এবং তাহার কার্য করিতেছে।

এই যে এক, ইহাকে যেমন স্বপ্রকাশ বলা চলে, তেমনি ইহাকে অব্যক্ত বা অপ্রকাশও বলা চলে। কারণ দ্বিতীয় নাই বলিয়া তিনি কাহার কাছে প্রকাশ হইবেন। তাই তিনি চির অব্যক্ত, চিরদিন 'নিহিতং গুহায়াম্'।

৩ — নিত্যলীলা কি ?

ভগবান নিরন্তর নিজকে নিয়া নিজে খেলা করিতেছেন। তিনি নিত্য, তাই তাঁহার লীলাও নিত্য। অজ্ঞানের ক্রিয়া থাকিলে এই নিত্যলীলা ধারণা করা যায় না। প্রথমে অদ্বৈত বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তখন দেখা যায় একই নানা সাজিয়া নিজের সহিত নিজে সর্বদা খেলা করিতেছেন। অনন্ত প্রকারে সেই একই দ্বিতীয় সাজেন এবং অনুরূপ রস আস্বাদন করেন। ভোক্তা তিনি, ভোগ্য তিনি, আর ভোগও তিনি—দ্বিতীয়ের স্থান নাই, অথচ অনন্ত প্রকারে সাজিয়া আছেন। ইহা সাজা দ্বিতীয়—বস্তুতঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। অদ্বৈতের একটি দিক আছে, সেটি লীলাতীত, নিরঞ্জন, নিষ্ক্রিয়। সেখানে কোন শক্তির ক্রিয়া নাই, পৃথক্ ভাবে শক্তির সত্তাও নাই, সর্বশক্তি সেখানে অন্তর্লীন। তখন তিনি আপনাতে আপনি মগ্ন, সুষুপ্ত। সেটি স্বয়ংপ্রকাশ বা অপ্রকাশ। তাহার আর একটি

দিক্ আছে। সেটি নিরন্তর লীলাময়, সক্রিয়। উভয়ই নিত্য এবং উভয়ই সত্য। বস্তুতঃ উভয়ই এক ও অভিন্ন—কারণ অখণ্ডের মধ্যে খণ্ড বা বিভাগ-কল্পনার কোন অবকাশ নাই। ভগবান সর্বশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই তাঁহার অনন্ত লীলা। তাঁহার সব লীলাই স্বরূপতঃ চিন্ময়, আনন্দময় এবং অপ্রাকৃত। অবিদ্যার অতীত বলিয়া লীলাকে অপ্রাকৃত বলা হইয়া থাকে। তিনি এক হইয়াও অনন্ত, তাই তাঁহার খেলার ইয়ত্তা নাই। রসরূপে এক হইয়াও তিনি অনন্ত। তাই তাঁহার রসাস্বাদনের বৈচিত্র্যেও অন্ত নাই। মনে রাখিতে হইবে ভগবানের এই নিত্যলীলায় সঙ্কোচ নাই, বিভাগ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, অজ্ঞান নাই—যাহা আছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহা লীলারই অঙ্গ। তাই উহাও চিন্ময়, অপ্রাকৃত ও আনন্দময়। লীলা অভিনয় মাত্র, রসাস্বাদনের অছিলাতে বিশ্বনাট্যমঞ্চে উহার আয়োজন হইয়া থাকে। মা বলেন, "তিনি স্বয়ং— সেই যে স্বয়ং নিজেকে নিয়া নিজে খেলা চলিতেছে, ঐ নিত্য লীলা। সেই স্থানে যে স্থানে যে প্রকাশ সব চিন্ময় রাজ্যের ব্যাপার কি না। এখানকার ভাগাভাগিটাও চিন্ময়, অপ্রাকৃত যে।"

শক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন "স্বেচ্ছয়া স্বভিত্তৌ বিশ্বম্ উন্মীলয়তি" অর্থাৎ তিনি স্বয়ং নিজেকে ভিত্তি করিয়া তাহাতে নিজ হইতে অভিন্নরূপে নিত্যস্থিত বিশ্বকে ভিন্নবৎ প্রকট করেন। ইহাতে তাঁহার নিজের ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্যই একমাত্র হেতু। ইহা তাঁহার স্বভাব বা লীলা মাত্র। এখানে দ্বিতীয়ের কোন স্থান নাই। নিমিত্ত তিনি, উপাদানও তিনি—কর্তা তিনি, কর্ম তিনি, করণ তিনি, এমন কি দেশ-কালাদি আধারও তিনি শুধু তাহাই নহে, ক্রিয়াও তিনি। এক চৈতন্যরূপী তিনি নানা সাজিয়া নানা প্রকারে খেলা করেন, নিজের সঙ্গে নিজেই। আবার সকল খেলার মধ্যেও তিনি লীলাতীত রূপে নিজের খেলা নিজেই দর্শন করেন। খেলা করেনও তিনি, দেখেনও তিনি, আপন খেলার ঊর্ধ্বেও তিনি। স্থানান্তরে বলা হইয়াছে

—"তস্য পুনঃ বিশ্বোত্তীর্ণবিশ্বাত্মক-পরমানন্দময় প্রকাশৈকঘনস্য এবংবিধমেব অখিলম্ অভেদেনৈব স্ফুরতি, ন তু বস্তুতঃ অন্যৎ কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং গ্রাহকং বা, অপিতু স এব ইত্থং নানাবৈচিত্র্যসহস্রৈঃ স্ফুরতি।"

অর্থাৎ তিনি বিশ্বের অতীত, তিনি বিশ্বময়, তিনি পরমানন্দময় ঘনীভূত প্রকাশ স্বরূপ, সব কিছু তাঁহাতে অভিন্নরূপে স্ফুরিত হইতেছে, তাঁহা হইতে পৃথক্ কোন জ্ঞাতা নাই, জ্ঞান নাই—সর্ব জ্ঞাতা তিনি, যাবতীয় জ্ঞেয়ও তিনি। একমাত্র তিনিই অনন্ত বৈচিত্র্য সহকারে সর্বদা ও সর্বত্র প্রতিভাসমান হইতেছেন।

ইহাই তাঁহার নিত্যলীলা।

৪ — সবই ঠিক

মা বলেন, "যেখান হইতে যে যা বল তার সবই কিন্তু ঠিক, কোনটাই আটকাইবে না।" আসল কথা, যেখানে অনন্ত বিরোধের সমন্বয় হয়, সেখানে দ্বিধা থাকে না। যেখানে মিথ্যাও মিথ্যা হইয়া যায় সেখানে ভ্রম বা বিপর্যয় বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ভাসে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং তাহার আভাসেই ভাসমান। যে যে দৃষ্টি নিয়া সেদিকে দেখিবে সে তাহাই দেখিবে, এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে তাহাই সত্য। যাঁহারা বলেন, অদ্বৈতে জীব জগৎ সবই আছে, কিছুই বাদ নাই—দ্বৈত থাকিয়াও অদ্বৈত—তাঁহারাও সত্যই বলেন। আবার ইহাও সত্য, যেখানে বিশুদ্ধ অদ্বৈত সেখানে দ্বৈতের কোন স্থান নাই—জীব ও জগৎ সেখানে কিছুই ভাসে না। একই সময়ে দুইই সত্য, তবে দৃষ্টি অনুসারে। আর দৃষ্টিকে বাদ দিলে কিছুই বলা চলে না। তাহাও সত্য। তাই বলা হয় "প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।" অর্থাৎ জ্ঞানের প্রস্থান বিভিন্ন প্রকারের। ইহাদের

মধ্যে প্রত্যেকটি প্রস্থানই অধিকার অনুসারে কাহারও না কাহারও পক্ষে শ্রেয় ও হিতকর। অধিকারগত, রুচিগত এবং সামর্থ্যগত বৈচিত্র্যবশত উপদেশকতার ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে।

৫ — ভগবানের অবতার হয় কি ?

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কোন না কোন আকারে অবতারবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম সমাজেও Descent of God as Man অর্থাৎ নররূপে ভগবৎ সত্তার অবতরণ, এই সিদ্ধান্ত প্রচলিত রহিয়াছে। ইসলামিক ধর্মেও প্রকারান্তরে অবতারবাদ যে না আছে তাহা নহে। ব্যাখ্যার কৌশলে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও কোন না কোন প্রকারে ভগবৎ শক্তির অবতরণ মানা হইয়াই থাকে। বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষতঃ ত্রিকায়াবাদী মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে, নির্মাণকায়রূপে অবতারবাদ স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং এক হিসাবে ধর্মমাত্রেই অবতার তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ বিষয়ক সিদ্ধান্তও অধিকাংশ ধর্মে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে স্পষ্টভাবেই জ্ঞানী ভক্তের উৎক্রমণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেবযান গতির প্রসঙ্গেও প্রকারান্তরে উৎক্রমণই সমর্থিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানী ভক্ত প্রারব্ধ-কর্মের অবসানে দেহত্যাগের সময় সুষুম্না নাড়ী অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া সূর্য-রশ্মি আশ্রয় পূর্বক সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন এবং তদনন্তর সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে বিরজাসলিল পর্যন্ত গমন করেন। এই ভাবে ক্রমশঃ প্রাকৃত অথবা জড়সত্তা হইতে তাঁহার স্বরূপগত চিৎসত্তা মুক্তিলাভ করে। তখন তিনি পরমব্যামে অথবা মহাবৈকুণ্ঠে নিজের ভাবানুরূপ ভগবৎ ধামে প্রবেশ করেন। অবতারবাদ ও উৎক্রমণবাদ—নামা ওঠার কথা। সুতরাং বুঝিতে হইবে এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে দেহগত ও

অবস্থাগত ভেদ বা বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয় বলিয়া নামা ওঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ-জগৎ অথবা মহাকারণ-জগৎ হইতে কার্য জগতে শক্তির অবতরণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কার্যক্ষেত্র হইতে শক্তি স্বীয় ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া কারণ অথবা মহাকারণ সত্তাতে আরূঢ় হয়।

এই নামা ওঠার ব্যাপার যাবতীয় সিদ্ধান্তবাদীদের ন্যায় মাও স্বীকার করেন। কিন্তু মা বলেন, যদিও স্থিতি বিশেষে নামা এবং ওঠা উভয়ই সত্য, তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে এমন স্থিতিও আছে যেখানে নামা ওঠার প্রশ্নই থাকে না। উহাই পরিপূর্ণ স্থিতি বা পরমস্থিতি, যাহাকে 'চরম পরম' বলিয়া কখনও কখনও তিনি নির্দেশ করিয়া থাকেন। দেহসত্তার বোধ থাকিলে দেহগত গতির প্রশ্ন সার্থক হয়। কিন্তু যে স্থিতিতে দেহ আছে কি নাই এই প্রশ্নই উদিত হয় না, সেখানে অবতরণ অথবা উৎক্রমণ এই দুইটিরই কোন অর্থ পাওয়া যায় না। যেখানে এক ও অখণ্ড সেখানে দেশের অথবা কালের অথবা আকৃতির কোন প্রকার সীমা বা অবচ্ছেদ থাকিতে পারে না। সেই সত্তা, যাহা বস্তুতঃই নিরবচ্ছিন্ন, কোন বিশিষ্ট দেশ, কাল অথবা আকৃতির সহিত সীমাবদ্ধভাবে সংশ্লিষ্ট না হইয়াও অসঙ্গভাবে প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায়, নামা ওঠা আছে ইহাও যেমন সত্য, তেমনি নামাও নাই, ওঠাও নাই, ইহাও তেমনি সত্য। মূলে যদি এক সত্তাই বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে যে নামে সেই ওঠে; ইহা বলিতেই হইবে এবং যে স্থানে নামা ওঠা হয় তাহাও সেই সত্তা ভিন্ন অপর কিছু নহে। শুধু তাহাই নহে নামা ওঠা ক্রিয়াটাও আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সেই মূল সত্তারই প্রকাশভেদ মাত্র। এই জন্যই মা বলিয়াছেন—"যিনি নাবছেন, যেখান হতে নাবছেন আর যেখানে নাবছেন সবই এক—ঐ ছাড়া আর কিছু নাই।"

৬ — তাঁতে সবই সম্ভব

শাস্ত্র অনুসারে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তির নাম মায়া। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা যাহা ঘটিবার কথা নহে তাহা ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ যাহা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে তাহার নাম মায়াশক্তি। বস্তুতঃ ইহা শ্রীভগবানেরই স্বাতন্ত্র্য শক্তির নামান্তর। জীব ও জগতের দৃষ্টিতে কার্য-কারণ শৃঙ্খলার নিয়ম অনুসারে নিয়তির অমোঘ সাধন বলিয়া যাহা প্রতীত হয় তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ত নহেই, বরং অতি সাধারণ ব্যাপার রূপে পরিগণিত হয়। তাঁহার ইচ্ছাই প্রকৃতির নিয়মের মূল। জগৎ এই নিয়মের অধীন। সুতরাং জগৎ ও জীব এই নিয়মকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাই বদ্ধ অবস্থাতে এই নিয়ম নিয়তিরূপেই প্রতীতি-গোচর হয়। কিন্তু যে ইচ্ছা জাগতিক নিয়মের মূল সেই ইচ্ছার নিকট ঐ নিয়মের বন্ধন থাকে না। ইচ্ছা ত্রিকালের মধ্যে নিয়মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ হইতে কার্যের আবির্ভাব তাই সম্ভবপর হয়। কিন্তু যেখানে চৈতন্যময় স্বাতন্ত্র্য বিরাজ করিতেছে—সেখানে অতীত অনাগতের বন্ধন নাই এবং কার্য-কারণ ভাবও থাকে না—সেখানে নিত্য বর্তমান। তাই সেখানে সেই ইচ্ছাই অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এইজন্য সমগ্র জীব ও জগৎ মায়ার অধীন। কিন্তু ভগবান স্বয়ং মায়ার অধীশ্বর। সম্ভব ও অসম্ভবের সীমারেখা অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি জীবের নিকট প্রতিভাত হয়। কিন্তু ভগবৎ দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া কোন কথাই নাই। একজন ভক্ত বিশ্বজননীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"ক্ক বা বৈধী সৃষ্টিঃ পততি যদি দৃষ্টিস্তব শিবে।" অর্থাৎ তাঁহার কৃপার সঞ্চার হইলে অঘটন ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই বহুস্থানে বহু প্রসঙ্গে মা ভগবৎ কৃপার উপর নির্ভর করিতে বলিয়াছেন। কারণ সেখানে সবই সম্ভব।

৭ — বুদ্ধি নিয়া ত ধরা যায় না

মা জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ব বুঝাকে বোঝা বলিয়া অনেক সময় শ্লেষ পূর্বক বর্ণনা করিয়া থাকেন। বোঝা শব্দে ভারকে বুঝায়। মানুষ যতক্ষণ ভারাক্রান্ত থাকে ততক্ষণ জীবনের সহজ ও সরল গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভার কাটিয়া গেলে যখন নিজে হাল্কা বোধ করে এবং আগন্তুক আবর্জনা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে না, তখন অতি সহজে অত্যন্ত গভীর তত্ত্বও তাহাতে স্ফুরিত হইয়া থাকে। পূর্ব সংস্কার আশ্রয় করিয়া মন, বুদ্ধি ও চিত্তের যে ব্যাপার তাহারই নাম 'বুঝা'। ব্যক্তিগত সংস্কার, রুচিগত ভেদ, অনন্ত প্রকার বাসনা, নানা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অধিকার ভেদ, আশা আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণ, রাগ দ্বেষের—ক্রিয়া—এই সকল ভাব হইতে নিজের অন্তঃকরণকে পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে না পারিলে সত্যের দর্শন অসম্ভব। এক কথায় পূর্বসংস্কার অথবা বাসনার সহজাত দৃষ্টিভঙ্গি (Prejudice and pre-conceived notion) হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলে অর্থাৎ রঞ্জিত দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ সরল দৃষ্টিলাভ করিতে না পারিলে সত্যের স্বাভাবিক রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। যোগিগণ ও জ্ঞানিগণ নির্বিকল্প জ্ঞানের যে প্রশংসা করিয়া থাকেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে বিকল্প হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলে অবিকৃত সত্যের রূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ হয় না। এই জন্যই অহংকার ও জ্ঞানের গরিমা পরিহার করিয়া সরল শিশুর ন্যায় স্বচ্ছ ও সংস্কারহীন চিত্তে গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞান হইতে conceptual element অর্থাৎ বিকল্পের অংশ অপসারণ না করিতে পারিলে ঐ জ্ঞান বোধরূপ সহজ জ্ঞান অথবা pure intuition অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। বিকল্প বুঝার বোঝা। ঐ বোঝা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে জ্ঞানহীন সরল শিশু ভাবের উদয় হয় তাহাই পরমহংসের উপযোগী মহাজ্ঞান ধারণের যোগ্য আধার।

৮ — চাওয়াই স্বভাব

মা বলিয়াছেন, "এই চাওয়াটাই স্বভাব। বাস্তবিক যে স্বরূপ জ্ঞান, 'আনন্দ'—সেই চাওয়া।" উপনিষদ বলিয়াছেন— 'ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।' ভূমা অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন যাহা কোনপ্রকার গণ্ডিদ্বারা নিবদ্ধ নহে। বস্তুতঃ ইহাই আত্মস্বরূপ, ইহাই আনন্দ, যেখানে পরিচ্ছিন্নতা বা খণ্ডতা অথবা গণ্ডীবদ্ধ ভাব, সেখানে একটি আবরণ রহিয়াছে জানিতে হইবে। মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই, শুধু মনুষ্য কেন, জীবমাত্রের মধ্যেই, অনাদিকাল হইতেই "এই চাওয়ার" প্রবৃত্তিটি রহিয়াছে দেখা যায়। বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়াই হউক, যে কোনো আকারেই হউক, সকলেই সেই একমাত্র বস্তুই চাহিতেছে। জীবমাত্রই অভাবগ্রস্ত। এই অভাববোধ স্পষ্টভাবেই হউক অথবা অস্পষ্টভাবেই হউক সকল জীবের মধ্যেই আছে এবং ইহাই তাহার কর্ম-প্রবৃত্তির উদ্দীপক। বস্তুতঃ আনন্দই একমাত্র প্রাপ্য বস্তু এবং আনন্দ হইতে চ্যুত হইয়াছে বলিয়াই, অথবা চ্যুত না হইয়াও চ্যুত হইয়াছে বলিয়া বোধ করে বলিয়াই, উহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়া থাকে। অন্য বস্তু আনন্দের সাধন বলিয়া গ্রাহ্য হয়। কিন্তু আনন্দ কিছুর সাধন নহে। আনন্দই একমাত্র সাধ্য। যতক্ষণ আনন্দ প্রাপ্তি না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত চাওয়ার বিরাম নাই এবং মনের চঞ্চলতারও নিবৃত্তি নাই। বস্তুতঃ মানুষের মন এই আনন্দরূপে অখণ্ডরূপে আত্মসত্তাকে লাভ করিবার জন্যই ভ্রমক্রমে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। শিশু যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় চঞ্চল হয়, মনের চঞ্চলতাও সেই প্রকার। শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে চঞ্চলতা থাকে না, তদ্রূপ মনও নিজের ভোগ্য বস্তু অর্থাৎ স্বরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইলে আর চঞ্চল হয় না। চাওয়াটা চঞ্চলতারই লক্ষণ এবং এক হিসাবে ইহা দুঃখের হেতু মনে হইলেও ইহার উদ্দেশ্য মঙ্গলময়। কারণ ইহা হইতেই কর্মপথে গতি হয় এবং চরম অবস্থায় প্রাপ্তির আনন্দ অধিকার করা যায়।

হারামণির অন্বেষণে অনাদিকাল হইতে মন ঘুরিয়া মরিতেছে—ঠিক যেন মণি হারা ফণী। গুরুকৃপাতে এবং নিজের পৌরুষবলে যখন সেই মণির সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিবে তখন সে কৃতকৃত্য হইবে এবং তাহার সকল প্রকার চাওয়া এক প্রাপ্তিতেই মিটিয়া যাইবে। মা বলেন, "অভাব যেন না থাকে—এই চাওয়াটাই স্বভাব।" সুতরাং চাওয়া যে পরম মঙ্গলময়ী মহাশক্তির মঙ্গলময় ব্যাপার তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আপাততঃ ইহা বিরুদ্ধরূপে প্রতীত হইলেও কখনও কখনও এই চাওয়াই প্রাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। বাস্তবিক পক্ষে যাহার ভিতরে চাওয়া স্পষ্টভাবে জাগে নাই তাহাকে এখনও অনেকটা কালক্ষেপ করিতে হইবে। কারণ চাহিতে না পারিলে চাওয়া শেষ হয় না।

পাঁচ

১ — চূড়ালা ও শিখিধ্বজের উপাখ্যান

এই উপাখ্যানটি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্বাণ প্রকরণের পূর্বার্ধে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে ইহার একটি সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

কথিত আছে, সপ্তম মন্বন্তরের অন্তর্গত চতুর্থ মহাযুগের দ্বাপর যুগে রাজা শিখিধ্বজ মালব দেশের শাসনকর্তারূপে কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনের উন্মেষে সৌরাষ্ট্র রাজার কন্যা অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকা চূড়ালার সহিত তাঁহার বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়। তিনি বুদ্ধিমান, বীর এবং রাজকার্যে নিপুণ ছিলেন এবং প্রজারঞ্জনই তাঁহার জীবনের

মুখ্য ব্রত ছিল। নবপরিণীতা পত্নীর সহিত নানা স্থানে পর্যটন ও আনন্দ বিহারে তিনি বহুদিন অতিবাহিত করেন। শিখিধ্বজ এবং চূড়ালা পরস্পরের প্রতি এত অধিক অনুরক্ত ছিলেন যে লোকসমাজে কথা-প্রসঙ্গে অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অর্ধ-নারীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইত। ঐ সময়ে সৎসঙ্গ এবং ভগবৎ অনুগ্রহ বশতঃ রাজা ও রাজপত্নী উভয়ের চিত্ত আধ্যাত্মিক আলোচনাতে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিত। তন্মধ্যে চূড়ালার হৃদয়ে প্রথমে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল এবং আত্মবিচারের প্রাধান্য প্রকৃষ্টভাবে স্থান লাভ করিয়াছিল। একমাত্র অখণ্ড মহাসত্তা বা সর্বব্যাপিনী চিৎশক্তিই সমগ্র বিশ্বলীলার মূল ভিত্তিস্বরূপ—এই বিষয়ে চূড়ালা স্থির জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই জ্ঞান পরোক্ষ অবস্থা হইতে অপরোক্ষ আত্মানুভূতিতে পরিণত হয়। তাহার ফলে চূড়ালা সুদীর্ঘ সংসার স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া চির শান্তিময় আত্মস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করিতে সমর্থ হন। বলা বাহুল্য, রাজা শিখিধ্বজ এই সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে চূড়ালার যে নিত্যতৃপ্ত এবং আত্মারাম অবস্থার উদয় হইয়াছিল তাহার প্রভাবে তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি ত দূরের কথা বাহ্য দেহ পর্যন্ত অলৌকিক শোভা ও দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ভিতরে প্রশান্ত প্রেম ও রাগ-দ্বেষের অভাব ক্রিয়াশীল থাকাতে চূড়ালার মুখ-শ্রীতে এমন একটি অনিন্দ্য সুষমার আবির্ভাব হইয়াছিল যাহা দর্শন করিয়া রাজা শিখিধ্বজ পর্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। একদিন তিনি চূড়ালাকে একান্তে ডাকিয়া তাঁহার এই অভিনব অনুপম শোভার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। চূড়ালা স্পষ্টভাবে রাজাকে বুঝাইয়া দেন যে বাহ্য কোন কারণে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের উদয় হয় নাই ও হইতে পারে না। জীবনের খণ্ড ভাব পরিত্যক্ত হইলে যে অখণ্ড সত্তা অন্তর ও বাহির সর্বত্র সমভাবে প্রভাবিত করে তাহা হইতেই এই অপূর্ব শ্রী উদ্ভূত হইয়াছে।

শিখিধ্বজ কিঞ্চিৎ বহির্মুখ এবং যুক্তি-প্রধান ছিলেন, তাই তিনি চূড়ালার সিদ্ধান্ত পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কারণ তিনি ভাবিলেন নিরাকার আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে স্থূল ও সাকার দেহে শ্রী-বৃদ্ধি কি প্রকারে হইবে! তিনি উহা বিশ্বাস ত করিলেনই না; উপরন্তু চূড়ালার প্রতি উপহাস-পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল চূড়ালা ভাবে উন্মত্ত এবং যুক্তাযুক্তবোধহীন। সুতরাং তাঁহার বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছু নহে। চূড়ালা যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গভীর দেশে নিহিত এবং উহার রহস্য স্থূলদর্শী রাজা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি স্বামীর সহিত আপাততঃ ঐ বিষয়ে অর্থাৎ আত্মদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বিরত হইলেন।

ঐ সময়ে জ্ঞানের উদয়ে চূড়ালা এমন একটি সুশান্ত ও সুসমাহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে অবস্থায় সাধারণতঃ অভাবমূলক ইচ্ছা উদিত হয় না। কিন্তু স্বভাবের লীলাতে নিত্যতৃপ্ত অবস্থাতেও খেয়ালের মত ইচ্ছার উদয় হইতে পারে। চূড়ালারও তাহাই হইয়াছিল। আকাশ-গমনের অহেতুক ইচ্ছা তখন তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। তখন তিনি ঐশ্চর্য-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া কিছু সময়ের জন্য নির্জনে গমন করেন ও আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধি প্রাণের ক্রিয়াদি সম্পাদন করেন। এইভাবে যথাবিধি প্রাণ ক্রিয়ার অভ্যাসের ফলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন—অনন্ত যোগসিদ্ধি অত্যল্প কালের মধ্যে তাঁহার আয়ত্ত হয়। সাধারণতঃ খণ্ডসিদ্ধির মূলে দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য প্রভৃতির প্রাধান্য থাকে, কিন্তু চূড়ালা আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে সিদ্ধিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য, একসঙ্গে বহু দেহ রচনা ও তাহাতে অনুপ্রবেশ অর্থাৎ কায়ব্যূহ, পরকায়া-প্রবেশ সবই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল।

চূড়ালার মহাজ্ঞানের প্রাপ্তি এবং এই প্রকার যোগৈশ্বর্য লাভ রাজা শিখিধ্বজ জানিতেন না। চূড়ালা জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা সর্বদাই স্বামীকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তখনও শিখিধ্বজের জাগিবার সময় হয় নাই বলিয়া সকল উপদেশ অরণ্যে রোদনের ন্যায় তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইত। তিনি নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করিতেন এবং স্বীয় পত্নী চূড়ালাকে মূর্খ বালিকা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

দীর্ঘকাল মোহে মগ্ন থাকিবার পর ভোগ-বাসনা ও অন্তঃস্থ কষায় পরিপক্ক হওয়ার দরুণ আপনা আপনি শিখিধ্বজের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তখন বৈরাগ্যের তীব্রতা এত অধিক হয় যে তিনি কালবিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। চূড়ালাকে বলাতে এই বিষয়ে চূড়ালা তাঁহাকে যৌবন অবস্থায় নিজের কর্তব্য এবং রাজধর্ম-পালন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু শিখিধ্বজ চূড়ালার নিষেধ-বাক্যে দৃক্‌পাত না করিয়া একদিন গভীর রাত্রে সুপ্তাবস্থায় অঙ্কশায়িনী চূড়ালাকে পরিত্যাগ করিয়া পরিবারের সুখ-সম্পদ সহ রাজ্য ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যান। নানাদেশ ভ্রমণ করিবার পর তিনি দক্ষিণ দেশে মন্দর পর্বতের তটভূমিতে গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া তাপসবেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

ঐ সময় কঠোর তপস্যাতে তাঁহার সমস্ত সময় ব্যতীত হইত। সন্ধ্যা-বন্দন, জপানুষ্ঠান, পুষ্প-চয়ন, স্নান, দেবার্চন, কন্দমূল-ভোজন ও পুনর্বার জপাদির অনুষ্ঠান, এইভাবে তাঁহার দিনচর্যা নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

এদিকে চূড়ালা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া যখন দেখিতে পাইলেন যে শিখিধ্বজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি উন্মনা

হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি যোগসিদ্ধা ছিলেন, তাই ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথে নির্গত হইয়া আকাশ-মার্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আকাশে ভ্রমণ কালে আকাশ মণ্ডল হইতেই দেখিতে পাইলেন তাঁহার স্বামী গভীর বন মধ্যে একখানি খড়গ ধারণ করিয়া উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি আকাশ-মণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহার নিকট নিজের পরিচয় দিবেন। কিন্তু দেখিলেন, নিয়তির খেলা অন্য প্রকার—তিনি ভবিষ্যতের চিত্র স্পষ্টভাবে অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন, বুঝিতে পারিলেন এখনও রাজার সঙ্গে মিলিত হইবার তাঁহার সময় হয় নাই। সে সময়ের এখনও কতকটা বাকী আছে। নিয়তির বিরুদ্ধে চলা সঙ্গত নহে মনে করিয়া তিনি তখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পতির প্রতিনিধিরূপে রাজকর্মচারীদের সহায়তায় রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ কাটিয়া গেল। তখন শিখিধ্বজ এবং তাঁহার বাসনাদি পক্ক হইয়াছে। চূড়ালা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আত্ম-কার্যের ইহাই শুভ অবসর। পতিকে আত্মজ্ঞান প্রদান করা— ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এতদিন তাহার অবসর উপস্থিত হয় নাই। তাই বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন সময় উপস্থিত। ইহার পর যোগসিদ্ধি বলে চূড়ালা পুনরায় আকাশ-মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে মন্দরাচল গমন করিলেন এবং শিখিধ্বজের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন পত্নীরূপে এই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কার্যসিদ্ধি হইবে না। কারণ তিনি জ্ঞানপূর্ণ বাক্য বলিলেও পতির নিকট উহা পত্নীর সাধারণ বাক্যরূপে উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য তিনি যোগবলে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ, একটি তপস্বী ব্রাহ্মণ বালকের রূপ গ্রহণ করিলেন এবং ঐ তেজোময় দীপ্তরূপ লইয়া তপস্বী শিখিধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শিখিধ্বজ চূড়ালাকে দেখিয়া নিজের পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না, একটি বাল-ব্রহ্মচারিরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং সমুচিত সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন। তখন চূড়ালা সেখানে উপবেশন করিয়া তাঁহার তপঃ সাধন কি ভাবে চলিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শিখিধ্বজ বাল-ব্রহ্মচারীর রূপ ও তেজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "একদা ব্রহ্মকুমার নারদ মুনি সুমেরু গুহাতে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ধ্যানান্তে সমীপস্থ গঙ্গাবক্ষে জলকেলিপরায়ণ অনেকগুলি নগ্নকায় সুন্দরী অপ্সরাকে দেখিতে পান। দর্শন মাত্র তাহাদিগের প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে ও তাহার ফলে চিত্ত বিকৃত ও প্রাণ ক্ষুব্ধ হইয়া বিন্দু স্খলিত হয়। নারদ বীতরাগ, নিষ্কাম ও জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন ইহা সত্য, তথাপি প্রবলতর প্রারব্ধের প্রভাবে তাঁহার বিবেকভ্রংশ হইয়াছিল।" এই জাতীয় ঘটনা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে তাহা চূড়ালা রাজাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার নিকট মানব-দেহ-সংশ্লিষ্ট নাড়ী-চক্রের বিজ্ঞান আলোচনা ও স্বভাব-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন। তিনি আরও বলিলেন—"নারদ মুনি ঐ বীর্য নিকটবর্তী এক স্ফটিক-কুম্ভে স্থাপন করেন। যথা সময়ে উহা গর্ভ রূপে পরিণত হয় ও সর্বাঙ্গপূর্ণ হইয়া পুত্র-সন্তানরূপে কুম্ভ হইতে নির্গত বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মা বালকের নাম রাখেন 'কুম্ভ'।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমিই সেই কুম্ভ। আমি পিতার সঙ্গে ব্রহ্মলোকে বাস করি। বেদ-চতুষ্টয় আমার সুহৃৎ, সরস্বতী আমার মাতা এবং গায়ত্রী আমার মাতৃস্বসা। আমি স্বেচ্ছাক্রমে অবাধে সমস্ত জগতে বিচরণ করি। ইহা লীলামাত্র, কারণ আমি কোন প্রয়োজনের বশীভূত নহি। আমার চরণ ভূমিস্পর্শ করে না ও পৃথিবীর ধূলিতে মলিন হয় না। আমার দেহ সর্বদা গ্লানিশূন্য থাকে।"

শিখিধ্বজও তাঁহাকে নিজের সকল ইতিহাস জানাইলেন ও নিজের অবস্থার উপযোগী কর্তব্য-উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তখন কুম্ভ রাজার নিকট ক্রিয়া অপেক্ষা জ্ঞানের আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বুঝাইলেন, জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ—জ্ঞানের অভাবে ক্রিয়ার উপাদেয়তা স্বীকার্য। তাহার পর বাসনা তত্ত্ব বুঝাইলেন। শিখিধ্বজ ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থনা জানাইলে কুম্ভ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। রাজা বুঝিতে পারিলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সর্বত্যাগ আবশ্যক—এমন কি তপস্যাও বর্জন করিতে হইবে। পূর্বে তিনি রাজ্য, গৃহ, দেশ, স্ত্রী সব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন রাজ্যের পরিবর্তে বনে বাস করিতেছেন। এবার বনও ত্যাগ করিলেন। তিনি তপস্যার সকল উপকরণই আহুতি দিলেন। কুম্ভ তাঁহাকে বুঝাইলেন, বস্তু-ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নহে। কারণ বস্তু ত কাহারও নিজের নহে। বস্তুর বাসনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। এবার শিখিধ্বজকে খাঁটি ভাবে বাসনা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। কুম্ভ রাজার মুখের দিকে মৌন ভাবে তাকাইয়া রহিলেন। রাজা নিজের সমস্ত সামগ্রী দগ্ধ করিলেন—সামগ্রীর মধ্যে ছিল জপের মালা, বসিবার আসন অর্থাৎ মৃগচর্ম এবং কমণ্ডলু। জপমালা ও মৃগাজিন অগ্নিতে অর্পণ করিলেন এবং কমণ্ডলু একটি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ভোজন পাত্রাদিও পরিহার করিলেন। নিষ্ক্রিয় হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রিয়াযোগ্য সকল পদার্থই বিসর্জন করিলেন। তখন দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রবল হইল—মনে করিলেন ভৃগু-পতন দ্বারা দেহও বিসর্জন করিবেন।

কুম্ভ তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"না, দেহত্যাগ করিতে হইবে না। চিত্ত ত্যাগ কর। চিত্তত্যাগই সর্বত্যাগ, দেহত্যাগ সর্বত্যাগ নহে। মনই সকলের বীজ—দেহেরও বীজ। মনকে ত্যাগ কর। মনকে ত্যাগ করিলেই সর্বত্যাগ হইবে। সর্বত্যাগ হইলে সর্বপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ সর্বত্যাগের

ফলে আত্মপ্রসাদ ও তজ্জন্য জ্ঞানের উদয় হয়। যে কিছু চায় না ও কিছু নেয় না, তাহাকেই সমস্ত দেওয়া হয়। সর্বত্যাগ নিষ্পন্ন হইলে ত্যাগের অভিমানও ত্যাগ করিতে হয়। বাসনাই চিত্তের স্বরূপ—বাসনার ত্যাগই চিত্তত্যাগ বা সর্বত্যাগ। চিত্তের বীজ অহঙ্কার—'আমি কে' এই আত্মবিচার দ্বারা ইহা নষ্ট হয়। কারণ বিচারে জানা যায় যে অহঙ্কারকার্য কোন দৃশ্য পদার্থই আমি নহি। আত্মা স্বচ্ছ চিন্মাত্র। অহঙ্কার উহার মল। অহঙ্কার হইতে মমতা জন্মে। ইহারও ত্যাগ চাই। চিৎ চেত্যোন্মুখ হইলেই দুঃখের কারণ হয়— চেত্যের উপশমই শান্তি। চেত্যভাবের কারণ পদার্থসত্তার বোধ। কিন্তু এই বোধ ভ্রান্তি মাত্র। কারণ একমাত্র চিদাত্মা ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই। ব্রহ্ম বস্তুতঃ কারণ নন, কার্য নন, কর্তাও নন। আত্মা শুদ্ধ ও মুক্ত— বন্ধ মোক্ষ কল্পনামূলক।

শিখিধ্বজ ধীরে ধীরে সব বুঝিতে পারিলেন— বুঝিলেন ব্রহ্ম কর্তা নন, তাই কার্যরূপে জগৎও বস্তুতঃ নাই— অহন্তাদিও নাই। তখন তিনি "নমো মহ্যম্" বলিয়া নিজেকে নিজে প্রণাম করিলেন। 'চেত্য নাই' বোধের সঙ্গে মুহূর্তের জন্য তাঁহার বিভ্রান্তি হইল। এটি নির্বিকল্পক অবস্থার উন্মেষ। কুম্ভ তাঁহাকে ঐ অবস্থায় জাগাইলেন। তখন স্বভাবতঃ শিখিধ্বজের মনে প্রশ্ন উঠিল— এই পরম শান্তপদে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপে ত্রিপুটীর উদয় হয় কেন? বিশ্ব স্ফুরণ হয় কেন? কুম্ভ তাঁহাকে বুঝাইলেন—"অহন্তা ও ইদন্তা স্বভাব হইতে উঠে— বস্তুতঃ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন।" এই ভাবে ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সঙ্গে রাজা কৃতকৃত্যতা লাভ করেন। তখন রাজার মনে প্রশ্ন উঠিল— "এই অমররূপ আত্মপদ আমি পূর্বে প্রাপ্ত হইলাম না কেন?" কুম্ভ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে ভোগেচ্ছার অভাবে মন শান্ত হইলেও সকল ইন্দ্রিয়বর্গের কষায় পক্ক হইলে নির্মল গুরুবাক্য চিত্তে বিশ্রান্তি লাভ করে। কষায় পাক হওয়ার পরই গুরুবাক্য তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার অজ্ঞান নাশ করিয়াছে ও তাঁহার চিত্ত নষ্ট করিয়াছে। হৃদয়ে মনের সত্তা

থাকা পর্যন্ত অজ্ঞান যায় না। ইহার পর কুম্ভ বুঝাইলেন যে জীবন্মুক্তগণ চিত্তহীন হইলেও সত্ত্বহীন হন না বলিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতে পারেন। কারণ বাসনা দুই প্রকার—ঘন বাসনা ও তরল বাসনা। ঘন বাসনাই মলিন বলিয়া পুনর্জন্মের হেতু। এই বাসনাই চিত্ত। জীবন্মুক্তের ইহা থাকে না, কিন্তু তরল বা শুদ্ধ বাসনা থাকে। তাহার নাম সত্ত্ব। তাহার দ্বারা বিহার করা চলে। মূঢ় চিত্তই চিত্ত, প্রবুদ্ধ চিত্ত সত্ত্ব।

ইহার পর কুম্ভ অন্তর্হিত হইলেন ও চূড়ালা-রূপ ধারণ করিয়া রাজধানীতে গমনপূর্বক পূর্ববৎ রাজকার্য পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু সময় পরে তিনি পুনর্বার যোগবলে কুম্ভ শরীর ধারণ করিয়া শিখিধ্বজের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে রাজা সমাধিতে মগ্ন রহিয়াছেন। তখন পরকায়া-প্রবেশের প্রক্রিয়াতে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া উঠাইলেন। নিজেও পুনরায় কুম্ভ-রূপ ধারণ করিয়া নিকটেই একস্থানে সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে ঐ গানের স্বর শ্রবণ করিয়া ব্যুত্থিত রাজা শিখিধ্বজের মধ্যে অহঙ্কারের উদয় ও পূর্বস্মৃতির স্ফুরণ হইল—তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়া কুম্ভকে দেখিতে পাইলেন। তখন উভয়ে নানা প্রকার বার্তালাপ হইল।

এই পর্যন্ত রাজার জীবনের কৃতকৃত্যতার ইতিহাস। ইহার পর কুম্ভ ও রাজা কিছুদিন এক সঙ্গে অতিবাহিত করিলেন ও নানাস্থানে পর্যটন করিলেন। ইত্যবসরে কৌশলপূর্বক কুম্ভ রাজার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন যে কোন কারণবশতঃ দুর্বাসার শাপে তিনি রাত্রি বেলা স্ত্রী-মূর্তিতে পরিণত হন ও দিনে বাল-ব্রহ্মচারী কুম্ভরূপেই অবস্থান করেন। ইহার পর কুম্ভের প্রেরণায় মহেন্দ্র পর্বতে উভয়ের বিবাহ হইল ও পতি-পত্নীভাবে উভয়ে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। এইভাবে রাজার অনাসক্তির

দৃঢ়তা পরীক্ষিত হইল। পরে ক্রোধের পরীক্ষা হইল। কুম্ভ মদনিকারূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া যোগ-সঙ্কল্পরচিত কোন পরপুরুষের সহিত গাঢ়ভাবে মিলিত হওয়ার অভিনয় শিখিধ্বজকে প্রদর্শন করিলেন। মনে কোন বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয় কিনা তাহাই পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল। দেখা গেল শিখিধ্বজের চিত্তে কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন হইল না।

এইভাবে রাগ দ্বেষের পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া চূড়ালা বুঝিতে পারিলেন—

নৈনং হরন্তি তে ভোগা ন মহত্যোঽপি সিদ্ধয়ঃ।
ন সুখানি ন দুঃখানি নাপদো ন চ সম্পদঃ।।

তখন তিনি তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বুঝাইলেন তিনিই যোগবলে কুম্ভাদি দেহ রচনা করিয়া তাঁহাকে যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছেন ও তাঁহার দৃঢ়তার পরীক্ষা নিয়াছেন। ধ্যানযোগে শিখিধ্বজ নিজেও সব অতীত বৃত্তান্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি চূড়ালাকে গুরুরূপে চিনিয়া "গুরুর্মে নমোঽস্তু তে" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সত্যলাভের পর শিখিধ্বজের অবস্থা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

ন তুষ্টোঽস্মি ন খিন্নোঽস্মি নায়মস্মি নচেতরঃ।
ন স্থূলোঽস্মি ন সূক্ষ্মোঽস্মি সত্যমস্মি চ সুন্দরি।।

ইহা রাজার নিজ উক্তি। চূড়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজন্, তোমার এখন কি ভাল লাগে? তুমি কি আকাঙ্ক্ষা কর?" রাজা বলিলেন, "আমি ভাল মন্দ বুঝি না, যাহা বলিবে তাহা করিব। চিত্ত হইতে ইষ্ট-অনিষ্ট ভাব দূর হইয়াছে। যখন যাহা আসে তাহাই ভাল বোধ হয়। স্তুতি নাই, নিন্দাও নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

তার পর উত্থিত হইয়া চূড়ালা সপ্ত সমুদ্রের জলে পূর্ণ রত্নকুম্ভ রাজ্যাভিষেকের জন্য সঙ্কল্প করিয়া ঐ মঙ্গল কুম্ভ দ্বারা পূর্বমুখে স্থিত রাজাকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সুবর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাকে বলিলেন, "এখন তোমাকে মুনি-যোগ্য শান্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া অষ্ট লোকপালের তেজঃ ধারণ করিতে হইবে।" রাজা উহা স্বীকার করিলেন। মহারাজ তখন চূড়ালাকে স্নান করাইয়া মহারাণীর পদে অভিষিক্ত করিয়া পট্টমহিষী করিলেন। রাজার আদেশে চূড়ালা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ক্ষণমধ্যে বিরাট ও বিপুল সৈন্য রচনা করিলেন। তারপর উভয়ে আড়ম্বরের সহিত মহেন্দ্র পর্বত হইতে স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন। সাত দিন নগরোৎসব করিয়া শিখিধ্বজ দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজকার্য সম্পাদন করিয়া অন্তিম অবস্থায় মোক্ষ লাভ করেন।

২ — দেহ থাকা কি?

মা বলেন, "জ্ঞানে আর সংশয়-সংসার থাকে না, দেহও থাকে না।" সংসার না থাকিলে দেহ থাকিল এ কথা বলা চলে না। সংশয়ই সংসার। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্যন্ত সংশয় ছিন্ন হয় না। সংশয় ছিন্ন না হইলে কর্মক্ষয় হইয়াছে একথা বলা চলে না। বস্তুতঃ গ্রন্থিভেদ, সংশয়-ছেদন এবং সর্বকর্ম-ক্ষয় এক অবস্থার বিভিন্ন দিক্ মাত্র। পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলেই এই অবস্থার উদয় হয়। তখন সংসার থাকে না, দেহও থাকে না—এমন কি থাকে না যে সে বোধও থাকে না। অজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেহে দেহ থাকা না থাকার প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু জ্ঞানীর স্বরূপদৃষ্টিতে এই প্রশ্নের কোন সার্থকতা নাই। মা তাঁহার অতুলনীয় ভাষাতে বুঝাইয়াছেন, "দেও, দেও—এই অভাবটাই ত দেহ।" সুতরাং দেহ থাকা মানে অভাব-বোধ থাকা। অভাবের বোধ থাকিলেই উহার নিবৃত্তিও আবশ্যক হয়।

যেখানে তাহা নাই সেখানে অভাব-নিবৃত্তির জন্য কর্মও নাই। সেটি সংসারের অতীত অবস্থা। উহা সংশয়হীন পরম স্থিতি—উহাই স্বভাব বা স্বরূপ। এদিককার দ্বন্দ্ব-কোলাহল সেখানে পৌঁছিতে পারে না, সেটি নিত্য নিরঞ্জন অবস্থা। তাই মা বলেন, "একেবারে ধোয়া-মোছা— নাইও নাই।" প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি নিবৃত্তি মাত্র, প্রপঞ্চ-মিথ্যা মিথ্যা মাত্র। কিন্তু যেখানে নিবৃত্তিও নিবৃত্ত হয় এবং মিথ্যাও মিথ্যা হইয়া যায়, সেখানে কিছু বলিবার থাকে না—তাহারই নাম 'ধোয়া মোছা' অবস্থা, সেখানে নাইও থাকে না, নাই নাই হইয়া যায়। প্রথমে negation তাহার পর negation এর negation মানবীয় ভাষাতে ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্টভাবে চরম তত্ত্বের বর্ণনা করা চলে না। সুতরাং শিখিধ্বজ যে চূড়ালার উপদেশে জ্ঞানের পর সংসার করিয়াছিলেন বলা হয় তাহা জাগতিক দৃষ্টিতে। স্বরূপদৃষ্টিতে এই ভাবের কথা উঠিতেই পারে না।

৩ — ধারা, ধরা ও অধরা

মা বলেন— "ধারা থাকলেই ধরা আছে, আর ধরা থাকলেই অধরাও আছে।" ধরিতে হইলেই কোন না কোন পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। যদিও অনুপায়-মার্গের কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ঐ স্থলেও অনুপায়কেও উপায়রূপে ধরা হইয়াছে। অনুপায় শব্দে উপায়ের অভাব বুঝায় না। 'অতি ক্ষুদ্র উপায়', ইহাই অনুপায় শব্দের তাৎপর্য। সেই জন্য অনুপায়কেও মার্গরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পদ্ধতি অথবা মার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে এক সময় তাঁহার কৃপার উদয় হয়। তখন তিনি হঠাৎ ধরা দিয়া বসেন। ধারা অনুসরণ করিয়া কতটা সময় এবং কিভাবে চলিতে হইবে তাহা বলা কঠিন, কারণ সকলের অধিকার সমান নহে। তথাপি

ইহা সত্য যে গম্যস্থানে পৌঁছিতে হইলে মানবের দিক্ হইতে ধারা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য তাঁহার অহেতুক কৃপার ফলে ধারা আশ্রয় না করিলেও আশ্রয়ের ফলপ্রাপ্তি না ঘটিতে পারে এমন কথা নহে। কিন্তু এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। জীবের কর্তব্য, কোন একটি মার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চলা। লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন না হয়, ইহাই তাহার প্রথম ধ্যেয় বিষয়। লক্ষ্য স্থির থাকিলে ধরা অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ ধরা বলিয়া কিছু নাই—একমাত্র অধরাই সর্বাতীতভাবে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু সাধক যখন ধারা ধরিয়া চলিতে থাকে তখন সেই বিশ্বাতীত অধরাই কৃপাপরবশ হইয়া নামিয়া আসেন এবং দুর্বল সাধকের নিকট নিজে হইতে ধরা দিয়া বসেন। সাধক যখন কোনও প্রশ্ন করে তখন কোন না কোন একটি ধারা আশ্রয় করিয়াই করে। কারণ প্রত্যেক মনুষ্যেরই একটি দৃষ্টিকোণ আছে। যেখান হইতে যে প্রশ্ন করে সেখান হইতেই তাহার প্রশ্নের সমাধান হইয়া থাকে। এইজন্যই জগতে নানা মতের উদয় হইয়াছে—"নাহসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। বস্তুতঃ কোনটিকে ভুল বলা চলে না। কারণ প্রত্যেকটি মতই একটি না একটি ধারা হইতে উদ্ভূত। সেইজন্য সব ধারাই আপেক্ষিকভাবে সত্য। একটি ধারা যে প্রকার সত্য, অপর ধারাটিও ঠিক সেই প্রকার সত্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে সকল ধারার মূলে সেই একই অধরা রহিয়াছে। বস্তুতঃ অধরাই ধরা দেয়—ধরা হয়ে, ইষ্ট হয়ে বিভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। ধরা ও অধরা একই মহাসত্তার দুইটি দিক্। এক দিকে গণ্ডীর আবেষ্টন আছে, ভাবের সীমারেখা আছে ও বর্ণের ভঙ্গিমা আছে। অপরদিকে গণ্ডী নাই, তাই নিত্যমুক্ত, ভাবাতীত তাই অসীম, বর্ণ নাই তাই চির-স্বচ্ছ। এই দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ প্রতীত হইলেও দুই-ই এক। আবার এমন স্থিতিও আছে, মা বলেন, "যেখানে ধরা ও অধরার প্রশ্ন নাই সে-ই", অর্থাৎ যেখানে ধারা আছে সেখানে ধরা আছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে অথচ অসঙ্গভাবে অধরাও আছে, এবং যেখানে ধারার

প্রশ্ন নাই সেখানে ধরা কোথায়? অধরাই বা কোথায়? সে প্রশ্নই বা কোথায়? কিছুই নাই, অথচ সবই আছে। থাকা না থাকার বিরোধ যেখানে নাই তাহাই তৎ, তাহাই সে-ই। সেখানে মত মতান্তরের স্থান নাই।

ছয় (ক)

১ — ধ্যান করা আর ধ্যান হওয়া

মা বলেন, "ধ্যান পেলে ধ্যান হয়, ধ্যান ত হওয়া চাই।" ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে স্বাভাবিকভাবে ধ্যানস্থ হওয়ার একটি দিক্ আছে। ঐ অবস্থার উদয় হইলে চেষ্টা করিয়া ধ্যান করিতে হয় না, চিত্ত আপনা হইতেই ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থাকে মা 'ধ্যান পাওয়া' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের যখন ঘুম পায় তখন যেমন চেষ্টা করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে আপন আপন বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে হয় না, ঐগুলি স্বভাবের নিয়মেই আপনা আপনি অন্তর্মুখ হইয়া পড়ে, সেইরূপ আপনা আপনি ধ্যান হওয়ার একটি অবস্থা আছে। ঘুম না পাইলেও চেষ্টা করিয়া ঘুমান না যায় এমন নহে, তবে তাহা সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। ঘুমাইতে চেষ্টা করিবার অভ্যাস করিতে করিতে পরে বিনা চেষ্টাতেই ঘুমের ভাব আসিয়া পড়ে। ধ্যান সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই জানিতে হইবে। ধ্যান পাওয়ার অবস্থা না হইলে প্রকৃত ধ্যান হয় না ইহা সত্য, কিন্তু প্রথম হইতেই এ অবস্থা পাওয়া যাইতে পারে না বলিয়া অস্বাভাবিক হইলেও কৃত্রিম উপায়ে ধ্যানের জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

যোগসূত্রকার ভগবান পতঞ্জলি সাধারণতঃ সমাধিযোগ আর ক্রিয়াযোগ ভেদে যোগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। যে সাধকের চিত্ত ব্যুত্থিত অর্থাৎ বহির্মুখ, তাহার পক্ষে ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যাহার চিত্ত অন্তর্মুখ অথবা সমাধিপ্রবণ, একমাত্র তাহারই জন্য সমাধি-যোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পতঞ্জলি ক্রিয়াযোগ বলিতে তপস্যা, স্বাধ্যায় অর্থাৎ জপ ও সৎগ্রন্থপাঠ এবং ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থাৎ ভজন, এই তিনটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। এই তিনটি সাধন সমভাবেই হউক অথবা গুণপ্রধান-ভাবেই হউক অনুষ্ঠিত হইলে ক্রিয়াযোগ নিষ্পন্ন হয়। চিত্তের প্রকৃতি অনুসারে কাহারও ক্রিয়া তপস্যা-প্রধান হয়, কিন্তু অন্য দুইটি সাধন-অঙ্গও তাহাতে থাকে। কাহারও ক্রিয়া স্বাধ্যায়-প্রধান হয় অথবা ভজন-প্রধান হয়। কিন্তু তাহাতেও অপ্রধানভাবে অপর দুইটি অঙ্গের সন্নিবেশ থাকে। আবার ব্যক্তিবিশেষে তিনটি অঙ্গই সমভাবেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। দীর্ঘকাল যথাবিধি আপন আপন গুরুনির্দিষ্ট প্রণালীতে ক্রিয়াযোগের পথে অগ্রসর হইতে পারিলে চিত্ত উহার প্রভাবে ক্রমশঃ ব্যুত্থিতভাব ত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করে এবং অন্তর্মুখ হইতে থাকে। তখন তাহার পক্ষে সমাধিযোগের অভ্যাস সম্ভবপর হয়। সমাধিযোগের অভ্যাসে ধ্যানের প্রাধান্য থাকে। চিত্ত চঞ্চল থাকা পর্যন্ত অন্তর্মুখভাব থাকে না বলিয়া প্রকৃত ধ্যান মার্গে অগ্রসর হইতে পারা যায় না। কিন্তু তথাপি সাধককে ধ্যানের যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য কোন না কোন প্রকার ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাও যোগ, যদিও সাক্ষাৎভাবে নহে, কিন্তু পরম্পরাভাবে।

ক্রিয়াযোগের ফলে চিত্ত একদিকে চঞ্চলতা পরিহার করে ও অন্তর্মুখ হয়, যাহাতে অনায়াসে প্রজ্ঞা অথবা জ্ঞানের উদয় হওয়া সম্ভবপর হয়। কিন্তু ক্রিয়াযোগের মুখ্য ফল চিত্তস্থিত অজ্ঞানাদি যাবতীয় ক্লেশের তনুত্ব

অথবা সূক্ষ্মতা সম্পাদন। সাধকের চিত্তে অনন্ত ক্লেশ সংস্কার অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। ক্লেশ অনন্ত হইলেও বুঝিবার ও বুঝাইবার সৌকর্যের জন্য উহাদিগকে প্রধান পাঁচ বর্গে বিভক্ত করা হয়। উহাদিগের নাম— অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অজ্ঞানমূলক যাবতীয় সংস্কারই কোন না কোন প্রকারে এই পঞ্চক্লেশের অন্তর্গত। এই সকল ক্লেশ কখনও কখনও অভিব্যক্ত অবস্থায় বৃত্তিরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে, আবার কখনও কখনও অব্যক্তভাবে সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। অব্যক্ত ক্লেশকে সহসা আমরা ক্লেশ বলিয়া চিনিতে পারি না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত উহারা ক্রিয়া-বিশেষের প্রভাবে ক্ষীণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদের বল ও সত্তা পূর্ণভাবেই বিদ্যমান থাকে। এই জন্য অব্যক্ত ক্লেশকে সুপ্ত অথবা বিচ্ছিন্ন মনে করা যাইতে পারে, কিংবা সাধন-প্রভাবে ক্ষীণ হইয়া যায় বলিয়া তনুও বলা যাইতে পারে।

পূর্বে যে ক্রিয়াযোগের বর্ণনা করা হইল উহা ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হইলে ক্লেশ বা সংস্কার সকল তনু অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উহাদের বিক্ষেপ শক্তি বা আবরণ শক্তি বলহীন হইয়া ক্ষীণভাব ধারণ করে। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে ক্লেশ-ক্ষয় সম্ভব নহে। অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা হউক তাহা দ্বারা ক্লেশকে অভিভূত করিয়া রাখা যায়, যাহার ফলে ক্লেশ উন্মুখ হইয়া তৎকালে ক্রিয়া করিতে পারে না। কিন্তু ক্লেশের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব পূর্বে যেমন ছিল তখনও তেমনই থাকে। কোন উত্তেজনা বা উদ্দীপক কারণের আবির্ভাব হইলেই ঐ সকল সুপ্ত ক্লেশ প্রবলবেগে উদ্দামরূপ ধারণ করে এবং মানুষকে অনেক সময় পদস্খলন করিতে বাধ্য করে। এই সকল সুপ্ত ক্লেশ অতি ভয়ানক, কারণ তাহাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না, অথচ তীব্রতা ও বিরুদ্ধ ভাব প্রবল থাকে। ক্রিয়াযোগের এমন সামর্থ্য আছে যে উহা ইহাদিগকে ক্ষীণবীর্য করিয়া

রাখিতে পারে। ইহাদের তেজ তখন মন্দীভূত হয়, তবে একেবারে বিনষ্ট হয় না। কারণ ক্রিয়ার প্রভাবে সংস্কার নষ্ট হয় না। সংস্কারনাশের একমাত্র উপায় জ্ঞানরূপ অগ্নি। তবে ক্রিয়া জ্ঞানের উদ্বোধক বলিয়া পরম্পরাতে উহার কারণ, ইহা সত্য।

ক্রিয়াযোগ যে কোন প্রকারের হউক না কেন উহার দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ ধ্যানোন্মুখ হয়। যাহার চিত্ত প্রথম হইতেই অন্তর্মুখ রহিয়াছে তাহার জন্য ক্রিয়াযোগের ততটা আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু যাহারা প্রথমে সাধন-পথে পদার্পণ করে তাহাদিগের পক্ষে যে কোন ধারা অবলম্বন করিয়াই হউক না কেন ক্রিয়া-মার্গ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়। ধ্যানের উন্মুখভাব চিত্তে জাগ্রত হইলে চিত্ত বিনা চেষ্টাতেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ ধ্যানের গভীরতর স্তরে মগ্ন হইতে সমর্থ হয়। চঞ্চল চিত্তে চেষ্টা করিয়া ধ্যান করিতে গেলে এইরূপ হয় না। এই জন্যই মা বলিয়াছেন, "ধ্যান পেলে ধ্যান হয়।" ইহাই বাস্তব ধ্যান, ইহাই হওয়া আবশ্যক। প্রথম অভ্যাসীর পক্ষে কৃত্রিম ধ্যানও প্রশংসনীয়। তবে উহা প্রাথমিক অবস্থা। ক্রমশঃ ঐ কৃত্রিম ধ্যান স্বাভাবিক ধ্যানে পরিণত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে কাহারও মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কৃত্রিম ধ্যান এবং স্বাভাবিক ধ্যানের মধ্যে পার্থক্য কি? উভয়ের প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্যের মধ্যে কোন ভেদ আছে কি? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধ্যানের তত্ত্ব আলোচনা আবশ্যক মনে হয়।

অতি প্রাচীন কালে যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তখন বৈদিক ধর্মের অনুগামী ঋষিগণের ন্যায় বহু সংখ্যক বৌদ্ধ যোগীর আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্যান্য সাধন অপেক্ষা তাঁহারা ধ্যানের সাধনাতে অধিকতর মনোনিবেশ করিতেন। কারণ ধ্যানের গূঢ় রহস্য সকল চিত্তের বিশ্লেষণের সহিত তাঁহারা যত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন

তদ্রূপ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমান প্রসঙ্গে অতি প্রাচীন যোগি-সম্প্রদায়ের মত আলোচনা পূর্বক ধ্যান তত্ত্বের উপর আলোক প্রক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

সাধন পথে তিনটি মূল তত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হয়—প্রথমটি শীল, দ্বিতীয়টি সমাধি এবং তৃতীয়টি প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা অথবা নির্মল জ্ঞান লাভই সাধক-জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু চিত্ত সমাহিত না হইলে এবং সংস্কার-মুক্ত না হইলে প্রজ্ঞারূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে যতক্ষণ চিত্ত শীল ও সংযমের অনুশীলনের প্রভাবে সম্যক্ প্রকারে পরিশোধিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা শান্তও হইবে না এবং সমাহিতও হইবে না। এই জন্য আচার্যগণ পঞ্চশীল অথবা দশশীলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যোগিগণের যম নিয়ম ইহারই অন্তর্গত। বর্তমান সময়ে সমাজে যে অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ধারা চলিয়াছে তাহাতে সংযমের আদর্শ দূর হইতে দূরতর হইয়া প্রায় অস্তমিত হইয়া পড়িয়াছে। সংযম ব্রতের ভিতর দিয়াই হউক অথবা প্রকারান্তরেই হউক জীবনকে কতকগুলি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। বন্ধন স্বীকার না করিলে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। একান্তবাস, গুরূপদিষ্ট ক্রম অনুসারে নানা প্রকার সংযমের অনুষ্ঠান এবং উৎকণ্ঠা, ভীতি, প্রলোভনাদি ভাব হইতে বর্জিত হইয়া নিষ্ঠার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে দীর্ঘকাল কোন একটি নির্দিষ্ট সাধনার যথাবিধি অভ্যাস—ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

এই অভ্যাসের মধ্যে দৃষ্টান্তরূপে আমরা দৃষ্টি অভ্যাসকে গ্রহণ করিতেছি। কারণ দৃষ্টি স্থির হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিই স্থির হয় এবং মনও স্থিতিলাভ করে। আচার্যগণ দৃষ্টি স্থির করিবার জন্য অভ্যাসী সাধককে একটি অবলম্বন গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। দৃষ্টির সম্মুখে ঐ অবলম্বনটি স্থিরভাবে রক্ষা করিয়া দৃষ্টির স্থৈর্য অভ্যাস করা আবশ্যক। ঐ

অবলম্বনটি যে কোন বস্তুই হইতে পারে। কারণ 'যথাভিমতধ্যানাদ্ বা'—ইহা যোগ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তবে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার ও যোগ্যতার তারতম্য বশতঃ বিভিন্ন সাধকের পক্ষে ঐ অবলম্বনের তারতম্য হইয়া থাকে। স্থির দৃষ্টিতে ঐ অবলম্বনটি দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। যাঁহারা ত্রাটক অভ্যাস করেন তাঁহাদের সাধনাও এক হিসাবে ইহার অন্তর্গত। দৃষ্টির নিমেষকালে চিত্ত মধ্যে ঐ অবলম্বনের অনুরূপ ছায়াটি যথাযথ ভাবে দেখিবার অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন চক্ষু নিমীলিত করিয়াও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ঐ অবলম্বনটি ঠিক চাক্ষুষ দৃষ্টির মতই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগিগণ এই অবলম্বনকে 'নিমিত্ত' নামে অভিহিত করেন। যখন প্রথম অবস্থায় বাহ্য অবলম্বন দর্শন করিয়া ভিতরে উহার অনুরূপ চিন্তার চেষ্টা করা হয় তখন ঐ অবলম্বনটিকে 'পরিকর্ম নিমিত্ত' বলিয়া বর্ণন করা হয়। সাধারণ সাধক মাত্রেই ইহার সহিত পরিচিত। কিন্তু যখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও পূর্বের ন্যায় ঐ অবলম্বনটিকে চিত্তে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তখন ঐটির পারিভাষিক নাম হয় 'উদ্গ্রহ নিমিত্ত'। যে অবস্থায় উদ্গ্রহ নিমিত্ত আবির্ভূত হয় সেই অবস্থায় বাহ্য অবলম্বনের আবশ্যকতা আর থাকে না। ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা দ্বারা কোন চিত্র গ্রহণ করিলে উহা যেমন ফটোগ্রাফিক প্লেটে স্থায়িভাবে অঙ্কিত হয়, কিন্তু সাধারণ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিত্র তদ্রূপ হয় না, সেই রূপ পরিকর্ম নিমিত্ত ও উদ্গ্রহ নিমিত্তের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পরিকর্ম নিমিত্ত অস্থায়ী অঙ্কণ এবং উদ্গ্রহ নিমিত্ত স্থায়ী অঙ্কণ। উদ্গ্রহ নিমিত্ত লাভ করার পর প্রকৃত ধ্যানের কার্য আরম্ভ হয় বলা চলে। কিন্তু ইহা নিম্নস্তরের ধ্যান তাহাতে সন্দেহ নাই। উদ্গ্রহ নিমিত্তই ধারণা, কারণ এই অবস্থাতেই চিত্রটি চিত্তে বিধৃত হয়, চলিয়া যায় না।

ইহার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উদ্গ্রহ নিমিত্তরূপ অবলম্বনকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লক্ষ্য করিলে এমন এক সময় আসে যখন উহা ভেদ হইয়া যায়।

তখন এক অভূতপূর্ব জ্যোতির্ময় প্রকাশ আবির্ভূত হয়। ইহার পারিভাষিক নাম 'প্রতিভাগ নিমিত্ত'। মনোময় ক্ষেত্রে এই অন্তর্নিহিত জ্যোতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের পথ খুলিয়া যায়। চিত্তে যে সকল দোষ ও অন্তরায় বিদ্যমান থাকিয়া চিত্তকে একাগ্রতা লাভ করিতে বাধা প্রদান করে ঐ সকল অন্তরায় এই প্রকাশের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হতবল হইয়া যায়। এগুলি যে তখনই ধ্বংস হয় এমন নহে, কিন্তু উহারা উত্থানশক্তি-রহিত হয়। যোগিগণ এই সকল অন্তরায়কে বুঝিবার সুবিধার জন্য পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

ঐ প্রকাশের উদয়ের পর প্রকৃত ধ্যানের অপেক্ষাকৃত উচ্চ অবস্থার উদয় হয়। ইহার নাম 'উপচার ধ্যান'। ইহাও ধ্যানের পূর্ণত্ব নহে। কারণ ধ্যানের পূর্ণ অবস্থা হইলে একাগ্রতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং ক্ষণমাত্রের জন্যও যদি একাগ্রতা লাভ হয় তাহা হইলে অনন্তকালের জন্য চিত্ত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ লৌকিক চিত্ত দিব্য চিত্তে পরিণত হইবে। চিত্তের যে সহজাত অন্তরায়ের কথা বলা হইল তাহা এখানে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা অনাবশ্যক। তবে ইহা সত্য যে ধ্যানের এক এক অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিপক্ষভূত এক একটি অন্তরায় তিরোহিত হইয়া যায়। চিত্তের পঞ্চম অবস্থাতে একাগ্রতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য বিতর্ক, বিচার, প্রীতি ও সুখ— এই চারিটি অবস্থা ক্রমশঃ লাভ করিয়া ও ধীরে ধীরে পরিহার করিয়া উঠিতে হয়। সুখের পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে সুখ-দুঃখের অতীত সাম্যভাবময় উপেক্ষার উদয় হয়। তখনই চিত্ত যথার্থ একাগ্রতা লাভ করে। চিত্তে একাগ্রতা উদিত হইলে চিত্তের চঞ্চলতা তিরোহিত হয়, কামনা বাসনা প্রভৃতি চিত্তকে আর আক্রমণ করে না, এবং অখণ্ড চিত্ত একাগ্র অবস্থায় আলম্বন বা নিমিত্তকে পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের কোন ভেদ থাকে না; ইহারই নাম অর্পণা, ইহাকে সমাধি বলে। এই অবস্থা

অতিক্রম করিতে না পারিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোক উদিত হওয়া অসম্ভব।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় ধ্যান করা আর ধ্যান হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? পরিকর্ম নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া যে ধ্যান তাহা বাস্তবিক ধ্যানই নহে। তবুও তাহাকে ধ্যান বলিতে হয়। ইহা ধ্যান করার অবস্থা। উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত অবলম্বনে যে ধ্যান তাহা উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহাও ধ্যান করা, স্বাভাবিক ধ্যান নহে। কারণ প্রতিভাগ নিমিত্ত উদয় না হওয়া পর্যন্ত স্বভাবের বিকাশ হয় না, আবরণ অস্তমিত হয় না, প্রকাশের উন্মেষ হয় না। সুতরাং প্রতিভাগ নিমিত্ত অবলম্বনে যে ধ্যান, যাহার নামান্তর উপচার ধ্যান, তাহাই প্রকৃত ধ্যান, যদিও ইহা নিম্নস্তরের। ইহা স্বাভাবিক ধ্যানের অন্তর্গত, তবে আভাসরূপে। এই অবস্থায় ধ্যানের সহিত জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে একটু একটু করিয়া চিত্তের মল ও বিক্ষেপ নষ্ট হইতে থাকে। উপচার ধ্যানের পরে অর্পণার উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত ধ্যান। উহা স্বভাবের খেলা। উহাতে কৃত্রিমতা মোটেই থাকে না। ঐ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণভাবে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, যাহা হইলে পূর্বাবস্থার প্রাপ্তি অর্থাৎ পতন প্রকৃত প্রস্তাবে আর হইতে পারে না।

২ — ধ্যান ও মনের লয়

কেহ কেহ মনে করেন ধ্যান করিতে করিতে মনের লয় হয়। ধ্যানের অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এবং শাস্ত্রবিহিত ক্রম অনুসারে অনুষ্ঠিত হইলে এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন চিত্ত অবলম্বন ত্যাগ করিয়া নিরালম্ব অবস্থায় স্থিত হয়। চিত্তের বৃত্তি ও সংস্কার এই দুইটি অবস্থা। যখন চিত্ত জ্ঞেয় বিষয় সংস্পর্শে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তখন উহা বিষয়ের

উপরাগ গ্রহণ করে ও তদাকারে আকারিত হয়। এই উপরাগগ্রহণ সাধারণতঃ প্রারম্ভিক অবস্থাতে ইন্দ্রিয়-প্রণালীদ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু পরিণত অবস্থাতে ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা ততটা আবশ্যক হয় না। বায়ুর হিল্লোলে যেমন শান্ত সমুদ্র-বক্ষ বিক্ষুব্ধ হইয়া তরঙ্গের রূপে পরিণত হয়, ঠিক সেই প্রকার বিষয়-সংস্পর্শে চিত্তসত্তাও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ের আকার ধারণ করে। ইহারই নাম চিত্তের বৃত্তি। কিন্তু বৃত্তি অবস্থাতে চিত্ত সব সময় অবস্থান করে না। বৃত্তির উপশম হইলে উহা সংস্কাররূপে অথবা বাসনারূপে চিত্তক্ষেত্র বীজের আকার গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান থাকে। বস্তুতঃ তখন বৃত্তিহীন চিত্ত সংস্কাররূপেই স্থিত থাকে। উদ্দীপক কারণের উত্তেজনাতে ঐ সকল সংস্কার পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বৃত্তিরূপ ধারণ করে। বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র এইভাবে নিরন্তর আবর্তিত হইতে থাকে। চিত্ত যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, উহা সম্যক্প্রকারে স্থিতিলাভ করিতে পারে না, কারণ উহা পরিণামী বলিয়া সর্বদাই চলনশীল। এমন কি, সংস্কার অবস্থাতেও চিত্তের এই সূক্ষ্ম স্পন্দন নিবৃত্ত হয় না। একমাত্র আত্মস্বরূপে স্পন্দন থাকে না—ঐটি সংস্কারের অতীত অবস্থা। ধ্যান অবস্থাতে চিত্ত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া নিবৃত্তির অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। স্থূল অবলম্বনের প্রভাবে চিত্ত স্থূলাকারে আত্মপ্রকাশ করে। সূক্ষ্ম অবলম্বনের প্রভাবে চিত্ত তদ্রূপ সূক্ষ্ম অবস্থা গ্রহণ করে। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম অবলম্বন উভয়ই ধ্যানের বিষয়ীভূত গ্রাহ্য বস্তু ভিন্ন অপর কিছু নহে।

বিতর্কানুগত সমাধিতে অবয়বিরূপ স্থূল অবলম্বন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাহার পর সূক্ষ্ম অবলম্বন গ্রহণ করিলে পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্ববর্তী সূক্ষ্মতর যাবতীয় তত্ত্বই প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে প্রকৃতির অন্তর্গত সূক্ষ্ম গ্রাহ্য সত্তা সাধকের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ এই স্থূল ও সূক্ষ্ম সত্তা সমাহিত যোগীর চিত্তেরই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ মাত্র। ইহার পর

করণরূপী অবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া ধ্যান প্রবর্তিত হয় ও গাঢ় হইতে হইতে সানন্দ সমাধিতে পর্যবসিত হয়। এই অবস্থায় চিত্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের আকার ভেদ করিয়া স্বয়ংই জ্ঞানের করণরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই সময়ে প্রজ্ঞার সম্মুখে জ্ঞেয়রূপে পৃথক্ কোন সত্তা থাকে না। উহা করণরূপে পরিণত চিত্তসত্ত্বে অস্তমিত হয়। ইহারও পরে চিত্ত নিজস্বরূপে অর্থাৎ জ্ঞাতৃস্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ করে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে উচ্চতম অবস্থা। এই অবস্থায় একমাত্র 'আমি-আছি' এই ভাবে প্রকাশমান সত্তায় বোধ মাত্র থাকে। তখন বাহিরে গ্রাহ্য কিছুই থাকে না। এবং করণরূপী গ্রহণও থাকে না। দুইই গ্রহীতা চিত্তস্বরূপে অন্তর্লীন হইয়া যায়। একমাত্র চিত্তই তখন অস্মিরূপে আপনাতে আপনি বিরাজ করে। ইহাই বিশ্বের বীজ অবস্থা। জ্ঞানাদি অনন্ত বিভূতি এই অণুরূপ অস্মিভাবকে অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠে। এই অস্মিতাই অভিব্যক্ত সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্র বা বিন্দুস্বরূপ। চিত্তে একাগ্রবৃত্তির চরম উৎকর্ষ হইলে এই বিন্দুতে স্থিতি হয়। ইহার পর আর চিত্তকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই অস্মিতারূপ গ্রন্থি হৃদয়-গ্রন্থিরূপে মহাজনগণের দ্বারা বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা জাগতিক দৃষ্টিতে উচ্চতম অবস্থা হইলেও বস্তুতঃ অবিবেকে বা অজ্ঞানেরই অবস্থা। চিৎ ও অচিৎ এই অবিবেকরূপ এই মূল গ্রন্থি ভাঙ্গিতে না পারিলে চিত্ত বৃত্তি অবস্থা হইতে সংস্কার অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। যাহাকে সর্বজ্ঞত্ব বা সর্ব-বিষয়ক জ্ঞানের উদয় বলে তাহার পরিচয় এই অস্মিতা ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

অস্মিতাভেদী বিবেকজ্ঞান সর্বজ্ঞত্বেরও অতীত অবস্থা। কারণ এই অবস্থায় চিত্ত ক্রমশঃ নিরোধের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিবেকজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বস্তুতঃ চিত্ত-নিবৃত্তিরই ইতিহাস মাত্র। ইহার পর্যবসন একমাত্র বিবেকখ্যাতির চরম ক্ষণে উপলব্ধ হয়, যাহার পর এই মহাখ্যাতিও নিরুদ্ধ হইয়া আত্মা গুণমুক্ত হইয়া নিজস্বরূপে স্থিতি লাভ করে।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ধ্যান অথবা সমাধির পূর্ণতার ফলে প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের উদয় হয়। চিত্ত অথবা মন তখনও বিদ্যমান থাকে। ইহার পর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরম অবস্থায় পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাও নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের উদয় হইয়া অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া গেলে জ্ঞানও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। জ্ঞানের নিরোধের সঙ্গে চিত্ত অতিক্রান্ত হয় ও আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়। সুতরাং ধ্যান হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে স্বরূপ-স্থিতি, ইহাই শাস্ত্র-নির্দিষ্ট স্বাভাবিক ক্রম।

যাহাকে কেহ কেহ চিত্তের লয় বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা এই প্রণালীর অন্তর্গত একটি অবান্তর স্থিতি মাত্র। চিত্তের লয় স্বীকার করিলে চিত্তের পুনরুদ্ভবও স্বীকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে ব্যুত্থানও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভগবানের পরমধাম অথবা আত্মস্বরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হইলে ব্যুত্থানের কোন আশঙ্কা থাকে না। ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত—'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।' এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে চিত্তের লয় প্রার্থনীয় নহে। জ্ঞানের উদয়ে চিত্তের আত্যন্তিক নিরোধই প্রার্থনীয়। বস্তুতঃ লয়ের অবস্থা অভিভূত থাকার অবস্থা মাত্র। উহাতে অজ্ঞান ও অনর্থ যথাবৎ থাকিয়াই যায়, কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে চিত্ত দগ্ধপটবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়,—উহা থাকিয়াও তখন না থাকার সমান।

জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই এই দগ্ধপটবৎ অবস্থার লাভ হইতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানই একমাত্র প্রার্থনীয়, যাহার প্রভাবে মন থাকিয়াও না থাকার মত হইয়া যায়। বস্তুতঃ মন তখন নির্বীজ ভাব প্রাপ্ত হয়। শুধু মনের লয় সাধক বা যোগী কাহারও প্রার্থনীয় নহে। কারণ মনের লয় হইলে পুনর্বার উহার উত্থান হইবেই। ভগবান শঙ্করাচার্যের পরম গুরু গৌড়পাদ মুনি এইজন্য বিক্ষেপের ন্যায় লয়কেও অন্তরায় বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াং শমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ।।

অর্থাৎ চিত্তকে লীন হইতে না দিয়া তাহাকে সর্বদাই জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তদ্রূপ চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া তাহাকে শান্ত রাখিতে হইবে এবং চিত্তকে রাগদ্বেষ ও মোহরূপ দোষে দূষিত হইতে না দিয়া বিবেকজ্ঞানের দ্বারা চেতন করিয়া রাখিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন—

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা।।

অর্থাৎ যখন চিত্তে লয় থাকে না, বিক্ষেপ থাকে না, চঞ্চলতা থাকে না এবং বিষয়ের আকার প্রতিভাসমান হয় না, তখন ঐ চিত্ত নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশমান হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, চিত্ত বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে। কিন্তু যতক্ষণ উহা হইতে পূর্বোক্ত দোষ সকল অপগত না হয় ততক্ষণ উহা চিত্তরূপে পরিচিত হয়। চিত্তলয় ও মনোনাশের রহস্য উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে।

চিত্ত থাকিয়াও না থাকার মত হইতে পারে এবং চিত্ত না থাকিলেও চিত্তের কার্য চলিতে পারে। ইহা জ্ঞানী ও যোগিগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই কারণেই বৌদ্ধ যোগিগণ বলিতেন, অর্হৎ বা জীবন্মুক্তের চিত্ত ক্রিয়াচিত্ত মাত্র। ইহা অতি দুর্লভ আধ্যাত্মিক সম্পদ্। অর্হৎ অবস্থার পূর্ববর্তী অনাগামী অবস্থাতেও এই প্রকার ক্রিয়াচিত্তের উদয় হয় না। বুদ্ধগণ যখন ধর্মোপদেশ দান করেন তখন তাঁহারা এই ক্রিয়াচিত্ত অবলম্বন করিয়াই উপদেশ দিয়া থাকেন। ক্রিয়াচিত্ত বলিতে ইহাই বুঝায় যে চিত্তে ক্রিয়া আছে অথচ সেই ক্রিয়ার কোন বিপাক নাই। যতদিন চিত্তে কুশল

অথবা অকুশল সংস্কার বর্তমান থাকে ততদিন ক্রিয়া হইতে বিপাক উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কর্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বিস্তার প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ চিত্তে সুপ্ত তৃষ্ণা বা অনুশয় সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহা হইতেই ভবিষ্যতে অনুরূপ ফলের বিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যখন রাগ, দ্বেষ ও মোহের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত হইতে অনুশয় বিনষ্ট হয় তখন ঐ চিত্তে ক্রিয়া থাকিলেও তাহা হইতে শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয় না। এই জাতীয় চিত্তত চিত্ত হইয়াও অচিত্ত। ইহাকেই দার্শনিক ভাষাতে ক্রিয়াচিত্ত বলা হইয়া থাকে। মনোনাশের প্রকৃত তত্ত্ব কি ইহা হইতে কিছু কিছু ধারণা করা যাইবে।

ছয় (খ)

৩ — সাধনা কতদিন পর্যন্ত করিতে হয়

সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনা আবশ্যক। যদিও দেখা যায় অনেক সময় কাহারও কাহারও সাধনা না করিয়াও অথবা সম্যক্ প্রকারে সাধন পথে অগ্রসর না হইয়াও ফললাভ হইয়াছে, তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে এই ফললাভও অহেতুক নহে। এবং অধিকাংশ স্থলে এই হেতু সাধকের জন্মান্তরীণ সাধন বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। অবশ্য আমরা এখানে অহেতুক কৃপা ও তজ্জন্য ফললাভের কথা বলিতেছি না। কারণ উহা ভগবানের স্বাতন্ত্র্যমূলক বলিয়া আমাদের আলোচনার অন্তর্গত নহে। এখানে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য এই যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধন পথ অবলম্বন করিয়া যথাবিধি দীর্ঘকাল আদরের সহিত সাধন কার্য সম্পাদন

করা আবশ্যক। সাধন কখনই ব্যর্থ হয় না। একজন্মে উহা ফলপ্রসব না করিলেও উহা সংস্কাররূপে চিত্তে নিহিত থাকে এবং ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে হইতে জন্মান্তরে ফল প্রসব করে। একজন্মেই হউক অথবা বহুজন্মেই হউক যতদিন পর্যন্ত সাধন পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্যন্ত সিদ্ধি অথবা ফলের আশা সুদূর পরাহত। কাহারও কাহারও অল্প সময়ের মধ্যে ফললাভের কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে বিনা সাধনাতেই আকস্মিক ভাবে ঐ প্রকার ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ঐ সব স্থানে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে যে ঐ ফললাভের পশ্চাতে পূর্ব-জন্মের কঠোর সাধনার ইতিহাস বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সাধনা করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা সিদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য ইহা লৌকিক দৃষ্টির কথা। কিন্তু প্রশ্ন হল, সাধনা কতদিন পর্যন্ত করিতে হইবে। এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলিয়াছেন— "যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ না হবে নিরন্তর করে যাওয়া। ফাঁক দিতে নেই, ফাঁকে পাক পড়ে যায়— যেমন বল তৈলধারাবৎ। তোমার চেষ্টা থাকবে নিরন্তর অখণ্ডধারায় করে যাওয়া।" মা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর সূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে। মা কোন কাল-নির্দেশ করেন নাই। কারণ কাল এক দৃষ্টিতে বাহ্যপদার্থরূপে পরিগণিত হইলেও বস্তুতঃ আভ্যন্তর ভাব মাত্র। সুতরাং যে কার্য নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে একমাসে সিদ্ধ হয় তাহা অত্যন্ত তীব্র সংবেগের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে একদিনে, অথবা কাহারও ন্যূন সময়েও, সম্পন্ন হইতে পারে। সংবেগের তীব্রতা অনুসারে কালের বিস্তার বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্থূল দৃষ্টিতে কালের নির্দেশ করা মোটেই সম্ভবপর নয়। কারণ সাধকের প্রাণের আবেগ বর্ধিত হইলে বাহ্যকালের সঙ্কোচ স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কাল কিন্তু একই। কিন্তু এই সূক্ষ্মকাল একমাত্র যোগী বা মহাজ্ঞানী ভিন্ন কেহ ধারণা করিতে

পারে না। এইজন্য কতদিন পর্যন্ত সাধনা করিতে হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে মা কোন কাল-নির্দেশ না করিয়া শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে যতদিন পর্যন্ত প্রকাশ না হয় ততদিন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এক লক্ষ্যে সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। কোন কারণে ফলপ্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে এবং কোন্ কারণে দ্রুত সিদ্ধিলাভ হয় তাহা অজ্ঞানী সাধকের পক্ষে জানা সম্ভবপর নহে এবং জানিবার কোন প্রয়োজনও নাই। যে কর্ম হইতে যে ফলের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী সেই ফলের উদয় না হওয়া পর্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত সেই কর্মকে সমগ্র অন্তরের সহিত ধরিয়া থাকা আবশ্যক। ইহাই মা'র উপদেশের তাৎপর্য। বস্তুতঃ ফল অথবা সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখার কোনই প্রয়োজন নাই। ক্রিয়মাণ সাধন কর্ম যাহাতে গুরুর আদেশ অনুসারে যথোচিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় একমাত্র সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহাতে কর্ম বা সাধনাও ভাল হয় এবং ফলের দিকে দৃষ্টি না থাকার দরুণ ফলপ্রাপ্তির সময়ও সন্নিহিত হইয়া আসে।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন— দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য ও সৎকারের সহিত সাধনা অভ্যাস করিলে সাধকের ভূমি দৃঢ় হয়। নৈরন্তর্য বলিতে অবিচ্ছিন্ন সাধনার প্রশংসা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধনার ধারাতে বিচ্ছেদ অথবা ব্যবধান থাকিলে উহার ফলে প্রকৃতির আবরণ আসিয়া সাধন ধারাকে আচ্ছন্ন ও মলিন করিয়া ফেলে। 'সৎকার' শব্দের এই তাৎপর্য যে যিনি যে সাধনাই করুন তাহা শ্রদ্ধার সহিত না করিলে ভূমি দৃঢ় হয় না। বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। এইজন্য উপায় মার্গের প্রথমেই যোগিগণ শ্রদ্ধাকে স্থান দিয়াছেন। গীতাতেও আছে— 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।' মূলে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সৎকার একই বস্তু। তারপর দীর্ঘকাল, ইহাও ভূমিসিদ্ধির পক্ষে আবশ্যক হয়। অবশ্য এই দীর্ঘকাল সংবেগের তারতম্য বশতঃ বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হইতে পারে। বুদ্ধদেব যখন বোধিবৃক্ষমূলে তপস্যা করিতে বসিয়াছিলেন তখন, 'ইহাসনে শুষ্যতু মে

শরীরম্' ইত্যাদি বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার ত্বক্, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি শুষ্ক হউক, শরীরের রক্ত-মাংস প্রভৃতি শুষ্ক হউক, যাহা হইবার তাহাই হউক, কিন্তু আমি উদ্যম বা পরাক্রম ছাড়িব না, যতদিন উদ্যমলভ্য বস্তু প্রাপ্ত না হই।' বৌদ্ধগণের দশ পারমিতার একটি প্রধান পারমিতার নাম বীর্য। পতঞ্জলি মতেও উপায়-মার্গের মধ্যে শ্রদ্ধার পরেই বীর্যের স্থান। তাই বৌদ্ধগণ বলেন, 'অত্তাহি অত্তনো নাথ, কোহি নাথ পরোসিয়া।' অর্থাৎ আত্মাই আত্মার প্রভু, দ্বিতীয় কেহ আত্মার প্রভু হইতে পারে না। এই প্রকার মনে দৃঢ় বল নিয়া আসনে উপবেশন করিতে হয়। মা বলেন—"যতই জাগতিক প্রতিবন্ধক আসুক লক্ষ্যটি যেন অখণ্ডের দিকে থাকে। তা'হলে কখনও না কখনও অখণ্ডের ছোঁওয়া মনের গতিতে লেগে যাবে।" ছোঁওয়া লাগিলে এককক্ষণেই পূর্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। তখন একক্ষণ আর সর্বক্ষণের কোন প্রভেদ থাকে না। কারণ প্রাপ্তি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে।

এই মহাক্ষণটি কাহার কখন আসে বলা যায় না। এই মহাক্ষণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণস্বরূপ ভূখণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন প্রকাশ খুলিয়া যায়—অপ্রকাশ কিছুই থাকে না। এই মহাপ্রকাশের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ইহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথাশক্তি সাধন করিতেই হইবে। ক্ষণের উদয় হইলে কালের বন্ধন কাটিয়া যায়।

৪ — একাংশ নিয়া ধ্যান আরম্ভ

প্রশ্ন হয় একাংশ ধ্যান হইতে সর্বাংশ হইবে কি প্রকারে? ইহার সমাধান ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একাংশ ও সর্বাংশের পরস্পর সম্বন্ধ অনুধাবন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ মনে হয়, যে অংশকে চিত্ত

অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে সেই অংশ হইতে অতিরিক্ত কোন অংশ বা সত্তা চিত্তে প্রকাশিত হইতে পারে না। কিন্তু উহা সত্য নহে। লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে একটির সঙ্গে অপরটির ভেদ সম্বন্ধ আছে এবং যে কোন একটির সঙ্গে সমগ্রটির ভেদ সম্বন্ধ আছে। যদিও অংশ ও অংশী মূলতঃ অভিন্ন বলিয়া এই ভেদের মূলেও অভেদ সম্বন্ধ রহিয়াছে তথাপি ভেদেরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। এই পরিস্থিতিতে একটি অংশকে ধ্যান করিয়া সমগ্রটিকে ধারণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যোগিগণ বলেন—"জাত্যনুচ্ছেদেন সর্বং সর্বাত্মকম্"—অর্থাৎ যে কোন জাতীয় বস্তু হউক উহা অপর যে কোন জাতীয় বস্তুর সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ সবের মধ্যেই সব আছে। তবে যাহা স্পষ্ট ও প্রধান তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়, বাকী সমস্ত বাহ্যদৃষ্টির অগোচরে প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু যাহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী তাহার দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত কিছুই থাকিতে পারে না। সে স্পষ্টই দেখিতে পায় প্রতি বস্তুর মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব ভাসিতেছে; প্রতি কার্যের পশ্চাতেই পরম কারণ নিহিত রহিয়াছে। তাই মা বলিয়াছেন —গুরুশক্তির প্রভাবে পূর্বোক্ত আবরণ কাটিয়া গেলে সর্ব জিনিষের মধ্যেই সর্ব জিনিষের সত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুশক্তি ভিন্ন ঐ আবরণ কাটাইবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। গুরুশক্তির অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য নির্বিকার চিত্তে গুরু আজ্ঞা পালন করিয়া যাইতে হয়। ইহার পর একাংশ ধ্যান হইতে সর্বাংশ কি ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, এই প্রশ্ন আর চিত্তে উদিত হয় না।

৫ — বাস্তব ধ্যান কাহাকে বলে

ধ্যান শব্দ বহু অর্থের বাচক। বহু সাধক বহু অবস্থাকে ধ্যান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি অনুসারে তাঁহারা ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু তবুও বলিতে হইবে ধ্যানের একটা বাস্তব এবং অবাস্তব ভেদ আছে।

সাধারণ সাধক সমাজে প্রচলিত বহু ধ্যানই তদনুসারে অবাস্তব ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। একটা আনন্দের আস্বাদ এবং গভীর তন্ময়তা থাকিলেই যে ধ্যান বাস্তব হয় তাহা বলা যায় না। অনেক সময় ধ্যানে চিত্ত আনন্দরসে মগ্ন হইয়া যায়। অনেক সময় চিত্ত আত্মহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই সব বাস্তব ধ্যানের লক্ষণ নহে। এইগুলি ধ্যানের অন্তরায় স্বরূপ জানিতে হইবে। এই আনন্দরস এক হিসাবে জাগতিক রসেরই অন্তর্গত। ইহাকে ত্যাগ করিয়া না উঠিতে পারিলে "মূলের স্বাদ" পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া অজ্ঞানজনিত কোন ভাবও বাস্তব ধ্যানে থাকিতে পারে না। উহাতে একটা সচেতন ও জাগ্রত ভাব সর্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। জড়ত্ব ও নিদ্রা সচেতন ভাবের অন্তরায়। সুষুপ্তিতে যেমন,— 'ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্', অর্থাৎ আমি কিছুই জানিতাম না, এই প্রকার অনুসন্ধান ব্যুত্থান কালে জন্মিয়া থাকে, এই জাতীয় ভাব সচেতন ধ্যানে থাকে না। কারণ অজ্ঞান বা শূন্যতা জড়ের লক্ষণ, চৈতন্যের নহে। বেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে সুষুপ্তি অবস্থার পরিচায়ক রূপে দুইটি ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি 'সুখমহম্ অস্বাপ্সম্" অর্থাৎ আমি বেশ আনন্দে নিদ্রিত ছিলাম অপরটি 'ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্' আমি কিছুই জানিতাম না। একটি রসাস্বাদ, অপরটি অজ্ঞান। বাস্তব ধ্যানে এই দুইটির একটিও থাকে না। কারণ এই রসাস্বাদ এক হিসাবে ভোগের অন্তর্গত এবং কিছু না জানা অজ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ। বাস্তব ধ্যানে যে আনন্দ থাকে না তাহা নহে, কিন্তু উহা স্বরূপের দিকের আনন্দ ভোগানন্দ নহে,— মা'র ভাষাতে 'মূলের স্বাদ।' এইজন্য বাস্তব ধ্যানের পর জাগতিক সর্বপ্রকার আনন্দ, এমন কি সুষুপ্তি অথবা ব্রহ্মলোকের আনন্দও, অত্যন্ত হাল্কা বোধ হয়। এই জন্যই জাগতিক আনন্দের দিকে স্বভাবতঃই চিত্ত বিতৃষ্ণ হয়, অর্থাৎ বৈরাগ্যের উদয় হয়। বাস্তব ধ্যানের ইহাই একটি পরিচায়ক লক্ষণ। যতই ধ্যানের গাঢ়তা বাড়িতে থাকে ততই সমগ্র বিশ্বের, এমন কি বিশ্বের মূলভূত প্রকৃতি বা গুণময়ী

সত্তার, প্রতি স্বভাবতঃ বৈরাগ্যের উদয় হয়। নিত্য ও অনিত্যের বিবেক আপনিই ফুটিয়া উঠে।

৬ — মনের পুষ্টি

দেহের পুষ্টির জন্য যেমন আহার আবশ্যক তেমন মনের পুষ্টির জন্যও তাহার উপযোগী আহার চাই। মন একমাত্র পরম বস্তু ব্যতীত আর কিছুতেই পুষ্ট হয় না। যতক্ষণ এই পরমবস্তু প্রাপ্ত না হইবে ততক্ষণ তাহার চঞ্চলতা দূর হইতে পারে না। জাগতিক কোন রসে মনের যে তৃপ্তি হয় তাহা সাময়িক তৃপ্তি। ঐ তৃপ্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। পরে আবার চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে। কিন্তু পরমবস্তু প্রাপ্ত হইলে মন স্থির হইয়া যায়, উত্থান-রহিত হয়, নিষ্ক্রিয় পরম শান্তরূপে পরম সত্তার সহিত এক হইয়া যায়। পরমবস্তুর রস প্রাপ্ত হইলে স্বভাবের ধারাতে মন পতিত হয়। তখন উহা বাহিরের দিকে আর আকৃষ্ট হয় না এবং স্বভাবের ধারাতেই অন্তর্মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। মন ঠিক ঠিক পুষ্টি লাভ করিলে জড় সমাধি, লয় প্রভৃতি সম্ভবপর হয় না। তখন পুষ্ট মন নিজেকে জানিতে চায় এবং তাহার ফলে কোন শুভ মুহূর্তে সে নিজেকেই পরমবস্তু বলিয়া চিনিয়া ফেলে।

৭ — ক্ষণ-রহস্য

ক্ষণের রহস্য অত্যন্ত জটিল, অথচ সরল অপেক্ষাও অতি সরল। আমাদের চিত্তবৃত্তি কালের অধীনে সংস্কারবশে নিরন্তর আন্দোলিত হইতেছে। সেইজন্য উহা স্থূল ভিন্ন সূক্ষ্ম সত্তা ধারণ করিতে পারে না। যোগশাস্ত্রে ক্ষণের মহিমা বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। কাল ক্ষণের

সমষ্টি। বস্তুতঃ কাল বলিয়া বুদ্ধির বাহিরে পৃথক্ কোন পদার্থ নাই। কালের বাস্তব সত্তা যোগিগণ স্বীকার করেন না। ক্ষণই বাস্তবিক সত্য। কাল বুদ্ধিতে কল্পিত পদার্থবিশেষ মাত্র। ক্ষণের আনন্তর্য হইতেই কালের বোধ উদিত হয় এবং মূল স্পন্দনের প্রভাবে একই ক্ষণ আন্দোলিত অবস্থায় বহুক্ষণরূপে বুদ্ধি ক্ষেত্রে প্রতিভাসমান হয় বলিয়া বিস্তার বিশিষ্ট কালের প্রতীতি জন্মে। সমগ্রকালের পৃষ্ঠভাগে একমাত্র ক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই একই ক্ষণে অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পরিণাম সংঘটিত হইতেছে। ক্ষণের মধ্যে ক্রম নাই। ক্রম কালের ধর্ম। এইজন্য ক্ষণকে আশ্রয় করিয়া যে মহাজ্ঞান উদিত হয় তাহাতেও ক্রম থাকে না। যখন এই মহাজ্ঞানের উদয় হয় তখন ইহা ক্রমশঃ হয় না। ক্রমকে অভিভূত করিয়া সর্ববিষয়ক সর্বাকার জ্ঞান একই ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার নাম সর্বজ্ঞত্ব। এই জ্ঞান একই সঙ্গে সামান্যজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞান উভয়ই। সেইজন্য এই জ্ঞানের উদয় হইলে আর কিছু জানিবার যোগ্য অবশিষ্ট থাকে না। জ্ঞান অনন্তরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া জ্ঞেয় তখন জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। যোগীর বিবেকজ জ্ঞান, যাহাকে প্রাতিভ জ্ঞানও বলা হইয়া থাকে, এই মহাজ্ঞানের একটা দিক্ মাত্র। স্তরের পর স্তর ক্রম ধরিয়া পূর্ণজ্ঞানের উদয় হয় না। অখণ্ডজ্ঞান যখন উদিত হয় অতর্কিত ভাবে একটি ক্ষণের মধ্যে উদিত হয়, ভাগে ভাগে হয় না।

কালের মধ্য হইতে ক্ষণের সন্ধান সহসা পাওয়া যায় না। কারণ কাল ক্ষণকে আবরণ করিয়া নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যদিও কালের সত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে সর্বত্রই ক্ষণ নিহিত রহিয়াছে তথাপি সন্ধি ভিন্ন উহাকে আবিষ্কার করা যায় না। দিনের মধ্যে কালের অবয়ব সকলের সন্ধি স্থূলভাবে তিন অথবা চারি অথবা আট আনা হইয়া থাকে। ত্রিসন্ধ্যা, চতুঃসন্ধ্যা, অষ্টকাল প্রভৃতি এই বিভাগের উপর কল্পিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণের অষ্টকালের লীলা-স্মরণও এই অষ্টক্ষণকে ধরিবার জন্য। ত্রিসন্ধ্যা বা চতুঃসন্ধ্যা অনুষ্ঠানও এই সন্ধিক্ষণকে ধরিবার জন্য। যে কোন প্রকারেই হউক একবার সেই মহাক্ষণের প্রাপ্তি হইলে আর তাহা হারাইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তখন কালের মধ্যে সর্বত্রই সেই মহাক্ষণকে সাক্ষাৎকার করা যাইবে। একবার স্বরূপে আত্মদর্শন হইলে বা ইষ্টদর্শন হইলে যেমন জগতের প্রতি বস্তুতে আত্মদর্শন বা ইষ্টদর্শন সহজ হয় তদ্রূপ একবার সেই মহাক্ষণকে পাইতে পারিলে কোন সময়েই আর তাহার অভাব অনুভব করিতে হয় না। তাই মা বলিয়াছেন—"ক্ষণের মধ্যে সর্বক্ষণ রয়েছে। সেই ক্ষণটার ছোঁওয়া লাগলে তুমি সর্বক্ষণকে পেয়ে যাবে।" মহাক্ষণ একই বটে, কিন্তু এক হইলেও উহা সকলের মধ্যে একই সময়ে প্রকাশিত হয় না। সেইজন্য প্রত্যেককেই প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে হয়। আর একটি কথা। প্রতি মনুষ্যই একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্য জন্মান্তরের কর্মসংস্কারের বৈচিত্র্যদ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কর্মবৈচিত্র্যও মূল কারণ নহে। মূল কারণ জন্মকালীন ক্ষণ-সম্বন্ধ। অর্থাৎ জন্মকালে যে ক্ষণ প্রবল থাকে সেইক্ষণই সমগ্র জীবনকে নিয়মিত করে। সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা অতিক্রম করা সহজ নহে। মা বলিয়াছেন— "যে যে-ক্ষণে জন্মিয়াছে সারাটা জীবন তাহার সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত চলছে ত।" গর্ভাধান কালের স্থিতি অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার সময়কার স্থিতি সমস্ত জীবনের ধারা নির্দেশ করিয়া থাকে।

৮ — প্রকৃত বৈরাগ্য কাহাকে বলে

বৈরাগ্য বলিতে সাধারণতঃ বিতৃষ্ণা বুঝায়। যোগশাস্ত্রানুসারে পর-বৈরাগ্য ও অপর বৈরাগ্য ভেদে বৈরাগ্য দুই প্রকার। ভোগ্য বস্তু অথবা

কাম্য পদার্থের উপর বিতৃষ্ণাই অপর বৈরাগ্যের স্বরূপ। এই জগতেই হউক অথবা লোক লোকান্তরেই হউক, কোন স্থানে ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তিভাবের উদয় না হইলে বুঝিতে হইবে বৈরাগ্য আবির্ভূত হইয়াছে। এই অনাসক্তি বাস্তবিক পক্ষে জগতের প্রতি অথবা বাহ্য বিষয়ের প্রতি বিরক্তি অথবা তাচ্ছিল্য নহে। এমন কি, দ্বেষও নহে। ইহা ভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার ফলে অথবা কারণান্তর হইতে উপজাত চিত্তের একটি উদাসীন ভাব। শরীর ও মনের উপাদান এমন ভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায় যে উহাতে আর বিষয়-সম্বন্ধ সহ্য হয় না। বিষয়ের লেশমাত্র সংস্পর্শ, এমন কি সংস্পর্শের সম্ভাবনাও, চিত্তকে আকুল করিয়া তোলে। ভিতরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে বাহিরের শীতলতা তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। যাহার হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহার পক্ষে জাগতিক সুখে তৃপ্তি বোধ করা সম্ভবপর নহে। প্রকৃত বৈরাগ্যের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মা সেইজন্য বলিয়াছেন "বৈরাগ্যে জাগতিক বস্তুর উপর বিরক্তি বা উপেক্ষা থাকে না, গ্রহণ হ'বে না, শরীর নেয় না, বিরক্তি বা ক্রোধ আসবে না।"

এই অপর বৈরাগ্যের উপরে পরবৈরাগ্যের স্থান। যে প্রকৃতির গুণ হইতে লোক-লোকান্তর ও যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ রচিত হইয়াছে যখন চিত্ত শুধু ভোগ্য পদার্থের উপর বিরক্ত না হইয়া আরও ঊর্ধ্বে পরিণাম-শীল জগতের মূল উপাদানের উপর বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় তখন তাহার এই গুণ-বিতৃষ্ণাকে পরবৈরাগ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পরবৈরাগ্য হইলে লোক-লোকান্তরের ঐশ্বর্য ত দূরের কথা, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ও তজ্জন্য প্রজ্ঞার, এমন কি বিবেকজ্ঞানের উপরও বৈরাগ্য হইয়া থাকে। গুণ-সংশ্লিষ্টভাবে আত্মস্বরূপের দর্শন না হওয়া পর্যন্ত পরবৈরাগ্যের আবির্ভাব ঘটে না। পরবৈরাগ্যের পর সংস্কারাত্মক চিত্তের নিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাই ইহার অব্যবহিত পরেই চিৎস্বরূপ আত্মার স্বরূপপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

৯ — বিষয় কাহাকে বলে

মা বলেন, "যাহাতে বিষ হয় অর্থাৎ যাহা ক্ষতি করে ও মৃত্যুর দিকে টানিয়া নেয় তাহাই বিষয়।" যেখানে বিষের গন্ধ নাই তাহার প্রকাশ নির্বিষয়, অর্থাৎ অমৃত। বস্তুতঃ বিষয় বলিয়া কিছুই নাই। একমাত্র জ্ঞানই অখণ্ডরূপে সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ সময়ের অধীন থাকে ততক্ষণ এই জ্ঞানকে কিয়দংশে সংস্কার বশতঃ বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া গেলে একমাত্র অখণ্ড জ্ঞানই বিরাজ করিয়া থাকে। তখন আর বিষয়ের ভাব থাকে না। জ্ঞানকে বিষয়রূপে সাজাইলেও জ্ঞান জ্ঞানই থাকে। তাহার রূপান্তর সিদ্ধ হয় না। ইহাই অমরত্বের নিদর্শন। চৈতন্য শক্তিকে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে ইহাই স্বাভাবিক।

১০ — গুরু ও ধারা

মা বলেন, "কার কোন্ ধারা গুরু জানেন।" সাধকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি অর্থাৎ তাহার জন্মান্তরের সংস্কার, রুচি, সামর্থ্য এবং অধিকার অনুসারে তাহার সাধন-পন্থা অথবা অধ্যাত্ম জীবনের ধারা নিরূপিত হইয়া থাকে। সাধক নিজেও নিজের প্রকৃত ধারা জানিতে পারে না। রোগী যেমন সাধারণতঃ নিজের রোগের বৈশিষ্ট্য ধারণা করিতে পারে না এবং নিদান সম্বন্ধে চিকিৎসকের বিচার-শক্তির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ জ্ঞানহীন সাধকও নিজের সাধন-পন্থা নিরপেক্ষভাবে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া সর্বদা গুরুর উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। একমাত্র গুরুই সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী, তাই তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে অল্পজ্ঞ জীব নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ধারাও ঠিক ঠিক নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারে

না। মা আরও বলেন, "লাইন ত গুরু দেন, লাইন গুরু নির্দেশ করেন, গুরুই সাধনা দেন। করতে করতে ফললাভ স্বয়ং প্রকাশ।" সাধকের কর্তব্য নির্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিয়া যাওয়া। গুরু যাহাকে যাহা করিতে অথবা না করিতে যে প্রকার নির্দেশ দিয়েছেন তাহার পক্ষে সেই নির্দেশ অনুসারে যথাশক্তি চলিতে চেষ্টা করাই একমাত্র কর্তব্য। তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অর্থাৎ অখণ্ডভাবে সাধককে গুরুদত্ত সাধনসম্পদকে বিকাশ করিবার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। অখণ্ডকে পাইতে হইলে দুইটি বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ, লক্ষ্যটি একমাত্র অখণ্ডের দিকে স্থাপন করা। খণ্ড সত্তার দিকে লক্ষ্য অভিনিবিষ্ট হইলে সহস্র সাধনাতেও অখণ্ডের উপলব্ধি ঘটে না। সমুদ্র যতই বিশাল হউক না কেন, ক্ষুদ্র ঘট সমুদ্র হইতে জল আহরণ কালে নিজের পরিমাণ অনুসারেই জল আহরণ করিয়া থাকে। সুতরাং লক্ষ্য যাহাতে অখণ্ডের দিকে নিবদ্ধ থাকে তাহার জন্য নিজের আধারকে প্রস্তুত করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, অখণ্ডকে পাইতে হইলে সাধকের ব্যক্তিগত চেষ্টা অখণ্ডভাবেই প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক। চেষ্টার ধারাতে কোনও সূত্রে বিচ্ছিন্নতা আসিয়া গেলে লক্ষ্য অখণ্ডে নিবদ্ধ থাকিলেও অখণ্ডের অনুগ্রহ লাভ অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়ে। চেষ্টা নিয়মিত ভাবে এবং অটুট নিষ্ঠার সহিত অক্ষুণ্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া করা আবশ্যক। মাঝে ব্যবধান পড়িলে পূর্বের সহিত পরের সম্বন্ধ অনেক সময় ভগ্ন হইয়া যায় এবং বহুদিনের সঞ্চিত সাধন-সংস্কার সাময়িক অসাবধানতার ফলে বাহ্য জগতের বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে অভিভূত হইয়া যায়। ইহার জন্য মা উদ্যমশীল সাধককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ফাঁকে পাক পরিয়া যায়।" যাহাতে ফাঁক না পড়ে, অর্থাৎ পূর্বাপর সাধনের পথে নৈরন্তর্য ভগ্ন না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত কারণ পাক পড়িয়া গেলে গ্রন্থিমোচন করিতে অযথা বহু সময় নষ্ট হয়।

সাধন করিতে করিতে কোন-না-কোন সময় এক মঙ্গলময় মহামুহূর্তে সেই মঙ্গলময় মহাপ্রকাশময় সত্তা স্বয়ংই ফলরূপে সাধকের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রকাশিত হন। যাঁহাকে ধরা যায় না, যিনি সকল সাধনের অতীত, তিনি নিজে হইতেই তখন ধরা দেন। ইহারই নাম অধরকে ধরা। বস্তুতঃ ইহা স্বয়ং-প্রকাশ সত্তারই আত্মপ্রকাশন। একমাত্র গুরুতেই এই শক্তি আছে। তা'ই বলা হয়, গুরুই ধারা দিয়া থাকেন এবং গুরুশক্তি স্বভাবের গতিতে সাধককে চালনা করেন। ইহারই নাম "যুক্তিস্থিতির মহাক্ষণের স্পর্শ।" একবার এই স্পর্শ পাইলে আর কিছু পাইবার বাকী থাকে না। কারণ ইহা একটি ক্ষণের ব্যাপার হইলেও এই একক্ষণের মধ্যেই অনন্তক্ষণ নিহিত রহিয়াছে। কাহার জীবনে কখন যে এই মহাক্ষণের উদয় হয় তাহা বলা যায় না। নিজের নির্দিষ্ট কর্ম অধিকার ও সামর্থ্য অনুসারে যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিতে পারিলে এবং ঠিক ঠিক ধৈর্যসহ প্রতীক্ষা করিতে পারিলে সেই ক্ষণ কখনও না কখনও আসিবেই আসিবে। সকল সাধকের কর্মের প্রকৃতি এক নহে। যাহার যে দিক্ অপূর্ণ থাকে কর্মদ্বারা তাহাকে সেই দিক্ পূর্ণ করিতে হয়। এইজন্য সাধকদিগের মধ্যে সকলের কর্মের ব্যবস্থা এক প্রকার হয় না। কাহার কোন্ দিকে কর্ম আবশ্যক গুরুই তাহার নির্দেশ করিয়া দেন।

১১ — করতে করতে জ্ঞান

কেহ কেহ মনে করেন, কর্ম করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু মা বলেন—"বাস্তবিক পক্ষে কর্ম হইতে জ্ঞান হয় না।" জ্ঞান সাধ্য বস্তু নহে, উহা নিত্যসিদ্ধ স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু। উহা উৎপন্ন হয় না, এবং এক হিসাবে বলিতে পারা যায়, আবির্ভূতও হয় না। তাই বস্তুতঃ উহা অন্য-নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র বলিয়া স্বয়ং-প্রকাশ। কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ হইলেও

সাধকের নিকট উহার প্রকাশ বা আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাধকের অন্তঃকরণ নানা প্রকার আবরণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া এই নিত্যসিদ্ধ প্রকাশও তাহার নিকট তিরোহিত হইয়া রহিয়াছে। ক্রিয়ার দ্বারা সাধকের চিত্তগত আবরণ নষ্ট হয়। এইজন্য ক্রিয়ার সার্থকতা সর্বতোভাবে স্বীকার্য। তবে ক্রিয়া জ্ঞানের কারণ নহে, ইহাও সত্য।

১২ — সময় ও স্ব-ময়

সাধক কালরাজ্যে সময়ের অধীন থাকে। তাই একই বস্তু সময় ভেদে তাহার নিকট ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। কালরাজ্যে ভেদ জ্ঞানের প্রাধান্য থাকে। এইজন্য সর্বত্র স্ব-ময় ভাব তখন উদিত হইতে পারে না। কিন্তু কালরাজ্যে ভেদজ্ঞান থাকিলেও সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ পরমার্থের দিকে গতি হয় বলিয়া ভেদজ্ঞানের মধ্যেও ক্রমশঃ একটা উৎকর্ষ অনুভূত হয়। এইজন্য প্রথমে যে সকল তত্ত্বের প্রকাশ হয় তাহার ঊর্ধ্বস্তরে অধিরোহণ করিলে অধিকতর তত্ত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে। তখন বুঝা যায় যে ভেদজ্ঞান ক্রমশঃ অভেদজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চরম অবস্থায় যখন অখণ্ড মহাতত্ত্বের প্রকাশ হয় তখন ঐ একতত্ত্বের সাক্ষাৎকার দ্বারা যাবতীয় মীমাংসা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া যায়।

১৩ — অভাবের গতি ও স্বভাবের গতি

জীবনের ধারা আলোচনা করিলে এই দুইটি গতির সহিত আমরা পরিচয় লাভ করি,—একটি অভাবের গতি ও অপরটি স্বভাবের গতি। সাধারণতঃ জাগতিক জীব অভাবের গতি ধরিয়াই চলিয়াছে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার অভাবের বোধ জাগান ইহার স্বভাব। শুধু তাহাই নহে, অভাবের বোধ জাগানোর সঙ্গে সঙ্গে ঐ অভাব পূরণের চেষ্টাও হইয়া

থাকে। চেষ্টা মাত্রই হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফললাভ হয় না। কারণ অভাব পূরণ হইয়াও ঠিক পূরণ হয় না। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠে সুশীতল বারি নিষেক করিলে শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র হয় এবং পিপাসাও নিবৃত্ত হয়, ইহা সত্য। কিন্তু এই পিপাসা-নিবৃত্তি স্থায়ী হয় না। আবার কিছু সময় পরেই পূর্ব্ববৎ পিপাসার পীড়নে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠে। অভাবের জগতে জীব আছে বলিয়া অভাবের গতিই ক্রিয়া করে। কোন অভাবই পূর্ণ হইয়াও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না, পুনরায় অভাবের উদয় হয়। পিপাসার সকল প্রকার অভাবই এক প্রকার জানিতে হইবে। অভাবের ধারাতে থাকিতে গেলে অভাব-শূন্য হইবার কোন উপায় নাই। সমগ্র জগৎ এই অভাবের গতিতে রহিয়াছে। তাই অভাবের বোধ হইতে চিরশান্তি লাভের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না। কিন্তু মা বলেন, প্রত্যেকের মধ্যেই অভাবের গতির ন্যায় আরও একটি গতি আছে, সেইটি স্বভাবের গতি। সেইটিই মহাগতি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই স্বভাবের ধারা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কার্য করিতেছে। কিন্তু আমাদের চৈতন্য অভাবের সংস্পর্শে জড়িত বলিয়া স্বভাবের ধারার কোন সন্ধান রাখে না। ফল্গু-নদীর ধারা যেমন অন্তঃ প্রবাহশীল, স্বভাবের ধারাও তেমনি অতি গুপ্ত এবং ভিতরে ভিতরে ক্রিয়াশীল। গুরু কৃপাতে এবং নিজের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফলে যদি কখনও এই ধারাতে পতিত হওয়া যায় তাহা হইলে অনন্তকালের জন্য অভাবের পীড়ন হইতে মুক্তি লাভের পথ পাওয়া যায়। অভাবের ধারাতে যেমন স্বভাব বা অপূর্ণতার বোধই স্বাভাবিক, তেমনি স্বভাবের ধারাতে পূর্ণতা লাভ স্বাভাবিক। স্বভাবে স্থিতি দান করা স্বভাবের কর্মের পূর্ণতা সাধন করা, ইহাই স্বভাবের ধারার বৈশিষ্ট্য। একবার এই ধারার স্পর্শ লাভ করিলে মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। কারণ শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, এই ধারাই তাহাকে স্বভাবে অথবা পূর্ণতাতে পৌঁছাইয়া দিবে এবং তাহার সকল প্রকার অপূর্ণতা দূর করিবে। প্রশ্ন হইতে পারে, জীব

স্বভাবের গতি কখন প্রাপ্ত হয়? মা ইহার উত্তরে বুঝাইয়াছেন—যদিও স্বভাবের গতি প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সর্বদা রহিয়াছে, তথাপি উহা ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে না, যতক্ষণ জীব জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত না হয়। মা বলেন—যখন হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়, যখন এ জগতের কোন বস্তুই আর মনকে শান্তি দিতে পারে না, যখন চারিদিকে অবিচ্ছিন্ন এবং অসহ্য জ্বালা ও তাপ অনুভূত হয়, তখনই স্বভাবের গতি আপনা হইতে জাগিয়া উঠে। জাগতিক আনন্দ বিরস বোধ না হইলে, জাগতিক ঐশ্বর্য এবং শক্তি মন হইতে প্রত্যাহৃত না হইলে, স্বভাবের আকর্ষণ জীব অনুভব করিতে পারে না। স্বভাবের গতি অনুভব করাও যা, নিত্যসিদ্ধ গুরুর অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চারও তাহাই। কারণ স্বভাবের ধারাতে জীবকে চালনা করা, ইহাই গুরুর অনুগ্রহশক্তির প্রধান কার্য।

সাত

১ — বিকৃত ক্ষণ ও মধ্যক্ষণ

ক্ষণের কথা পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ক্ষণ একই, তাহারই মধ্যে সর্বক্ষণ রহিয়াছে। যাহাকে মহাক্ষণ বলা যায় তাহাও তাহাতেই এবং যাহাকে মা কোন কোন স্থানে বিকৃতক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও তাহাতেই। মূলে ক্ষণ এক ভিন্ন দুই নাই। এইজন্য যোগ্যভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "এক এব ক্ষণঃ, তস্মিন্ একস্মিন্নেব ক্ষণে সর্বং জগৎ পরিণামম্ অনুভবতি।" অর্থাৎ একই মাত্র দ্বিতীয় ক্ষণ বলিয়া কিছুই নাই।

সেই একই ক্ষণে নিখিল জগৎ অনন্ত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। মানুষের যখন জন্ম হয়, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যখন মনুষ্যসত্তার প্রথম সঞ্চার হয় অথবা দেহপুষ্টির পর মাতৃগর্ভ হইতে মনুষ্য যখন ভূমিষ্ঠ হয় সেই ক্ষণটিকে মনুষ্যজীবনের মূল ক্ষণ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। উহা অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ উহাই তাহার সমগ্র জীবনের নিয়ামক। প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত জীবনের মধ্য দিয়া ঐ একটি ক্ষণেরই বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া চলিতে থাকে। ঐ মূল ক্ষণটিতে সমগ্র জগতের আপেক্ষিক সম্বন্ধমূলক সত্তাটি নিহিত রহিয়াছে। উহাতে যে সকল শক্তি নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকে জীবনের পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ তাহাদেরই অভিব্যক্তি হয়। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ ও পুষ্প-ফলাদি যাবতীয় সম্ভার অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে, তদ্রূপ ঐ একটি ক্ষণের মধ্যেই বিস্তারপ্রাপ্ত সমগ্র জীবনের যাবতীয় বৈচিত্র্য নিহিত থাকে। যাহাকে আমরা কাল বলিয়া ব্যাখ্যা করি তাহা যোগীর দৃষ্টিতে ঐ ক্ষণেরই কল্পিত বহুত্বমূলক বিস্তার মাত্র। ঐ ক্ষণটিকে সম্যক্ প্রকারে আয়ত্ত করিতে পারিলে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমগ্র জীবন ও উহার অন্তর্গত কর্ম ও ভোগবৈচিত্র্য সবই আয়ত্ত হয়। এইটি পূর্ণ সত্তার দিক্ হইতে অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় এবং অনিত্য প্রকাশের দিক্ হইতে বলা হইল। পক্ষান্তরে সাধকের সাধনবলে ও সমুদিত সৌভাগ্যের প্রভাববশতঃ যে ক্ষণটি আবির্ভূত হয় সেইটি মহাক্ষণ। উহাই তাহাকে তাহার পূর্ণতার পথে সাথীরূপে চালনা করে। ঐ ক্ষণের স্পর্শ লাভ হইলে মনুষ্যের নিকট নিত্যসত্যের প্রকাশ হয় এবং তাহার সকল ক্রিয়া পূর্ণতায় পর্যবসিত হয়। ঐ সময়ে মনুষ্যের নিকট তাহার নিজের স্বরূপ হইতে পৃথক্ কিছুই থাকে না অর্থাৎ সবই তখন এক অদ্বৈতরূপে প্রতিভাত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যেখানে পার্থক্যের কোন ভান থাকে না সেখানেও পার্থক্যের স্ফুরণ স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। ঐ অবস্থায় মহাসত্য—বিকল্পহীন, অখণ্ড, অবারিত সত্য— আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া ভেদ ও অভেদের মধ্যে কোন প্রকার

দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না। তখন ভেদের মধ্যেও স্পষ্ট অভেদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং অভেদের মধ্যেও অনন্ত বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। বিরুদ্ধ ধর্মের প্রভাবে পরস্পরের সহাবস্থান অসম্ভব হইলেও অখণ্ড প্রকাশের স্ফুর্তি হইলেও এই অসম্ভবও সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হয়। এইজন্যই পার্থক্য বা ভেদও যেমন সত্য, অভিন্নতা ও সাম্যও তেমনি সত্য। প্রকৃত মহাসত্য তাহাই যাহাতে এই বিরুদ্ধধর্মাক্রান্ত দুইটি খণ্ডসত্যের সমন্বিতরূপে একই মহাসত্য নিজেকে নিজে প্রকাশ করে। বিকৃত ক্ষণ ও মহাক্ষণের ইহাই পার্থক্য।

২ — মহাপ্রকাশের মহিমা

যোগীর নিকট আবরণ থাকিয়াও থাকে না অর্থাৎ জাগতিক জীবের দৃষ্টি যেখানে আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় যোগীর নির্মল দৃষ্টি সেখানে আবরণ দেখিতে পায় না। পক্ষান্তরে লৌকিক দৃষ্টিতে যেখানে কোন প্রকার আবরণ অনুভূত হয় না যোগী সেখানেও আবরণ সৃষ্টি করিতে পারে। এই যে আবরণের মধ্যে অনাবৃত ভাব এবং অনাবৃত মুক্ত স্বরূপের মধ্যেও আবরণের সৃষ্টি, ইহার উভয়েরই মূল ঐ মহাপ্রকাশের মহিমা। পর্দা অথবা আবরণ এই প্রসঙ্গে দুই দিক্ হইতেই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান বা দৃষ্টিশক্তি এবং কর্ম বা ক্রিয়াশক্তি, এই দুইদিক্ হইতেই আবরণ থাকা অথবা না থাকার কথা বলা হইতেছে। আগমে স্পষ্ট নির্দেশ করা হইয়াছে যে মূলতঃ জ্ঞান ও ক্রিয়াতে কোন ভেদ নাই। প্রাধান্য অনুসারে এবং বক্তার বিবক্ষা অনুসারে ভেদ কল্পনা করা হয় মাত্র। কিন্তু যাহা অখণ্ড চৈতন্য তাহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ই রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, দুই-ই সেখানে অভিন্ন। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে জ্ঞানের আবরণ আলাদা এবং এই আবরণের অপসারণও ক্ষেত্রভেদে আলাদা আলাদা। কারণ জ্ঞানের আবরণ অপসারিত হইলেও খণ্ডদৃষ্টির সম্মুখে

কর্মের আবরণ বজায় থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে কর্মের আবরণ কাটিয়া গেলেও স্থূলদৃষ্টিতে জ্ঞানের আবরণ থাকিতে পারে। কিন্তু মহাক্ষণের স্পর্শ হইলে অর্থাৎ মহাপ্রকাশের উদয় হইলে জ্ঞান ও কর্মের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ কাটিয়া যায় বলিয়া আবরণ নিবৃত্তি-ও মূলে একই। তাই একই সঙ্গে উভয় আবরণ নিবৃত্ত হইয়া যায়। তাই এইদিক্ হইতে মা বলিয়াছেন, "যে যোগে পর্দার আড়াল তার কর্মের বাধা দিতে পারে না এই দেখাটাও সেই প্রকার হয়।" শুধু তাহাই নহে, লৌকিকদৃষ্টিতে গতি ও স্থিতি পরস্পর বিরুদ্ধ, থাকেও তাহাই। কিন্তু মহাপ্রকাশের এমনি মহিমা যে গতিতে স্থিতি অথবা গতিই যে স্থিতি তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে স্থিতিতে গতি বা স্থিতিই যে গতি তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। মা বলিয়াছেন, "যে দেখতে পারে তার কাছে গতি স্থিতি ভিন্ন থেকেও ভিন্ন নেই। ওখানে সবই সম্ভব।" যে দেখিতে পারে না অর্থাৎ যাহার সম্যক্ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় নাই, সে গতিতে গতিই দেখে এবং স্থিতিতেও স্থিতিই দেখে। কিন্তু গতিতে স্থিতি দেখিতে হইলে অথবা গতিকে স্থিতিরূপে দেখিতে হইলে মহাপ্রকাশের স্পর্শ আবশ্যক। কারণ বিরুদ্ধের মধ্যে অবিরুদ্ধের দর্শন মহাপ্রকাশ ভিন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ অবিরুদ্ধ ও অখণ্ডসত্তার বক্ষের উপরেই বিরুদ্ধ খণ্ডসত্তা খেলা করিতেছে। লৌকিক দৃষ্টি স্বভাবতঃই খণ্ডসত্তা দেখিতে পায়। খণ্ডসত্তা অপূর্ণ। কিন্তু অপূর্ণতাও পূর্ণের বুকে নিত্য বিকাশ পাইয়া থাকে। তাই পূর্ণদৃষ্টির উদয় হইলে সর্বব্যাপক মহাসত্তা ত দেখা যায়ই, পরন্তু তাহার অন্তরালে অপূর্ণ খণ্ডসত্তাও দেখা যায়। উহাই অবিরোধী সত্তা। তাহার অভাব কোথাও নাই এবং হইতেও পারে না। এইজন্য এই মহাসত্তার সাক্ষাৎকার হইলে জাগতিক সর্বপ্রকার বিরোধ বিরুদ্ধ থাকিয়াও অবিরুদ্ধ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব যাহার পূর্ণ সত্য দর্শনের শক্তি জন্মিয়াছে তাহার নিকট কোন বিরোধই বিরোধ নহে অর্থাৎ উহা সকলের নিকট বিরোধরূপে প্রতীত

হইলেও তাহার নিকট অবিরোধরূপেই প্রতীত হয়। ইহার একমাত্র কারণ ঐ মহাপ্রকাশের মহিমা। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ অবিরুদ্ধদর্শী পুরুষকে বুদ্ধিমান্, যুক্তযোগী এবং কৃৎস্নকর্মকৃৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।"

ইহার তাৎপর্য—এই যে কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দেখিতে পারে সেই বুদ্ধিমান্, তাহাকেই যুক্তযোগী বলা উচিত। তাহার পক্ষে দেখা ও করাতে কোন পার্থক্য থাকে না, অর্থাৎ এই প্রকার দেখিতে পারিলেই যাবতীয় কর্ম করা হইয়া যায়। এইরূপ দর্শন প্রাপ্ত হইলে কিছুই করিবার অবশিষ্ট থাকে না। সেটি নিত্যপ্রাপ্ত মহাযোগীর অবস্থা। কারণ তখন কিছুর সঙ্গেই তাহার ব্যবধান থাকে না। মহাক্ষণের প্রকাশ ধরা যায় বলিয়া প্রকাশের মহিমায় অসম্ভবও তখন সম্ভব হয়, অঘটনও ঘটিয়া থাকে। তাই মা ঐ স্থিতিকে "চমৎকার রাজ্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "মহাক্ষণে এই স্থিতি অস্থিতি থেকেও নাই এবং আছে।" শুধু তাহাই নয়, মহাক্ষণ ও বিকৃতক্ষণের যে ভেদ তাহাও তখন থাকে না। কারণ ঐ অখণ্ডে খণ্ডরূপে কিছু নাই বলিয়া খণ্ডও সেখানে উহার সহিত অভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

আট

১ — ক্ষণ ও সময়

মা বলেন, "ক্ষণ মানে সময়, কিন্তু তোমাদের এ সময় নয়। সময় মানে স্ব-ময়, যেখানে স্ব ছাড়া আর কথাই নাই।" মায়ের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ক্ষণের তত্ত্বটি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। সাধারণতঃ সময় বা কালের কল্পিত ক্ষুদ্রতম অংশকে ক্ষণ বলা হয়। যোগী সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে, যে সময়ে একটি পরমাণু একটি প্রদেশ ত্যাগ করিয়া প্রদেশান্তর আশ্রয় করে সেই ক্ষুদ্রতম কালের অবয়বকে ব্যবহারের ভাষাতে ক্ষণ বলে। বাস্তবিক ইহা পরিভাষা মাত্র। চিন্তাশীল দার্শনিকগণ কেহ কালকে অখণ্ডদণ্ডায়মান ও নিত্য স্বীকার করিয়া ক্ষণকে তাহারই একটি কল্পিত অংশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই এই অবয়ব-বিভাগ কল্পনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। কারণ নিষ্ক্রিয় সত্তাতে বিভাগ থাকে না। ইহা একপক্ষের মত। অন্য পক্ষে ক্ষণকেই মূলসত্তারূপে গ্রহণ করিয়া কালকে তাহা হইতে আবির্ভূত বৌদ্ধসত্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, অর্থাৎ কালের অস্তিত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব পর্যন্ত স্বীকৃত হয়। যেখানে বুদ্ধির ক্রিয়া থাকে না সেখানে বৌদ্ধপদার্থ কালেরও অস্তিত্ব থাকে না। সেই অবস্থাটি বাস্তব সত্য। যেখানে পূর্বাপর ভাগ নাই, একমাত্র সত্তা বিরাজ করে তাহাই ক্ষণ। দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন বলিয়া ক্ষণ ও কাল সম্বন্ধে এই প্রকার বিভিন্ন কল্পনা উত্থিত হয়। ইহা ছাড়া আরও বহু প্রকার কল্পনা আছে। এই স্থানে উহার আলোচনা অনাবশ্যক। মা বলেন, ক্ষণ বলিতে সেই মহাসত্তাকে বুঝিতে হইবে যেখানে স্ব ভিন্ন অপর কোন অস্তিত্ব অনুভূত হয় না অর্থাৎ যেখানে এক ভিন্ন দ্বিতীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা

যায় না। সেই মহাপ্রকাশময় সত্তাই সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির মূলে নিজ স্বভাবে বিরাজ করিতেছেন। বস্তুতঃ তাহাই সকল পদার্থের স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ অর্থাৎ নিজরূপ। ক্ষণ বলিতে এই স্ব-ময় ভাবটিকে বুঝিতে হইবে। ইহা যে ভাবাতীত তাহাও ঠিক বলা যায় না,—বস্তুতঃ যেখানে বিভাগ নাই এবং পূর্বাপরের বিরোধ নাই সেই পরম অদ্বয় স্বপ্রকাশ এবং অসংবেদ্য স্থিতিটিই স্ব। মহাক্ষণের ইহাই তাৎপর্য। পূর্বে ক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই প্রকারান্তরে প্রকাশ।

২ — মহাযোগ কাহাকে বলে

এই যে ক্ষণের আলোচনা করা হইল ইহা হইতেই মহাযোগের তত্ত্বটিও কিছু কিছু ধারণা করা যাইতে পারিবে। প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ ধারায় চলিয়া থাকে। কিন্তু যে ধারাতেই যে চলুক তাহাকে তাহারই আপন ধারা অনুসারে এমন একটি ক্ষণ পাইতে হইবে যাহা সে যে সর্বত্র সর্বসত্তার সঙ্গে সমভাবে যুক্ত রহিয়াছে এই মহাসত্যের প্রকাশ সম্ভবপর হয়। ইহারই নাম মহাযোগের প্রকাশ। ক্ষণ মূলে এক হইলেও ব্যক্তিগত ধারায় ভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রকাশ যদি বাস্তব প্রকাশ হয় তাহা হইলে ইহা মহাপ্রকাশরূপে ফুটিয়া উঠে। খণ্ডভাবের উন্মেষ, ইহাই ক্ষণের মুখ্য পরিচয়। ধারা পৃথক্ হইলেও ধারাগত পরিণামের পূর্ণ পর্যবসান এই মহাপ্রকাশের উদয়। এই মহাপ্রকাশই বস্তুতঃ মহাযোগের প্রকাশ। যোগ নিত্য সিদ্ধ, উহা সাধনের ফল নহে এবং কোনও ক্রিয়ারই পরিণামও নহে। উহা ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে অব্যক্তরূপে বর্ণনীয়, কিন্তু উহা আছে, উহাকে গঠন করিতে হয় না। ক্ষণের সম্বন্ধ পাইলেই ঐ অব্যক্ত অথচ চিরব্যক্ত মহাপ্রকাশ সাধকের নিকট স্বপ্রকাশরূপে ফুটিয়া উঠে। তখন

দেখা যায় এই মহাযোগ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুর সহিত, শুধু তাহাই নহে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ যাবতীয় অবস্থার সহিত এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান সর্বপ্রকার কালের সহিত অভিন্নরূপে নিত্য সম্বন্ধ। শুধু তাহাই নহে। এই মহাপ্রকাশের সৎ ও অসৎ এর বৈকল্পিক ভেদও অস্তমিত হইয়া যায়। এই স্থিতিতে বিরোধ থাকিয়াও অবিরোধের সহিত একাকার হইয়া প্রকাশ পায়। মা এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন, "ইহা আছে, নাই, নাইও না, আছেও না।" অর্থাৎ ইহাকে সৎ বলিলেও হয়, অসৎও বলা চলে, আবার সৎও বলা চলে না, অসৎও বলা চলে না, সবই একই সময়ে। মা'র এই বর্ণনা হইতে শূন্যবাদী বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনের প্রসিদ্ধ কারিকাটি মনে পড়ে। "চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ।" অর্থাৎ যাহা প্রকৃত তত্ত্ব তাহাকে আছে বলিয়া বর্ণনা করা যায় না এবং নাই বলিয়া ও বর্ণনা করা যায় না এবং একই সময়ে আছে এবং নাই এই উভয় প্রকারেও বর্ণনা করা চলে না এবং এই উভয় প্রকারের অতীত কোন প্রকার কল্পনা করিয়াও তাহার নির্দেশ করা চলে না। ব্যবহার ভূমিতে বলিতে গেলে কোন একটি ধারা ধরিয়া বর্ণনা করিতে হয়। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই চতুর্বিধ প্রকারের কোন প্রকারেই তাহার স্বরূপেরই পরিচয় দেওয়া যায় না। নাগার্জুনের ন্যায় প্রাচীন বৈদান্তিকগণও এই জাতীয় বহু কথা বহু স্থানে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক সত্য এই, যেখানে পূর্ণ অদ্বয় স্বরূপের কথা বলা হইতেছে সেখানে এক পক্ষে যেমন কিছুই বলা যায় না ইহা সত্য, তেমনি অন্য দিক্ হইতে দেখিতে গেলে উহাকে যে যে-ভাবে বলিতে চায় সে সেইভাবেই বলিতে পারে এবং সেই বলাও সত্য বলিয়া গ্রাহ্য। তাই মা বলেন যে উহা "যে যা' বলে তা'ই"। মহাযোগ উহারই প্রকাশ মাত্র।

আমরা পূর্বে মহাক্ষণ ও বিকৃত ক্ষণের কথা বলিয়াছি। বিকৃত ক্ষণ তাহাই যাহা আমার খণ্ডজীবনকে নিয়মিত করে। এই কথাও পূর্বে বলা

হইয়াছে। ঐ ক্ষণমূল অবিদ্যারূপ গাঢ় অন্ধকারময় অজ্ঞানের ক্ষণ। তখন 'আমি' প্রকাশিত হয় অথচ প্রকাশের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নিজের উপলব্ধিতে থাকে না। এইজন্যই এই ক্ষণ হইতে জীবনের যে ধারাটি নিয়মিত হয় তাহাতে যতই জ্ঞানের বিকাশ হউক না কেন, নিজের স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয় না। সাধনার ফলেই হউক অথবা উভয়ের সম্মিলিত প্রভাববশতঃই হউক যখন মহাক্ষণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রভার ন্যায় একটি ক্ষণের মধ্যে অখণ্ডভাবে, ক্রমবিবর্জিতভাবে, সমগ্র, মহাসত্তারূপী নিজ প্রকাশটিকে নিজ স্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারে। এই অবস্থাটি নিজেকে নিজের 'আশ্চর্যবৎ' দর্শন করা, যাহার কথা গীতাতে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই আত্মদর্শন। ইহা ক্রমশঃ হয় না, খণ্ডভাবেও হয় না এবং কালের মধ্যেও হয় না। এই সমগ্র অক্রম সাক্ষাৎকার স্ব-প্রকাশময় আত্মারই সাক্ষাৎকার। এই অবস্থায় দ্বিতীয় কিছু দর্শনীয়রূপে অবশিষ্ট থাকে না। এইজন্যই এইভাবে নিজেকে জানিলে বা দর্শন করিলে দ্বিতীয়বার কিছু জানিবার বা দর্শন করিবার থাকে না। একেই অনন্ত এবং অনন্তেই এক, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। তাই বলা হয়, নিজেকে পাইলেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পাওয়া হইয়া যায়।

৩ — অভাব ও স্বভাব

যাহা অভাব তাহাই স্বভাব। মূলে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। বৈচিত্র্য যতই থাকুক, তাহা যে একেরই বিলাস, শুধু বিলাস নহে, একই, তাহার প্রকাশই যথার্থ প্রকাশ। জীবের অভাব মিটে না ইহা সত্য। ইহার একমাত্র কারণ এই যে জীব অভাব দিয়াই অভাব মিটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা প্রকৃত পথ নহে। স্বভাব না পাইলে, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, অভাব মিটিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত অভাব বোধ জাগে না

বলিয়াই অভাবের দ্বারাই অভাব মিটাইবার চেষ্টা করা হয়। তীব্র অভাবের বেদনা জাগিয়া উঠিলে তাহা হইতেই আপন আপন স্বভাবের সাড়া পাওয়া যাইবে। অভাব-বোধ উদিত হওয়াই অভাব বোধ-নিবৃত্তির একমাত্র হেতু। ইহা যত তীব্রভাবে হইবে ততই স্বভাবের উপলব্ধি নিকটবর্তী হইবে। তৃষ্ণা পানীয় জলের অভাব সূচনা করে ইহা সত্য, কিন্তু চিত্ত অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া শুধু এই জলের অভাবের দিকে স্থাপিত হইলে এবং উহা তীব্র হইলে এই তীব্র অভাবের বোধের ফলেই আপনা-আপনি পানীয় জল আবির্ভূত হইবে, হইতে বাধ্য। কাহারও নিকট চাহিবার প্রয়োজন নাই। কারণ মূলে যাহা অভাব তাহাই স্বভাব। কিন্তু বোধ থাকা চাই। এই জন্য মা বলেন, অভাব যাহা স্বভাবও তাহাই, মূলে বিরোধ ত কোথাও নাই, অথচ ব্যবহার ভূমিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রকাশ খুলিয়া গেলে দেখা যায় বিরোধের মধ্যে বিরোধের অতীত মহাসাম্য বিদ্যমান রহিয়াছে। মিলনের মধ্যে বিরহ এবং বিরহের মধ্যে মিলন যে দেখিতে শিখিয়াছে সেই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ অর্থাৎ অদ্বৈত দৃষ্টিই দৃষ্টি, ইহাই চরম সত্য। অর্থাৎ সবই মূলে এক। তা'ই মা বলেন, "দুই বল, এক বল, অনন্ত বল, যে যা' বল সবই ঠিক।" অর্থাৎ সকলই বিকল্প। তাই যাহা বলা চলে না, যাহা চিন্তার অতীত, তাহা আবার সর্বপ্রকারে বলাও চলে, চিন্তাও করা যায়। ইহা এমনই অদ্ভুত বস্তু। ইহাকে জানিবার ইচ্ছাই প্রকৃত জিজ্ঞাসা। প্রকৃত অভাব বোধ না জাগিলে এই প্রকার জিজ্ঞাসা উদিত হইতে পারে না।

নয়

১ — জীব এক অথবা নানা

যাঁহারা বেদান্ত দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে মূলে জীব এক অথবা নানা এই প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যাঁহারা একজীববাদী তাঁহারা জীবের নানাত্ব ঔপাধিক বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু যাঁহারা নানা-জীববাদী তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্য প্রকার। দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ এই দুইটি মতই প্রাচীন বেদান্ত দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টিই সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টি দৃষ্টির সমকালীন অথবা সমসত্তাক, এই মতটি একজীববাদীর সম্মত সিদ্ধান্ত। দৃষ্টি হইতে অতিরিক্ত সৃষ্টি স্বীকার করিতে এক-জীববাদী রাজী হন না। কারণ তন্মতে দৃষ্টির সত্তা ও সৃষ্টির সত্তা স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া অথবা দৃষ্টির কাল এবং সৃষ্টির কাল মূলতঃ একই বলিয়া দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ ভিন্ন অন্য কোন মত যুক্তি সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয় না। এই মতের সঙ্গে প্রাচীন বিজ্ঞানবাদীর মতের কিয়দংশ সাদৃশ্য আছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দৃষ্টিরই প্রাধান্য। সৃষ্টি দৃষ্টি হইতে স্বভাবতঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে। অনেকের মতে ইহাই বেদান্তের তাৎপর্য। কিন্তু স্থূলদর্শী লৌকিক জগৎ এই গভীর তাৎপর্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ বলিয়া কোন কোন আচার্য তাহাদের ধারণার অনুরূপ সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদও স্বীকার করিয়াছেন এবং তদনুসারে জীবের নানাত্বও সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদের তাৎপর্য এই,—সৃষ্টি পূর্বকালীন এবং দৃষ্টি উত্তরকালীন। অর্থাৎ পদার্থ প্রথমে সৃষ্ট হয়, তাহার পর সেই সৃষ্ট পদার্থকে দ্রষ্টা দর্শন করিয়া থাকে। ব্যবহার-ভূমিতে আমরা সকলেই এই রূপই বিশ্বাস করি।

যাহার নাম দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে তাহারই নাম এক-জীববাদ। পক্ষান্তরে সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ ও নানা-জীববাদ একই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। এক-জীববাদ মতে একটি জীবের মুক্তিতেই সর্বমুক্তি সম্পন্ন হয়। কারণ ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেকটি জীবের পৃথক্ মুক্তির প্রশ্ন উঠে না—একটি পুষ্প দশটি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে দশটি পৃথক্ পুষ্পরূপে প্রতীয়মান হয়। এই দশটি পুষ্পের যে-কোন পুষ্পকে পৃথক্‌ভাবে অপসারণ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু মূল পুষ্পটি অপসারিত হইলে বিনা চেষ্টায় অন্য নয়টি পুষ্পও একই সঙ্গে অপসারিত হইয়া যায়। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ অপসারণের প্রশ্ন উঠেই না। তদ্রূপ এক-জীববাদীর দৃষ্টি অনুসারে যেটি মূল জীব তাহাই নানা জীবরূপে প্রতিভাসমান হইতেছে। অবিদ্যার অংশই হউক অথবা অন্তঃকরণই হউক অথবা অন্য যে কোন সত্তাই হউক তাহাতে একই জীব প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে সময়ে ঐ মূল একমাত্র জীবটি মুক্তিলাভ করিবে সেই সময়ে উহার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আভাসরূপী অসংখ্য জীবও মুক্তি লাভ করিবে। এক-জীববাদীর মতে সেই মূলজীবের মুক্তি এখনও হয় নাই। যদি তাহা হইত তাহা হইলে এখন কোন বদ্ধ জীবেরই অস্তিত্ব থাকিত না। কারণ বিম্বের অভাবে প্রতিবিম্বের সত্তা সম্ভবপর নহে।

বস্তুতঃ জীব এক অথবা নানা এই সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতগণের বিচারের অন্ত নাই। প্রকৃত সত্য এই—জীব এক ইহাও সত্য, এবং জীব নানা ইহাও সত্য। দৃষ্টিভেদে দুইটি মতই সমান সত্য। আবার এমন দৃষ্টিও আছে যাহাকে আশ্রয় করিলে জীবের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সেই দৃষ্টিতে জীব নামে কোন বস্তুই নাই—একই ঈশ্বর এক অথবা নানা জীবরূপে প্রতিভাসমান হইতেছে। আবার এমন দৃষ্টিও আছে যাহাতে জীব ও ঈশ্বর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—এক অখণ্ড সত্তা

স্বয়ংপ্রকাশরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। তাহাই জীবরূপে ও ঈশ্বররূপে, এমন কি জড় পদার্থরূপে খণ্ডদৃষ্টি দর্শকের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ সত্তা হইতে পৃথক্ জড়, জীব, অথবা ঈশ্বর নামে কোন বস্তু নাই। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সত্যের বিভিন্ন রূপ উপলব্ধি-গোচর হয়। এই সকল বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্যে একটিকে সত্য বলিয়া অন্যটিকে অসত্যরূপে প্রত্যাখ্যান করিবার বাস্তবিক কোন হেতু নাই। কিন্তু গণ্ডীবদ্ধ মানুষ নিজ নিজ প্রাক্তন সংস্কারের গণ্ডী অনুসারে নিজের ভাবানুরূপ দৃষ্টিটি গ্রহণ করিয়া থাকে। সে তদ্বিরুদ্ধ অন্য দৃষ্টিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যাহার দৃষ্টি নিত্যমুক্ত, অর্থাৎ কোন প্রকার বিশিষ্ট ভাবের দ্বারা রঞ্জিত নহে, তাহার পক্ষে সত্যের সকলরূপই সমরূপে উপাদেয়।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির দিক্ হইতেও জীবের একত্ব অথবা নানাত্বের সিদ্ধান্ত আলোচিত হইয়া থাকে। বহু ব্যষ্টির একীভাব সমষ্টিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সমষ্টিতে একত্বের অভিমান থাকিলে তাহাকে এক বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তি-সম্মত। কিন্তু যখন সমষ্টিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যষ্টি সত্তাকে পৃথক্ ভাবে আবিষ্কার করা যায় তখন সেই পৃথক্ ব্যষ্টি সত্তার অভিমানের দিক্ হইতে জীবের নানাত্বও স্বীকার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহাকে সমষ্টি বলা হইল তাহাও আপেক্ষিক সমষ্টি জানিতে হইবে। কারণ বহু সমষ্টির সমবায়ে যে বৃহত্তর সমষ্টি উদ্ভূত হয় তাহাতেও পূর্ববৎ একত্বের অভিমান সম্ভবপর। এই দিক্ হইতে দেখিতে গেলে এই বৃহত্তর সমষ্টিতে অভিমানী জীবকে একজীব বলিয়া গ্রহণ করা চলিতে পারে। কিন্তু সমষ্টির বিশ্লেষণের ফলে পূর্ববৎ জীব-নানাত্ব আবির্ভূত হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির আপেক্ষিক সম্বন্ধ প্রকৃত মহাসমষ্টিতে যাইয়া পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি, যাহাতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্ভূত, একই অখণ্ড শরীররূপে গৃহীত হইতে পারে। যে এই মহাশরীরে অভিমানশীল

সেই মূল একজীব। এই মহাসমষ্টির পরে সৃষ্টি নাই বলিয়া এই এক জীবই মূল জীব। অন্যান্য জীব খণ্ড খণ্ড পৃথক্ শরীরে অভিমানশীল বলিয়া নানা জীবের অন্তর্গত।

প্রাচীন বৈষ্ণবগণ এই দৃষ্টি লইয়াই জীবের একত্ব ও বহুত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। মহাসমষ্টির অভিমানী জীব, সমষ্টির অভিমানী জীব এবং ব্যষ্টির অভিমানী জীব আলোচনার সৌকর্য্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এক মহাসমষ্টি জীবের অন্তর্গত অসংখ্য সমষ্টি জীব বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্রূপ একটি সমষ্টি জীবের অন্তর্গত কোটি কোটি ব্যষ্টি জীব বিদ্যমান রহিয়াছে। দেহের অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই জীবের জীবভাব কল্পিত হইয়া থাকে। সমগ্র সৃষ্টিই যেখানে সেইরূপে কল্পিত সেখানে তাহার অভিমানী জীব এক ভিন্ন দুই প্রকারে কিরূপে হইবে। যুক্তির অনুরোধে ব্যষ্টির সীমা এবং মহাসমষ্টির সীমা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সৃষ্টি অনন্ত বলিয়া সীমা কোথাও নাই। মহাসমষ্টির পরেই মহত্তর সমষ্টি সম্ভবপর, এবং তদ্রূপ ব্যষ্টির ভিতরেও ক্ষুদ্রতর ব্যষ্টি থাকা অসম্ভব নহে। অতএব জীব এক অথবা নানা এই প্রশ্নের ইহাই উত্তর—জীব যে দৃষ্টিকোণ হইতে মানা হয় তদনুসারে একও হইতে পারে অথবা নানাও হইতে পারে। উভয় মতই সমরূপে স্বীকার্য, তবে দৃষ্টিভেদে। এইজন্য মা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন— "যেমন তোমার হাত, তোমার পা, তোমার আঙ্গুল, তোমার মাথা, সর্বাঙ্গ নিয়া তুমি একটি জীব। আবার যদি তুমি একজীব না বলিয়া তোমাতে অনন্ত জীব বল—তোমার সমগ্র শরীরে কত জীব ইত্যাদি।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য চক্ষু দান করিয়া নিজের দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্বরূপ দর্শনের কথা বহু স্থানেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রতি দেহের মধ্যেই বিশ্বরূপ রহিয়াছে। এক একটি লোমকূপে যদি এক

একটি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সমগ্র দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একটি ব্রহ্মাণ্ডই মূলতঃ কোটি কোটি ব্যষ্টি জীবের সমষ্টি। তাই একটি দেহকে এক বলা যায়, যদি উহা একত্বের দৃষ্টি নিয়া পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি ঐ দেহকেই এক বলা সম্ভবপর হয় না যদি উহাতে নানাত্বের দৃষ্টি দিয়া বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য উপলব্ধি-গোচর হয় এবং ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনে না করিয়া উহাদিগকে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট মনে করা হয়।

২ — সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সর্বক্ষণ

জীব যেমন এক অথবা অনন্ত দুইই বলা চলে, আবার জীব নাই, একমাত্র পরম সত্তাই আছে, ইহাও বলা চলে, তদ্রূপ সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধেও ধারণা করিতে হইবে। সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে প্রথমে সৃষ্টি হয়, তারপর সৃষ্ট বস্তুর স্থিতি হয় এবং স্থিতির পর উহার লয় হয়। সুতরাং সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ে একটি স্বাভাবিক ক্রম আছে যাহা অতিক্রম করা যায় না। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই মনে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দৃষ্টি যখন সূক্ষ্ম হয় এবং আবরণ-মুক্ত হয় তখন সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের গভীর রহস্য চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। যেমন একজন লোকের স্থানান্তর প্রাপ্তি বা গতিকে আপেক্ষিক দৃষ্টি অনুসারে 'যাওয়া' বলা যাইতে পারে অথবা 'আসা'ও বলা যাইতে পারে,—কারণ একই ব্যাপার যাহা একদিক্ হইতে 'যাওয়া' তাহাই অপর দিক হইতে দেখিলে 'আসা', দৃষ্টিভেদে নামভেদ—তদ্রূপ এক দৃষ্টিতে যাহার নাম সৃষ্টি, বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহারই নাম হয় সংহার। আমি যে ব্যাপারকে সৃষ্টি মনে করিতেছি সেই একই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ তাহাকে সংহারও মনে করিতেছে। এইখানে আমরা যখন সূর্যোদয় নিরীক্ষণ করি পৃথিবীর অপরার্ধ

হইতে অন্য লোকে সেই ব্যাপারকে সূর্যাস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। সৃষ্টি ও সংহার পরস্পর বিরুদ্ধ ইহা সত্য, কিন্তু ইহা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে। বস্তুতঃ সৃষ্টির মধ্যেই সংহার রহিয়াছে। অনুরূপ দৃষ্টিলাভ করিলে ইহা অবশ্য অনুভব করা যায়। সুতরাং সৃষ্টি কেবল সৃষ্টি নয়, সংহারও কেবল সংহার নয়। তদ্রূপ স্থিতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এক সৃষ্টির মধ্যেই একই সময়ে সৃষ্টি স্থিতি সংহার সবই আছে। তদ্রূপ স্থিতি ও সংহারের মধ্যেও সৃষ্টি আদি প্রত্যেকটি ব্যাপার রহিয়াছে। তাই মা বলেন—"তুমি যখন যেই পা বাড়ালে ওখানে যাবে, সেই মুহূর্তেই তোমার স্থান ত্যাগ, স্থান গ্রহণ, গতি, স্থিতি।" বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, কিন্তু দুর্বোধ্য নহে। একটু একাগ্রতার সহিত অনুধাবন করিলেই মা'র এই কথাটির ধারণা করা যায়। ত্যাগ ও গ্রহণ ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নয়। এক স্থানকে ত্যাগ করা মানেই অন্য স্থানকে গ্রহণ করা। গ্রহণ না করিয়া ত্যাগ হয় না, ত্যাগ না করিয়াও গ্রহণ হয় না। বস্তুতঃ একদিকে যাহার নাম ত্যাগ, অন্যদিকে তাহারই নাম গ্রহণ। এই দুইটি দিক্ই যদি মূলে একই হয় তাহা হইলে ত্যাগ ও গ্রহণে পার্থক্য কোথায় থাকিল? একজন দান করে এবং অন্য জন গ্রহণ করে। যদি এই দুইটি ব্যক্তি মূলে একই ব্যক্তি হয় তাহা হইলে একদিকে যাহা দান করা, অপর দিকে তাহাই গ্রহণ করা। এই তত্ত্বটি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। জগতের মূলে একই তত্ত্ব। শুধু মূলে নহে, শাখা-প্রশাখাতেও সেই একই তত্ত্ব বিরাজমান। যদি জগতের যাবতীয় খণ্ড সত্তা সেই এক সত্তারই প্রকাশ হয় তা হইলে যে দিতেছে সেই রূপান্তরে গ্রহণ করিতেছে। দেওয়া, নেওয়া, উঠা, নামা, একেরই খেলা। এই দৃষ্টিতে স্থিতি ও গতিতে মূলে কোন ভেদ নাই। কারণ উভয়ের সমন্বয় যে মহাসন্ধিতে হইয়া থাকে তাহা সেই এক। তাহাতেই সকল বিরুদ্ধ সত্তা বিরুদ্ধ থাকিয়াও অবিরুদ্ধভাবে বিরাজ করে। উহাই মহাসমন্বয়ের একমাত্র ভূমি।

৩ — মুক্তের অমুক্ত দর্শন অসম্ভব

মা বলেন, "যদি ঐ দিকের অমুক্ত দেখা থাকে তা'হলে তিনি মুক্ত কোথায়?" মা'র গভীর অর্থব্যঞ্জক এই বাক্যটিতে অনেক নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। যাহার মধ্যে যাহা নাই সে তাহা দেখিতে পায় না, জানিতেও পারে না। আমার মধ্যে যে ভাব নাই অর্থাৎ যাহা বিকশিত হয় নাই তাহা অন্যের মধ্যে থাকিলেও অর্থাৎ বিকশিত থাকিলেও আমার পক্ষে অনুভব করা সম্ভবপর নহে। একটি ছোট শিশুর মধ্যে কামাদি বৃত্তির ক্রিয়া হয় না। কারণ ঐ সকল বৃত্তি শিশুতে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। তাই শিশু অন্যত্র ঐ সকল বৃত্তি দেখিতে পায় না, অর্থাৎ দেখিলেও চিনিতে পারে না। যাহার মধ্যে দুঃখের অনুভব নাই, এমন কি স্মৃতিও নাই, সে অন্যের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। কারণ তাহার নিকট অন্যের দুঃখ দুঃখরূপে উপস্থিতই হয় না। তদ্রূপ যদি কেহ প্রকৃতই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে বন্ধনের যাবতীয় সংস্কারও তাহার সত্তা হইতে দূরীভূত হইয়া যায়। সুতরাং যে প্রকৃত মুক্ত তাহার নিকট বন্ধন ও মুক্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ সে মুক্ত হইয়াছে এ সংস্কারও তাহার তখন থাকে না। তাহার নিকট বন্ধন ও মুক্তির ভেদজ্ঞান ত থাকেই না, ইহাদের কোন অর্থজ্ঞানও হয় না। নিজের মধ্যে যাহা নাই বাহিরে কোথাও তাহা নাই, নিজের মধ্যে যাহা আছে তাহাই আমরা বাহিরেও দেখিয়া থাকি। বস্তুতঃ সব কিছুই নিজের মধ্যে—নিজে থাকিলেই সব কিছু থাকে। সুতরাং নিজে মুক্ত হইলে সমগ্র বিশ্বই তখন মুক্ত। সমগ্র বিশ্বই যেখানে মুক্ত সেখানে বন্ধন কোথায়? বন্ধন নাই বলিয়া বিশ্ব এবং নিজে মুক্ত এই বোধও নাই। উহা বদ্ধ-মুক্ত-প্রশ্নহীন অবস্থা। তাই মা বলেন, "মুক্ত অমুক্তের প্রশ্ন কোথায়? এবং সেই তুমিই যদি মুক্ত অর্থাৎ তুমি যে মুক্ত তার প্রকাশ, তাহা হইলে আর অমুক্তের প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে কি?

৪ — খাঁটি সত্য

সত্য কি এবং সত্যের নির্ণয় কি প্রকারে হয়—ইহা একটি অতি কঠিন সমস্যা। অতি প্রাচীন সময় হইতেই দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু সত্যের স্বরূপ দ্রষ্টার দৃষ্টিকোণের তারতম্য বশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হয়। দেশের, কালের, রুচির, অধিকারের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য নিবন্ধন অখণ্ড সত্য পরিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ড সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে কোন দার্শনিক চিন্তার ধারা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা একটি খণ্ড ও পরিমিত সত্যেরই ধারণার চেষ্টা মাত্র।

যেখানে খণ্ডভাব সেখানে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কারণ খণ্ড ভাবের মূলে মনের ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যতক্ষণ আমরা মন অথবা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া সত্যের দিকে অগ্রসর হইব ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সত্যের স্বরূপ দর্শন অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবিভক্ত সত্তাকে বিভক্তরূপে গ্রহণ করাই মনের কার্য। মনকে নিরুদ্ধ করিয়াই হউক অথবা কোন কৌশলে উহাকে অতিক্রম করিয়াই হউক যদি বোধ-ভূমিতে প্রবেশ লাভ করা যায় তাহা হইলে সত্যের পূর্ণরূপের দর্শন হইতে পারে। ঋষি বাক্যে আছে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" অর্থাৎ নানা মুনির নানা মত। ইহা খুবই সত্য কথা। কারণ যাহাকে মত বলা হয় তাহা মনের ভুমির ব্যাপার। মনের ভূমি অতিক্রান্ত হইলে এক অখণ্ড সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। সেখানে মত মতান্তরের প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং যতক্ষণ জ্ঞান মনকে ছাড়িয়া উঠিতে না পারে ততক্ষণ উহা খণ্ডজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নহে। তদ্রূপ ঐ খণ্ডজ্ঞানের যে জ্ঞেয় তাহাই খণ্ড সত্য বলিয়া জানিতে হইবে।

দর্শন শাস্ত্রের এবং ধর্ম শাস্ত্রের ইতিহাসে সর্বত্র এই খণ্ডন-মণ্ডনের ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। একজন দার্শনিক যুক্তি সহকারে যে মত স্থাপন করেন বিভিন্ন প্রস্থানের অপর দার্শনিক যুক্তি সহকারে সেই মত খণ্ডন করেন। দার্শনিক মহলে এই প্রকার বাদবিবাদ অতি পরিচিত সত্য। যাঁহার রুচি যে সিদ্ধান্তের অনুকূল তিনি সেই সিদ্ধান্তই প্রকৃত মত বলিয়া গ্রহণ করেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সিদ্ধান্ত অসঙ্গত মনে করিয়া ত্যাগ করেন। বস্তুতঃ ইহাতে দোষের কিছুই নাই। কারণ যাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি যে প্রকার তিনি ত সত্য বস্তুকে সেইরূপেই দেখিবেন। তিনি অন্যরূপে দেখিবেন কি প্রকারে? কিন্তু অভিমান এবং গণ্ডীবদ্ধ ভাবের জেদ বশতঃ প্রত্যেকেই শুধু যে নিজের সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া ধারণা করেন তাহা নহে, উপরন্তু তিনি ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধী যাবতীয় মতকে হেয় বলিয়া প্রচার করেন। এই ভাবেই বিরোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ অখণ্ড সত্য-দর্শনের অভাব জন্য উদারতার অভাব। এই সব দর্শনও সত্য দর্শন সন্দেহ নাই, কিন্তু অখণ্ড সত্য দর্শন তাহা নহে। কারণ অখণ্ড সত্যের দর্শন হইলে সকল প্রকার বিরোধের সমাধান হইয়া যায়। মহাসত্তার মধ্যে বিরোধেরও একটা স্থান আছে। বিরুদ্ধ দুইটি বস্তু বা ধর্ম পরস্পর পরস্পরকে পরিহার করিয়া থাকে, কারণ ইহারা উভয়ের গণ্ডীবদ্ধ এবং পরিচ্ছিন্ন। অবিরুদ্ধ সত্তা অখণ্ড, উহা কাহাকেও পরিহার করে না। কিন্তু যে সত্তা বা প্রকাশ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নির্মল, যাহাতে কোন প্রকার আবরণের কলঙ্ক দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহা অপ্রতিহত, অবারিত এবং সর্বব্যাপক মহাসত্তা স্বরূপ। তাহা প্রতি খণ্ডসত্তার সহিত অভিন্ন বলিয়া তাহাতে বিরোধের কোন স্থান নাই। কারণ তাহাই অবিরুদ্ধ প্রকাশ। অথচ যাবতীয় বিরোধ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া আপন আপন অধিকার-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই সত্যই পূর্ণ সত্য। কারণ বিরোধহীন বলিয়া ইহা কাহাকেও বর্জন করেন না। মা ইহাকেই খাঁটি সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই মহাসত্যের একটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, যদিও বাস্তবিক পক্ষে

ইহার কোন লক্ষণও নাই। সেই লক্ষণটি এই—খণ্ড সত্যে যেমন পরস্পর বিরোধ থাকে বলিয়া অনেক কিছু উহা হইতে পরিত্যক্ত হয়, নতুবা সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না, অখণ্ড সত্যে তদ্রূপ কিছুই পরিত্যক্ত হয় না। কারণ বিরোধও ঐ সত্যের আলোকে পরম অদ্বয় স্বরূপে অবিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশমান হয়। এই জন্যই খাঁটি সত্যে কিছুই বর্জিত হয় না। তাই মা বলিয়াছেন, "কিছুই সেখানে বাদ নয় ত, খাঁটি সত্য প্রকাশ যেখানে।" এই মহাবাক্যের গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে মা সর্বদা এই পূর্ণ অর্থাৎ খাঁটি সত্যে অবস্থিত রহিয়াছেন বলিয়াই বাদী ও বিবাদী উভয়কেই সমরূপে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কারণ প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণের সহিতই তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫ — না পাওয়াকে পাওয়া

আমরা জগতে সর্বত্র চাওয়া ও পাওয়ার খেলা দেখিতে পাই। অভাবের তাড়নায় মানুষ সর্বদাই কিছু-না-কিছু চাহিতেছে। সময় সময় দেখা যায়, যে যাহা চাহে তাহা পাইয়াছে বলিয়া মনে করে এবং তৎকালে একটা তৃপ্তির আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার দেখা যায় যে তাহার এই তৃপ্তি স্থায়ী হয় না—আবার অভাব জাগিয়া উঠে। তখন সে আবার সেই পূর্ববৎ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। পিপাসার্ত পথিক জলের অভাব বোধ করে বলিয়া জল চায়। জল যে পাওয়া যায় না তাহা নহে। সে জল পায় এবং উহা পান করিয়া তৃপ্তও হয়। কিন্তু এই তৃপ্তি তাহার স্থায়ী হয় না। কারণ ইহার পরেই সে আবার পূর্ববৎ পিপাসাতে ক্লেশ অনুভব করে। তখন আবার পূর্বের ন্যায় তাহাতে জলের আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং সে পুনরায় জল আহরণ করিতে চেষ্টা করে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে মানুষের পাওয়ার কোন মূল্য নাই। কারণ এ পাওয়ার দ্বারা তাহার চাওয়া, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং এ পাওয়াকে পাওয়া বলা চলে না। প্রকৃত পাওয়া তাহাই যে স্থলে পাওয়ার পর মুহূর্তের জন্যও আর চাওয়ার ভাব উত্থিত হইবে না। জাগতিক পাওয়া প্রকৃত পাওয়া নহে। মা উহারই নাম দিয়াছেন, "না পাওয়ার পাওয়া।" না পাওয়া পর্যন্ত 'পাই নাই' বলিয়া যদি হৃদয়ে নিরন্তর বিরহের আগুন জ্বলিতে থাকে তাহা হইলে এই আগুনের তাপে তাহার ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা চিরদিনের জন্য দূরীভূত হয়, সে খণ্ড-প্রাপ্তিকে প্রাপ্তিরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত প্রাপ্তি না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে অভাবগ্রস্ত বলিয়াই মনে করে। অভাবের বোধ তীব্রভাবে জাগরুক থাকিলে জাগতিক খণ্ড খণ্ড পাওয়ার পশ্চাতে আর তাহাকে উন্মত্ত করিতে অথবা আত্মবিস্মৃত করিতে পারে না। তাহার হৃদয়ে অনির্বাণ প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, যাহার পবিত্র আলোকে প্রকৃত প্রাপ্য বস্তু প্রকাশিত হয় ও তাহার চাওয়া বা অভাব-জ্ঞান অনন্তকালের জন্য শান্ত হইয়া যায়। তাই মা বলিয়াছেন, "এই যে সর্বক্ষণ অভাবটা জেগে আছে তোমাদের, সে'টা কেন? এই যে না পাওয়াকে পেয়ে বসে আছে সেইটিই এই।" অর্থাৎ আমাদের অন্তঃকরণে না পাইয়াও যে পাইয়াছি বলিয়া বোধ মাঝে মাঝে উদিত হয় তাহারই ফলে আমাদের প্রকৃত প্রাপ্তি হয় না এবং একটা শাশ্বত হাহাকার চিত্তকে শোষণ করে ও তাপ দিতে থাকে। তবে লক্ষ্য স্থির থাকিলে এই অভাবের বেদনাই স্বভাবকে জাগাইয়া দিতে বাধ্য হয়।

৬ — মা ও মতামত

সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে চিন্তাশীল মনুষ্য মাত্রেরই একটা না একটা ব্যক্তিগত মত আছে। ইহার কারণ এই যে প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার

সংস্কার-সম্পন্ন মনের দ্বারা সঞ্চালিত। কিন্তু মা মনোভূমিতে অবস্থান করেন না। তিনি সর্বদা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। তাই তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং মনেরও অতীত। শুধু তাহা নহে তিনি সব প্রকার গণ্ডীর অতীত। যাহার কোন গণ্ডী নাই অথবা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ নাই তাহার কোন মতামত থাকিতে পারে না। কারণ সে মতামতের ঊর্ধ্বে সর্বদা স্বরূপে অবস্থিত। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে তাহার নিজের মতামত নাই বলিয়া সে সকলের সব প্রকার মতামতকেই এক হিসাবে নিজের মতামত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কারণ সে স্বরূপস্থ হইয়াও আত্যন্তিক স্বচ্ছতাবশতঃ সকল খণ্ড সত্তা হইতে অভিন্ন। এই জন্য এক দিকে যেমন তাহার নিজস্ব কোন মতামত নাই অপর দিকে তেমনি সকলের সহিত তাদাত্ম্য-বশতঃ সকলের মতামতই সে আপন রূপে গ্রহণ করে ও পূর্ণভাবে আদর করে। তাই মা বলিয়াছেন, "মনে ক'রো না এটা এ শরীরের মত। কোন মতামত নাই বল—একেবারে নাই। আছে বল, যা' বল তাই।"

দশ

১ — বিশ্বাসের বল

জাগতিক ব্যবহার-জীবনের ন্যায় আধ্যাত্মিক জীবনও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মের পথে, জ্ঞানের পথে এবং ভক্তির পথে চলিতে গেলে বিশ্বাসই একমাত্র সম্বল। বিশ্বাস ব্যতীত জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। শ্রদ্ধা বিশ্বাসেরই নামান্তর। গীতা বলিয়াছেন— "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। অর্থাৎ শ্রদ্ধা হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মহর্ষি পতঞ্জলিও

উপায়ের মধ্যে শ্রদ্ধাকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে শ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাস হইতেই ক্রমশঃ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয়। বৈষ্ণবগণও 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু' বলিয়া বিশ্বাসের মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টীয় উপাসকগণ Faith, Hope ও Charity এই তিনটি খ্রীষ্টীয় ধর্মের মধ্যে Faith অথবা বিশ্বাসকেই প্রথমে স্থান দিয়াছেন। সুতরাং জীবনের পথে বিশ্বাসের মূল্য যে অত্যন্ত অধিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন যাহাদের অন্তরে বিশ্বাসের স্থান নাই অর্থাৎ যাহারা সন্দিগ্ধ-চিত্ত তাহাদের অত্যন্ত দুর্গতি হইয়া থাকে। কথাটি খুবই সত্য। ভগবানও বলিয়াছেন "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। মা বলেন, মনুষ্য মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্বাস না থাকিয়া পারে না। বিশ্বাসের মাত্রা কম হইলে সংশয়ের দ্বারা উহা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য-হৃদয় হইতে উহার বীজ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না। বীজরূপে বিশ্বাসের সত্তা সংশয়াকূল চিত্তেও থাকে। অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য দেহ অত্যন্ত দুর্লভ। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর এই দুর্লভ দেহের প্রাপ্তি হয়। এই দেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহে পূর্ণভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রতি মনুষ্যের মধ্যে ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিশ্বাস-ভাব কিঞ্চিৎ মাত্রাতে না থাকিয়া পারে না। কাহারও বিশ্বাস একদিকে, অন্য কাহারও বিশ্বাস অন্যদিকে এইরূপ বিশ্বাসের বিষয়গত ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু কোন বিষয়েই বিশ্বাস নাই এইরূপ মনুষ্য হইতেই পারে না।

যতদিন সৎসঙ্গের প্রভাবে আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় না হয় ততদিন অন্তঃস্থিত বিশ্বাস-বীজ অভিব্যক্ত হইবার অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ সৎসঙ্গে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নিজের অন্তঃকরণে অবস্থিত বিশ্বাসের বীজ

ফুটিয়া উঠে ও বাহিরে প্রকাশ পায়। বিশ্বাস-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে একমাত্র নিজেকেই প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করা সম্ভবপর। যাহাকে আপন বলিয়া মনে করা যায় তাহাকেই বিশ্বাস করা যায়। বস্তুতঃ নিজেকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেই প্রকৃত বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। অপরকে আপন বলিয়া মনে করিলে বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া যায়, অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। কথাটা অত্যন্ত জটিল, কিন্তু জটিল হইলেও অবোধ্য নহে। আমরা ব্যবহারের ভাষায় আত্মা এবং অনাত্মা এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি। মূলে একই অখণ্ড সত্তা থাকিলেও জাগতিক দৃষ্টি অনুসারে এই বিভাগ অসঙ্গত নহে। আত্মাই আপন। এই আত্মাকে আপন বলিয়া মনে করার নামই বিশ্বাস। অনাত্মাকে আপন বলিয়া মনে করা উহার বিপরীত, অর্থাৎ উহারই নাম অবিশ্বাস। বস্তুতঃ অনাত্মাও কিছু নাই। যখন সর্বত্র আত্মদর্শন হয় তখন কোথায়ও অনাত্মভাব থাকে না, তখন সবই আপন হইয়া যায়। তখন আপন বস্তুকে আপন বলিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়। ইহারই নাম বিশ্বাস। মা বলেন, “বিশ্বাস মানে আপনাকে মানা। অবিশ্বাস মানে অপরকে আপন মনে করা।”

২ — দুঃখ রহস্য

দুঃখের মূল কারণ কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। এই মায়াময় জগতে দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয় নাই এমন কোন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমগ্র জীবনের অনুভূতির মধ্যে দুঃখের অনুভূতি প্রায় সকলেরই প্রবল। কিন্তু দুঃখের উদয় কেন হয় ইহা অনেকেই অনুধাবন করেন না। স্থূল দৃষ্টিতে দুঃখের বিভিন্ন কারণ থাকিতে পারে এবং আছেও, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ‘দ্বিতীয়’- বোধ হইতেই দুঃখের উদয় হয়। দুঃখের মূল কারণ অন্য কিছু হইতেও পারে না। উপনিষদ্

বলিয়াছেন, "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি।" ইহাতে আরও আছে, "তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ।" অর্থাৎ দ্বিতীয়-বোধই, কিংবা আমি ছাড়া কেহ বা কিছু আছে এই প্রকার বোধই, ভয়ের কারণ। যে সর্বত্র একত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছে তাহার শোক-দুঃখ থাকে না, মোহও থাকে না। মোটের উপর দুইভাব কাটিয়া গিয়া অদ্বয় ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে দুঃখ হইতে চিরমুক্তি লাভ হয়। মা বলেন, "ভিন্ন রুচি দুঃখ দেয়। দুঃখ দেয় দোষ থেকে, দুই ভাব থেকে, এইজন্যই বলা হয় দুনিয়া।" এই যে দোষের কথা বলা হইল, ইহাই বৈষম্য এবং ইহাই দুঃখের কারণ। গীতা "নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" এই বাক্যে সমভাব বা সাম্যকেই দোষ-বর্জিত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈষম্যই একমাত্র দুঃখ। চিকিৎসকগণ ধাতুর সাম্যকে স্বাস্থ্য বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বৈষম্যকে রোগ অথবা দুঃখ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যথা, "রোগো হি দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।" স্থানান্তরে মা বলিয়াছেন, "নিজের বোধে দুঃখ নাই। পরের বোধেই দুঃখ। দুই বোধেই দুঃখ, দ্বন্দ্ব, লড়াই, মৃত্যু।" বাস্তবিক পক্ষে নিজ-বোধই আনন্দ-স্বরূপ।

৩ — দুই প্রকার যাত্রী

সংসার পথে দুই প্রকার যাত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এক প্রকারের যাত্রী সংসারে ঘোরাফেরা করে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তর অনুভব করে। ইহারা জীবনের লক্ষ্য স্থিরভাবে ধরিতে পারে নাই বলিয়া সর্বদাই বিক্ষিপ্ত চিত্ত থাকে। এই সকল যাত্রী বিষয়-সুখের আশায় ইতস্ততঃ পর্যটন করে এবং একমাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সকল কার্যে প্রবৃত্ত হয়। সংসারে এই প্রকার যাত্রীর সংখ্যাই অধিক। কিন্তু আর এক প্রকার লোকও আছে, তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট নহে। এই সকল যাত্রী ভগবৎ কৃপায় নিরন্তর মহালক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকে, যথাশক্তি সেই

লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। মা ইহাদিগকে 'স্বভাবের যাত্রী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারা সংসারকে বিদেশ বলিয়া মনে করে এবং সর্বদা স্বদেশে ফিরিবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। কালের রাজ্য যেখানে ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু এবং কামক্রোধাদি রিপুর খেলা নিরন্তর জীবকে পীড়িত করে, ইহাই চিদানন্দ বা ভগবৎ স্বরূপ হইতে উদ্ভূত জীবের পক্ষে বিদেশ। যতক্ষণ মহাজ্ঞানের উদয় না হয় ততক্ষণ নিজ দেশ ও বিদেশের এই ভেদ অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সবই বিপরীত হইয়া দেখা দেয়। তখন এই বিদেশ স্বদেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন দেখা যায় বিষয় কোথাও নাই। একমাত্র ভগবৎ সত্তাই বিষয়রূপে সর্বত্র বিরাজ করিতেছে।

৪ — নিত্য সম্বন্ধ

সম্বন্ধ বস্তুতঃ নিত্যই, তাহাতে কোন ভুল নাই। অর্থাৎ যে কোন ভাবেই হউক ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ নিত্য ও কালাতীত। পিতা পুত্ররূপে, দাস প্রভুরূপে, গুরু শিষ্যরূপে, সখা সখীরূপে অথবা প্রিয় প্রিয়ারূপে তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য। সংসার অবস্থায় আত্মবিস্মৃতির দরুণ এই নিত্য সম্বন্ধও অনিত্যরূপে প্রতীত হয়। শুধু তাহাই নহে, সম্বন্ধের অস্তিত্বও লুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। মনে হয় সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা সম্বন্ধ কোন কালে ছিলই না। কিন্তু লীলার মধ্যে এইরূপ প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে সম্বন্ধ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ আছে এবং অক্ষুণ্ণই থাকে। সম্বন্ধের বিলোপ হয় না। আবার এমন স্থিতিও আছে যেখানে ভক্ত ও ভগবান এই দুইটি ভাব লুপ্ত বলিয়া সম্বন্ধের প্রশ্ন উঠে না। ইহা ভাবাতীত অবস্থার কথা। এইজন্যই একদিকে যাহা চির পুরাতন, এমন কি সনাতন এবং কালের অতীত, অন্য দিকে তাহা প্রতি ক্ষণে নূতন রূপে প্রতীত হয়। উভয়ই সমরূপে সত্য। সম্বন্ধ আছে এবং চিরদিন থাকিবে ইহাও

সত্য, আবার সম্বন্ধের প্রশ্নই নাই, কারণ এক অদ্বিতীয় সত্তাই নিজের প্রকাশে সর্বদা প্রকাশমান।

এগার

১ — কথার মীমাংসা

অনেকের বিশ্বাস মা'র নিকট কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায় না। মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রশ্নের অথবা কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা চরম সত্য নহে। কারণ একদিক্ হইতে দেখিলে কথার মীমাংসা অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু যখন দেখা যায় যে এক কথার মধ্যেই অনন্ত কথা নিহিত রহিয়াছে এবং দৃষ্টি খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলিও লক্ষ্য পথে ভাসিয়া উঠে তখন বুঝিতে পারা যায় যে সব কথার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কোন একটি কথারও প্রকৃত মীমাংসা হয় না। জগতের প্রত্যেকটি পদার্থ অপর প্রত্যেকটির সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট। তেমনি অন্তর্জগতেও একটি ভাব অন্যান্য সকল ভাবের প্রত্যেকটির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। সেইজন্য সকলগুলির তত্ত্বভেদ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন একটি ভাব অথবা পদার্থেরও ঠিক ঠিক নিশ্চয় হইতে পারে না। বস্তুতঃ সকল প্রশ্নের চরম মীমাংসা একই স্থানে রহিয়াছে। মানবীয় বুদ্ধির দ্বারা যে মীমাংসা হয় তাহা প্রকৃত মীমাংসা নহে। কারণ তাহা স্থায়ী হয় না। এই জন্য একজনের যাহা সিদ্ধান্ত অপরের দৃষ্টিতে তাহা পূর্বপক্ষরূপে পরিগণিত হয়। আচার্য ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়ে অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন যে তর্ক অপ্রতিষ্ঠা। কারণ একজনের বুদ্ধিতে যে সিদ্ধান্ত প্রকৃত মীমাংসারূপে

গৃহীত হয় অপর একজন অধিকতর প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন হইলে তিনি ঐ মীমাংসাকে মীমাংসা বলিয়া গণ্য করেন না—তিনি উহার উপর দোষারোপ করিয়া উহাকে সংশয় কোটিতে স্থাপন করেন এবং যুক্তিদ্বারা উহার মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই মীমাংসাই যে চরম হইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। কারণ অধিকতর তীব্র বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ঐ মীমাংসাকেও প্রকৃত মীমাংসা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না, তিনি পৃথক্ ভাবে মীমাংসার মার্গ প্রদর্শন করেন। এইভাবে বুদ্ধি পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া কোন তত্ত্বের খাঁটি মীমাংসা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভগবান শঙ্করাচার্য (বেদান্ত দর্শনেও) তর্কের অপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক কথা বলিয়াছেন। এই জন্য মা যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের পন্থা। আমাদিগকে এমন স্থানে উপনীত হওয়া আবশ্যক যেখানে শুধু যে সকল সংশয়ের সম্যক্ সমাধান হয় এমন নহে, শঙ্কা ও সমাধানের বিরোধই থাকে না। অর্থাৎ অমীমাংসার কোন প্রশ্নই সেখানে উঠে না। কারণ যে স্থিতিতে সংশয়েরই উদয় হয় না সেখানে নির্ণয়ের সার্থকতাই বা কি? মনের রাজ্য যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ততদূর পর্যন্তই সংশয়ের প্রসার জানিতে হইবে। কারণ সঙ্কল্পের মধ্যে বিকল্পের উত্থাপন করা মনের কাজ। মনের উপর দৃষ্টিলাভ না করা পর্যন্ত, অর্থাৎ মনোরাজ্য ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ চিদালোকে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, শঙ্কা ও সমাধানের চক্রব্যূহ হইতে অব্যাহতি লাভের আশা সুদূর পরাহত। সংশয়ের অধিকার মনের রাজ্যে নিবদ্ধ বলিয়া মীমাংসার অধিকারও ঠিক ততদূর পর্যন্তই। প্রকৃত স্থিতিলাভ হইলে মনোভূমি অতিক্রান্ত হয় বলিয়া কোন বিষয়েই বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না, পূর্বে যে বিরোধ অনুভূত হইয়াছিল তাহারও উপশম হয় এবং ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকার বিরোধের আশঙ্কা থাকে না।

বার

১ — বিশ্ব-শান্তি

জগতের বর্তমান পরিস্থিতি দেখিয়া কাহারও কাহারও মনে একটা নৈরাশ্যের ভাব উপস্থিত হয়। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় দুঃখ, অশান্তি, অনাচার ও নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা। ইহা হইতে মনে হয় ভগবানের করুণাতে জগৎ আজ যেন বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এই অশান্তির অবসান বর্তমানে হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহার উপায় কি—এই চিন্তা অনেকের মনেই উদিত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন বর্তমানে যে অবস্থার উদয় হইয়াছে ইহা বিনা কারণে হয় নাই। বিরুদ্ধশক্তি পূর্ণভাবে কার্য করিয়াছে, তাই এই প্রকার ঘোর অশান্তি ও দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক নহে এবং বর্তমানে ভোগ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইহা দূর হইবারও নহে। কিন্তু জগতে যেমন কিছুই স্থায়ী হয় না তেমনি এই অশান্তিও স্থায়ী হইবে না। যতক্ষণ এই অশান্তির স্থিতিকাল আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা অবশ্যই স্থিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পরে ইহার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্তনের পূর্বাভাস এখনও কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অশান্তির অন্ত কবে হইবে এই জাতীয় চিন্তার উদয় অনেকের মনেই হইয়া থাকে। ইহা অশান্তি-নিবৃত্তির শুভক্ষণ আবির্ভূত হইবার পূর্ব লক্ষণ। মা বলেন, যখন কেহ দীর্ঘকাল হইতে বদ্ধ অবস্থাতে অবস্থান করিয়াও নিজের বন্ধনের সত্তা অনুভব করে না, তখন বুঝিতে হইবে তাহার বন্ধন-মুক্ত হইবার এখনও বিলম্ব আছে। কিন্তু যে বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বন্ধন অসহ্য বলিয়া বোধ করিতেছে, তাহার পক্ষে বন্ধন-

মোচন শুধু অবশ্যম্ভাবী নহে, অচিরভাবী। ভোগকে ভোগ বলিয়া অনুভব করিতে না পারিলে সেই ভোগের নিবৃত্তি সহজে হয় না। পাপকে পাপ বলিয়া ধরিতে পারিলেই পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার একটা সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বব্যাপক অশান্তির ব্যাপক অনুভূতি আসিয়াছে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই অশান্তির অবসানেরও সময় আসিয়াছে। মা বলিয়াছেন, "এখন ত এই রকমই হবার।" এই বাক্য দ্বারা বর্তমান অশান্তি যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তাহার দ্যোতনা হইতেছে, এবং ইহা যে আগন্তুক নহে তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাহার পর যখন মা বলিলেন, "এই তোমাদের চিন্তা এসেছে 'কবে অন্ত হবে,' এও তারই একটা প্রকাশ।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, অশান্তির অন্তের চিন্তা মানুষের মনে উদিত হইলেই অদূর ভবিষ্যতে ঐ অন্ত কর্মরূপে পরিণত হয়। জগৎ গতিশীল বলিয়া জাগতিক কোন অবস্থাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাই অশান্তি যতই তীব্র হউক না কেন, তাহার পরে শান্তির উদয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই শান্তি প্রকৃত শান্তি নহে। প্রকৃত শান্তি তখনই বলা চলে যখন শান্তি-অশান্তির প্রশ্নই থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জগৎকে অতিক্রম করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত স্থিতিও গতিরই অন্তর্গত। কারণ গতিই জগতের ধর্ম। কিন্তু প্রকৃত স্থিতি তখনই হয় যখনই গতি-স্থিতির দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। অর্থাৎ যখন আবাগমন বা আসা-যাওয়ার চিরনিবৃত্তি হইয়া যায়।

২ — ধ্যান ও অভ্যাস

ধ্যান সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। চিত্তের যে অবস্থায় ধ্যানের আবির্ভাব স্বাভাবিক মনে হইয়া থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থার উদয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত ধ্যানেতেও নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয় না। মা

বলেন—পূর্ব সংস্কার এবং বর্তমান কর্মপ্রভাবের দ্বারাই ধ্যানে প্রবেশ করিতে পারা যায়। যে সাধক পূর্বে ধ্যানের অভ্যাস করিয়া এখন অবস্থান্তরে পতিত হইয়াছে তাহার চিত্তে ধ্যানজনিত সংস্কার সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যাহার পূর্ব সংস্কার নাই, তাহার পক্ষে নূতন করিয়া ধ্যানের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টা কষ্টসাধ্য হইলেও ধ্যানার্থীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। পূর্ব সংস্কার থাকিলে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অল্প চেষ্টাই পর্যাপ্ত হয়। এইজন্য কাহারও অতি সামান্য চেষ্টার ফলেই গাঢ় ধ্যানের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব সংস্কারের বল না থাকিলে ইহা সম্ভবপর হয় না। নবীন সাধকের পক্ষে কঠোর ভাবে সংযত হইয়া নৈরন্তর্য রক্ষা পূর্বক চেষ্টা করা আবশ্যক। কি ভাবে এই চেষ্টা করিতে হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ মা'র শ্রীমুখ নির্গত মহাবাক্যে স্পষ্ট ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। মা এই সকল নবীন সাধকের পক্ষে অভ্যাসের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। ধ্যানে চিত্ত রস না পাইলেও অথবা আকর্ষণ বোধ না করিলেও কর্তব্যের অনুরোধে উহার অভ্যাস করা উচিত। ধ্যানের সংস্কার না থাকিলে অভিনব কর্মে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হয়, ইহা সত্য। কারণ বিক্ষেপ বা চঞ্চলতার সংস্কার অনাদিকাল হইতেই চিত্তে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিপরীত সংস্কারের প্রভাবে চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় সফলতা লাভ হয় না। কিন্তু তথাপি চেষ্টা করিতে হয়। উদ্যম ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ মা বলিয়াছেন, চেষ্টার দ্বারাই শক্তির বিকাশ হয়। দৃঢ়সংকল্প লইয়া বিরুদ্ধ সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আভ্যন্তরীণ শক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ সংঘর্ষের তীব্রভাব কমিয়া আসে, এবং অভিনব কর্মজনিত নবীন সংস্কার সঞ্চিত হইতে হইতে এমন এক সময় আসে যখন সংঘর্ষ মোটেই থাকে না। কারণ পূর্ব প্রতিকূল সংস্কার এবং অভিনব অনুকূল সংস্কার তুল্যবল হইয়া পরস্পরের বৃত্তি রোধ করিয়া থাকে। তখন সেই তটস্থ অবস্থায়

চিত্ত শূন্যবৎ হইলে নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎ করুণা সেই ক্ষেত্রে পতিত হয় এবং সেই মহাস্রোতে সাধকের মন প্রাণকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সাধনার কঠোরতার তাৎপর্য এই যে ইহার দ্বারা অভিমান-শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বিকল্প দ্বারা সংকল্প প্রতিরুদ্ধ না হওয়ার দরুণ উহা সত্যসঙ্কল্প রূপে পরিণত হয়। এইভাবে নিরন্তর চেষ্টা করিতে করিতে অনুকূল স্রোতের সাহায্যে ক্রমশঃ নিজের অভিমান ক্ষয় হইয়া যাইবার ফলে কোন এক মহাক্ষণে আপনা-আপনি আত্ম-সমর্পণ সিদ্ধ হইয়া যায়।

তের

১—ভাব ভঙ্গ

মা কাহারও ভাব ভঙ্গ করেন না। গীতাতে শ্রীভগবান যেমন বলিয়াছেন —'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' ইত্যাদি, সেই প্রকার মাও বলেন, যাহার যে ভাব তাহার পক্ষে সেই ভাব ধরিয়া অগ্রসর হওয়াই শ্রেষ্ঠ। একজনের ভাব অন্যের পক্ষে নষ্ট করা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে। কারণ প্রকৃত সত্য ভাবের অতীত। নিজ ভাব ধরিয়া সকলকেই সেই ভাবাতীত সত্যে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু যেখানে ভাবের ঘরে চুরি হয় সেখানে এ কথা চলে না। সেখানে প্রয়োজন হইলে, এবং সকলের কল্যাণের জন্য, ভাব ভাঙ্গিয়া দেওয়াই উচিত। কিন্তু মা যাহা করেন তাহাতে উচিতানুচিতের বিচার অথবা অন্য কোন প্রকার যুক্তি প্রবর্তক হয় না। তাঁহার যাহা কিছু হয় তাহা আপনিই হইয়া যায়, ব্যক্তিগত ইচ্ছা অথবা অন্য কোনও প্রকার লৌকিক বা অলৌকিক কারণ, এমন কি কর্তব্য-

বিচার, কিছুই তাঁহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে না। তাঁহার দেহাশ্রয়ে যাহা কিছু হয় সবই স্বভাবের খেলা। যাহার পিছনে উদ্দেশ্যের প্রেরণা নাই এবং সম্মুখে প্রয়োজনবোধও থাকে না তাহাকে স্বভাবের ক্রিয়া ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে এই প্রকার স্বাভাবিক ক্রিয়াতেও যেন গভীর উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। মা নিজেই বলিয়াছেন, মিথ্যার প্রশ্রয় দিতে নাই। কারণ তাহাতে সত্যের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্য অনেক সময় এই মিথ্যার আবরণ ভাঙ্গিবার জন্য মায়ের স্বাভাবিক ক্রিয়াও প্রবৃত্ত হয় বলিয়া মনে হয়। মা'র দিক্ হইতে প্রয়োজন-বিচার না থাকিলেও জাগতিক কল্যাণের দিক্ হইতে প্রয়োজন-বিচার অবশ্যই আছে। এই জন্য যদিও মা কাহারও ভাব ভাঙ্গেন না ইহা সত্য, তথাপি অনেক সময় সত্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রকৃত সত্যের রূপ দেখাইবার জন্য ভাব ভাঙ্গার অভিনয় তাঁহার শরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

২ — দর্শন ও শ্রবণ

সাধক সাধ্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য সঙ্কল্প করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত নৈরন্তর্য সংরক্ষণ পূর্বক দৃঢ়ভাবে সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহার ফলে ব্যক্তিগত প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে কোন কোন সাধক কিছু কিছু অলৌকিক অনুভূতি লাভ করিয়া থাকে। ইহা সর্বজন-পরিচিত সত্য। কিন্তু এই সকল অনুভূতির বিশ্লেষণ সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। অনুভূতি সকলের মধ্যে দর্শন এবং শ্রবণই সাধারণতঃ প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয় বর্গের মধ্যে যেমন চক্ষুঃ ও কর্ণ প্রধান, তেমনি লৌকিক অনুভূতির মধ্যেও দর্শন ও শ্রবণের প্রাধান্য স্বাভাবিক। সাধক যাহা দর্শন করে অথবা যাহা শ্রবণ করে তাহার মূল্য এবং সারবত্তা সাধক নিজে অনেক সময় বুঝিতে পারে না। এই অনুভূতির মধ্যে যেমন

দর্শন ও শ্রবণের একটা দিক্ আছে তেমনি বৃত্তি নিরোধেরও একটা দিক্ আছে। অর্থাৎ অনেক সময় অনেকের এমন অবস্থার উদয় হয় যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে সমাধি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। দর্শনের মধ্যে নানা প্রকার দেবদেবীর দর্শন, সিদ্ধ পুরুষের দর্শন, দিব্য ভূমি সকলের দর্শন, এবং নানা প্রকার মন্ত্র উপদেশাদি শ্রবণ অথবা দেবদেবী বা সিদ্ধ পুরুষের মুখোচ্চারিত বাক্য বিশেষ শ্রবণ, এই সব সর্বত্র সুপরিচিত। এই বিষয়ে মা কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দর্শন শ্রবণাদিতে সাধকের পক্ষে মনোনিবেশের উপযোগিতা মোটেই নাই। সাধকের যদি পরমার্থপ্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য অটুট থাকে তাহা হইলে লৌকিক এবং অলৌকিক সকল বিষয়ের প্রতিই তাহার বৈরাগ্য আসা স্বাভাবিক। পরমার্থ লাভ না হওয়া পর্যন্ত তদ্ভিন্ন সব কিছুই তাহার পক্ষে হেয়। অবশ্য দর্শন ও শ্রবণের স্তরভেদে মূল্যের তারতম্য আছে, ইহা সত্য। কিন্তু মহালক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহাদের কোন মূল্যই নাই। সাধন ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া জাগ্রদ্ভাবে অগ্রসর হওয়া একান্ত আবশ্যক। স্বাধীনতা চ্যুত হইলে এবং জাগ্রদ্ভাব রাখিতে না পারিলে জড়ত্ব অবশ্যম্ভাবী। সাধারণতঃ লোকে যে সকল দৃশ্য দর্শন করে এবং সে সকল বাক্যাদি শ্রবণ করে তাহাদের অধিকাংশই মনোময় চক্রের কল্পনা প্রসূত। অজ্ঞাতসারে কল্পনাশক্তি পূর্ব সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া কার্য করিয়া থাকে এবং বিচিত্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই সব দর্শনে বা শ্রবণে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তদ্রূপ শুধু বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া মগ্নভাব প্রাপ্ত হইলেই এবং সে অবস্থায় একটি তীব্র আনন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেই সাধন পথে প্রকৃত উন্নতি হয় না। কারণ এ তন্ময়তার সহিত যদি সচেতন ভাব অর্থাৎ জাগ্রদ্ভাব অনুস্যূত না থাকে তবে উহা জড়ত্ব মাত্র, এবং ঐ আনন্দের আস্বাদ যদি নিরন্তর অনুভূত হয়, এবং সাধককে ঐ স্তরে নিরন্তর আকর্ষণ করে তাহা হইলে

বুঝিতে হইবে উহাও এক প্রকার ভোগ মাত্র। সাধকের পক্ষে উভয়ই বর্জনীয়। সাধকের উন্নতির প্রকৃত নিদর্শন এই যে ধীরে ধীরে তাহার অন্তরের গ্রন্থি সকল খুলিয়া যাইতেছে, ক্রমশঃ তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রকাশ আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ক্রমশঃ বিষয় জ্ঞান হইতে তাহার চিত্ত প্রত্যাহৃত হইয়া নিজের মধ্যে নিজে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করিতেছে। অনেক সময় দেহবিহীন বাহ্য আত্মা অথবা তজ্জাতীয় দেবতাদি দুর্বল সাধকের চিত্তে আবিষ্ট হইয়া অনেক কিছু প্রকাশ করিয়া থাকে। সে অবস্থায় সাধকের ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলিয়া বাহ্য আত্মার পক্ষে তাহাকে অভিভূত করিয়া আত্মপ্রচার করা সম্ভবপর। ইহাতে চিত্ত পরাধীন হইয়া যায় এবং নিজের স্বাভাবিক মার্গে সঞ্চরণ করিতে বাধা প্রাপ্ত হয়। ইহা সাধকের অগ্রগতির অনুকূল ব্যাপার নহে। বাহ্য আত্মা বা শক্তির আবেশ হইলে সাধকের পক্ষে পরমার্থ লিপ্সার ব্যাকুলতা কমিয়া যায় এবং সে প্রলোভন ও অহঙ্কারের পথে স্খলিত হইয়া পড়ে। সত্য দর্শন এবং সত্য প্রগতি অতি উচ্চস্তরের জিনিষ, কিন্তু উহা অত্যন্ত দুর্লভ। প্রতি পদে নিজেকে যাচাই করিতে না পারিলে অনেক সময় সাধকের মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা—ইচ্ছাকৃত না হউক অনিচ্ছাকৃত আত্ম-বঞ্চনা—অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ দর্শন ও শ্রবণের তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে একজন অতি প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় সিদ্ধ ভক্তের উপদেশ সংক্ষিপ্ত ভাবে দিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহা অবহিত চিত্তে চিন্তা করিলে সাধক বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃত দর্শন ও শ্রবণ কাহাকে বলে এবং উহা এত দুর্লভ কেন।

যদিও দর্শন ও শ্রবণের অনেক প্রকার বৈচিত্র্য আছে এবং সাধারণ ভাবে ব্যক্তিগত জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর নহে, তথাপি স্থূল দৃষ্টিতে দর্শন ও শ্রবণ এই দুইটিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই তিন শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীকে মোটামুটি বাহ্য দর্শন বা স্থূল

দর্শন বলিয়া বর্ণনা করা চলে। আমরা সাধারণ অবস্থায় যে বাহ্য জগতের দর্শন করিয়া থাকি ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ এই দর্শন ধ্যানের অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় সাধকগণ এই দর্শনকে Corporeal অর্থাৎ দেহসম্বন্ধীয় দর্শন আখ্যা দিয়াছেন। সাধারণ দর্শনের সময় বাস্তব সত্তা ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া দৃশ্য রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু ধ্যানজ বাহ্য দর্শনে যে সত্তার প্রকাশ হয় তাহা বাস্তব সত্তা নহে, কিন্তু প্রাতিভাসিক সত্তা। অর্থাৎ দৃশ্যটি যেরূপে প্রতিভাসমান হইতেছে তাহার বাস্তবরূপ উহা নহে। অনেক সময় দেবদেবী অথবা সিদ্ধ পুরুষের দর্শন পাওয়া যায়, তখন ইহাদিগকে সত্যই দেখা যায় এবং স্পর্শও করা যায়। শুধু তাহাই নহে। অনেক সময় অন্যান্য দ্রষ্টাও সমরূপে এই সকল দৃশ্য দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি ইহা বাস্তব দর্শন নহে। বস্তুতঃ এই দৃশ্য সত্তা সিদ্ধপুরুষ অথবা দেবতার কল্পিতরূপ মাত্র। বৌদ্ধ সাধকগণ এই সকলরূপকে 'নির্মাণ' সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। অনেক দার্শনিক সাধক এই জাতীয় দর্শনকে আলোচ্য দর্শন-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করিতে ইচ্ছা করেন না। খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর তাঁহার দেহ ভূ-গর্ভে সমাহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর তাঁহার দেহ অচিন্ত্য প্রণালীতে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং তিনি অভিনব দেহে উত্থিত হন। এই পুনরুত্থান ব্যাপারটিকে resurrection বলা হয়। তখন উত্থিত হইয়া তাঁহার ঐ উদিত দেহে ভক্ত সাধক ও সাধিকাগণকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই দেহ সকলেই দেখিতে পাইয়াছিল এবং ইহা বাহ্য দেহরূপে সকলের নিকট প্রতীত হইয়াছিল। তথাপি ইহা খ্রীষ্টের বাস্তব দেহ ছিল না। তাঁহার বাস্তব দেহ তখন 'glorified body' অর্থাৎ জ্যোতির্ময় স্বরূপ। ঐ স্বরূপ নরলোকের কার্যকারণভাবের অধীন নহে এই প্রকার বাহ্য দর্শনের ন্যায় শ্রবণও বুঝিতে হইবে। অনেক সময় অনেক সাধক মানবীয় কণ্ঠে উচ্চারিত বাক্য শুনিতে পান। পূর্বোক্ত দৃশ্য যে কারণে

প্রাতিভাসিক, এই বাক্যও সেই কারণে প্রাতিভাসিক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

এই জাতীয় দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত আর এক জাতীয় দর্শন ও শ্রবণ আছে—তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা সাধকের কল্পনা-শক্তির দ্বারা অজ্ঞাত ভাবে উদ্ভূত হয়। যদিও এই স্থলে ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া থাকে না, তথাপি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ফলে কল্পনা-শক্তিতে যে প্রকার ছাপ পড়ে এই জাতীয় দর্শনে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ব্যতীতও ঠিক সেই প্রকার ছাপ পড়িয়া থাকে। সাধারণতঃ আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মচৈতন্য মনোরূপ কল্পনা-শক্তি হইতে সত্তার আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কল্পনা-শক্তি ইন্দ্রিয় হইতে প্রথমতঃ ঐ আকার প্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় উহা প্রাপ্ত হয় বহির্জগৎ হইতে, ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। এই জাতীয় দর্শন সাধকের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইহা ত প্রার্থনীয় নহেই, বরং সর্বপ্রকারে পরিহার্য। কল্পনা-শক্তির সঙ্গে স্মৃতির যোগ থাকে ও স্মৃতির সঙ্গে পূর্ব সংস্কারের সম্বন্ধ থাকে। তাই অনেক সময় ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, দর্শনটি ইন্দ্রিয়দৃষ্ট পদার্থের অবচেতন অথবা অচেতন পুনরাবৃত্তি কি না। এই প্রকার দর্শনে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত আত্ম-প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকে। কারণ অনেক সময় মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। এই জাতীয় দর্শনে দেহবর্জিত পারলৌকিক আত্মার অথবা শক্তি বিশেষের প্রভাব কখনও কখনও স্পষ্টই ধরিতে পারা যায়। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এই জাতীয় দর্শনের প্রামাণিকতা স্বীকার করা চলে না। সাধক ও ভক্তদের জীবনে এই জাতীয় বহু দর্শনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক পক্ষে এই সব দর্শনের কোনই মূল্য নাই। যেমন কাল্পনিক দর্শনের কথা বলা হইল, তদ্রূপ কাল্পনিক শ্রবণও আছে।

পূর্বে যাহা বলা হইল তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে

কাল্পনিক দর্শন বা শ্রবণ দৃষ্টিভ্রম মাত্র। কারণ ঐ জাতীয় ভ্রমবিকার দৈহিক বিকৃতি বশতঃ অথবা বায়ু পিত্ত কফের বৈষম্য নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। দৈহিক বিকৃতির ফলে স্মৃতিশক্তি বিকৃত হইয়া পূর্ব সঞ্চিত সংস্কার রাশিকেও বিকৃত করিয়া নিজের নিকট প্রদর্শন করে। কাল্পনিক দর্শন এই জাতীয় বিকারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নহে। কিন্তু ইহা পারমার্থিক দর্শন নহে। ইহাই শুধু বক্তব্য।

কাল্পনিক দর্শন ব্যতীত আরও এক প্রকার দর্শন অথবা শ্রবণ আছে যাহা প্রামাণিক বলিয়া উপাদেয়। ইহা অত্যন্ত বিরল, কিন্তু তথাপি ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইহাকে খ্রীষ্টীয় ভক্তগণ intellectual নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্রিয়, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি কিছুরই উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। সাধকের সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয়, কোন শক্তির নিকট হইতেই কিছু গ্রহণ করে না। ইহা সাক্ষাদ্‌ভাবে সত্যের প্রকাশ করিয়া থাকে। এই দর্শনের ব্যাপার একটি গূঢ় রহস্য। ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে বাহ্য সত্তার আত্মচৈতন্যে প্রতিবিম্ব-পাত কি প্রণালীতে ঘটিয়া থাকে তাহার বিশ্লেষণ আবশ্যক। বস্তুতঃ বাহ্য সত্তা পরিবর্তিত না হইয়া চৈতন্যের চিন্ময় ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। এই চিন্ময়ীকরণ আপনা আপনি হয় না। ইহা সত্ত্বময় মনোভূমিতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমে ভৌতিক সত্তা ভাবময় সত্তারূপে পরিণত হয়। তারপর ঐ ভাবময় সত্তা চিৎ-দর্পণে চিন্ময় সত্তার আকার ধারণ করে। ইহাই সাধারণ ক্রম। এই প্রক্রিয়া এক জাতীয় ভাবনার ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা একান্তই আবশ্যক। খ্রীষ্টীয় দার্শনিক আচার্যগণ বলেন—এই ভাবময় আকার সকল (species impressa) স্মৃতির ভাণ্ডারে অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। মন ঐ সকল আকারের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে অর্থাৎ তন্ময়তা প্রাপ্ত

হয়। তাহার পর মন হইতে এক প্রকার শব্দ উত্থিত হয়। ইহাকে বলে word of the mind। ভারতীয় তান্ত্রিকগণ এই শব্দকেই 'অন্তঃসংজল্প' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দার্শনিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন verbum mentis। ইহার দ্বারা আমাদের মানসিক বোধকার্য নিষ্পন্ন হয়। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে চিন্তা বলিয়া অভিহিত করি ইহাই তাহার স্বরূপ। বিশুদ্ধতম দর্শন অথবা শ্রবণ প্রামাণিক। কারণ ইহা সাক্ষাৎ ভগবৎ-শক্তির প্রেরণা হইতেই হইয়া থাকে। ইহাতে আত্ম-প্রবঞ্চনার ভয় থাকে না এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিও ক্ষুণ্ণ হয় না। পূর্বে বলা হইয়াছে মানসিক ক্রিয়ামূলক কল্পিত দর্শন অনেক সময়ে শুধু অপ্রামাণিক নহে, বিপজ্জনকও হইয়া থাকে। ভগবৎ-শক্তির প্রভাবে যে সত্য জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তাহাতে কল্পনা শক্তির, স্মৃতি শক্তির এবং ইন্দ্রিয় শক্তির কোন প্রভাব বিদ্যমান থাকে না। তাহা ভগবদ্-ইচ্ছায় সাক্ষাদ্‌ভাবে হৃদয় মধ্যে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে ফুটিয়া উঠে। ইহারই নাম শব্দহীন শব্দ অথবা অরূপের রূপ। ইহা প্রাপ্ত হইলে বাহ্য বা আন্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়া কিছু বুঝাইতে হয় না। যাহাকে আমরা intuition অথবা প্রাতিভ জ্ঞান বলি, তাহার মূল এই স্থানেই জানিতে হইবে। পূর্ব সংস্কারের উদ্দীপন, যুক্তি, তর্ক, কল্পনা, কোন কিছুই আবশ্যক হয় না। যাহা জানা আবশ্যক হয় অর্থাৎ ভগবান বা গুরু যে জ্ঞান জিজ্ঞাসুর আত্মাতে সঞ্চার করিতে ইচ্ছা করেন তাহা সাক্ষাৎভাবেই সঞ্চার করেন—কোন প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন থাকে না। 'গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ'—এই যে একটি কথা আছে ইহা খুবই সত্য। কারণ গুরু মৌনী হইলেও তাঁহার মৌনই বিশদ ব্যাখ্যারূপে শিষ্য-হৃদয়ের সংশয় ও অজ্ঞান-অন্ধকার অপসারিত করে। ভাষা প্রয়োগে ঐ প্রকার সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই অনৌপদেশিক জ্ঞানই খ্রীষ্টীয় ভক্ত সাধকগণের intellectual locution অথবা চিন্ময়

বাণীর অন্তর্গত মনে করিতে হইবে।

আর একটি কথা। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাহিত্যে শ্রুতি ও স্মৃতি নামে দুইটি শব্দ প্রচলিত রহিয়াছে। স্মৃতি হইতে শ্রুতির প্রামাণ্য অধিক, ইহা সর্বত্র সুপরিচিত। পূর্ব বর্ণিত প্রকারে সাক্ষাৎভাবে যে নিঃশব্দ বাণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে বাণীতে সংশয়ের লেশমাত্র থাকিতে পারে না, তাহাই শব্দ-ব্রহ্মরূপ শ্রুতি নামে পরিচিত। সাকার স্বরূপ বিশিষ্ট কোন পুরুষের মুখ হইতে ঐরূপ বাণী উচ্চারিত হয় না। উহা অখণ্ড চিদাকাশ হইতে স্বাভাবিক ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠে। উহার কোন বক্তা নাই এবং নিজে ভিন্ন অপর কোন শ্রোতা নাই, উহাই শ্রুতি। শ্রবণের পর মনোময় ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যখন ঐ বাণী পদ-বাক্য-সমষ্টি রূপে পুনঃ প্রকাশিত হয় তখন উহার নাম হয় স্মৃতি। শ্রুতি হইতে স্মৃতির প্রামাণ্য কম হইবার কারণ এই যে শ্রুতি মনের অতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যভূমির বস্তু। কিন্তু স্মৃতি উচ্চস্তরের হইলেও মনোভূমির ব্যাপার। সাধকের সাধন জীবনে অধিকাংশ স্থলে স্মৃতিরূপ বাণীরই প্রকাশ হইয়া থাকে। অত্যন্ত ভাগ্যবান সাধক সমগ্র জীবনে কদাচিৎ কেহ শ্রুতিরূপ অপৌরুষেয় বাণী প্রাপ্ত হইয় থাকে।

আর একটি কথা। দর্শন সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম। কারণ প্রকৃত সত্যের দর্শন লাভ হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইয়া পারে না। শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রানুসারে অপরোক্ষ দর্শনের পরেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, সংশয়-ভঞ্জন এবং কর্মক্ষয় সম্ভবপর হয়। কল্পিত দর্শনে এইরূপ মহাফলের উদয় হইতেই পারে না। বিশুদ্ধ দর্শন ও শ্রবণে চিত্তে শান্তি, উৎসাহ, বল প্রভৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং জীবনের ধারা পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়। খাঁটি দর্শনের প্রভাব মানবীয় চিন্তার অগোচর। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন সাধকগণের যাবতীয় দর্শন বা শ্রবণ মিথ্যা অথবা নিরর্থক। সত্য দর্শন ও শ্রবণ প্রতি স্তরেই হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। তবে অধিকাংশ

স্থলেই নানা কারণে উহার সংখ্যা অতি পরিমিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, দর্শন ও শ্রবণ সত্য হইলেই যে সাধকের সাধনগত উন্নতির কারণ হয় তাহা নহে। আত্ম-চৈতন্যের বিকাশের পথে, তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণের পথে, নিজের খণ্ড সত্তার ক্রমিক প্রসারের পথে এবং প্রেম, ক্ষমা, দয়া, মায়া প্রভৃতি মহনীয় গুণকলাপের বিকাশের পক্ষে যে দর্শন ও শ্রবণ সাহায্য করে তাহাই মুমুক্ষু সাধকের আদরণীয়।

৩ — গ্রন্থি কাহাকে বলে—গ্রন্থি মোচন

মুক্তির পথে চলিতে হইলে গ্রন্থি তত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। দুই অথবা ততোধিক গাঁঠ দিয়া একত্র করিলে তাহাকে গ্রন্থি বলে। গ্রন্থি দেওয়ার ফলে একাধিক জিনিষ আপাততঃ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় এবং তাহাদিগকে সহসা আলাদা করা যায় না। মনুষ্যের দেহাবচ্ছিন্ন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার মূলে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ও পৃথক্ বস্তুর অচ্ছেদ্য মিলন রহিয়াছে। এই দুইটি বস্তুর নাম চিৎ অথবা পুরুষ বা প্রকাশ এবং সত্ত্বগুণ-প্রধান প্রকৃতি, যাহা স্বচ্ছ হইলেও অচিৎ রূপে গণ্য। এই সত্ত্ব গুণটি— রজঃ ও তমঃ গুণকে গর্ভে ধারণ করিয়া একীভূত স্বরূপে চিদ্রূপ দর্পণে প্রতিফলিত হয়। তখন ঐ প্রতিফলিত রূপটিকে চিত্তরূপে বর্ণনা করা হয়। ইহা একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। ইহাকে আবার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার মূলে চিদ্রূপ প্রকাশ রহিয়াছে এবং তাহার উপর সত্ত্বগুণাত্মক প্রকৃতি বা অচিৎ সত্তা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত রহিয়াছে। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ বলিয়া চিদালোকে তাহা আলোকিত হয় এবং চিত্ত পরম স্বচ্ছ বলিয়া সত্ত্বকে নিজের সহিত অভিন্ন না হইলেও অভিন্নভাবে ধারণ করে। ইহার মূল কারণ আপাতদৃষ্টিতে অবিবেক বা অজ্ঞান এবং চরম দৃষ্টিতে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য-কল্পিত প্রাকৃতিক লীলায় প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা। এই প্রক্রিয়াটির নাম গ্রন্থি-বন্ধন অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ

এর কল্পিত তাদাত্ম্যের প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিবিম্বভূত চিত্তরূপ বীজটি সমস্ত সংসারের মূল বীজ। এই বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া এবং পূর্ণ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া শাখা পল্লবাদি-সম্পন্ন বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে, ইহাই জীবের সংসার। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে চিত্তের উপর স্তরে স্তরে বাহ্য সত্তার আবরণ আসিয়া জুটিয়াছে, এবং সবই মূল চিত্ত-সত্তার সহিত অভিন্ন রূপে গ্রথিত রহিয়াছে। এইভাবে নিজের আত্মাতেই সমগ্র জড় জগৎ জড়িত হইয়া গাঁথিয়া গিয়াছে। গুরু কৃপাতে বৈরাগ্যের উদয় হইলে এই বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয় এবং জড় সত্তা কেন্দ্রীয় চৈতন্য সত্তা হইতে ক্রমশঃ আলগা হইতে থাকে। বাহ্য স্তরগুলি এইভাবে শিথিল হইয়া ভাঙ্গিয়া গেলেও ভিতরের বীজরূপী স্তরটি থাকিয়াই যায়। বৈরাগ্য ক্রমশঃ বিবেকজ্ঞানে পরিণত হয়। তখন ঐ বিবেকজ্ঞানরূপ অগ্নি ঐ মূল বীজটিকে ধ্বংস করে। অর্থাৎ তখন অচিদ্‌রূপী সত্ত্ব-প্রধান প্রকৃতি এবং চিদ্‌রূপ পুরুষ পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া পৃথক্ হইয়া পড়ে। তখন গ্রন্থি মুক্ত হইয়া যায়। দুইটি পৃথক্ বস্তু তখন আর এক বলিয়া মনে হয় না। জড় জড়রূপে এবং চৈতন্য চৈতন্যরূপে স্থিতিলাভ করে। গ্রন্থিবন্ধনের ফলে যেরূপ সংসারের আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনি গ্রন্থিমোচনের ফলে সংসার-নিবৃতিরূপ মুক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাধক যে কোন সাধনায় নিয়ত হউক না কেন তাহার সাধনায় সার্থকতার একমাত্র মানদণ্ড গ্রন্থি-মোচন। যে সাধনায় চিৎ ও অচিতের মিথ্যা তাদাত্ম্য ভাঙ্গিয়া না যায় সে সাধনা প্রকৃত সাধনা নহে। ধ্যান, জপ, নাম-কীর্তন, সমাধি, সেবা, সবই এই মূল চিদ্‌গ্রন্থি-মোচনের সহায়ক। তাই এই সকল সাধনের মাহাত্ম্য।

চৌদ্দ

১ — কর্মশক্তির ফল বিস্তার

কর্ম ও কর্মফল এই দুই লইয়াই সংসার। কর্তৃত্ব-অভিমান হইতে কর্মের উৎপত্তি হয় এবং ঐ অভিমান হইতেই উক্ত কর্মের ফলভোগও হইয়া থাকে। কর্ম শুভাশুভ ভেদে দুই প্রকার। তাই তাহার ফলও সুখ দুঃখরূপে দুই প্রকার। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য-নিয়ম শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে অধিকরণে বা আধারে কর্তৃত্ব থাকে সেই একই অধিকরণে ভোক্তৃত্বও থাকে, ভিন্ন অধিকরণে থাকে না। ইহার তাৎপর্য এই যে কোন কর্মের কর্তাকেই স্বয়ং সেই কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়। একজনে কর্ম করিতেছে এবং অন্যে তাহার ফলভোগ করিতেছে এরূপ কখনও হইতে পারে না। কার্যকারণভাব এবং নৈতিক শৃঙ্খলার দিক্ হইতে ইহাই স্বাভাবিক। যাঁহারা কর্মবাদ স্বীকার করিয়াও জন্মান্তর স্বীকার করেন না তাঁহাদিগকেও ইহা মানিতে হয়। সেই জন্য খ্রীষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধার্মিক সিদ্ধান্তেও এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। এদিকে বৌদ্ধ এবং জৈনগণ জন্মান্তরবাদী ও কর্মবাদী। তাঁহারাও কর্ম ও ফলের এই একাধিকরণ নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের উপরেই বিশ্ব-ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। করুণা অথবা প্রেম যদিও এই সিদ্ধান্তের অতীত তথাপি উহা ইহাকে লঙ্ঘন না করিয়া, ইহার নিয়ন্ত্রণ অঙ্গীকারপূর্বক, ইহাকে অতিক্রম করিয়া থাকে।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা কর্মবাদের সাধারণ নিয়ম। ইহা যে সুসঙ্গত এবং সর্ববাদিসম্মত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ভিতরে

অনেক গুহ্য রহস্য আছে। যাহাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলিয়া মনে করি তাহা বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে বিরাট সত্তার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ মূলে জীব-স্বরূপ এক বলিয়া সৃষ্টির মধ্যেও জীবভাবের বিবর্তনের প্রসঙ্গে আমরা একই জীবকে দেখিতে পাই, অর্থাৎ মূলে জীব এক ও অভিন্ন থাকিয়াও কালের প্রভাবে ও কর্মবিবর্তনের মাহাত্ম্যে উহা আধারভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। তখন নানা জীবের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এই নানাত্বের অন্তরালে অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্য নিহিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। গুণগত, ক্রিয়াগত, ভাবগত, রুচিগত ও সামর্থ্যগত অসংখ্য ভেদ জীবসৃষ্টিতে লক্ষিত হয়। মূলে এক জীব থাকিলেও বাহিরে আসিয়া জীব হয় নানা। কিন্তু নানা হইলেও পরস্পরের অনুপ্রবেশমূলক অভেদ সম্বন্ধও রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝা যায় জগতের প্রতি বস্তুই যেমন সর্বাত্মক তেমনি প্রতি জীবও সর্বজীবাত্মক। গুণ, ক্রিয়া, বাসনা-সংস্কারাদির প্রাধান্যের দিক্ হইতে প্রতি জীবের ব্যক্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অবচেতন ভূমিতে সকল জীবের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সাম্য লক্ষিত হয়। এইজন্য আমরা পূর্বে যে বিশ্বনীতির প্রসঙ্গ উঠাইয়াছি তাহার যে একটি পরিপূরকের দিক্ আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। 'যে কর্তা সেই ভোক্তা' এই মূল নিয়মের খণ্ডন না হইলেও পরিপূরণ আবশ্যক, ইহা তখন প্রতীত হয়। Love is the fulfilment of Law. তখন বুঝা যায় যে কোন কর্ম এক ব্যক্তি দ্বারা কৃত হইলেও এবং প্রধানতঃ তাহারই ভোগ্য হইলেও আংশিকরূপে তাহার ফল সমগ্র বিশ্বের ভোগ্য না হইয়া পারে না। সম্বন্ধমূলক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বলিতে পারা যায়, যে সত্তা উক্ত প্রধান সত্তার যত নিকটবর্তী সে উহার ফলের তত অধিক অংশের ভোক্তা হইয়া থাকে। অংশগত তারতম্য থাকিলেও তাই বিশ্বের অন্তিম রেখা পর্যন্ত ঐ কর্মদ্বারা প্রভাবিত হয়। নিকটে প্রভাব বেশী, দূরে প্রভাব কম, ইহাই মাত্র প্রভেদ। সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও বিচার্য

যে যদিও এখানে কোন কর্মকে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইল তথাপি ইহা জানিতে হইবে যে প্রধানতঃ ইহা উক্ত ব্যক্তির কর্ম হইলেও অবচেতনভাবে উক্ত আধারের মধ্য দিয়া উহা বিশ্বেরই কর্ম। কর্তৃত্ব-অভিমান থাকার দরুণ কর্মকর্তা উহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু তথাপি বিশ্বশক্তির ক্রিয়া অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন ঃ

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।"

পক্ষান্তরে ব্যক্তিবিশেষ যে সুখ দুঃখরূপ ফল ভোগ করে তাহা প্রধানতঃ তাহারই প্রাক্তন কর্মের ফল হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা আংশিকরূপে বিশ্বকর্মেরই ফল। অভিমান বিগলিত হইয়া গেলে ইহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

এইজন্য ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে একজনের কৃতকর্মের ফল আংশিকরূপে অনুকূল অথবা প্রতিকূলভাবে অন্যকে স্পর্শ না করিয়া পারে না এবং ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে অন্যের ফল আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ভোগ করিয়া থাকি। তাই প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যেই একটি দায়িত্বের ভাব রহিয়াছে। কারণ এই দৃষ্টি অনুসারে ব্যষ্টির ফল সমষ্টিকে ভোগ করিতে হয় এবং সমষ্টির ফল ব্যষ্টিকেও স্পর্শ করে। সূক্ষ্ম বিচারে বুঝিতে পারা যায় যে এই ফলোৎপত্তির কতকগুলি প্রধান ধারা আছে। তন্মধ্যে রক্তগত দৈহিক সম্বন্ধ একটি প্রধান ধারার মধ্যে গণ্য। ভাবগত রাগ অথবা দ্বেষ অবলম্বন করিয়াও অনুরূপ ধারা আছে। এই সকল ধারা অধঃ উর্ধ্ব এবং সমান্তরালভাবে চারিদিকে বিস্তৃত। রক্তগত সম্বন্ধ এবং ইচ্ছামূলক ভাবসম্বন্ধ উভয়ই এই ধারার

নিয়ামক। মা বলিয়াছেন, "দেখ ভাল মন্দ যে কাজই করা যায় তাহা এদিকে সাত পুরুষ আর ওদিকে সাত এই চৌদ্দ পুরুষের উপর ক্রিয়া করে।" সাত পুরুষ পর্যন্তই রক্তগত বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে উপলক্ষিত হয়। এই জন্য শাস্ত্রে প্রধানতঃ অধঃ দিকে সাত পুরুষ এবং ঊর্ধ্বদিকে সাত পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে তিন পুরুষের কথাও আছে। বুঝিতে হইবে ঐ পর্যন্ত শক্তির ক্রিয়া অত্যন্ত তীব্রভাবে হয়, তাহার পর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। সাত পুরুষ পর্যন্ত ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও ধারণা করা যায়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অধঃ অথবা ঊর্ধ্ব কোন দিকেই সাত পুরুষে ক্রিয়ার অবসান স্বীকার্য নহে। তবে ঐ স্থলে প্রভাব অত্যন্ত সূক্ষ্ম যোগিগম্য ভাবে বিদ্যমান থাকে ইহাই বক্তব্য।

২ — সংযোগ রহস্য

'সংযোগ' তত্ত্বটি গূঢ় রহস্যময়। ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলে অনেক গভীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সাধারণতঃ সংযোগ বলিতে বুঝায় 'ভবিতব্য'। লোকে মনে করে যাহা সাধারণ কার্যকারণভাবের দৃষ্টিতে সম্ভাবিত নয় তাহা সংঘটিত হইলে প্রাক্তন কোন অব্যক্ত কারণ এবং উহার কার্যকারিতা উহার পশ্চাৎ রহিয়াছে। নিয়তি সংযোগেরই একটি প্রকার-ভেদ মাত্র। সাধারণ মনুষ্য ত্রিকালদর্শী নহে। তাহাদের দৃষ্টি স্থূল এবং কেবলমাত্র বর্তমানে নিবদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের গোচর বর্তমানরূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষ না থাকিলেও যে বর্তমান হইতে পারে তাহা স্থূলদর্শী জীব ধারণা করিতে পারে না। ত্রিকালের অন্তর্গত যে বর্তমান তাহা অতীত ও অনাগত এই দুই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু যে বর্তমানে অতীত ও অনাগতের ব্যবচ্ছেদ নাই তাহা সাধারণ মনুষ্যের গোচর নহে এবং সে সম্বন্ধে জাগতিক

জীব কোন ধারণাই রাখে না। বাস্তবিক পক্ষে অতীত ও অনাগত নামক অব্যক্ত অংশ জ্ঞানের মধ্যে আসিয়া ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তখন উহা বর্তমানরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। যেখানে শুদ্ধদৃষ্টির প্রকাশ সেখানে এই বিশাল বর্তমান স্বীকৃত হয়। এই বিশাল বর্তমানে বস্তু-স্থিতি কালের অধীন নহে, উহা দৃষ্টির অগোচর (অদৃষ্ট)। ঐ অবস্থাতে বস্তু বিশেষের সহিত বস্তু-বিশেষের অথবা ভাব-বিশেষের সহিত ভাব বিশেষের যে সম্বন্ধ তাহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা 'সংযোগ'। সুতরাং বর্তমানে যাহা কিছু ঘটে তাহার মূলে ঐ ব্যাপক বর্তমানের 'সংযোগ' রহিয়াছে জানিত হইবে। এই নিয়ম বা শৃঙ্খলাকে বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে নিয়তি বলা যায়, ইহা সত্য, কিন্তু প্রচলিত ভাষায় 'সংযোগ' শব্দ দ্বারাই এই অর্থ ধ্বনিত হইয়া থাকে। সংযোগ অচিন্ত্য শক্তিস্বরূপ। মানুষ যাহা কল্পনা করিতে পারে না, যাহা প্রচলিত শৃঙ্খলার অনুবর্তী নহে, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহাও সংযোগ প্রভাবে সম্ভবপর হয়। কেহ ইহাকে ভাগ্যও বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শব্দবিশেষের দ্বারা তত্ত্বের জটিলতা দূরীভূত হয় না। সংযোগ হইতে কার্যবিশেষের প্রারম্ভ হইতে পারে, আবার সংযোগ হইতে কার্যবিশেষের পূর্ণতাও হইতে পারে। যেটা হওয়ার সম্ভাবনা নাই সংযোগ থাকিলে তাহাও হইতে পারে এবং যে পূর্ণত্বের আশা দুরাশা বলিয়া মনে হয় সংযোগ থাকিলে তাহা সহজেই ঘটিতে পারে। শুধু তাহাই নহে। স্থিতির মূলেও সংযোগ রহিয়াছে। তাই মা বলিয়াছেন, "এক ত যোগ নিত্য আছেই, দ্বিতীয়তঃ সংযোগে কিছুটা পূর্ণ হল; আবার কারো শুরু হল—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। কোন কোন অংশে পূর্ণ হওয়া, আবার কোন কোন অংশে শুরু হওয়া। এক ত মিলবার ছিল, পূর্ণ হল, আর যেটা হবার তা'র শুরু, আর আছেই ত।"

দার্শনিকগণ জাগতিক ব্যাপারকে নিয়তক্রম ও অনিয়তক্রম এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক হিসাবে নিয়তক্রম ব্যাপারের মূলে

রহিয়াছে নিয়তি। সেখানে কার্যকারণভাব একটি শৃঙ্খলার মত সুনিয়ন্ত্রিত। যে মহা-ইচ্ছা সৃষ্টিমুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহা ত্রিকালের মধ্য দিয়া নিজকে নিজে পূর্ণ করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে কার্যকারণের মধ্যে একটা ক্রম লক্ষিত হয় এবং ঐ ক্রম যে লঙ্ঘন হয় না তাহাও দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই মহা-ইচ্ছাই সৃষ্টির অতীত নিজ স্বরূপে পূর্ণভাবে জাগ্রত রহিয়াছে এবং নিরন্তর নিজ কার্য করিতেছে। ঐ ইচ্ছাটি স্বতন্ত্র কারণ, উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কিছুই নাই। কালের প্রবাহের উপরেও ঐ স্বতন্ত্র ইচ্ছা উহার অব্যাহতস্বরূপে নিত্য বর্তমান রহিয়াছে। ঐ মহা-ইচ্ছার প্রভাবে ক্রমের বন্ধন ভাঙ্গিয়া যায়, অর্থাৎ ক্রমের কোন সার্থকতা থাকে না। যে কোন স্থান হইতে যে কোন ভাবের অভিব্যক্তি হইতে পারে। ক্রমকে আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র স্বাতন্ত্র্যময়ী মহা-ইচ্ছা হইতেই কার্যটি নিষ্পন্ন হয়। এরূপ স্থলে সাধারণ চিন্তাশীল লোক বলিয়া থাকে যে সংযোগ ছিল তাই ইহা ঘটিল, অর্থাৎ হবার ছিল তা'ই ইহা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ হবার ছিল, এ কথার কোন অর্থ নাই। "ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র", অর্থাৎ যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে। তাহাকে কেহই বাধা দিতে পারে না। এই কথাটির মূলেও ঐ স্বাতন্ত্রময়ী মহা-ইচ্ছার অলঙ্ঘ্য প্রভাবের কথাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

এই যে বিচারের ধারা—সক্রম অথবা অক্রম, পূর্বনির্দিষ্ট অথবা প্রতি ক্ষণে স্ফুরণশীল—ইহার মীমাংসা পূর্ণ প্রকাশে। পূর্ণ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সংযোগের রহস্য পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয় না। সেইজন্য মা-ও বলিয়াছেন, "যতক্ষণ পূর্ণ প্রকাশ না হয় ততক্ষণ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্যে সংযোগ থেকেই যায়।"

৩ — শ্রবণ মাহাত্ম্য

বিষয় ভেদে শ্রবণ দুই প্রকার, অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে শ্রোতা নিজের অনুভবযোগ্য বিষয় অন্যের মুখ হইতে শ্রবণ করে সেই ক্ষেত্রে শ্রবণ এক প্রকার। কিন্তু যে ক্ষেত্রে শ্রোতা যাহা কিছু শ্রবণ করে তাহার কোন অংশই বুঝিতে পারে না অথচ শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করে সেই ক্ষেত্রে শ্রবণ দ্বিতীয় প্রকার। সাধারণ লোক কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাহা দীর্ঘকাল ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিতে চায় না এবং পারেও না। কিন্তু যদি কোন বিষয় রুচিকর হয় অথবা চিত্তাকর্ষক হয় তাহা হইলে বিষয়ের গুণে শ্রোতার চিত্ত রঞ্জিত হয় বলিয়া সে ধৈর্য ধরিয়া শ্রবণ করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা শ্রবণকে সাধনার অঙ্গ করিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে শ্রবণটি নিরপেক্ষ, কারণ বিষয়টি চিত্তাকর্ষক না হইলেও অথবা অন্য কোন প্রকারে মনোরঞ্জনের সাধক না হইলেও বিষয়ের অন্তর্নিহিত গুণে অথবা বাক্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রভাবে শ্রোতা শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনেকে মনে করেন যে, যে বিষয় অথবা যে ভাষা শ্রোতার বোধের অগোচর তাহা শ্রবণ করিয়া কোন প্রকার ফল লাভ হইতে পারে না। লৌকিক জগতে ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে সাধক শ্রোতার শ্রবণরূপ সাধনা তাহার বুদ্ধি অথবা বিচার শক্তির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না। বেদবাক্য অপৌরুষেয়, মহাজন বাক্য অপৌরুষেয় না হইলেও মহাজ্ঞানী ঋষিমুনিদিগের নিজ মুখে উচ্চারিত। এই প্রকার অন্যান্য সিদ্ধবচনও বুঝিতে হইবে। এই সকল শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে চৈতন্যশক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই শব্দগুলির কেবলমাত্র লৌকিক শব্দ নহে, যদিও সাধারণ শ্রোতার নিকট ইহারা সাধারণ শব্দরূপে প্রতীত হয়। এই সকল

শব্দের অন্তঃস্থিত শক্তির প্রভাবে মানুষের জীবন প্রভাবিত এমন কি পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ গুপ্ত শক্তিকে কার্যকরী রূপে পাইতে হইলে পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিতে হয়। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার ফলে ঐ সকল শব্দ জাগিয়া উঠে অর্থাৎ চৈতন্যময়ী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই চৈতন্যময়ী শক্তির প্রভাবে দেহ, প্রাণ ও মনের যাবতীয় শৃঙ্খল ক্রমশঃ ছিন্ন হইয়া যায়।

এই জন্য বুদ্ধিদ্বারা বুঝিতে না পারিলেও ভগবদ্বাণী অথবা মহাজনের বাণী শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করিতে হয়। ঐ শ্রবণও বৃথা যায় না। অনেক সময় বুদ্ধিপূর্বক শ্রবণের পরিবর্তে ঐ প্রকার সরল ও সাদর শ্রবণের ফলে সাধকের অন্তঃকরণের আবরণ খুলিয়া যায় এবং সাধক জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ের অতীত নিজস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং অনুভবে না আসিলেই যে সৎকথা ও সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিবে না ইহা সত্য নহে, কারণ অনুভবে না আসিলেও শুধু শ্রবণের ফলে অনুভবের পথ খুলিয়া যায়। তা'ই মা বলিয়াছেন, "এই সব কথা শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে ঐ দিকের রাস্তা খোলে। জল প'ড়ে প'ড়ে যেমন পাথরে ছিদ্র হয়।"

গ্রন্থ-পাঠ, সৎ-কথা এবং কীর্তন এই তিনটি স্থূলতঃ পৃথক্ পৃথক্ মনে হইলেও বিষয় গুণে অভিন্ন। কারণ সর্বত্রই ভগবৎ-প্রসঙ্গই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং শ্রবণ সৎ-গ্রন্থেরই হউক অথবা অন্য প্রকার সৎকথারই হউক কিংবা কীর্তনেরই হউক, ফলে কোন পার্থক্য নাই। যাহার যে দিকে রুচি সে সেই দিক্‌কার শ্রবণে আকৃষ্ট হয়। সেই দিক্ দিয়াই তাহার পথ খুলিয়া যায়। অধিকারভেদে সবই ঠিক। শ্রবণ সম্বন্ধে মা বিশেষভাবে শ্রদ্ধার উপর জোর দিয়া থাকেন। কারণ শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ না করিলে শ্রবণের সম্যক্ ফললাভ হয় না। এই জন্যই দোষ-দৃষ্টি বর্জন করিয়া শ্রবণ করাই

বিধেয়। শাস্ত্রবাক্যই হউক অথবা মহাজনের উপদেশই হউক উহা শ্রবণ করিবার সময় উহার দোষ-গুণের বিচারের ভাব মনের মধ্যে থাকা উচিত নয়। নিজে উন্মুখ হইয়া সরলভাবে উহা গ্রহণ করিতে হয়। নিজে সমালোচক হইয়া সৎ-প্রসঙ্গ অথবা মহাজনের উপদেশ শ্রবণ করা নিষিদ্ধ। ঠিকভাবে শ্রবণ সিদ্ধ হইলে মননের অবসর আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রবণ শ্রদ্ধাপূর্বক না হইলে শ্রুত বিষয়ে সংশয় থাকিয়া যায় বলিয়া উহাকে অবলম্বন করিয়া মননের কার্য ঠিকভাবে চলিতে পারে না। মননের মুখ্য উদ্দেশ্য সংশয় নিরসন। কিন্তু প্রথমে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ না করিলে দীর্ঘকাল মননের যাহা যথার্থ ফল তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মননের পরে দৃঢ় নিশ্চয়ের আবির্ভাব হইলে উহা কর্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অনুভবশূন্য শ্রবণ হইতেও পূর্ণ অনুভবের উদয় সম্ভবপর। কারণ সংশয়-নিবৃত্তির পর কর্মরূপে প্রকাশ হওয়ার সময় প্রত্যক্ষ অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী।

৪ — অভেদ দৃষ্টির মহিমা

মানুষ সর্বত্র খণ্ডভাব নিয়া ব্যবহার-ভূমিতে কার্য করিতেছে। তাহার দৃষ্টি ভেদ-দৃষ্টি। সমস্ত সত্তার মধ্যে যে এক অখণ্ড অভিন্ন সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে এই দৃষ্টি তাহার নাই। তাই যে যখন যাহা দেখে সে তখন তাহাই দেখে। দেশ ভেদে, কাল ভেদে, বস্তু ভেদে এই সব দেখা পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু এমন দেখা সে দেখে না যাহাতে তাহার এই নানা দেখার বৈচিত্র্য সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তা'ই এই দেখা হইতে সে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। কারণ সর্বত্র ভাবগত ভেদ রহিয়াছে, কোন ভাবে পূর্ণ তৃপ্তি না পাওয়ায় এক ভাব হইতে অন্য ভাবে সঞ্চরণ অনবরত ঘটিয়া থাকে। যা'র যে ভাব সেই ভাবই যে পূর্ণভাব এবং সেই ভাবই যে ভাবাতীত

ইহা অনুভবে আসে না। মাতৃভাব, পিতৃভাব, বন্ধুভাব, পতিভাব সবই খণ্ডভাব। কিন্তু অখণ্ডভাবের সহিত যোগ না থাকিলে মাতা শুধু মাতাই, পিতা শুধু পিতাই। মাতাতেও পিতৃভাব নাই এবং পিতাতেও মাতৃভাব নাই। সুতরাং অতৃপ্তির অবসান হয় না। কিন্তু প্রতি ভাবই সেই অখণ্ড মহাভাবের প্রকার ভেদ মাত্র, ইহা দেখিতে পাইলে অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সব সময় এককেই জানিতে পারা যায়। তখন মাতা, পিতা, বন্ধু, স্বামী সকলের মধ্যেই সেই একই যে অনন্তরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং খণ্ডভাবকেও পূর্ণরূপে পাইতে হইলে, অর্থাৎ মাতৃভাবকেও পূর্ণভাবে অখণ্ডরূপে পাইতে হইলে অভেদ দৃষ্টি আবশ্যক। কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ দৃষ্টি থাকা পর্যন্তও সেই পরম স্থিতি লাভ করা যায় না এবং বিরোধেরও সমন্বয় হয় না। বেদান্তের প্রকৃত লক্ষ্য ইহাই, অর্থাৎ অভেদ দৃষ্টি হইতেই ভেদ অভেদ উভয়ের অন্ত সম্ভবপর। কারণ ভেদ ও অভেদের যে পরস্পর বিরোধ তাহাও সেখানে নাই।

পনের

১ — বিক্ষেপের মধ্যেই স্থৈর্যের চেষ্টা

মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। এই চঞ্চল মনকে স্থির করিবার জন্য সাধনা আবশ্যক হয়। কিন্তু সাধনা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হওয়া আবশ্যক; যে সব কারণে মন চঞ্চল হয় তাহা হইতে দূরে থাকা আবশ্যক। অবশ্য মন স্থির হইয়া গেলে এই প্রকার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অনুকূলতা সংসারী জীবের পক্ষে ব্যবহার ক্ষেত্রে সব সময় সুলভ নহে। সংসারে চিত্ত বিক্ষেপের বহু হেতু আছে

এবং এইগুলি সব সময় নিজের উপর নির্ভর করে না। এই সব স্থলে মনঃস্থৈর্যের অভ্যাস করা সম্ভবপর মনে হয় না। এই প্রকার পরিস্থিতিতে মা'র উপদেশ এই যে বাহ্য বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া ভিতরের বিক্ষেপ দূর করার জন্য চেষ্টা করা যদি সম্ভবপর না হয় তবে ঐ বিক্ষেপের মধ্যে থাকিয়াই কৌশল করিয়া বিক্ষেপের অতীত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের এমন শক্তি আছে যে সে বহুর মধ্যেও একককে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে এবং ধরিতেও পারে যদি কৌশলপূর্বক চেষ্টা করে। বহুকে বাদ দিয়া একককে পাইবার চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সহজ। বহুর মধ্যে একককে চিনিয়া নেওয়া তদপেক্ষা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নহে। একের দিকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। বিক্ষেপ থাকিলে তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া একের দিকেই লক্ষ্য রাখা—ইহাই তাঁহার উপদেশ। এই অভ্যাসের ফলে এমন একটি স্থিতির উদয় হয় যখন বিক্ষেপ থাকিলেও সে বিক্ষেপকে বিক্ষেপ বলিয়া মনে হয় না, কারণ দৃষ্টি অন্তর্মুখ হইয়াছে। মা বলেন, "সমুদ্রে ছোট বড় কত ঢেউ আসে, তা'র মধ্যেই ডুব দেওয়া।" ইহার তাৎপর্য এই— যখন ঢেউ আসিবে না তখন আমি নিশ্চিন্তে ডুব দিব এরূপ মনে করিলে তাহার পক্ষে ডুব দেওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। তদ্রূপ বাহ্য অর্থাৎ সাংসারিক বিক্ষেপ আসিবে না এবং আমি নিশ্চিন্তভাবে একান্তমনে অভ্যাসে নিরত হইব এরূপ আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে চিরদিন বসিয়াই থাকিতে হইবে, অভ্যাস করা হইয়া উঠিবে না। কারণ সাংসারিক জীবনে বিক্ষেপের কারণ থাকিবে না এরূপ অবস্থা দুর্লভ।

২ — রিপুর প্রতিকার

রিপু সম্বন্ধে মা একটি মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছেন। 'ক্রোধ' উপলক্ষ্য করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা শুধু ক্রোধ নহে অন্যান্য রিপু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মা'র উপদেশের সার মর্ম এই—যে কোন রিপুর উপদ্রব অনুভব

করিলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ-শক্তির প্রয়োগ করা আবশ্যক। মা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আহারের মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণশক্তির প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যে বস্তু যাহার নিকট অধিক রুচিকর তাহার পক্ষে সেই বস্তুকে অন্ততঃ একদিনের জন্য পরিহার করা সংযম অভ্যাসের একটি সোপান। ইহার ফলে শুধু যে সংযমের দৃঢ়তা বাড়িতে থাকে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে রিপুর উদয়জনিত নিজের অপরাধী ভাবটাও মনে সব সময় জাগ্রত থাকে। কারণ ঐ অপরাধের জন্যই ত সংযম অভ্যাস করা হইতেছে। ইহার ফলে অভিমান ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসে এবং পরে এমন একটি স্থিতির উদয় হয় যখন প্রকৃতই দৈন্যভাব আত্মপ্রকাশ করে। এই অবস্থায় সব রিপুই অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করে। ইহা যেমন ক্রোধ নিবারণের কৌশল তদ্রূপ ঠিকভাবে অভ্যাস করিতে পারিলে সকল রিপুরই দমনের উপায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই ভাবে রিপুসকল উদ্দাম বেগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে ইহা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয় না। বীজভাবে রিপুসকল থাকিয়া যায়। তখন সংযমের প্রভাবে এবং সাধন করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় জ্ঞানের উদয় হইলে সকল রিপুই নিবৃত্ত হইয়া যায়।

ষোল (ক)

১ — শ্রাদ্ধের ফল

শ্রাদ্ধ ও তর্পণের প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। উভয়েরই নানা প্রকার ভেদ আছে। প্রাচীন কাল হইতেই শ্রাদ্ধাদির বিরুদ্ধে নাস্তিক সম্প্রদায় তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন।

যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী এবং পরলোক স্বীকার করেন না, যাঁহারা কর্ম ও কর্ম জন্য ফল স্বীকার করেন না, যাঁহারা সূক্ষ্ম জগৎ অথবা মৃত্যুর পর পারলৌকিক সত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে চার্বাক সম্প্রদায় বিশেষভাবে এই বিরুদ্ধবাদীদিগের নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। বৃহস্পতি লোকায়ত মতের প্রবর্তক ছিলেন এবং ঐ মতের অনুরূপ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে এবং তাঁহার অনুবর্তী নাস্তিক-মতাবলম্বীগণ সকলেই পরলোকের বিরুদ্ধে স্থূল দৃষ্টিকোণ হইতে বহু প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় চিন্তারাজ্যে কোন সম্প্রদায়ই তাঁহাদের মত গ্রহণ করেন নাই।

বর্তমান সময়েও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন অনেক শিক্ষিত পুরুষ এই প্রকার নাস্তিক মতই হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই মত সত্য নহে। তাঁহাদের যুক্তি এই—এই লোকে যাহা কিছু মৃত আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয় তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হন এবং তাহার দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। স্থূল দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং ত্রিকালদর্শী সর্বত্র অব্যাহতদৃষ্টি মহাজনগণের অনুভব ইহার বিরুদ্ধ। প্রকৃত সত্য এই যে জীব দেহ নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্য। স্থূল শরীরের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীরও কৈবল্যলাভের পূর্ব পর্যন্ত জীবকে বহন করিতে হয়। এই শরীরেই কৃতকর্মের সংস্কারাদি বিদ্যমান থাকে। মৃত্যুর পর স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিয়োগ সম্পন্ন হইলে সূক্ষ্ম শরীর স্থূল জগৎ ত্যাগ করিয়া পরলোকে অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্তরে উপনীত হয়। এই স্তরটি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এইজন্য সাধারণ মনুষ্য অনুকূল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দর্শনযোগ্য। ঋষিগণ এবং শাস্ত্রকারগণ এই প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরেই

তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকল স্থাপন করিয়াছেন। সূক্ষ্ম জগতে পিতৃলোক, দেবলোক ও ঋষিলোক— এই প্রকার বিভাগ আছে। মৃত্যুর পর একদিকে পিতৃলোকের ধারা এবং অপর দিকে দেবাদিলোকের ধারার সঙ্গে যোগ স্থাপন করার সূত্রপাত হয়। পিতৃলোক প্রবিষ্ট হইবার পূর্বেই কতকগুলি আতিবাহিক অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। তারপর পিতৃলোকে প্রবিষ্ট হইয়া কর্মানুরূপ সুখময় অথবা দুঃখময় স্থানবিশেষে গতি হয়, এবং ঐ সমস্ত স্থানে সুখ দুঃখ ভোগের দ্বারা অনুরূপ পূণ্য ও পাপ ক্ষীণ হইয়া গেলে অবশিষ্ট কর্মাংশের ফল-ভোগের জন্য নরলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য বিশেষ কারণে মনুষ্যেতর স্তরেও সাময়িক গতি লাভ হইতে পারে। মানুষ মরণোত্তর গতিতে যে কোন স্থান লাভ করুক না কেন, তাহাকে চিন্তা করিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে স্থূল জগৎ হইতে কোন অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল সে অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। চিন্তাসূত্র অথবা ভাবসূত্র যোগে সকলের সহিত সকলের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে যেখানেই বিদ্যমান থাকুক না কেন, তীব্র চিন্তার প্রভাবে তাহার নৈকট্য অনুভবে উভয়ের অন্তরালবর্তী ব্যবধান কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা পরীক্ষিত সত্য। শ্রদ্ধা সহকারে যাহা অর্পিত হয় তাহা ইচ্ছার সহযোগ-বশতঃ যথাস্থানে প্রকট না হইয়া পারে না। শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠেয় বলিয়াই 'শ্রাদ্ধ' এই নামের সার্থকতা জানিতে হইবে। শ্রাদ্ধে যাহাই কিছু অর্পিত হউক তাহার সারাংশ ভাবরূপ আকার পরিগ্রহ পূর্বক ভাবসূত্রের সাহায্যে ভাবময় আত্মীয়স্বজনের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে পরলোকগত জীব ব্যক্তিগত কর্ম অনুসারে যথাস্থানে সুখ দুঃখ ফলভোগ করিবে, ইহা কর্মবাদীর দৃষ্টিকোণ হইতে স্বীকার করা যাইতে পারে। নাস্তিকের কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কর্ম ও ফলের সামানাধিকরণ্য-নিয়ম স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ যিনি সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করেন তিনি নিজের প্রাক্তন

কর্মানুসারেই করেন, ইহা যেমন সত্য, তেমনই যিনি কোন অভিনব কর্মের অনুষ্ঠান করেন উহার ফলস্বরূপ সুখ দুঃখ তিনি নিজেই ভোগ করিতে বাধ্য, ইহাও তেমনই সত্য। সুতরাং একজনের কৃতকর্মের ফল অন্য একজনে ভোগ করিবে কি প্রকারে? ইহাতে নৈতিক কার্য কারণ-ভাব-নিয়ম সংরক্ষিত হইতে পারে না। এই বিষয়ের মীমাংসা এই যে কর্মের ফলভোগ ভাব অনুসারেই হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম কর্তা ভাবনার দ্বারা যদি কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কোন কর্ম করেন তাহা হইলে তাঁহার ভাবনার প্রভাবে ঐ কর্মের ফল যাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম করা হইয়াছে তিনিই প্রাপ্ত হইবেন— ইহা কর্মবাদের বিরোধী নহে। কে শ্রাদ্ধাদি কর্মের অধিকারী সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যাহার পুত্রাদি কেহই নাই তাহাকেও যদি অসম্পর্কিত কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্বক কিছু অর্পণ করে তাহাও তাহার ভোগে আসে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাহারও জন্য শুভ অথবা অশুভ ইচ্ছা পোষণ করিলে এবং তদনুরূপ কর্মানুষ্ঠান করিলে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না। তবে যাহার কল্যাণার্থে কোন প্রকার ভাবময় অথবা ক্রিয়াময় অনুষ্ঠান করিবার কেহ না থাকে, তাহার জন্য অগতির গতি স্বয়ং ভগবান কল্যাণকারী নিজ জনরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সূক্ষ্মজগতে অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা শ্রীভগবানের এই মহাকরুণাপূর্ণ ব্যাপারের নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। পরলোকগত ব্যক্তির ব্যক্তিগত কর্মের কথা পৃথক্। কর্মের গতি অনুসারে তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহার সঙ্গে ঐ পূর্ববর্ণিত কল্যাণকামনাজনিত সহায়তা কর্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

মৃতকের জন্মান্তর হইলেও এই নিয়মের কোন ব্যভিচার হয় না। কর্মপ্রভাবে যে কোন প্রকার দেহই ধারণ হউক না কেন শ্রাদ্ধে প্রদত্ত বস্তুসত্তা অমৃতরূপ ধারণ করিয়া তাহার অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত আত্মীয়ের ভোগ্যরূপ পরিগ্রহ পূর্বক তাহার নিকটে উপস্থিত হয়। দেশ-কালের ব্যবধান ইহাকে বাধা দিতে পারে না।

২ — কর্ম পূরণ

কর্ম হইতে কর্মের ফল উৎপন্ন হয় ইহা সত্য, কিন্তু কর্মের পূর্তি না হইলে ফলের উৎপত্তিও হইতে পারে না। কারণের সমষ্টি হইতে কার্য উৎপন্ন হয়। এই সমষ্টির অন্তর্গত কোনও একটি অবয়বের মধ্যে যদি অপূর্ণতা থাকে তাহা হইলে ঐ বৈগুণ্যের জন্য যথারীতি কর্মফল আবির্ভূত হইতে পারে না। জীব অল্পজ্ঞ তাহার শক্তিও পরিমিত। এতদ্ব্যতীত সে পূর্ব-সংস্কারের দ্বারা চালিত হয় এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিও তাহার খোলে নাই। কার্য-বিশেষের উৎপাদনের জন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম যে সকল কারণের সম্মেলন আবশ্যক হয় তাহাদের মধ্যে কোন অংশে ত্রুটি থাকিলে সে তাহা ধরিতে পারে না। এই অবস্থায় তাহার পক্ষে যথাবিধি বিশুদ্ধভাবে কর্ম পূর্ণ করা কি প্রকারে সম্ভব? কর্ম পূর্ণ না হইলে কর্মের যথোচিত ফল প্রাপ্তিই বা তাহার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব? এই জন্যই যাবতীয় কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে অন্তে ভগবৎ-স্মরণের ব্যবস্থা আছে। নিজে সরলভাবে যথাশক্তি ও যথাবিধি কর্ম করিয়া তাহার পর অসামর্থ্য ও অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ত্রুটির জন্য সর্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। প্রসিদ্ধি আছে—

অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং শ্রীহরের্নামকীর্তনাৎ।।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে অপূর্ণ কর্ম একমাত্র ভগবানই পূর্ণ করিতে পারেন এবং কৃতকর্মের ত্রুটির জন্য সরলচিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে বৈগুণ্যাদি-নিবন্ধন যাবতীয় ন্যূনতা তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তখন কর্ম হইতে কর্ম-ফলের উদ্ভব সম্ভবপর হয়। নিজে জানিয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া শিথিলতাবশতঃ ত্রুটি করা অনুচিত। তাই মা বলিয়াছেন—"মনে রাখবে যে কর্ম নিয়াছি পূর্ণরূপে করব ...... আমি ত কোন ত্রুটি করি নাই —কর্মে পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য যেন থাকে।"

ষোল (খ)

১ — ধ্যানে রূপ ভাসে

যাঁহারা সাকার ধ্যান করেন তাঁহারা রূপের উপাসক। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক অথবা গুরুর নির্দেশ অনুসারে কোন নির্দিষ্ট রূপের ধ্যান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা নিরাকারের উপাসক তাঁহারা রূপ অথবা মূর্তির চিন্তা করেন না। তথাপি অনেক সময় তাঁহাদেরও হৃদয়ক্ষেত্রে অজানিতভাবে রূপ ভাসিয়া উঠে। রূপের চিন্তা করা এবং না করিলেও অচিন্তিতভাবে হঠাৎ রূপের আবির্ভাব, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ এই প্রকার রূপের আবির্ভাব বর্তমান জন্মের অথবা পূর্বজন্মের সংস্কার হইতেই হইয়া থাকে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। কিয়দংশে ইহা যে সত্য তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অন্তরালে রূপ ভাসার একটি গভীর রহস্য আছে। যোগিগণ যে বিসর্গশক্তির বর্ণনা করিয়া থাকেন তাহারই প্রভাবে অরূপের মধ্যে রূপের আবির্ভাব হয়। এই বিসর্গশক্তির খেলা অতি বিচিত্র। শাস্ত্রানুসারে শাম্ভব বিসর্গ, শাক্ত বিসর্গ এবং আণব বিসর্গ—বিসর্গ এই তিন প্রকার। আণব বিসর্গে ভেদজ্ঞানের প্রাধান্য থাকে। শাক্ত বিসর্গে ভেদজ্ঞান থাকিলেও অভেদ জ্ঞানের আভাস জাগিয়া উঠে। কিন্তু শাম্ভব বিসর্গে ভেদজ্ঞান মোটেই থাকে না—বিশুদ্ধ অভেদজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। এখানে যে রূপ ভাসার কথা বলা হইয়াছে তাহা আণব বিসর্গেরই একটা দিক্। এই প্রকার অচিন্তিত রূপের আবির্ভাব হইলে সাধকের পক্ষে তাহাকে পরিহার না করিয়া তাহাকে চিন্তন করা আবশ্যক। এইস্থলে মা'র উপদেশ এই—ভগবান বিশ্বরূপ অথচ অরূপও তিনি। হৃদয়ক্ষেত্রে যখন যে রূপেরই প্রকাশ হউক তাহা সর্বময় শ্রীভগবানের রূপ মনে করিয়া লইয়া তাঁহাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করা উচিত।

যে কোন রূপ হউক তাহাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহাতেই বিশ্বরূপ, এমন কি অরূপ পর্যন্ত, দর্শন হইতে পারে।

২ — মা'র উপদিষ্ট ক্রম

কোন নবীন সাধকবিশেষকে উপাসনা সম্বন্ধে মা যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ আলোচনা করিলে এইরূপ পাওয়া যায় ঃ

(ক) স্বতঃস্ফূর্ত রূপের আবির্ভাব। ইহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।
(খ) নিজে আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঐ স্বতঃস্ফূর্ত রূপের চিন্তন করা।
(গ) রূপ অথবা মূর্তিটিকে কল্পিত আসনে স্থাপন।
(ঘ) তাহার পর প্রণাম। এইখানেই প্রথম স্তর শেষ হইল। মূর্তি আসনে সাক্ষিস্বরূপে স্থির রহিলেন।

ইহার পর জপ অথবা গুরুদত্ত নামের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। জপ সমাপ্ত হইলে পূর্বোক্ত মূর্তিকে পুনর্বার প্রণাম করা। এই সময় ঐ মূর্তি পুনর্বার নিজের হৃদয়ক্ষেত্রে বিলীন করিয়া দেওয়া অথবা উহাকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত-রূপে রক্ষা করা। উপাসনার মধ্যে আবাহন এবং বিসর্জন এই দুইটি অঙ্গ আছে। যাঁহারা আবাহন করেন, তাঁহারা আবাহনের পর উপাসনা সম্পন্ন করিয়া বিসর্জন দ্বারা কর্ম সমাপন করেন। ইহা এক পক্ষ। কার্যভূত ইষ্টরূপকে কারণ-সলিলে বিসর্জন এবং প্রয়োজন হইলে পুনর্বার কারণ-সলিল হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করা ইহাই এই ধারার নীতি। কেহ কেহ আবাহন স্বীকার করেন, কিন্তু বিসর্জন স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ইষ্টের আবির্ভাব কালের অন্তর্গত বলিয়া এবং সাধন-সাধ্য বলিয়া আবাহন আবশ্যক। কিন্তু প্রতিষ্ঠা স্থায়ী এবং কামনা নিত্য বলিয়া বিসর্জন অবৈধ। প্রথম সম্প্রদায় জ্ঞান-প্রধান এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায়

ভক্তি-প্রধান। উপাসনা উভয় মতেই সম্ভবপর। ভক্তি-প্রধান সাধনাতে ইষ্টের তিরোধান কখনই হয় না, সুতরাং ভজনের সমাপ্তিও কখনই হয় না। জ্ঞানপ্রধান ধারাতে ইষ্ট তিরোহিত হইয়া আত্মস্বরূপে প্রকাশিত হন। ইহাই জ্ঞানের উদয় বা উন্মেষ, যাহাকে উপাসনার চরম লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞানিগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন।

৩ — তাঁতে বিশ্ব, বিশ্বে তিনি

মা বলেন, "তাঁতে বিশ্ব বিশ্বে তিনি"। ইহা খুবই সত্য কথা। চরম অবস্থায় তাঁহাতে ও বিশ্বে কোনই ভেদ থাকে না—উভয়ই এক। সাধক সাধন পথে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানের বিকাশ প্রাপ্ত হইলে বিশ্বের সহিত আত্মার এবং আত্মার সহিত বিশ্বের সম্বন্ধটি কি তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন। যাঁহারা প্রথম অবস্থায় বিবেকের পথে অগ্রসর হন তাঁহাদের বিবেকজ্ঞান পরিনিষ্পন্ন হইলে তাঁহারা নিজেকে বিশ্ব হইতে পৃথক্ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন। সাংখ্যের প্রকৃতি হইতে পুরুষের এবং বেদান্তের মায়া হইতে ব্রহ্মের বিবেক প্রসিদ্ধই আছে। বিশ্ব প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, সুতরাং প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষ অথবা আত্মা বদ্ধ অবস্থায় বিশ্বের সহিত অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না হইলে বিশ্ব হইতে নিজের পৃথক্ সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যখন আত্মা নিজের অপ্রাকৃত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে বিশ্বাতীত চিৎস্বরূপ। কিন্তু এই অবস্থায় সে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহার বিশ্বাতীত স্বরূপেই স্থিতি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। পূর্ণত্বের আস্বাদন তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। পূর্ণ সত্তা অদ্বয়—তাহাতে প্রকৃতিও আছে, পুরুষও আছে অথচ উভয়ের দ্বৈতভাব নাই। পূর্ণে প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর ভেদ বর্জিত হইয়াছে। কিন্তু এই অভেদ অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে

যেমন পুরুষকে শুদ্ধরূপে জানিতে হয় তেমনি প্রকৃতিকেও তাহার নিজ স্বরূপে চিনিতে হয়। তখন এই উভয়ই যে এক মহাসত্তার অবয়ব তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। তাহার পর এই অঙ্গাঙ্গিভাব অথবা অবয়ব-অবয়বিভাব থাকে না। একমাত্র পরসত্তাই নিজের অখণ্ড প্রকাশে নিজের নিকট ভাসিয়া উঠে। এই অখণ্ড প্রকাশের মধ্যে পুরুষ অথবা আত্মা এবং প্রকৃতি অর্থাৎ অনাত্মা বা মায়া অভিন্নরূপেই আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু এই অদ্বয় স্থিতি প্রাপ্ত হইবার পূর্বে দুইটি অবস্থা বিশেষভাবে অতিক্রম করা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রথমটি এই— বিশ্বের সর্বত্র আত্মদর্শন। এই অবস্থা উদিত হইবার পূর্বে নির্বিকল্পক মহাজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্ববিযুক্ত বিশ্বোত্তীর্ণ বিশুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার হওয়া আবশ্যক। এই সাক্ষাৎকারের কালে যদি দেহপাত হইয়া যায় তাহা হইলে এই স্থিতিতেই থাকা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি ভাগ্যক্রমে অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের ফলে আত্ম-সাক্ষাৎকারের পর সমাধি হইতে ব্যুত্থানের অবস্থা হয় তখন দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব ভাসিয়া উঠে। কিন্তু এই বিশ্ব এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের পূর্বানুভূত বিশ্ব এক হইয়াও ঠিক এক নহে। কারণ পূর্বে অজ্ঞান অবস্থায় যে বিশ্বের দর্শন হইয়াছিল তাহা প্রকৃতির কার্যভূত জড় বিশ্ব। কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞানের পর ব্যুত্থিত অবস্থায় যে বিশ্ব দর্শন হয় তাহা জড় হইলেও বিশুদ্ধ এবং তাহাতে অসঙ্গভাবে আত্মসত্তার ভান হয়। বস্তুতঃ তখন আত্মসত্তারই সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু পূর্বসংস্কার নিবৃত্ত না হওয়ার দরুণ বিশ্বেরও ভান সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় অথবা মন স্থূলভাবে ও সূক্ষ্মভাবে জাগতিক সত্তার অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্মীলিত জ্ঞাননেত্র সর্বত্র আত্মসত্তার দর্শন করিয়া থাকে। এই উভয় দর্শন যুগপৎ সম্পন্ন হয় এবং এক হিসাবে এই উভয় দর্শনকে এক দর্শন বলিয়াও ব্যাখ্যা করা চলে। ইহাই বিশ্বের সর্বত্র আত্মসত্তার দর্শন। এই দর্শন কোন দৃশ্যের দর্শন নহে। কারণ আত্মা দর্শক, দৃশ্য নহে, তথাপি সংস্কার প্রভাবে দৃশ্য-দর্শন সঙ্গে সঙ্গে হয় বলিয়া এই দর্শনকে আত্মারই দর্শন বলিয়া গ্রহণ

করা সঙ্গত। বস্তুতঃ আত্মাই দ্রষ্টা এবং বিশ্বের সহিত অভিন্নরূপে আত্মাই দৃশ্য। ইন্দ্রিয়ের গোচরভাবে সর্ব পদার্থের দর্শন হয়, ইহা সত্য। কিন্তু অতীন্দ্রিয় স্বয়ং-প্রকাশভাবে এই স্থলে আত্মারই দর্শন হয়। এই দর্শন এক প্রকার। ইহার পর যখন আরও শুদ্ধ অবস্থার উদয় হয় তখন দেখা যায় যে এই সমগ্র বিশ্ব বস্তুতঃ সেই আত্মস্বরূপেই ভাসিতেছে। সেই সময় আত্মস্বরূপেই তদন্তর্গতরূপে বিশ্বের দর্শন হইয়া থাকে। বিশ্বে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে বিশ্বদর্শন উভয়ই সত্য অনুভূতি। বিশ্বে আত্মদর্শন অবস্থায় বিশ্ব আধার এবং আত্মা তাহাতে আশ্রিত। এই অবস্থায় সংস্কারের প্রভাব বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। কিন্তু আত্মাতে বিশ্বদর্শন যখন হয় তখন আত্মা ব্যাপক মূল ভিত্তি। ইহা চৈতন্যস্বরূপ দর্শন। ইহাতেই প্রতিবিম্বরূপে বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়। সমুদ্রের জলে যেমন তরঙ্গ উদ্গত হয় তেমনি আত্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের উদ্গাম হয়। শক্তির বিকাশ না হইলে অর্থাৎ চিৎশক্তির উন্মেষ না হইলে নিষ্কল আত্মা সকলরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। কলাই শক্তি এবং সমগ্র বিশ্ব এই আত্মকলারই স্ফুরণ। সুতরাং নিষ্কল আত্মাতে বিশ্বের স্ফুরণ হয় না। শুদ্ধ আত্মারই আপনাতে আপনি প্রকাশ হয়। স-কল (কলাযুক্ত) আত্মাতে সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিম্ববৎ নিত্য প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।

এই উভয় অবস্থাই অপূর্ণ—বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া আত্মদর্শন অথবা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বদর্শন। প্রথম দর্শনে আশ্রয়ের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে। কিন্ত দ্বিতীয় দর্শনে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের দর্শন হয় বলিয়া আত্মারই প্রাধান্য থাকে। কিন্তু সাম্যভাবের উদয় হইলে বিশ্ব ও আত্মার পরস্পর ভেদ কাটিয়া যায়। তখন সাকার ও নিরাকার অভিন্ন প্রতিভাসে অদ্বয়রূপে ফুটিয়া উঠে। যে নীতিতে সবেতেই সব আছে ইহা স্বীকৃত হয় সেই নীতি অনুসারে বিশ্বে আত্মা আছে, যোগ্য ব্যক্তি তাহা দেখিতে পায়; এবং আত্মাতে বিশ্ব আছে, এই দর্শনও যোগ্য পুরুষেরই

হয়। কিন্তু যোগ্যতার বিকাশ অধিক হইলে বিশ্বও থাকে না, আত্মাও থাকে না, অথচ উভয়ই অভিন্ন সত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ পূর্ণ সত্তা।

৪ — নিজ গুরু ও জগদ্-গুরু জাগতিক দৃষ্টিতে

প্রত্যেকের নিজ নিজ গুরুর সহিত জগদ্-গুরুর পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রত্যেকের নিজ গুরু মনুষ্যরূপ ব্যক্তিবিশেষ, কিন্তু জগদ্গুরু স্বয়ং ভগবান। কিন্তু শাস্ত্রে আছে যে সাধকের পক্ষে উভয়কে এক করিতে না পারিলে কোন সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। এক হিসাবে দেখিতে গেলে মনুষ্য গুরু হইতে পারে না। অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ভগবানও গুরু হইতে পারেন না। মনুষ্য যে গুরু হইতে পারে না তাহার কারণ এই যে মনুষ্য অজ্ঞানের অধীন, এমন কি জ্ঞানলাভ করিলেও অজ্ঞানের হাত হইতে মনুষ্য একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং মনুষ্য জ্ঞানস্বরূপ গুরু হইতে ভিন্ন না হইয়া পারে না। পক্ষান্তরে ভগবান সর্বসংস্কার-বর্জিত বলিয়া গুরুপদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ, গুরুভাবও একটা সংস্কার। অজ্ঞানমগ্ন আর্ত জীবকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা অথবা করুণা, ইহাও এক জাতীয় বাসনা। ইহা শুদ্ধ বাসনা তাহাতে সন্দেহ নাই এবং বিশ্ব-কল্যাণ সম্পাদন ইহার উদ্দেশ্য। তাই ইহার মহিমা সকলকে কীর্তন করিতে হয়। কিন্তু যিনি বাসনাশূন্য তিনি কি প্রকারে গুরুরূপে প্রকাশিত হইবেন? সুতরাং দেখা যায় মনুষ্যের যেমন গুরুত্বের যোগ্যতা নাই তেমনি ভগবানেরও সে যোগ্যতা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ উভয় স্থানেই এককভাবে গুরুভাবের প্রাকট্য হইয়া থাকে। তখন মনুষ্যের আধারে ভগবৎ শক্তির পূর্ণযোগনিবন্ধন মনুষ্যকে জীবোদ্ধার শক্তিসম্পন্ন গুরু বলিয়া গ্রহণ করা চলে। পক্ষান্তরে মনুষ্যের সম্বন্ধনিবন্ধন অসঙ্গ ভগবৎ স্বরূপেও মহাকরুণার উদয় হয়। তখন ভগবানকেই একমাত্র গুরু বলিয়া

গ্রহণ করিতে কোন বাধা থাকে না।

পূর্ব প্রদর্শিত ক্রম অনুসরণ করিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ব্যবহার-ভূমিতে মনুষ্য যেমন গুরুপদবাচ্য তেমনি ভগবানও গুরুপদবাচ্য। তখন বুঝা যায় নিজের ব্যক্তিগত গুরুতেই বিশ্বগুরুর আবেশ হইয়া থাকে, ইহা যেমন সত্য, তেমনি বিশ্বগুরুকেও নিজের ব্যক্তিগত গুরু বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভবপর, ইহাও তেমনি সত্য। গুরুতে ঈশ্বর ভাবনা করিবার উপদেশ শাস্ত্রে সর্বত্র আছে। ইহাই তাহার মূল কারণ। এই প্রকার ভাবনার ফলে মনুষ্য-গুরুর যাবতীয় ন্যূনতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি অপগত হয় এবং উহারা সাধক শিষ্যকে স্পর্শ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরের দিব্যজ্ঞান মনুষ্য গুরুর ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া যোগ্য শিষ্যকে পরমার্থের পথে আকর্ষণ করিয়া নিয়া চলে। সুতরাং 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা' ইহা যেমন সত্য 'মদ্ গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ', ইহাও তেমনি সত্য।

সতের

১ — অহেতুক কৃপা

কৃপা বাস্তবিক পক্ষে স্বাভাবিক হইলেই 'কৃপা' নামের যোগ্য হয়। যদি অতীতের সঙ্গে কোন যোগ থাকে, অর্থাৎ যদি প্রাক্তন কর্মের ফল-স্বরূপে ইহার প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ইহাকে বিশুদ্ধ কৃপা বলা চলে না। সেই প্রকার যদি ভবিষ্যতের সঙ্গে যোগ থাকে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য যদি কৃপার প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সেই কৃপাও প্রকৃত 'কৃপা' পদবাচ্য নহে। যাহা স্বাভাবিক তাহা স্বভাব হইতেই প্রবৃত্ত

হইয়া থাকে— তাহার সঙ্গে পূর্বের অথবা পরের কোন যোগসূত্র থাকে না। কিন্তু প্রকৃত কৃপা সকল ভূমি হইতে প্রকাশিত হইতে পারে না। ইহা নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র। তাই একমাত্র সেই পূর্ণ স্থান হইতেই ইহার প্রকাশ সম্ভবপর। নিম্নভূমি হইতে যাহা কৃপারূপে প্রকাশিত হয় তাহা কৃপা হইলেও সাপেক্ষ, কারণ যাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শিত হয় তাহার কোন যোগ্যতা অবলম্বন করিয়াই সাপেক্ষ কৃপা প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহাই কৃপার বীজ। উহা কোন আধারে লক্ষিত না হইলে সাপেক্ষ অধিকারী পুরুষ কৃপা প্রদর্শন করিতে পারেন না। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। বিশ্ব লৌকিক দৃষ্টিতে দ্বৈত ভাবময়, সুতরাং উচ্চ এবং নিম্ন ও মহান এবং ক্ষুদ্র, এই প্রকার ভেদ ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। যে নিজকে মহান বলিয়া মনে করে, সে ক্ষুদ্রকে নিজ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে এবং যে নিজকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ করে সেও মহান্ হইতে নিজকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে। এই স্থলে যে মহান্ সে ক্ষুদ্রের উপর স্বভাবতঃই কৃপাপরায়ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কৃপা প্রকৃত প্রস্তাবে তখনই কার্যে পরিণত হয় যখন ক্ষুদ্র উহা ধারণ করিতে পারে। কারণ কৃপা ধারণ করিতে না পারিলে উহা না পাওয়ারই সমান হয়— উহা দ্বারা অভাব মোচন হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রের অন্য যোগ্যতা না থাকিলেও মহানের প্রদত্ত কৃপাকে ধারণ করিবার যোগ্যতা থাকা চাই। কিন্তু যদি কোন স্থলে ক্ষুদ্র ঐ কৃপা ধরিতে না পারে তাহা হইলে মহানের কৃপা এক প্রকার ব্যর্থই হইয়া গেল বলিতে হইবে। তিনি কৃপা করিয়াও কৃপা না করার মতই থাকেন। ইহার একমাত্র কারণ এই—তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ। অগ্নি যেমন ইন্ধনকে আশ্রয় করিয়া প্রজ্জ্বলিত হয় এবং ইন্ধনকে আশ্রয় করিতে না পারিলে অগ্নির প্রকাশ সম্পন্ন হয় না, তদ্রূপ সাপেক্ষ কৃপাও জানিতে হইবে। একমাত্র পরম বস্তু ভিন্ন নিরপেক্ষ কৃপা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। —সাপেক্ষ কৃপা এক হিসাবে প্রকৃত কৃপাই নয়। ইহা বীর্যহীন, নিষ্ফল

ও নাম মাত্রে পর্যবসিত। প্রকৃত কৃপা তাহাকেই বলে যেখানে কোন উপাধি নাই। নিরপেক্ষ কৃপা স্বতন্ত্র। উহা কিছুর উপরই নির্ভর করে না। কৃপা-পাত্রের কৃপা-ধারণের যোগ্যতা না থাকিলেও নিরপেক্ষ কৃপার প্রভাবে আপনিই ঐ যোগ্যতা অভিব্যক্ত হয়। বস্তুতঃ উহা একাধারে কৃপা করাও বটে এবং কৃপা ধারণ করাও বটে— মহান্‌রূপে কৃপা করা এবং ক্ষুদ্ররূপে ঐ কৃপা ধারণ করা, উভয়ই নিরপেক্ষ কৃপা হইতে ঘটিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত অহেতুক কৃপা। ভগবৎকৃপা এই অহেতুক কৃপার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা পূর্ব কর্মের অপেক্ষা রাখে না, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টিপাত করে না, ধারণকারীর ধারণশক্তির অথবা যোগ্যতার উপরে নির্ভর করে না। ইহা প্রকাশিত হইলে নিজ মহিমায় নিজের সফলতা ফুটাইয়া তোলে। ইহা স্বাতন্ত্র্যেরই নামান্তর। গ্রহণকারীর ইচ্ছার সঙ্গে দানকর্তার ইচ্ছার যোগ হইলেই কৃপা সফল হয়। দানকর্তা পূর্ণ হইলে তাঁহার ইচ্ছার প্রভাবে গ্রহণকর্তাতেও অনুরূপ ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মা যশোদা যখন মাখন তুলিয়া গোপালের মুখে দিবেন বলিয়া মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করিতেন অমনি কোথা হইতে গোপাল ছুটিয়া আসিয়া 'মা মাখন দাও' বলিয়া মাখনের জন্য মাকে পীড়ন করিতেন। যশোদার দিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই গোপালের ভিতরে নিবার ইচ্ছা জাগিত অথবা গোপালের মাখন নিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই যশোদার মনে মাখন খাওয়াইবার ইচ্ছা জাগিত। একই সত্যের দুইটি দিক্ মাত্র। যিনি স্বয়ং ভগবান তিনি কৃপা করিলে কোন বিশেষ কারণে জীব তাহা প্রাপ্ত হইবে না তাহা হইতে পারে না। জীবের অযোগ্যতা যতই থাকুক নিরপেক্ষ ভদবৎ-কৃপাতে তাহার গণনা হয় না। ইহার একমাত্র কারণ দাতা ও গ্রহীতা অভিন্ন। দাতা তাহা জানেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্বই তাঁহার সহিত অভিন্ন। তাই এই অদ্বৈত-ভূমি হইতে কৃপার সঞ্চার হইলে তাহা একদিকে অর্থাৎ দাতার দিকে কৃপা-প্রকাশের যোগ্যতা নিয়া এবং অপর দিকে অর্থাৎ গ্রহীতার দিকে উহা ধারণ করিবার যোগ্যতা

নিয়া আবির্ভূত হয়। অপূর্ণ ভূমি হইতে কৃপার প্রকাশ হইলে উহার সফলতার জন্য দেশ, কাল ও ধারকের যোগ্যতা প্রভৃতি আবশ্যক হয়। কৃপাকারী অপূর্ণ বলিয়া ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অপেক্ষিত হয়। এইজন্যই ভগবৎ-কৃপা যে অহেতুক তাহা সিদ্ধান্ত রূপে মা গ্রহণ করিয়া নিজে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যে নিত্য-সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন তাহা স্বাভাবিক বলিয়া কর্ম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে না। অদ্বৈত ভাবের মধ্যে সকল ভাবই গুপ্ত রহিয়াছে। সবই স্ব-ভাবের অন্তর্গত, হেতুর স্থান কোথাও নাই। জীবের ইচ্ছার মূলেও যে সেই মহাইচ্ছার খেলা রহিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মহাযান বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে কৃপা অথবা করুণা তিন প্রকার— সত্ত্বাবলম্বন, ধর্মাবলম্বন এবং নিরবলম্বন। সকল জীবের দুঃখ-সাক্ষাৎকার হইতে যে করুণার উদ্রেক হয় তাহাকে সত্ত্বাবলম্বন করুণা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু এমন দৃষ্টিও আছে যে-দৃষ্টিতে জীবের দুঃখ-সাক্ষাৎকার আবশ্যক হয় না, কিন্তু জগতের নশ্বরত্ব অথবা ক্ষণিকত্ব দর্শন হইতেই করুণার উদ্দীপন হইয়া থাকে। ইহার নাম—ধর্মাবলম্বন করুণা। ইহা প্রথম প্রকারের করুণা হইতে উৎকৃষ্ট। কিন্তু যাহার দৃষ্টি অত্যন্ত নির্মল তাহার করুণা সত্ত্বগণের দুঃখ দেখিয়া হয় না জগতের নশ্বরত্ব-সাক্ষাৎকার করিয়াও হয় না। ঐ করুণার কোন অবলম্বন নাই—উহা নিরালম্ব বা নিরুপাধিক করুণা অর্থাৎ উহার নামান্তর স্বাভাবিক করুণা। উহা স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ। উহা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। যখন নিরালম্ব পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন প্রজ্ঞা নিরালম্ব হইয়া প্রজ্ঞাপারমিতা রূপে পরিণত হয় এবং কৃপাও নিরালম্ব হইয়া মহাকৃপা রূপ ধারণ করে। তখন শূন্যতা এবং করুণা অভিন্ন হয়। ইহারই জন্য প্রমাণবার্তিককার বলিয়াছেন—

নিরালম্বপদে প্রজ্ঞা নিরালম্বা মহাকৃপা।
একীভূতা ধিয়া সার্দ্ধং গগনে গগনং যথা।।

আমরা যে অহেতুক কৃপার আলোচনা করিতেছিলাম ইহাই সেই অহেতুক কৃপা।

২ — জীবের কর্তৃত্ব বোধ ও তাহার দায়িত্ব

মা বলেন, জীব যাহা কিছু পাইয়াছে সবই সেই পরম স্থান হইতেই পাইয়াছে। যে কর্তৃত্ব বোধ বা স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে বলিয়া জীব-জগতে তাহার বৈশিষ্ট্য তাহাও সে সেই মূল স্থান হইতেই পাইয়াছে। বস্তুতঃ জীব স্বয়ংই সেই স্থান হইতে আসিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে —ইহার উদ্দেশ্য কি? জীবের শক্তি, জীবের স্বরূপ, সবই এই ভাবে দেখিতে গেলে আগন্তুক মনে হয়। কিন্তু মা বলেন, ইহার একটি গভীর উদ্দেশ্য আছে। বস্তুতঃ সেই মূল স্থানে জীব নিজেই আসীন। কিন্তু জীব যখন সেই মূল স্থানে ছিল তখন জীব নিজকে নিজে চিনিত না। সেই ভগবানেই ছিল অভিন্নভাবে, কিন্তু সে বোধ তাহার ছিল না। কারণ একটা গভীর আবরণে ঐ বোধ আচ্ছন্ন ছিল। আশ্চর্য এই যে আবরণের ঐ বোধও তাহার ছিল না। তাই ভগবান তাহাকে একটা পৃথক্ বোধ দিয়া যেন নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া বাহির করিয়াছেন। এই পৃথক্ বোধের সঙ্গে একটা স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব-অভিমানও দিয়াছেন। জীবের কর্তব্য, এই 'কর্তাভাব'-টিকে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা, তাঁহাকে পাওয়ার কার্যে বিনিয়োগ করা। তবেই ইহার সার্থকতা। তখন তাঁহাকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পাওয়া যাইবে, সকল অভাব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি ঐ ভাবটি অন্য ভাবে প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ তিনি দূরে আছেন ও তাঁহাকে পাওয়া যায় না, এইরূপ ভাবনার আশ্রয় নেওয়া হয় তাহা হইলে ভগবৎ-প্রদত্ত স্বাধীনতা শক্তির অপব্যবহার করা হয়। এই ভাবে কর্ম কি ও অকর্ম কি তাহা মা বুঝাইয়াছেন। তাঁহাকে পাইলে অর্থাৎ নিজকে পাইলে কর্ম থাকে না, অকর্মও থাকে না। কিন্তু না পাওয়া গেলে

যদি নিজের সর্বশক্তি তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় ও বিশ্বাস রাখা হয় যে তিনি মোটেই দূরে নন ও তাঁহাকে অবশ্য পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে জীবের কর্তৃত্ব-অভিমান সফল হয়। তখন জীব কৃতকৃত্যতা লাভ করে।

৩ — চাওয়া ও পাওয়া সমসূত্র

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।

ইহার তাৎপর্য এই, যে তাঁহাকে যে যেভাবে চায় তাহাকে তিনি সেইভাবেই অনুগ্রহ করেন। মাও তাহাই বলেন— "যেখানে ভগবান ব'লে মানলে, ঈশ্বর ব'লে মানলে, সেখানে দয়া, কৃপা, করুণা, প্রার্থনা সবই যে যে রূপে তুমি স্থিত হবে সেই সেই আকারে তিনি প্রকাশ হবেন।" ভগবান সর্বাতীত হইয়াও সর্বময়। তিনি আপ্তকাম। তিনি পূর্ণ। তাঁহার কোন অভাব নাই। কিন্তু জীব অপূর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ ও কামনার অধীন। কিন্তু সে যদি ভাবনা-সূত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হয় তাহা হইলে ঈশ্বর এই যোগভাবনার ফলে স্বভাবতঃ ইচ্ছাহীন হইয়াও জীবের ইচ্ছানুসারে ইচ্ছাময় রূপে প্রকাশিত হন। ইহার প্রভাবে জীবের অভাব দূর হয়, তাহার ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে। তাই বলা হয়— 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' তাই সর্বত্র তাঁহারই প্রকাশ বিচারে রাখিতে মা বলেন। বিচার ও ভাবনা একই বস্তু। সর্ব বস্তুতে তাঁহার প্রকাশ ভাবনা করিতে পারিলে সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশ ফুটিয়া উঠে— আবরণ সরিয়া যায়। তখন জীবের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছারূপে ভাসিয়া উঠে। ইহারই নাম করুণা।

৪ — যতটা ভাব ততটা লাভ

অনেকে ভ্রম বশতঃ মনে করে, দেবদেবীর মধ্যে তারতম্য আছে। যতদিন ভ্রম না কাটে ততদিন আপন আপন প্রাক্তন সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে রুচিগত পার্থক্য বশতঃ এই ভেদ-জ্ঞান বর্তমান থাকে। ইহা জীবের ভেদ-ভাবনার ফল। কিন্তু বস্তুতঃ এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সর্বত্র একেকে দেখাই অভ্যাস করা উচিত। সুতরাং উপাস্য বা ইষ্টগত কল্পিত উৎকর্ষের উপর নিজের সাধনার উন্নতি নির্ভর করে না। উৎকর্ষ বা অপকর্ষের তুলনামূলক বিচার না করিলে ভাল হয়। যাহার ইষ্ট যে মূর্তিই হউক না কেন তাহার ভাব ও সাধনাগত উৎকর্ষের পরিমাণ ঐ মূর্তি মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। সময়ে এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন ঐ এক মূর্তিতেই ভগবানের বিশ্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহা মূর্তির উৎকর্ষ বশতঃ নহে, কিন্তু সাধকের ভাবনার উৎকর্ষ বশতঃ তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫ — বিরাট শরীর

ভাগবতে, গীতাতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে ভগবানের বিরাট শরীরের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। জগতের যাবতীয় বস্তুই ঐ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তিনটি কাল এবং সমস্ত দেশ ঐ শরীরে একীভূত। ইহা অর্থাৎ ভগবানের এই বিরাট শরীর লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা একমাত্র দিব্য-চক্ষুতেই ধরা পড়ে। এই দিব্য চক্ষু মানুষ নিজের সাধনবলেও পাইতে পারে। তখন ইহা হয় তাহার স্বোপার্জিত ঐশ্বর্য, আবার ইহা একমাত্র ভগবানের কৃপার প্রভাবেও উপলব্ধি-গোচর হইতে পারে। যে কোন প্রকারেই হউক দিব্য চক্ষুর উন্মেষ হইলেই দিব্য-দৃষ্টির উন্মীলন হয়। তখন সাধকের দৃষ্টি হইতে কালগত ও দেশগত ভাবে জগতের কোন বস্তুই গুপ্ত থাকিতে পারে না। এই বিরাট শরীরের দর্শন প্রতি সাধকের জীবনে

কখনও না কখনও অবশ্যই হয়। তাহা না হইলে সাধকের পক্ষে বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। মার্গ-মধ্যে প্রক্রিয়াগত ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু যখন সর্বাবরণ মুক্ত হইয়া যায় তখন এক অখণ্ড সত্তারই প্রকাশ হয়। তখন ভেদ থাকিতে পারে না অথবা যাহা থাকে তাহা অদ্বয় পরম তত্ত্বেরই আভাস রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। মা বলিয়াছেন, "একটা সময়ে এটা কিন্তু আসতেই হবে"। বুদ্ধদেব সম্যক্-সম্বোধির পূর্বে এই প্রকার দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তখনকার বর্ণনা করিতে গিয়া কবিবর অশ্বঘোষ বলিয়াছিলেন, "দদর্শ নিখিলং লোকম্ আদর্শ ইব নির্মলে।" অর্থাৎ নির্মল দর্পণে যেমন বাহ্য দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয় তদ্রূপ এই মহাজ্ঞানে সমগ্র বিশ্ব একই সঙ্গে যুগপৎ ফুটিয়া উঠে। এই পর্যন্ত অনুভব সম্পন্ন না হইলে বিশ্বের অতীত সত্তাতে প্রবেশ করা যায় না।

৬ — অন্তহীন সংখ্যাহীন এবং অন্ত ও সংখ্যা

শুনিতে পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও ইহা সত্য যে যাহা অন্তহীন তাহাই অন্ত এবং যাহা সংখ্যাহীন তাহাই সংখ্যা। অর্থাৎ মহাশক্তির রাজ্যে অনন্ত ও অন্ত একার্থবাচক। অনন্ত বলিতে বুঝায় যে গতির শেষ নাই এবং সমাপ্তি নাই, অন্ত বলিতে বুঝায় তাহাই প্রকৃত অন্তস্বরূপ। ইহার তাৎপর্য এই যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত যখন বিক্ষেপ পরিহার পূর্বক এক-ধর্ম-গ্রাহিরূপে আভাসমান হয় তখন সর্বদা এবং সর্বত্রই এক ধর্মেরই গ্রহণ হয়। তখন দেখা যায় সেই একই বস্তু পর পর অনন্ত রূপেতে ফুটিয়া উঠিতেছে। সুতরাং বিক্ষিপ্ততার অভাব বশতঃ একদিকে যাহা অন্ত অন্যদিকে শক্তির প্রভাবে তাহারই অনন্ত রূপ। সুতরাং অনন্ত যেমন সত্য, অন্তও তেমনি সত্য। তদ্রূপ সংখ্যাহীন যেমন সত্য, সংখ্যাও তেমনি সত্য।

৭ — সুকৌশল

গীতাতে ভগবান্ কর্মের সুকৌশলকেই 'যোগ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন— "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। মা বলেন, মানুষের চিন্তা সাধারণতঃ বহির্মুখী বলিয়া তাহার নিকট জগতের প্রকাশ হয়, কিন্তু সেই ধারাটি অন্তর্মুখ হইলে সর্বত্র সেই একেরই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধারাকে অন্তর্মুখী করাই মায়ের বর্ণিত সুকৌশল। অর্থাৎ দৃশ্য যখন যে কোন আকারেই প্রকাশিত হউক উহা সেই একেরই প্রকাশ ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম প্রথম ইহা ভাবনা দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। তাহার পর উহা আপনা-আপনিই ভাসিয়া উঠিবে। ভগবান সর্ব সময় সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও এই কৌশলের অভাবে তাঁহার আবরণ মুক্ত হয় না এবং তিনি অনুগত ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন না। জীবের কিঞ্চিৎ পুরুষকার প্রযুক্ত না হইলে এই আবরণ-উন্মোচন-ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না। সর্বত্র অর্থাৎ প্রতি দৃশ্যের পৃষ্ঠ-ভূমিতে এবং সর্বদা প্রতি ঘটনার অন্তরালে একমাত্র সেই মহাপ্রকাশকেই দেখিতে চেষ্টা করা উচিত। ইহাকেই উত্তম কৌশল বলে।

৮ — নাই ও আছে একেরই রূপ

জগৎ পরিবর্তনশীল। জগতের অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তুই স্থায়ী নয়। উহা নিরন্তর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার ফলে যাহা 'আছে' তাহা 'নাই' হইয়া যাইতেছে। কারণ অনাগত হইতে কালের প্রবাহ আগত হইয়া বর্তমানকে অতীতের কুক্ষিতে লীন করিয়া দিতেছে। কিন্তু অতীত হইলেও তাহাকে 'নাই' বলা যায় না, কারণ উহাও তো আছে। উহা অব্যক্ত রূপে স্থিত। 'নাই' রূপে বর্ণনা করিলে উহা সৃষ্টির একটি দিকেরই বর্ণনা করা হয়। সুতরাং অখণ্ড রাজ্যে উহারও একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। তদ্রূপ

যাহাকে চিন্ময় রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহাতে সকল বস্তুই নিত্য বর্তমান। কোন বস্তুই পরিণামশীল নহে, অথচ অনন্ত ক্ষণিক প্রকাশে ঐ মহাপ্রকাশ অভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। ইহারও একটি স্তর আছে। পূর্ণের মধ্যে এই 'নাই' ও 'আছে' উভয়েরই সমান স্থান রহিয়াছে। পূর্ণ 'নাই' এবং 'আছে' উভয়ের অতীত হইয়াও উভয়াত্মক। বস্তুতঃ এই বর্ণনা দ্বারাও পূর্ণের সঠিক পরিচয় দেওয়া যায় না। তাই মা বলিয়াছেন "এক জায়গায় নাই ও আছে যুগপৎ, নাইও না আছেও না—আরও চল।" ইহা বলিয়া মা এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে ভাষার রাজ্য পার হইয়া আগে না গেলে পূর্ণ সত্যের ঠিক ঠিক সন্ধান হৃদয়ে ধারণা করা যায় না।

৯ — মহাশূন্য

আমরা সাধারণতঃ শূন্য শব্দের দ্বারা নিরাকারকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, অর্থাৎ আকার-শূন্য বলিতে আমরা আকার-বর্জিত কোন একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আকার-শূন্য শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে আকারও শূন্য অর্থাৎ আকারকে অপসারিত করিয়া শূন্যকে লাভ করা নহে। কিন্তু আকার থাকা সত্ত্বেও আকারের মধ্যেই নিরাকারকে লক্ষ্য করিয়া নিরাকারের গ্রহণ করা। ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আকার না থাকিলে সেই অতীত আকারকে লক্ষ্য করিয়া নিরাকারের চিন্তা প্রকৃত শূন্য-চিন্তা নহে। উহা স্পষ্টভাবে আকারের চিন্তা না হইলেও প্রকারান্তরে আকারেরই চিন্তা; কারণ যে আকার জানে না সে এই জাতীয় আকারহীন বা শূন্য জানিতে পারে না। মানুষের মন যতক্ষণ প্রকৃতিরাজ্যে ক্রিয়াশীল থাকে ততক্ষণ প্রকৃত শূন্য তাহার পক্ষে ধারণা করা সুকঠিন। মা এই শূন্যকে "প্রাকৃতিক রূপই" বলিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক শূন্য ভেদ করিতে না পারিলে মহাশূন্যে প্রবেশ অসম্ভব। মহাশূন্যই প্রকৃত অরূপ, প্রাকৃতিক শূন্য সংস্কারাত্মক রূপ মাত্র।

১০ — বোধ-দেবরূপে প্রকাশ

সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন বোধের রূপান্তর হইয়া যায়। সাধারণ মানুষ সর্বদা যে বোধে যুক্ত রহিয়াছে তাহা তখন অন্য প্রকার রূপ ধারণ করে। পূর্বের বোধ তাহার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়কে জগদ্ভাবে ভাবিত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন নিজের কর্তৃত্ব-অভিমান পরিত্যক্ত হওয়ার পরে এক অনন্ত মহাশক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হয় তখন তাহার সকল বোধই বিশ্ব-বোধের অঙ্গ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তাহার খণ্ড ভাব চলিয়া যায় এবং সমগ্রের সঙ্গে যোগে সে নিজেকেও সমগ্রেরই এক অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারে। এই বোধ খণ্ড জীববোধ নহে, ইহা অখণ্ড বিশ্ব-বোধেরই একটা তরঙ্গ বা ভঙ্গিমাত্র। ইহাকেই মা বলিয়াছেন, "বোধ-দেব।" এই বোধই দেবতারূপ—ইহা চিৎশক্তিরই একটি উল্লাস মাত্র। আগম শাস্ত্রে আছে যে, উচ্চাধিকার সম্পন্ন সাধক বাহিরে কোন আচার্য হইতে চৈতন্যময় জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলেও তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান চৈতন্যরূপে পরিণত হইয়া তাহাকে দীক্ষিত করিতে পারে। এই অবস্থায় তাহার ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্মুখ হইয়া তাহার আত্মস্বরূপে মিলিত হইয়া চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন এই সকল ইন্দ্রিয়-শক্তি 'সংবিদ্ দেবী'রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই সকল দেবী নিজের স্বরূপচৈতন্য দ্বারা তাহাকে প্লাবিত করিয়া অভিষিক্ত করিয়া ফেলে। মা যাহাকে বোধ-দেবরূপে প্রকাশ বলেন তাহা কতকটা ইহারই অনুরূপ। এই অবস্থায় রূপ ও অরূপের বোধ অসংখ্য প্রকারে নিজ-বোধ-রূপে প্রকাশমান হয়।

১১ — ঋষি পন্থার স্ফুরণ

যে যে রাস্তা ধরিয়াই চলুক না কেন সেইটা তাহার নিজের রাস্তা কিনা তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু তথাপি ঐ রাস্তায় চলা তাহার বৃথা যায় না। চলিতে চলিতে কোন সময়ে তাহার নিজের রাস্তা খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কোন মানুষ তাহার নিজ সংস্কারের সহিত সঠিক ভাবে পরিচিত নহে। এইজন্য যে কোন রাস্তায়ই চলুক না কেন চলিতে চলিতে তাহার নিজ সংস্কার জাগিয়া উঠিলে তাহার নিজের রাস্তা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন ঐ রাস্তা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। তাহাকে বৃথা পরিশ্রম করিতে হয় না। এইজন্য বেদান্তের ধারাতে সাধন জীবন আরম্ভ করিয়াও ঐ ধারা ঋষিধারাতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। এইরূপ সকল দিকেই বুঝিতে হইবে। এইরূপ পন্থার স্ফুরণ হইলে স্বভাবের স্রোতে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়। এইজন্য সর্বত্রই মা'র মুখ্য উপদেশ এই যে, যেখানেই থাকুক কোন একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকুক—চলিতে চলিতেই সে এক সময়ে নিজের রাস্তা পাইয়া যাইবে।

১২ — সম্প্রদায় রহস্য

সম্প্রদায় মানে সম্যক্ প্রদান অর্থাৎ যেখানে ভগবান নিজেকে নিজের মধ্যে প্রদান করিতেছেন। অর্থাৎ যিনি দিতেছেন এবং যিনি নিতেছেন মূলে কিন্তু উভয়েই এক। অথচ দাতার দিক্ হইতে অভেদ এবং গ্রহীতার দিক্ হইতে ভেদ, উভয়ই যুগপৎ সত্য বলিয়া এই সম্প্রদান-ব্যাপারে ভেদ ও অভেদ উভয় সম্বন্ধই থাকিয়া যায়। কারণ উভয়ই তো সত্য। আবার এমন একটা দিকও আছে সেখানে ভেদাভেদের কোন প্রশ্নই নাই। তাই মা বলিয়াছেন, "সেখানে কোন রূপ, গুণ, ভাব, অভাব, কোন প্রশ্নই দাঁড়ায় না।"

১৩ — অনন্ত স্থিতি—মূল এক

মানুষের বুদ্ধি ও সংস্কার ভেদে দৃষ্টি যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয় তেমনি সাধন-পথের স্থিতিও ভিন্ন হয়। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রভৃতি দার্শনিক বাদ নানা প্রকার আছে। ঠিক সেই প্রকার সৃষ্টি প্রকরণেরও আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ, বিবর্তবাদ, আভাসবাদ প্রভৃতি নানা প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি রহিয়াছে। মূলে শূন্য অথবা মূলে পূর্ণ উভয় প্রকার দৃষ্টিই প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে কোনটিকেই মিথ্যা বলা চলে না এবং কোনটিকেই একমাত্র সত্যও বলা সম্ভবপর হয় না। যে ভূমিতে এক একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় তাহা সর্বপ্রকার আবরণ শূন্য ভূমি নহে, কারণ দৃষ্টিতে আবরণ থাকে বলিয়াই সকলে সকল জিনিষ দেখিতে পায় না এবং সকল দৃশ্য সকলের নিকট রুচিকরও হয় না। আবরণের পর্দা সম্পূর্ণভাবে সরিয়া গেলে গণ্ডীবদ্ধ দর্শন থাকে না। তখন আবরণ-মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে সত্যের অনন্তরূপ খুলিয়া যায়। যে আলোকে এই মহাসত্যের দ্বার উদ্ঘাটন হয় উহাই সেই অখণ্ড প্রকাশের আলোক। তখন দেখা যায় "তিনি স্বয়ং সর্বরূপে অরূপে নানা ভাবে প্রকাশিত।" যদিও প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ লক্ষ্যের নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই লক্ষ্য পরস্পর ভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়, তথাপি ইহা সত্য যে এই লক্ষ্যে উপনীত হইলে পরের অখণ্ড অবস্থাটা আপনি খুলিয়া যায়। তাহার জন্য আর পৃথক্ উদ্যমের প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ বিরোধ আছে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে উহা স্থিতির ভূমি নহে। মহাপ্রকাশে বিরোধ কাটিয়া গেলে তখনই প্রকৃত স্থিতির সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ বিরোধহীন স্থিতিই স্থিতি— উহার নির্বিরোধ পূর্ণাঙ্গীণ প্রকাশ। বিরোধ অপূর্ণতার লক্ষণ, পূর্ণতার অভিব্যক্তি হইলে বিরোধ থাকিবে কেন? রাস্তায় চলার সময় ইষ্টনিষ্ঠা আবশ্যক, কিন্তু রাস্তার পর্যবসানে সর্বত্রই নিজ ইষ্টের স্ফুরণ হয় এবং নিজের ইষ্টের মধ্যে সর্ব সত্তার দর্শন হয়। তাই তখন বিরোধ থাকিতে পারে না।

আঠার

১ — সমাধি ও চমৎকার

সমাধি অবস্থায় কোন প্রকার চমৎকার প্রকাশ সম্ভবপর কি না এবং যদি কখনও ঐরূপ প্রকাশ ঘটে তাহা হইলে সমাধি অবস্থা হইতে স্খলন হইল বলা চলে কিনা, এইরূপ শঙ্কা কাহারও কাহারও মনে উদিত হইয়া থাকে। এই শঙ্কা অবশ্যই স্বাভাবিক, কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও সমাধির স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধ থাকিলে ইহার সমাধানও স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া যায়। মা যদিও শাস্ত্রীয় পরিভাষা অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন না, তথাপি তাঁহার ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ ত হয়-ই না, বরং অনেক সময় এত ব্যাপক রূপ ধারণ করে যাহা সাধারণতঃ শাস্ত্রেও সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। মা 'সমাধি' শব্দে যাহা বলেন, তাহা শাস্ত্রেও প্রকারান্তরে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। মা বলেন, 'সমাধি' মানে সমাধান অর্থাৎ সমাপ্ত হইয়া যাওয়া। যেমন প্রশ্নের উদয় হয়, আবার সেই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেলে তাহার সমাধান হয় তদ্রূপ এই যে অনন্ত বিশ্ব অনন্ত বৈচিত্র্যরূপে স্ফুরিত হইতেছে, এই সকল বৈচিত্র্য বিগলিত হইয়া সমগ্র বিশ্ব এক পরম সত্তায় সমাহিত হইয়া যায়, এরূপ অবস্থা আছে। বৈচিত্র্য তিরোহিত হইয়া যখন একত্বের স্পষ্ট প্রতিভাস থাকে, অর্থাৎ ভাবগত নানাত্ব যখন একটি মহান ভাবের ভিতরে আত্মসমর্পণ করে, তখন ঐ এক মহাভাব-ই সর্ব-সম্পূর্ণ হইয়া চৈতন্যযোগে বিরাজ করিতে থাকে।

মনের বহুমুখী বৃত্তি— বিষয়ের ভেদ অনুসারে বৃত্তির ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন এক-ই বিষয় অবলম্বন-রূপে স্থিত থাকে এবং জগতের যাবতীয় বিষয় ঐ এক বিষয়ে লীন হইয়া ঐ এককেই পূর্ণরূপে পুষ্ট

করে, তখন জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে ঐ এক সত্তাই ভাসিতে থাকে। উহাতে যাবতীয় খণ্ড সত্তা বিলীন হইয়া ঐ এক সত্তারই পুষ্টি বা বিকাশ সম্পাদন করে। ঐ এক সত্তা কোনটি সে বিচারে প্রয়োজন নাই। স্বেচ্ছানুসারে যে কোন সত্তাই গৃহীত হউক না কেন, বৃত্তির বিক্ষিপ্ততা তিরোহিত হইয়া গেলে ঐ এক সত্তাই মহাসত্তারূপ ধারণ করে। তখন উহার বাহিরে আর কোন সত্তা থাকিতে পারে না। এই যে সমাধান ইহাই সমাধি। কিন্তু এই সমাধান, সমাধান হইলেও প্রকৃত সমাধান নহে। কারণ এক ত রহিয়াছে, নানাত্ব না থাকিলেও ঐ একের মধ্যেই নানাত্ব বিলীন রহিয়াছে। যে এক সত্তা বিদ্যমান উহাই পূর্ণ সত্তা—ইহা যে সমাধান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমাধান যতক্ষণ এক সত্তাকেও তিরোহিত করিতে না পারিবে ততক্ষণ পূর্ণ সমাধান রূপে বর্ণিত হইতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, চিত্তের বৃত্তি বিষয় অনুসারে বিভক্ত হয়। বিষয় এক হইলে বৃত্তি এক না হইয়া পারে না। প্রাথমিক অবস্থায় বিক্ষেপের সংস্কার থাকে বলিয়া এই একত্ব-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার বশতঃ নানাত্বের প্রতিভাস জাগিয়া ওঠে। উহা একাগ্রতার অঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে। একাগ্রতার সঙ্গে উহার কোন বিরোধ নাই। কিন্তু উহা থাকা পর্যন্ত একাগ্রতা পূর্ণ হইতে পারে না। ক্রমশঃ অভ্যাস পরিপক্ক হইলে বিক্ষেপের আবির্ভাব নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং একাগ্রভাব একীভূত প্রজ্ঞারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রজ্ঞা বস্তুতঃ চিত্তেরই স্বরূপ। চিত্তই বিষয়ের সান্নিধ্য বশতঃ বৃত্তিরূপে পরিণত হয় এবং ঐ বৃত্তি একমুখে প্রবাহিত হইয়া একাগ্ররূপে আবির্ভূত হয়। চিত্তে আলম্বন বা বিষয় প্রকাশিত থাকে, অর্থাৎ ঐ এক আলম্বনের আকার ধারণ করিয়া চিত্ত নিজ উজ্জ্বল আলোকে প্রকাশিত হয়। সুতরাং নানাত্বের পরিহার হইলেও এই যে এক সত্তারূপ প্রজ্ঞার প্রকাশ ইহা বস্তুতঃ চিত্তই। ইহার পরের অবস্থায় একাগ্রবৃত্তিও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন চিত্ত বৃত্তি রূপে আর থাকে না, মাত্র সংস্কার রূপে

থাকে। এই অবস্থায় প্রজ্ঞা অস্তমিত হয়। ইহা জ্ঞানের অতীত অবস্থা। জ্ঞান হওয়ার পর এবং জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ার পর জ্ঞানগত বিষয় যে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায় ইহা সমাধির প্রারম্ভিক অবস্থা। মা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"এক হয় বিশ্বব্রাহ্মণ্ড এক সত্তায় পরিণত হওয়া, আর হয় সত্তার ও কথা নাই।" এই যে এক সত্তারূপে প্রকাশ, ইহাই শাস্ত্রের সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অথবা মতান্তরে সবিকল্প সমাধি। এই অবস্থাতে মন বা চিত্ত অবস্থিত থাকে, কারণ এই এক সত্তা বাস্তবিক পক্ষে চিত্তেরই সত্তা। তখন সমগ্র বিশ্ব এক অদ্বিতীয় চিত্তরূপে পরিণত হইয়াছে এবং এই চিত্তই প্রজ্ঞারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কারণ বিষয়ের সান্নিধ্য বশতঃ চিত্ত দ্রুতি লাভ করিয়া বা বিগলিত হইয়া বিষয়ের আকার ধারণ করে। সুতরাং চিত্তের আকার যাহাই হউক না কেন উহা প্রজ্ঞারূপে পরিণত, এবং বিশ্বের অনন্ত আকার ঐ প্রজ্ঞার আলোকে বিলীন অর্থাৎ সমাধান প্রাপ্ত। এই জন্যই বলা হয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক সত্তায় পরিণতি। ইহাই আপেক্ষিক সমাধান। পূর্ণ সমাধান হইতে হইলে ঐ এক সত্তারও সমাধান হওয়া আবশ্যক। ঐ এক সত্তা চিত্ত বলিয়া ঐ সমাধান চিত্তের সম্যক্ নিবৃত্তি ভিন্ন অপর কিছুই নহে, অর্থাৎ উহা চিত্তের নিরোধ অবস্থা। চিত্ত বা মন বলিয়া তখন কিছুই থাকে না। সাধারণতঃ যাহাকে উন্মনী ভাব বলা হয় ইহা তাহাই। বিশ্ব ত থাকেই না, যে আলোকে বিশ্ব আলোকিত হয়, সে আলোকও থাকে না, এবং শুধু তাহাই নহে, থাকে না যে, সে সংস্কারও থাকে না। ইহারই নাম সর্ব-সমাধান। এই অবস্থার উদয় হইলে বোঝা যায় যে, এই স্থিতিতে দেহ থাকা না থাকার কোন প্রশ্ন উঠেই না! মন থাকে বা থাকে না, এই প্রশ্নেরও স্থান নাই। কিন্তু এই যে পূর্ণ-সমাধানের কথা বলা হইল ইহার পরবর্তী মহাস্থিতিতে কোন প্রকার দ্বন্দ্বের প্রশ্ন উঠে না বা উঠিতে পারে না।

চমৎকার দর্শন বা চমৎকার আবির্ভাব চিত্তসাপেক্ষ। যাহাকে চমৎকার

বলা হইতেছে, তাহা চিত্তেরই একটি বিভূতি এবং দর্শন চিত্তই করে। সুতরাং যেখানে পূর্ণ সমাধান, সেখানে চমৎকারের কোন প্রশ্ন উঠেই না। সেখানে চমৎকার থাকে কি থাকে না একথার কোন অর্থই নাই। কিন্তু যেখানে আপেক্ষিক সমাধান সেখানেও চমৎকারের কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ আপেক্ষিক সমাধানও তখনই সম্ভবপর যখন সকল বৈচিত্র্য একত্বের মধ্যে সমাহিত হয়। চমৎকার প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে একত্বের প্রকাশ অসম্পূর্ণ এবং বিক্ষেপের সংস্কার যুক্ত। সুতরাং আপেক্ষিক সমাধানেও চমৎকারের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ইহাই হইল যোগীর অথবা জ্ঞানীর স্বরূপের দিক্ হইতে দৃষ্টির সমন্বয়। বহির্মুখ দৃষ্টি নিয়া চমৎকারের আলোচনা অবশ্য পৃথক্ কথা। এখানে তাহা আলোচ্য নহে।

যেখানে চমৎকার দর্শনের কথা ওঠে সেখানে সমাধান স্বীকার করা চলে না, কারণ সমস্ত বিশ্বের এক সত্তারূপে পরিণতি যে সমাধানে ঘটিয়া থাকে, সেখানে চমৎকারের কোন প্রশ্ন-ই নাই। যখন সে এক সত্তাও থাকে না, তখনকার তো কোন কথাই নাই। চিত্তক্ষেত্রে তথাকথিত চমৎকার দর্শনের বীজ না থাকিলে, চমৎকার-দর্শন হয় না। এই বীজ-ই বাসনা; সুতরাং আপেক্ষিক সমাধানে সমুদিত প্রজ্ঞার উদ্দেশ্য ও ফল যদি বাসনাক্ষয় হয়, তাহা হইলে চমৎকারের কথাই বা কোথায়? চিত্তের বহির্মুখ অবস্থায় চমৎকার, অন্তর্মুখ অবস্থায় সমাধান, অর্থাৎ প্রাথমিক সমাধান। আর যখন অন্তর্মুখ বহির্মুখ কোন দিক্-ই থাকে না, যখন ভিতর বাহির সমান হইয়া যায়, তখন পূর্ণ সমাধান। তখন এক-ও নাই, নানাও নাই; অথবা এক-ও আছে, নানা-ও আছে, কিন্তু আছে অভিন্ন ভাবে।

চমৎকার-দর্শন বিভূতি প্রকাশের-ই নামান্তর। বিভূতি মিথ্যা নহে, কারণ তাহারও একটা স্থান আছে; কিন্তু উহা জীবনের চরম লক্ষ্য নহে। চরম ত নহে-ই, আদি লক্ষ্যও নয়। ভগবান পতঞ্জলি দেব যোগদর্শনে স্পষ্টই বলিয়াছেন, বিভূতি সকল ব্যুত্থিতচিত্তের পক্ষে সিদ্ধিরূপে পরিগণিত

হয়, কিন্তু নিরোধের পক্ষে উহারা অন্তরায়। যোগের লক্ষ্য কৈবল্য, বিভূতি নহে। বিভূতি পার হইতে না পারিলে কৈবল্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে একথা সত্য যে বিভূতির মধ্যেও প্রকার ভেদ আছে। এই জন্যই শঙ্করাচার্য দশশ্লোকীতে, এবং তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য উহার বার্তিকে সর্বাত্মক বলিয়া মহাবিভূতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা হেয় নহে। কারণ পুরুষ ও পরমশ্বের একই সত্তা। মায়া ও মহামায়ার সংস্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের শিবত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে এই মহাবিভূতির প্রকাশ হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিতে হয় না, এবং সংযমাদিরও প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। ইহা আত্মার অকৃত্রিম স্বয়ংসিদ্ধ বিভূতি। আত্মার স্বরূপগত আবরণ অবগত হইলে উহা আপনি-ই ফুটিয়া ওঠে। এই বিভূতি বস্তুতঃ স্বয়ংপ্রকাশ ও আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন। ইহাই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা মহাশক্তি। ইহা কৃত্রিম নহে বা আগন্তুক নহে। ইহা আত্মার সহজরূপা নিজ শক্তি। ইহার তুলনায় অণিমাদি সিদ্ধি সকল সমুদ্রের তুলনায় বিন্দুর ন্যায় অতি তুচ্ছ। এই বিভূতি অথবা স্বভাব কৈবল্যের অন্তরায় নহে। কিন্তু চিত্তের শুদ্ধির ফলে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ নিবন্ধন যে বিভূতি প্রকাশিত হয়, যাহা অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বের বা ঐশ্বরিক রূপাদির স্ফুরণ নহে, তাহাই অন্তরায়। সাধারণ সাধকের পক্ষে ঐ আগন্তুক বিভূতিকেই কৈবল্যের পরিপন্থী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। যোগিগণ সাধারণতঃ যোগ-ভূমিকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে প্রথমটি প্রথম কল্পিক। এই ভূমিতে সমাধি হইতে উদ্ভূত প্রজ্ঞাত্মক জ্যোতি-মাত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ভূমি মধুমতী। এই ভূমিতে সাধক বা যোগীর পরীক্ষা হইয়া থাকে। নানা প্রকার অলৌকিক প্রলোভনের বস্তু তাহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাকে প্রলোভিত করিয়া থাকে। তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে বিভীষিকাদির-ও উদয় হয়। এতদ্ব্যতীত অহংকার বা চিত্তের স্ফীততা ইহার-ও যথেষ্ট সম্ভাবনা এই ভূমিতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, প্রথম ভূমিতে যে জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহা সম্পূর্ণ শুদ্ধ নহে।

সাধক ক্রিয়াবলে এই জ্যোতিকে বিশুদ্ধ করিতে পারিলে অতি সহজেই মধুমতী ভূমি উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। জ্যোতি-ই শক্তি। বিশুদ্ধ জ্যোতি বলিতে বিশুদ্ধ শক্তিকে বোঝায়। এই শক্তি অর্জিত এবং শোধিত হওয়ার পর, ইহা দ্বারা যোগীর দেহেন্দ্রিয়াদির সম্পূর্ণ উপাদান সংস্কারপ্রাপ্ত হয়। পঞ্চভূত ঐ শুদ্ধাশক্তির প্রভাবে নির্মল হয়। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণ-বর্গও নির্মল হয়। মোট কথা, প্রকৃতির যে সব উপাদান লইয়া মানুষের দেহ ও অন্তঃকরণ রচিত হইয়াছে সব-ই নির্মল জ্যোতির দ্বারা শোধিত হয়। ইহাই প্রকৃত যোগবিভূতি উদয়ের অবস্থা। এই অবস্থায় পরীক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার পর ঐ সকল বিভূতি-ও স্বরূপে লীন হইয়া যায়। কারণ বিভূতি অন্তর্লীন না হইলে কৈবল্য বা স্বরূপস্থিতি অসম্ভব। এই জন্য তৃতীয় ভূমির নাম ভূতেন্দ্রিয়জয়। চতুর্থ ভূমিটি অব্যক্ত। ইহাকে যোগিগণ অতিক্রান্ত-ভাবনীয় বলিয়া নিদের্শ করেন। বস্তুতঃ ইহা ভাবনার অতীত অবস্থা। ইহার অব্যবহিত পরেই কৈবল্য। চমৎকার দর্শনের স্থান কোথায় তাহা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

৩ — শুদ্ধজ্ঞান ও দেহস্থিতি

বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। কেহ কেহ মনে করেন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে সঞ্চিত কর্ম ঐ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। তবে সঞ্চিতের যে অংশ প্রারব্ধ রূপে ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ জন্ম আয়ু ও ভোগের হেতু হইয়াছে, উহা তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা কাটে না। উহাকে অবশ্যই-ই ভোগ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান তীব্র হইলে উহা সঞ্চিতের ন্যায় প্রারব্ধ কর্মফলও নষ্ট করিতে পারে। অজ্ঞানের আবরণ শক্তি জ্ঞানের মৃদু অবস্থাতে-ই নষ্ট হয়, কিন্তু অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি নষ্ট করিতে হইলে অত্যন্ত তীব্র জ্ঞান আবশ্যক হয়। সুতরাং তীব্র জ্ঞান উদিত হইলে প্রারব্ধও তাহাকে বাধা দিতে পারে না। প্রারব্ধ স্বয়ংই ঐ জ্ঞানের প্রভাবে নিষ্ক্রিয়

হইয়া যায়। এই অবস্থায় দেহপাত হইতেও পারে, আবার না হইতেও পারে। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেহের সত্তা ও অসত্তার কোন প্রশ্ন-ই সেখানে থাকে না। মা-ও ঠিক তাহাই বলেন। তবে এখানে একটি কথা আছে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেহ থাকা না থাকার কোন পার্থক্য না থাকিলে-ও তটস্থ দৃষ্টিতে ঐ অবস্থায় দুই প্রকার স্থিতি সম্ভবপর। উভয় স্থিতিতেই অজ্ঞানের লেশ থাকে না ইহা মানিয়া লওয়া হইল। বিক্ষেপ শক্তিরূপ অজ্ঞান তখন থাকে না, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মও তখন থাকে না ইহা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু এই সাধারণ ভিত্তির উপর তটস্থ দৃষ্টি অনুসারে দুইটি পৃথক্ স্থিতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য জ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন প্রশ্নই নাই, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই দুইটি স্থিতির একটি স্থিতি তীব্র জ্ঞানের সঙ্গেই প্রারব্ধ মূলক দেহের পতন এবং বিদেহ কৈবল্যের উদয়। দ্বিতীয় স্থিতি দেহ রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যমান থাকা। ইহারই নাম শিবময় তনু। ইহা চিন্ময় স্বরূপ। এই স্বরূপদেহ প্রারব্ধ কর্মজন্য দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই স্থলে প্রারব্ধ জন্য দেহ নাই, কিন্তু ইহা পরিবর্তিত হইয়া চিৎশক্তির আপূরণ জন্য অভিনব চিন্ময় দেহ আছে। এই দেহে কর্মাশয় বা কর্মবীজ থাকে না। ইহা বিশুদ্ধ ও নির্মল। ধ্যানজ নির্মাণকায়ে কর্মাশয় থাকে না, ইহা পতঞ্জলিও বলিয়াছেন। এই দেহ ঐ স্থিতিতে ঐ ধ্যানজ কর্মবীজহীন চিন্ময় আকারের অনুরূপ।

এই যে দেহ থাকা, অর্থাৎ চিন্ময় আকারে থাকা অথবা না থাকা অর্থাৎ বিদেহ কৈবল্যের উদয় হওয়া, এই দুইটি অবস্থার কোনটি-ই তীব্র জ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। কারণ তাহার নিকট দেহের থাকা ও না থাকার মধ্যে স্বরূপে কোন পার্থক্য প্রতীত হয় না। এই জন্য-ই মা পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন যে জ্ঞানের উদয় হইলেও অবিদ্যার লেশ থাকে, ইহারও একটি স্থান আছে, আবার থাকে না ইহার-ও একটি স্থান আছে। এই দুই কথাই সত্য।

৪ — স্বরূপজ্ঞান ও বৃত্তি জ্ঞান

স্বরূপজ্ঞান ও বৃত্তি জ্ঞানে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। বৃত্তিজ্ঞান চিত্তের পরিণাম বিশেষ অর্থাৎ বায়ুর আঘাতে জল যেমন তরঙ্গ আকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ বিষয়ের সান্নিধ্যে চিত্ত বৃত্তিরূপে পরিণত হয়। ইহাই বৃত্তি জ্ঞান। ইহা বস্তুতঃ চিত্তের পরিণাম এবং বিষয়ের আকার নিয়াই সাকার রূপে প্রতীত হয়। ইহার নিজের কোন আকার নাই। এই বৃত্তিজ্ঞানকে ফুটাইয়া তোলে অর্থাৎ প্রকাশিত করে স্বরূপ জ্ঞান। স্বরূপ জ্ঞান পিছনে না থাকিলে বৃত্তি-জ্ঞানের উদয়-ই হইতে পারে না। কিন্তু বৃত্তি-জ্ঞান না থাকিলে-ও স্বরূপ-জ্ঞান থাকিতে পারে। বস্তুতঃ চিত্তবৃত্তির আত্যন্তিক নিরোধ হইলেই, স্বরূপাত্মক জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে। স্বরূপজ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। উহার প্রকাশক দ্বিতীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। উহা নিজের আলোকেই নিজে প্রকাশিত। কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান এই প্রকার নহে। উহা স্বরূপ-জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত হয়। উহা স্বয়ংপ্রকাশ নহে, পরপ্রকাশ্য। সাধারণতঃ 'জ্ঞানী', 'অজ্ঞানী' বিচারের মূলে এই বৃত্তি-জ্ঞানই থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বরূপ-জ্ঞানের স্ফুরণ ব্যতীত, প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায় না। স্বরূপ-জ্ঞান ও বৃত্তি জ্ঞানের সন্ধি স্থলে যে জ্ঞানটি ভাসিয়া ওঠে তাহা প্রকাশ হইয়া-ও বস্তুতঃ বিষয়াকার এবং বিষয়াকার হইয়া-ও স্বরূপতঃ প্রকাশ হইতে অভিন্ন।

৫ — শিষ্যের গতি কতদূর

মা বলেন, "উপদেষ্টা যেখানে স্থিত, সেই পর্যন্ত-ই শিষ্যের গতি।" সত্যের দুইটি দিক্ আছে—একটি ভাবময় ও গণ্ডীবদ্ধ, অপরটি ভাবাতীত ও সকলপ্রকার গণ্ডী হইতে মুক্ত। পিতাপুত্র ভাব, ভাই ভাই ভাব, আমি তুমি ভাব প্রভৃতির ন্যায় গুরু শিষ্যভাব-ও ভাবের অন্তর্গত। অনন্ত প্রকার

ভাব আছে। কিন্তু ভাবের গণ্ডী পার হইয়া গেলে সেখানে কোন ভাবের-ই স্পর্শ থাকে না। শিষ্য ও গুরু উভয়ই সাপেক্ষ। গুরুভাব শিষ্যভাবের অধীন এবং শিষ্যভাব গুরুভাবের অধীন। গুরু জ্ঞানের উপদেষ্টা, শিষ্য ঐ উপদিষ্ট জ্ঞানের গ্রহীতা। গুরুর উপদেশ যদি ভাবমূলক হয় তাহা হইলে তাহা তখনই সম্ভবপর হয় যখন গুরুশিষ্য ভাব স্মৃতিতে রাখিয়া শিষ্যের কল্যাণ কামনায় গুরু নিজভাব হইতে শিষ্যকে উপদেশ দান করেন। এই উপদেশের মূলে এক হিসাবে দেখিতে গেলে গুরুর অহংভাব রহিয়াছে। সুতরাং এই উপদেশের মূলে শিষ্যের ঊর্ধ্বগতি (যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে) ততদূর পর্যন্তই সম্ভব যতদূর গেলে শিষ্য গুরুর স্তর পর্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং শিষ্যের এই প্রাপ্তি বা সিদ্ধি বস্তুতঃ আপেক্ষিক। কেননা গুরুর সমত্ব লাভই তাহার সাধনার পরিসমাপ্তি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহাই তাহার পরম লক্ষ্য নহে, কারণ পরম লক্ষ্য কখনো কোন ভাবের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। পরম লক্ষ্য তাহাই, যেখানে শিষ্য যেমন শিষ্য থাকে না তেমনি গুরুও গুরু থাকেন না—উভয়েই অখণ্ড ভাবাতীত সত্তায় অদ্বয় রূপে প্রতিভাসমান হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে কি গুরুর উপদেশ নেওয়া যাইতে পারে?— ভাবকে আশ্রয় করিয়া কখনো কি ভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়? এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। ইহার উত্তর এই। গুরু যদি নিজকে গুরু মনে করিয়া উপদেশ দান করেন, তাহা হইলে সেই উপদেশ শিষ্যকে গুরুভাব পযর্ন্ত-ই নিয়া যাইতে পারে। কিন্তু গুরুতে যদি গুরুত্ব-অভিমান না থাকে, অর্থাৎ গুরুভাব যদি ভাবাতীত অখণ্ডের সঙ্গে এক হইয়া যায়, তাহা হইলে গুরুর মুখনির্গত বাণী, অন্তরের-ই বাণী মনে করিতে হইবে,— তাহা ভাবাতীতের-ই বাণী, অখণ্ডের আহ্বান, অসীমের ডাক। ব্যক্তি বিশেষের বা আধার বিশেষের মধ্য দিয়া তাহা প্রকটিত হইলেও ঐ ব্যক্তি বিশেষের অভিমান না থাকার দরুণ তাহা জীবকে আকর্ষণ করিয়া

কোন ভাব বিশেষে আবদ্ধ করে না, কিন্তু মুক্ত অনন্ত আত্মস্বরূপে পৌঁছাইয়া দেয়। এই জন্য-ই বলা হয়, এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে কোন শব্দ পৌঁছায় না, এমন একটি স্বরূপের প্রকাশ আছে যেখানে মানুষের বর্ণনার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই অখণ্ড স্বপ্রকাশ সত্তা হইতে স্বতঃস্ফুরিত ভাবে যে প্রেরণা আসে— শব্দের ভিতর দিয়াই হউক অথবা শব্দাতীত বোধ রূপেই হউক, —এমন কি ভাবের ভিতর দিয়া ভাব রূপেই হউক, তাহা মানুষকে সীমায় বদ্ধ রাখে না। তাহা হইতে-ই মানুষের সকল ভ্রান্তি মুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয়। বাস্তবিক পক্ষে ঐ স্থিতিতে গুরু প্রতিষ্ঠিত হইলে গুরু আর গুরু কোথায়? অর্থাৎ তখন-ই তিনি প্রকৃত গুরুপদবাচ্য হ'ন। কারণ উহা গুরু-ভাব নহে ভাবাতীত গুরু। বস্তুতঃ ঐ স্থিতিতে একভিন্ন দ্বিতীয় ভাসে না। সুতরাং শিষ্যের প্রশ্ন এবং গুরুর সমাধান, এই সব ভাষার প্রয়োগ ঐ স্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া চলে না। এই অবস্থায় যে বক্তা সেই হয় শ্রোতা। বস্তুতঃ বক্তা-ও কেহ নাই, শ্রোতা-ও কেহ নাই। সেই একই নিজের মধ্যে নিজের আলোড়ন ফুটাইয়া তুলিতেছে, অথচ ইহার কোন নিদর্শন মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হইলে পূর্ণাবস্থায় শরীর থাকা না থাকার প্রসঙ্গ কেন উঠিতে পারে না তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

৬ — বিচার ও বিচারের অতীত

বিচার মন-বুদ্ধির ব্যাপার। মন-বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া উঠিলে বিচার থাকে না। স্বভাব সত্যই আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হয়। বিচারের তৃতীয় অবস্থায়, এক অখণ্ড ও অভিন্ন সত্তা ব্যতীত আর কিছুর-ই ভান হয় না। বিচার করিলে অনন্ত ভেদ, অনন্ত বৈচিত্র্যই দৃষ্টি গোচর হয়। কিন্তু উহা কোথায়? উপাধির সঙ্গে যোগে, মন বুদ্ধির স্তরে নামিয়া। সেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় আছে, উভয়ের ভেদ আছে, একটি জ্ঞাতার সঙ্গে অপর একটি

জ্ঞাতার পরস্পর ভেদ আছে, প্রত্যেক জ্ঞেয়ের আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে, তা ছাড়া দেশগত, কালগত, গুণক্রিয়াগত অন্য বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও সত্তা এক। বিচার না করিলে সহজ ভাবে ধরিতে পারিলে সর্বাবস্থায়, সর্বকালে সেই এক সত্তাই দেখা যায়, দ্বিতীয় কিছু নাই। বিচারের দৃষ্টিতেই সৃষ্টি হয়—ইহার-ই নাম দৃষ্টি-সৃষ্টি। একই দৃষ্টি অনন্ত দৃষ্টিরূপে অনন্ত সৃষ্টির উদ্ভাবন করে, কিন্তু বিচারের অতীত স্বরূপ-সত্তায় কোন সৃষ্টি নাই। এক অখণ্ড নিত্য সত্তা অনন্তরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সৃষ্টিরূপ নহে, তাহাই স্বরূপ। এই অনন্ত বৈচিত্র্য একই স্বরূপের বৈচিত্র্য। বস্তুতঃ বৈচিত্র্য-ই বা কোথায়? যখন একেকে দেখা যায় তখন সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালে একই সত্তার আত্মপ্রকাশ হয়। ফলে তাহা দেশের অতীত, কালের অতীত এবং সকল প্রকার পরিচ্ছেদ ও গুণের অতীত ঐখানে কোন ভাষার গতি নাই। উহা মন এবং বাণী উভয়ের-ই অতীত।

ঊনিশ

১ — আয়ু বৃদ্ধি

আয়ু কি, তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে অথবা কারণ বিশেষে তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে, ইহাই প্রশ্ন। যোগ শাস্ত্রের দৃষ্টি অনুসারে আয়ু বিপাকোন্মুখ কর্মের অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের—তিনটি বিপাকের মধ্যে একটি বিপাক। ইহা অনেকেই জানেন যে কর্ম সাধারণতঃ ক্রিয়মাণ ও প্রাক্তন ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। যে কর্মটি বর্তমান মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ক্রিয়মাণ কর্ম। অবশ্য এই কর্মের উদ্ভবের মূলে অবিবেক ও

তন্মূলক দেহাত্মক বোধ বা অভিমান থাকা আবশ্যক। এই বর্তমান কর্ম বা ক্রিয়মাণ কর্ম উৎপন্ন হওয়ার পরই নিজের অনুরূপ একটি সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে আধান করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ কর্ম সংস্কারই কর্মাশয় নামে পরিচিত। উহা চিত্তে বিদ্যমান থাকে। পর পর ক্রমবদ্ধ ক্রিয়মাণ কর্মের সংস্কার সকল চিত্তে অঙ্কিত হইতে থাকে। অনাদিকাল হইতে এই প্রকারে কর্ম সংস্কার সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। এই সমষ্টি কর্মের নাম সঞ্চিত কর্ম নামে প্রসিদ্ধ। সঞ্চিত কর্ম অতীত কালের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে প্রাক্তন কর্মও বলা হয়। এই ভাবে দেখিতে গেলে প্রাক্তন এবং বর্তমান এই দুই প্রকার কর্মই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এইখানে একটা রহস্য কথা আলোচনা করা আবশ্যক। এই যে সঞ্চিত কর্মের কথা বলা হইল উহার মধ্যে সবগুলি কর্মই যে ফল প্রসব অবশ্যই করিবে তাহা বলা যায় না। কাহারও অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে তো কোন কথাই নাই— তখন যাবতীয় সঞ্চিত কর্মই দগ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা না হইলেও কোন কোন কর্ম বিরুদ্ধ কর্মান্তরের দ্বারা নষ্ট হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। কোন কোন কর্ম নিজের অঙ্গিস্বরূপ মুখ্য কর্মের অন্তর্গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উহার অন্তর্গতি হইয়া যায়— উহা পৃথক্ ভাবে ফলদান করে না। কোন কোন কর্মের ফলারম্ভ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সেগুলির বিপাক অর্থাৎ ক্রমিক পরিণাম ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন কোন কর্ম অনিয়ত বিপাক হইয়া থাকে— তাহাদের বিপাক ঘটিবে কি না তাহা কোন সময়েই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। উৎকট কর্ম নিয়ত বিপাক ও সাধারণতঃ দৃষ্ট জন্মবেদনীয় হইয়া থাকে। যাহাকে ব্যবহারিক ভাষায় আমরা নিয়তি বলিয়া থাকি উহাই তাহার স্বরূপ। কিন্তু মৃদুকর্ম বিপক্ক হইতেও পারে অথবা প্রতিকূল শক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে বিপক্ক নাও হইতে পারে।

প্রাক্তন কর্মের উপর বর্তমান কর্মের প্রভাব অবশ্যই পড়ে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমান কর্মের মাত্রার তীব্রতা অনুসারে ঐ প্রভাবও তীব্র অথবা মৃদু হইতে পারে। প্রতিনিয়ত ক্রমিক ভাবে যে ক্রিয়মাণকর্মের

প্রভাব চলিতেছে তাহা মৃত্যু কালে সমাপ্ত হইয়া যায়। জীবের অন্তিম-শ্বাস-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনব কর্মের উদয়-পথ বন্ধ হইয়া যায়। আসন্ন-মৃত্যু অবস্থায় যে ভাব চিত্তে উদিত হয় ও তদনুসারে যে কর্ম আত্মপ্রকাশ করে তাহাই অন্তিম কর্ম। কারণ তাহার পর আর ক্রিয়মাণ কর্ম হইতে পারে না, এইজন্য ঐ কর্মের বল অত্যন্ত অধিক, কারণ উহা ক্রিয়মাণ অন্য কর্মের দ্বারা বাধিত হয় না। এই কর্ম উদিত হইয়া নিজ বলে প্রাক্তন অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম-ভাণ্ডার হইতে নিজের অনুরূপ কর্ম-সংস্কারগুলি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এই সকল কর্ম-সংস্কার যে বিপাকোন্মুখ কর্মের সংস্কার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্তিম কর্মকে খুটি করিয়া অর্থাৎ কেন্দ্রে রক্ষা করিয়া এইগুলি তাহার অঙ্গরূপে মাত্রার তারতম্য অনুসারে সজ্জিত হয়, এবং সবগুলি মিলিয়া একটি সমষ্টি কর্মরূপে পরিণত হয়। মৃত্যু সময়ে স্বভাবের নিয়মে যে অন্তর্মুখী গতি জন্মিয়া থাকে—যাহাকে একাগ্রতা বলা চলে এবং স্বাভাবিক যোগও বলা চলে—তাহার ফলে ঐ কর্মসমষ্টি ঘনীভূত হইয়া পিণ্ড আকার ধারণ করে। এই পিণ্ড কর্মের কেন্দ্রস্থ রূপেই মৃত্যুকালীন ভাবের কর্মবীজ থাকে। অন্যগুলি তাহারই স্বজাতীয় এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই কর্মপিণ্ড রচিত হইলেই জীবের দেহ ত্যাগের সময় উপস্থিত হয়। তখন, অর্থাৎ ঐ সন্ধিক্ষণে বিগত জীবনের ঘটনাপুঞ্জ অতি অল্প সময়ের মধ্যে, বায়স্কোপের চিত্রাবলীর ন্যায়, মুমূর্ষের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখীন হয় এবং ভাবী জন্মের একটি সাধারণ চিত্রও ফুটিয়া উঠে। মৃত্যুকালে যে জ্যোতি প্রকাশ হয় তাহাতেই এই উভয় দৃশ্যের অভিব্যক্তি হয়। এই যে কর্ম-পিণ্ডের কথা বলা হইল ইহারই নাম প্রারব্ধ কর্ম। ইহা প্রাক্তন কর্মেরই বিপাকোন্মুখ অংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অর্থাৎ প্রাক্তন অনন্ত কর্মরাজির মধ্যে যে পরিমাণ কর্ম ফলদানে উন্মুখ হইয়াছে—সেইগুলিই প্রারব্ধের অন্তর্গত হয়। প্রারব্ধের মুখ্য ফল সুখ দুঃখ ভোগ। কিন্তু এই ভোগ সম্ভবপর হয় না, যদি ভোগায়তন দেহ প্রাপ্ত না হওয়া যায়। এইজন্য

ভোগদেহ প্রারব্ধের ফল বলিয়া পরিগণিত হয়। শুধু তাহাই নহে, এই দেহের স্থিতিকাল অর্থাৎ ঐ দেহ কতদিন স্থায়ী হইবে তাহাও ঐ কর্মের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। এই দেহের স্থিতিকালকেই আয়ু বলে। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল প্রারব্ধ কর্মের তিনটি বিপাক বা ফল বিদ্যমান আছে। এই তিনটি ফল পরস্পর সংশ্লিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্বত্রই যে কর্মমাত্রেরই এই ত্রিবিধ বিপাক হইবে এমন কোন কথা নাই।

যে কর্মের তিনটি বিপাক অর্থাৎ জন্ম, আয়ু ও ভোগ উৎপন্ন হয় সেই কর্মকে ত্রি-বিপাক কর্ম বলে। যে কর্ম হইতে শুধু দুইটি বিপাক উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আয়ু ও ভোগ তাহাকে দ্বি-বিপাক কর্ম বলে। যে কর্ম হইতে শুধুই ভোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে এক বিপাক বলে। মৃত্যুকালে যে কর্ম প্রারব্ধরূপে প্রকট হয় তাহা ত্রি-বিপাক। কিন্তু জীবিতকালে ক্রিয়মাণ কর্ম মৃদু হইলে এক-বিপাক হয়, মধ্যম হইলে দ্বি-বিপাক হয় এবং অত্যন্ত উৎকট হইলে ত্রি-বিপাক হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বর্তমান দেহে অনুষ্ঠিত কর্ম বর্তমান দেহের আরম্ভক প্রারব্ধ কর্ম অপেক্ষা অধিকতর তীব্র বেগ সম্পন্ন না হইলে ঐ কর্মের ফল এই দেহে ভোগ করা সম্ভবপর হয় না—কারণ প্রারব্ধের নির্দিষ্ট ভোগ কাটাইতে পারিলে ঐ প্রকার অভিনব ভোগের প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। তবে দেহান্তরে অথবা স্বপ্নাদি কিংবা ধ্যানাদি অবস্থার মধ্য দিয়াও উহা ঘটিতে পারে ইহাও সত্য। তদ্রূপ বর্তমান জন্মেও এরূপ কর্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে যাহাতে শুধু ভোগ নহে, আয়ুরও বৃদ্ধি অথবা ন্যূনতা ঘটিতে পারে। কিন্তু এই কর্ম দ্বি-বিপাক। বর্তমান কর্মের তীব্রতা অত্যধিক হইলে বর্তমান দেহকেই পরিবর্তিত করিয়া দেহান্তর উদ্ভূত হইতে পারে। প্রকৃতির আপূরণ বশতঃ এই প্রকার জাত্যন্তর-পরিণাম সম্ভবপর হয়।

উপরোক্ত কর্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তীব্র ক্রিয়মাণ কর্মের প্রভাবে আয়ুর বৃদ্ধি সম্ভবপর।

এই ক্রিয়মাণ কর্ম ইষ্ট দেবতার অনুগ্রহ, শ্রীভগবানের অহেতুক করুণা, মন্ত্রশক্তির প্রভাব অথবা যোগসিদ্ধ মহাজনের কৃপা—ইহাদের যে কোনটি দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। আয়ুবৃদ্ধি যেখানে সম্ভবপর সেখানে মাত্রাগত তারতম্য থাকাও স্বাভাবিক, অর্থাৎ এই বৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা অঙ্কন করা যায় না। দুই মাস, ছয় মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি যদি সম্ভবপর হয় তবে দুই বৎসর বা শত বৎসর সম্ভবপর হইবে না কেন? শঙ্করাচার্যের আয়ুষ্কাল ষোল বৎসর ছিল এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। উহা দ্বিগুণ হইয়া বত্রিশ বৎসরে পরিণত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষির আয়ুষ্কাল দ্বাদশ বৎসর মাত্র ছিল, অথচ তাহার আয়ু বর্ধিত হইয়া কল্পান্তকাল পর্যন্ত হইয়াছিল। এই আয়ু-বৃদ্ধি, পূর্বেই বলা হইয়াছে, যেমন উৎকট কর্মবলে সিদ্ধ হয়, তেমনই মহাজনের বা ঈশ্বরের বা দেবতাদের অনুগ্রহেও হইতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যের আয়ু হইতে অংশরূপে অথবা পূর্ণরূপে আয়ুর সঞ্চার বশতঃও হইতে পারে। আবার ইহাও সম্ভবপর যে শুধু কল্পান্ত বা মহাকল্পান্ত আয়ুর পরিবর্তে আয়ুহীন অবস্থাও হইতে পারে। কালের ভিতর থাকিলে আয়ু থাকিবেই। কিন্তু কালের অতীত হইলে আয়ুর কোন প্রশ্নই নাই। অমরত্ব অথবা মৃত্যুঞ্জয় অবস্থা যদি উদিত হয় তাহা হইলে আয়ু বৃদ্ধির প্রশ্নই আর থাকে না, কারণ ভগবানের যেরূপ আয়ু নাই, তেমনই বিশুদ্ধ চৈতন্যময় কোন পুরুষেরও আয়ু নাই। কারণ তাঁহারা কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। সেইজন্য মা বলিয়াছেন "সেখানে সবই সম্ভব" ও "একভাবে শরীর রাখবার হলে তাও রাখতে পারে এবং আছে।"

২ — প্রতি জীবের নানা দেহ

বিশুদ্ধ চৈতন্য অন্তঃকরণ ও দেহ দ্বারা অবচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবরূপে পরিচিত হয়। জীব বস্তুতঃ এক অথবা নানা এই সম্বন্ধে অনেক বিচার আছে। তবে দৃষ্টিভেদ অনুসারে দুইটি মতই সত্য। যে মতে জীবকে এক

বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহাকে এক-জীববাদ বলা হয়। উহারই নামান্তর দৃষ্টি-সৃষ্টি-বাদ। আবার যে দৃষ্টিতে জীব ভিন্ন ভিন্ন তাহাকে নানা-জীব-বাদ বলে। উহার নামান্তর সৃষ্টি-দৃষ্টি-বাদ। এক জীববাদ বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে এখানে আলোচনায় প্রয়োজন নাই। কিন্তু নানা জীববাদ সর্বত্র পরিচিত। ঐ মত অনুসারেই বর্তমান প্রসঙ্গে জীব ও দেহের সম্বন্ধমূলক আলোচনা করা হইতেছে। সাধারণ লোকে জানে যে প্রতি জীবেরই একটি মাত্র দেহ থাকে। ঐ দেহ তাহার প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে রচিত হয়। উহার আয়ু এবং ভোগও ঐ প্রারব্ধেরই অধীন। ঐ দেহ অতীত হইলে কর্মানুসারে পুনর্বার দেহ গ্রহণ হয়। সম্যক্ জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত পর পর এইরূপ হইতে থাকে। এই হিসাবে প্রতি জীব বহু দেহ ধারণ করিয়া থাকে। ইহা সর্বত্র সুপরিচিত এবং এই সম্বন্ধে মনে কাহারও সংশয় উঠে না। কিন্তু একই সময় একটি জীব বহু দেহ ধারণ করিতে পারে কি না অথবা করে কিনা তাহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর এই, যোগী প্রয়োজন হইলে অল্প সময়ে বহু কর্ম ক্ষয় করিয়া মুক্তি পথে অগ্রসর হইবার জন্য যোগবলে একই সময়ে বহু দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। এই সকল দেহকে সমষ্টিভাবে যোগীর কায়ব্যূহ বলে। এক এক দেহে এক এক প্রকার কর্মের ভোগের সমাপ্তি হয়। যে জাতীয় কর্ম থাকে দেহ ঠিক তাহারই অনুরূপ হয়। যোগী ইচ্ছা করিলে এবং প্রয়োজন হইলে এক দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া নিবিড় অরণ্যে উগ্র তপস্যা করিতে পারেন এবং ঐ একই সময়ে অন্য দেহে রাজ-আসনে আসীন হইয়া রাজ্য শাসন ও ইচ্ছানুরূপ ভোগ বিলাসের আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারেন। দুই দেহ কেন, যোগীর সামর্থ্য অনুসারে তিন, চার, পাঁচ অথবা অধিক দেহ রচনা করিয়া ঐ সকল বিভিন্ন দেহ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ভোগ সম্পাদন পূর্বক অল্প সময়ে প্রাক্তন কর্মের ভার লঘু করিতে পারেন। ইহা শাস্ত্রে আছে এবং মহাজনদের ইতিহাস আলোচনা করিলেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সৌভরি ঋষির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু এই বহু দেহ গ্রহণের আর একটা দিক্‌ও আছে। সে স্থলে ইহা ভোগ-সম্পাদনের জন্য নহে কিন্তু জিজ্ঞাসুকে জ্ঞান দান, ভীতকে অভয় দান ও আর্তের আর্তিনাশ করার জন্য। পূর্বে যে বহু দেহের কথা বলা হইল সেগুলি সাধারণতঃ যোনিজ দেহ অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে সঞ্জাত এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। যোগী পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া ভৌতিক উপাদান আকর্ষণ করিয়াই অনুরূপ দেহ রচনা করিয়া থাকেন— ঐ দেহ গ্রহণের উদ্দেশ্য অল্পকালের মধ্যে কর্মফল ভোগের সমাপ্তি। দ্বিতীয় প্রকার দেহ অর্থাৎ যাহা অন্যকে জ্ঞান-ভক্তি সঞ্চারের জন্য রচিত হয় তাহাকে যোগিগণ নির্মাণকায় বলিয়া থাকেন। কখনও ইহাকে নির্মাণচিত্তও বলা হয়। বস্তুতঃ ঐ অবস্থায় কায় ও চিত্তে কোন ভেদ নাই। এই সকল দেহ বা চিত্ত সংখ্যায় বহু হইতে পারে এবং একই সময় বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হইতে পারে। ইহাদের চালক বা প্রয়োজক চিত্ত কিন্তু একই। সেই এক চিত্ত যাবতীয় কায়ের নিয়ামক। কায় সকলের সঙ্কোচ বিকাশ ঐ মূল চিত্তের উপর নির্ভর করে। বৌদ্ধগণের নির্মাণকায় বুদ্ধও কতটা এই জাতীয়।

এইত গেল অসাধারণ এবং অলৌকিক মহাপুরুষের কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সাধারণ লোকেরও অর্থাৎ যে সব ব্যক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন তাহাদেরও একই সময়ে বহু দেহ থাকা সম্ভবপর কি না ইহার উত্তর এই, হ্যাঁ— ইহাও সম্ভবপর। সম্ভবপর কেন, প্রতি জীবের অসংখ্য দেহ রহিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞানী বলিয়া সে উহা জানে না এবং সে ঐ সকল দেহকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। ঐ সকল দেহ থাকা না থাকা তাহার পক্ষে সমান। কিন্তু আছে ইহা সত্য— কারণ মূল সিদ্ধান্তই এই যে সৃষ্টির অন্তর্গত প্রতি বস্তুতেই প্রতি বস্তু অভিন্নরূপে বিদ্যমান—সর্বং সর্বাত্মকম্। সেইজন্য জগতের প্রতি স্তরে এবং প্রতি স্তরের প্রতি প্রদেশে প্রত্যেকের সত্তা রহিয়াছে। কিন্তু সেই সত্তা আকৃতিরূপে অভিব্যক্ত না হইলে সে উহা অনুভব করিতে পারে না।

সেইজন্য অজ্ঞান অবস্থায় সে নিজেকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে।

সে স্থূলতঃ যেখানে আছে বলিয়া নিজেকে অনুভব করে তাহার বিশ্বাস যে সে শুধু সেইখানেই আছে, কিন্তু সে ত জানে না যে সেও পরমাত্মার ন্যায় ঠিক সমভাবে বিশ্বরূপ। অনন্ত বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে তাহার সত্তা ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। যেখানে সে আসিয়া প্রবেশ করিবে সেখানেই সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে যে সেও ঐখানকার একজন। বস্তুতঃ এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একজন মানুষের লিঙ্গশরীর যদি দেবলোকে প্রবেশ করে তখন ঐ লিঙ্গশরীর দিব্য শরীরে সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ঐ দিব্যশরীর তাহারই শরীর। যদি কখনও ঐ লিঙ্গ-শরীর ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করে তবে উহা তৎক্ষনাৎ ব্রহ্মলোকের উপযুক্ত দেহ লইয়াই প্রকাশিত হয়। উহা স্বর্গীয় দেহ হইতে বিলক্ষণ। আবার ব্রহ্মলোক ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ব্রাহ্মদেহ জ্যোতিতে পরিণত হইয়া যায় আর ঐ লিঙ্গ-শরীর একাকী ব্রহ্মলোক হইতে নির্গত হয়। তদ্রূপ শিবলোকে প্রবেশের সময় ঐ একই লিঙ্গ-শরীর শিবলোকের উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়, আবার শিবলোক ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শৈবদেহ জ্যোতিতে পরিণত হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইবে প্রত্যেক জীবেরই জগতের প্রত্যেক স্থানে আত্মপ্রকাশ করিবার ক্ষমতা আছে, কারণ সর্বত্রই তাহার সত্তা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহার নিজের সহিত অথবা অহঙ্কারের সহিত স্তরাত্মক জ্যোতি-বিশেষের সংসর্গ হইলেই ঐ স্তরের উপযোগী তাহারই নিজ শরীর প্রকাশিত হয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ইহাতে কাহারও বৈশিষ্ট্য নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে—সকল জীবই সকল স্থানে ঐ স্থানের উপযোগী কায়া সহিতই বিদ্যমান আছে। কায়া এখন অব্যক্ত। লিঙ্গ বা অহঙ্কারের যোগে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু অভিব্যক্ত না হইলেও ইহা আছে। জ্ঞানী উহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন এবং এইভাবে নিজের একই স্বরূপের মধ্যে অনন্তস্বরূপ দেখিতে পান। এই সকল স্বরূপ এক হইলেও পৃথক্ পৃথক্। কর্মের বিচিত্র বিধান অনুসারে কখনও ইহার কোন কোনটি

অজ্ঞাতসারে ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ নিজের মধ্যেই বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য যেমন আছে তেমনই নিজের মধ্যেই বিশ্বের সকল রূপই আছে। আবার বিশ্বের সকল রূপের মধ্যেও নিজেই প্রকাশমান। এই সত্তাদৃষ্টিতে ত্রিকালভেদে ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও বাস্তবিক কোন ভেদ নাই! তাই মা বলিয়াছেন, "সেরূপ তোমার সর্বাবস্থার শরীর সর্বদা মজুত—যাহা হয়েছিল, এখন হচ্ছে আবার হবে" ইত্যাদি।

৩ — গুরুশক্তি ও পুরুষকার

দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ হইতেই কৃপা ও পুরুষকারের আপেক্ষিক বলাবল ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে নানাপ্রকার বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে কৃপা শব্দে বস্তুতঃ গুরুশক্তিই লক্ষিত হইয়া থাকে। গুরুশক্তি আবার অন্য কিছু নহে, ইহা ঈশ্বরের নিজ শক্তি যাহা তিনি আর্ত ও অজ্ঞানী জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রয়োগ করেন। পুরুষকার বলিতে জীবের অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যমকে বুঝাইয়া থাকে। প্রশ্ন এই, যে কোন সাধক নিজে চেষ্টা করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে কিনা, অথবা গুরুকৃপা-শক্তি বলে সাধকের বিনা উদ্যমে জ্ঞান প্রাপ্তি হইতে পারে। দ্বৈত দৃষ্টি হইতে দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে উভয়ই পরস্পর সাপেক্ষ। কারণ গুরু-কৃপা শুধু কৃপা নয়। কৃপার সঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও শিষ্যের ধৃতি-শক্তির অভাবে যথোচিতভাবে উহা কার্য করিতে পারে না। আধারের কাজ ধারণ করা। গুরু হইতে কৃপারূপে যে শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়, শিষ্যের আধার যদি তাহা ধরিয়া রাখিতে না পারে তাহা হইলে ঐ শক্তি তেমন ভাবে কার্য করিতে পারে না। শিষ্য বা আধারের ধারণশক্তির ন্যূনতা বা অভাব হইলে গুরুদত্ত কৃপার সম্পূর্ণ সফলতা ঘটে না। পক্ষান্তরে আধার যতই প্রবল হউক, এবং সাধকের

ধারণ-সামর্থ্য যতই অধিক হউক, কার্যকারিণী শক্তি গুরু হইতে সংক্রান্ত না হইলে শুধু আধারের শক্তিদ্বারা ফললাভ ঘটে না, ইহাই সাধারণ মীমাংসা। কিন্তু যে দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিষ্য বা সাধকের ধারণ-শক্তি অত্যন্ত কম এবং সেই জন্য গুরুর শক্তিসঞ্চার তৎকালে অর্থাৎ অবিলম্বে ফল প্রসব করিতে পারে না, সেই দৃষ্টি অনুসারে ইহা বলিতেই হইবে যে গুরুর পূর্ণ দায়িত্ব তখনই সফল হইতে পারে যখন তিনি শিষ্যের শুধু প্রাপ্তির দিকে নহে, গ্রহণের দিকেও অবসর এবং যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া দেন। গুরু আলোক দান করিয়া জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য দর্শন করিবার সৌভাগ্য দিয়াছেন ইহা সত্য, কিন্তু সাধকের দৃষ্টি যদি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, এ আলোক বিশ্বজগৎকে প্রকাশ করিলেও তাহার পক্ষে কোন প্রকার কার্যসাধক হয় না। সুতরাং গুরুকে শুধু আলোক দিয়া নিবৃত্ত হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন হইল বলা চলে না। আলোক-দানের সঙ্গে সঙ্গে আলোক গ্রহণ করিবার সামর্থ্যও অর্থাৎ অন্ধের অন্ধত্ব মোচনও তাঁহার কর্তব্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। এই জন্যই চরম বিশ্লেষণে বলিতে হয় যে যদিও কৃপা ও পুরুষকার পরস্পর সাপেক্ষ তথাপি কৃপার মহিমা অধিক, কারণ পুরুষকারের ক্ষীণতা বা দুর্বলতা উৎকট কৃপার বলে দূরীভূত হইতে পারে। তা' ছাড়া অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাও সত্য যে যতটুকু পুরুষকার জীবে নিহিত আছে তাহার মূলেও কৃপা বিদ্যমান। পুরুষকারের মূলে ইচ্ছাশক্তি এবং কৃপার মূলে গুরুশক্তি। একটু অন্তর্মুখ হইয়া অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে গুরুশক্তি ইচ্ছাশক্তির ও মূল। এক হিসাবে উভয়ই এক, তথাপি ভেদবৃষ্টিতে দেখিতে গেলে গুরুশক্তি হইতেই ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা গুরুশক্তির উপর নির্ভর করে। গুরুশক্তি মহাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি সংকল্প-বিকল্পাত্মক হইলে জীবের শক্তি এবং শুদ্ধ সংকল্পাত্মক হইলে উহাই ঈশ্বরের শক্তি। সংকল্পের সহিত দ্বিতীয় সংকল্পের মিশ্রণ থাকিলে উহাই বিকল্পরূপে পরিণত হয়। বিকল্পের অভাবে অথবা সংশয়ের অভাবে উহাই সত্য

সংকল্পরূপ ধারণ করিয়া ঐশীশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ উভয়ই ইচ্ছা। এক ইচ্ছাতে রজো-গুণ ও তমোগুণের ক্রিয়া থাকে; অপর ইচ্ছাতে নির্মল সত্ত্বগুণের ভাব মাত্র থাকে। কিন্তু মহাশক্তিতে ইচ্ছাই নাই। উহা ইচ্ছাহীন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা। মা এই জন্যই ইচ্ছাকে এক পক্ষে গুরুশক্তির ক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে উভয়ের মূলেই অর্থাৎ গুরুশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এই দুই ক্ষেত্রেই একমাত্র স্বয়ং প্রকাশ মহাশক্তিই কার্য করিয়া থাকে। এই জন্যই বস্তুতঃ কেহ যদি গুরু স্বীকার নাও করে, তাহা হইলেও ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে মূলে একমাত্র মহাশক্তির স্বভাবই খেলা করিতেছে। গুরুভাব স্বীকার করিলেও ইহা যেমন সত্য, গুরুভাব অস্বীকার করিলেও ইহা তেমনই সত্য। তাই মা বলিয়াছেন, "এই যে ইচ্ছাশক্তি সে'টাও বলা যে'তে পারে, গুরুশক্তি মেনেই। তা'হলে স্বয়ংই প্রকাশ দুদিকে।......পুরুষকারে যে গতি তা'তেও ত ঐ শক্তির ক্রিয়া।"

৪ — শেষ রক্ষা

মানুষের লৌকিক জীবনের উন্নতির পথে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন আসিয়া থাকে। অধ্যাত্ম জীবনের ইতিহাসেও ঠিক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অবস্থাবিশেষে হতোদ্যম হইয়া কেহ কেহ মনে করে যে জীবনে সফলতা লাভ সুদূর পরাহত। অধ্যাত্মজীবনের কথা লৌকিক জীবনের অনুরূপ। অধ্যাত্মমার্গে নানাপ্রকার অন্তরায় আসিয়া থাকে এবং আসা স্বাভাবিক। এই অন্তরায় দেখিয়া অধ্যাত্ম সাধকের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। কারণ অধ্যাত্ম মার্গের চরম উপলব্ধি চিরন্তন উপলব্ধি। সমস্ত জীবনে ধীরভাবে সাধন ভজন না করিতে পারিলেও যদি কেহ মৃত্যুকালে ভগবদুন্মুখ হইতে পারে তাহা হইলে উহাই তাহার ভবিষ্যৎ উন্নত জীবনের সূত্রপাত করে। মৃত্যুর সময়, অন্তিমশ্বাস ত্যাগের সময়,

যদি সদ্‌ভাব হৃদয়ে জাগরুক হয় তাহা হইলে ঐ সদ্‌ভাব প্রবল হইয়া তাহার অনুরূপ সৎ সংস্কার সকলকে আকর্ষণ করিয়া ঘনীভূত করে ও ভাবী অনন্দময় জীবনের সূত্রপাত করে। এই জন্য একটি কথা আছে, 'সাধন ভজন যাহাই কর, মরতে জানলে হয়।' ইহারই নাম শেষরক্ষা। সমস্ত জীবন বৃথা নষ্ট করিয়াও যদি চরম সময়ে তদ্গত হইয়া ইষ্ট চিন্তায় নিবিষ্ট হওয়া যায় তাহা হইলেও উহা ফল দান করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। পক্ষান্তরে সমস্ত জীবন সদাচারে অতিবাহিত করিয়াও যদি অন্তকালে ভগবৎ-স্মৃতি না জন্মে তাহা হইলে ঐ সকল সদাচার আপাততঃ তাহাকে সাহায্য করিতে পারে না। কোন কর্মই নষ্ট হয় না ইহা সত্য। কিন্তু যতক্ষণ ঐ কর্ম প্রারব্ধরূপে পরিণত না হয় ততক্ষণ উহার মূল্য অধিক নহে। এই জন্যই বাস্তবিক পক্ষে শেষ রক্ষাই রক্ষা। অল্প সময়ের মনন হইতে একটি সমগ্র জীবনের সুখময় পরিণাম সংঘটিত হইতে পারে।

৫ — মন্ত্রের স্বরূপ কি

মন্ত্র একটি রহস্যময় বস্তু। ইহার মধ্যে দুইটি পরস্পর বিরোধী অংশ অবিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হইয়া মন্ত্রের মন্ত্রত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটি অহংকার যাহা তুমি অথবা আমি রূপে বোধস্বরূপে বিদ্যমান। আর একটি শব্দ, চৈতন্যময় শব্দ। শব্দের সহিত অহংভাবের যোগে মন্ত্রের আবির্ভাব হয়। যাহাকে শব্দ বলা হইল তাহা স্বয়ংরূপে আত্মপ্রকাশ। পক্ষান্তরে যাহা অহংকার, তাহা তুমি রূপেই ফুটুক অথবা আমি রূপেই ফুটুক তাহা প্রকৃতির যোজনা। এই উভয় অংশ যুক্ত হইলে অহংকার বিশিষ্ট চৈতন্যময় শব্দই মন্ত্র, এইরূপ তাৎপর্য উপলব্ধিগম্য হইবে। মন্ত্র সাধনা করিতে করিতে যখন অহংকারের অংশ কাটিয়া যায় অর্থাৎ সংঘর্ষণের ফলে যখন চিদাগ্নি জ্বলিয়া উঠে তখন ঐ শব্দের চৈতন্যরূপ জ্যোতির আকারে ভাসমান হয়। অহংকারের সম্বন্ধ থাকে বলিয়া ঐ

জ্যোতিও একটি সাকার পিণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অহংকার বশতঃ ঐ সাকার পিণ্ডে অভিমানের উদয় হয়। মনে রাখিতে হইবে মন্ত্রের ব্যাপারও মনেরই খেলা। কারণ শাস্ত্রানুসারে মননের দ্বারা মনন হইতে নিজের যে ত্রাণ অর্থাৎ আত্মরক্ষা ঘটে তাহাই মন্ত্রের স্বরূপের নিদর্শন। এই মন শুদ্ধ হইলেও ইহাও বন্ধন স্বরূপ। কিন্তু বন্ধন হইলেও এই বন্ধনের উপযোগিতা আছে। কারণ যদি কেহ একটি বন্ধন স্বীকার করিয়া জগতের অনন্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে তাহা হইলে সেই বন্ধন হেয় নহে, বরং উপাদেয়। বস্তুতঃ মন্ত্ররূপী যে শব্দ তাহা মন্ত্রাখ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বা অক্ষর পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই বিষয়ে বিশেষ ধ্যান রাখিলে বুঝা যাইবে মন্ত্র এবং শব্দব্রহ্ম আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার একটি মুখ্য উপায়। মন্ত্রশক্তি অনন্ত মহাশক্তিরই এক কণিকা মাত্র। কিন্তু কণিকা হইলেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উহা জীবন্ত কণিকা। কারণ উহা মহাজ্ঞানের সহিত অভিন্ন। তাই মা বলিয়াছেন, এই টুক্‌রা আগুনের টুক্‌রা আর কি—সেই যে জ্ঞানস্বরূপ।” আর এক কথা, অখণ্ড মহাসত্যের মধ্যে একটা অংশ আছে যাহা শব্দাত্মক ও শব্দময় আর একটা অংশ আছে যেটি শব্দের অতীত, নিত্য নির্বিকার। সমস্ত জগৎ এই শব্দময় অংশে অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের মধ্যে ডুবিয়া আছে। এই অংশের বাহিরে না যাইতে পারিলে মহাজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। শব্দব্রহ্ম ও শব্দাতীত পরব্রহ্ম এই উভয় সত্তা মিলিয়াই অখণ্ড ব্রহ্ম সত্তা। তবে সাধকের দৃষ্টিতে শব্দের মধ্যেও তারতম্য আছে। আমরা সাধারণতঃ যে শব্দ প্রয়োগ করি তাহা বিকৃত এবং জড়শব্দ। ঐ সকল শব্দের প্রভাবে চিত্ত স্বভাবতঃই বহির্মুখে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে এমন শব্দও আছে যাহা সংস্কার বলে শুদ্ধ বাক্‌রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে সংস্কৃত শব্দ বা সংস্কৃত বাক্ বলে। ইহার প্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্ত ক্রমশঃ অন্তর্মুখ হইতে থাকে। শব্দের এই উভয় প্রকার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনকালে ঋষিগণ অন্তর্মুখ হইবার জন্য সাধকবর্গকে সংস্কারযুক্ত শব্দের আশ্রয় নিতে উপদেশ দিয়াছেন। মন্ত্রের সঙ্গে যে শব্দের যোগ আছে তাহা বিকৃত শব্দ নহে,

তাহা সংস্কারযুক্ত শব্দেরই রূপ। মা বলিয়াছেন, "যতক্ষণ সেই জ্ঞানে স্থিত না হয়, তরঙ্গ ও শব্দের মধ্যে সকলেই আছ। এক শব্দ বাইরে এনে দেয়, এক শব্দ অন্তর্মুখ করে দেয়"। এই যে শব্দ ও তাহার মহিমা বর্ণিত হইল তাহা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এমনও স্থিতি আছে যে বাহ্যশব্দ ব্যতিরেকেও স্বয়ংপ্রকাশ আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিতে পারেন। যিনি নিত্য শব্দের অতীত, অথচ সঞ্চার কালে যিনি নিত্য শব্দকে বাহনরূপে ব্যবহার করেন তিনি শব্দের অধীন নন ইহা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। শব্দের মহিমা যতই হউক—অবশ্য সংস্কৃত ও বিশোধিত শব্দের কথাই বলা হইতেছে— তাহা হইতেও অধিক মহিমা নিঃশব্দ বা শব্দাতীতের। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্ন সংশয়ঃ।"

বিশ

১ — অপরোক্ষ জ্ঞান ও আবরণ

অনেকের ধারণা অপরোক্ষ জ্ঞান উদিত হইলে আবরণ নিবৃত্তি ঘটে। কিন্তু শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে কাহারও কাহারও অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় সত্ত্বেও আবরণ নিবৃত্তি ঘটে নাই, অর্থাৎ অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি দোষ কাটে নাই। ইহা একটি সমস্যা বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে প্রতীত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা কোন সমস্যা নহে। কারণ যাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে তাহা যথার্থ অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। অথবা উহা অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেও উহাতে বিবিধ সংস্কার বীজরূপে

থাকিয়া যায় বলিয়া আবরণের নিবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে ঘটে না— শুধু যে উক্ত জ্ঞানের দ্বারা বিক্ষেপ নিবৃত্ত হয় না তাহা নহে, আবরণও সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয় না। প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে আবরণের সম্ভাবনা মোটেই থাকিত না। স্বয়ংপ্রকাশ পূর্ণ সত্য যেখানে স্ফূর্তি পাইতেছে সেখানে আবরণের আশঙ্কা কোথায়? শাস্ত্রে আছে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, মনোনাশ এবং প্রাণশুদ্ধি অথবা বাসনার ক্ষয় এই তিনটি সম্মিলিত না হইলে পূর্ণ প্রকাশ আবির্ভূত হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান হইলেও চিত্তে বাসনারূপ মল এবং প্রাণের বেগ নিবন্ধন সাম্যভাবের অভাব থাকিয়া যাইতে পারে। তাই জ্ঞানের উদয় হইলেও জীবন্মুক্তি লাভ হয় না। জ্ঞানের উদয় তত্ত্ববিচার নিবন্ধন হইতে পারে এবং প্রাচীনক্রম অনুসারে উপাসনার প্রকর্ষ হইতেও হইতে পারে। জ্ঞানোদয়ের প্রক্রিয়া যাহাই হউক, জ্ঞানের প্রভাব উভয় ক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। উপাসনা দ্বারা ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হয় বলিয়া অথবা ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় বলিয়া উপাসনালব্ধ অপরোক্ষ জ্ঞানই প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান। উহার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জীবন্মুক্তি পদলাভ হইয়া থাকে— প্রাণ ও মনের মলিনতা তখন থাকে না। অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয়ের পর বুদ্ধিক্ষেত্রে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন অনাবৃত নিজস্বরূপ প্রত্যক্ষ গোচর হয়। কিন্তু তত্ত্ব বিচার প্রভাবে ও উৎকৃষ্ট অধিকারীর চিত্তে কখনও কখনও অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। এই অপরোক্ষ জ্ঞান সাধারণতঃ তীব্র শক্তিসম্পন্ন হয় না। তাই মন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় না, কর্মবীজও কিঞ্চিৎ থাকিয়াই যায়। শুধু প্রারব্ধ নহে, প্রারব্ধোত্তর কর্মের কথাও বলা হইতেছে। এইস্থলে যোগাদি অথবা উপাসনা দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে চিত্ত শোধন হইলে ঐ অস্পষ্ট অপরোক্ষ জ্ঞান স্পষ্টতা লাভ করে। তখন স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়। উহা অনাবৃত্ত প্রকাশ। কারণ উহাতে যাবতীয় আবরণের বীজ দগ্ধ হইয়া যায়। এই জন্যই মা বলিয়াছেন, "এক হয় নিরাবরণ প্রকাশ, আর হয় আবরণের সম্ভাবনা রাখিয়া প্রকাশ।"

নিরাবরণ প্রকাশ ক্ষেত্রে আবরণের পুনরুদয়ের কথা উঠেই না। যাহাকে সাধারণতঃ নিরাবরণ বলা হয় তাহা আপাত দৃষ্টিতে আবরণ শূন্য প্রতীত হইলেও তাহাতে সূক্ষ্ম আবরণ থাকিয়া যায়।

আগম শাস্ত্রে জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্বন্ধে যে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে এই বিষয়টি আরও পরিস্ফুটরূপে বোধগম্য হইতে পারে। আগম মতে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই পৌরুষ ও বৌদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। অর্থাৎ যে অজ্ঞান বা জ্ঞান পুরুষগত অর্থাৎ আত্মগত তাহা পৌরুষ অজ্ঞান বা পৌরুষ জ্ঞান। পক্ষান্তরে যে অজ্ঞান বা জ্ঞান বুদ্ধিগত তাহাকে বৌদ্ধ অজ্ঞান বা বৌদ্ধজ্ঞান বলা হয়। আত্মা মূলে এক ও অভিন্ন। তিনি নিজ স্বাতন্ত্র্যবলে নিজের পূর্ণত্বকে সঙ্কুচিত করিয়া পরিচ্ছিন্ন হন ও অণু-ভাব ধারণ করেন। এই অণু-ভাবই মন অথবা পশুত্ব বা জীবত্ব নামে পরিচিত। সুতরাং জীবত্বের মূলে ভগবৎস্বরূপ আত্মার স্বাতন্ত্র্য মূলক সঙ্কোচ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আত্মসঙ্কোচ শুদ্ধ আত্মার উপর এক প্রকার পর্দারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইহারই নাম পৌরুষ-অজ্ঞান। জীব মাত্রেরই মূলে এই অজ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ অজ্ঞান এই প্রকার নহে। উহা বুদ্ধির ধর্ম। বুদ্ধিতে যে অজ্ঞানের ভান হয়— তাহাই বৌদ্ধ অজ্ঞান। আত্মা অনাবৃত অবস্থাতে 'শিবোহহং' রূপে নিজের শিবত্ব বা ভগবত্তা অপরোক্ষ-ভাবে অনুভব করে। এই অনুভব বস্তুতঃ স্বয়ংপ্রকাশ চিৎএর ব্যাপার। কারণ অনাবৃত্ত আত্মস্বরূপ শিবভাবেই তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই পৌরুষ জ্ঞানের উদয়ের ফল। বৌদ্ধজ্ঞান বৌদ্ধ অজ্ঞানের ন্যায় বুদ্ধির ব্যাপার। বুদ্ধিতে 'শিবোহহং' রূপে যে বৃত্তির উদয় হয়— তাহাই বৌদ্ধজ্ঞান। বৌদ্ধজ্ঞানের ফলে জীবন্মুক্তি হয় ইহা সত্য, কিন্তু তাহার পূর্বে পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়া চাই। পৌরুষ অজ্ঞান যোগাদি ক্রিয়া দ্বারা অথবা উপাসনার প্রভাবে নিবৃত্ত হইতে পারে না। উহার নিবৃত্তির একমাত্র উপায় ভগবৎ অনুগ্রহমূলক ভগবৎশক্তির সঞ্চাররূপ দীক্ষার ব্যাপার। যে নিগ্রহ শক্তির প্রভাবে আত্মা পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ সাজিয়াছে এবং জীবনরূপে পরিচিত হইয়াছে উহাকে

নিবৃত্ত করিতে হইলে ঐ আত্মারই অনুগ্রহ শক্তির ক্রিয়া আবশ্যক। দীক্ষা বস্তুতঃ ঐ শক্তিরই সঞ্চার ব্যতীত আর কিছু নহে। উহার প্রভাবে সঙ্কোচ বা পরিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ জীবত্ব কাটিয়া যায় এবং নিত্যসিদ্ধ শিবভাবের উদয় হয়।

এখন প্রাসঙ্গিক আলোচনার দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ভগবৎ অনুগ্রহে অথবা শ্রীগুরু কৃপায়— পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটে না। কারণ বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয় না হইলে বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটিতে পারে না। বুদ্ধিতে যে আবরণ রহিয়াছে তাহা সরাইবার জন্য সাধনা, উপাসনা, যোগাভ্যাস প্রভৃতি আবশ্যক হয়। পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে মানুষে এই অধিকার আপনি উদিত হয়। সাধনার ফলে বৌদ্ধভাবের উদয় হয়, তখন বুদ্ধিস্থ আবরণ সরিয়া যায়। এই জ্ঞান বুদ্ধিরই ধর্ম। সুতরাং ইহা স্বরূপের সহিত অভিন্ন নহে, কিন্তু স্বরূপের লিঙ্গ স্বরূপ। এই জ্ঞান উদিত হইলে সাধক নিজেকে শিবোহহং বলিয়া বুঝিতে পারে। এই জ্ঞানের প্রভাবে বৌদ্ধ অজ্ঞান উপশান্ত হয় এবং জীবন্মুক্তির আস্বাদন লাভ ঘটে। তখন প্রারব্ধ কর্ম থাকিলেও আবরণ থাকে না। ইহা নিরাবরণ প্রকাশ। দেহে অবস্থান করিয়াও এই পূর্ণ প্রকাশ অনুভব করা সম্ভবপর। কারণ ইহা বুদ্ধির ব্যাপার। কিন্তু দেহান্তকালে অথবা প্রারম্ভের অবসানে স্বভাবতঃই বুদ্ধিক্ষেত্রের খেলা আর থাকে না। তখন পৌরুষ জ্ঞানের উদয় হয়। তখন শিবত্বে প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে পৌরুষস্থলে সর্বপ্রথম অজ্ঞান নিবৃত্তি আবশ্যক এবং সর্বান্তে জ্ঞানের উদয় হইয়া শিবস্বরূপে স্থিতি ঘটে। কিন্তু বুদ্ধিস্থলে সর্বপ্রথম জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার পর ঐ জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। তখন জীবন্মুক্তির উদয় হয়। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ বুদ্ধির দ্বারা নিজের শিবত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্তির পর বৌদ্ধ জ্ঞানোদয়ে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্তির ফলে ইহা সংঘটিত হয়। ইহা হইতে

বুঝা যাইবে যে নিজকে শিবরূপে জানিলেও প্রকৃত শিব হওয়া হয় না। কারণ এই জানা বুদ্ধির জানা মাত্র, স্বরূপের জানা নহে। স্বরূপের জানাই পৌরুষ জ্ঞানের উদয়। তখন জানা ও হওয়া এক হইয়া যায়, নিজের শিবত্ব পুনঃ প্রাপ্তিতে আর কোন বাধা বা আবরণ থাকে না। বুদ্ধি যতই স্বচ্ছ হয় ততই প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তথাপি প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বই, বিম্ব নহে। বুদ্ধি দর্পণস্বরূপ। দর্পণ চলিয়া গেলে, আর প্রতিবিম্ব থাকে না, একমাত্র বিম্বই থাকে। ইহাই জ্ঞান ও সত্তার অভেদ। বলা বাহুল্য, দেহ সম্বন্ধ সত্ত্বেও এমন স্থিতি হইতে পারে, যখন দেহ থাকা না থাকার প্রশ্ন হইতে পারে না। ইহা মা বহু প্রসঙ্গে বহুবার বুঝাইয়াছেন। যে স্থলে দেহের থাকা না থাকার প্রশ্নই উঠে না সে স্থলে ঐ স্থিতিকে নিত্য মহাপ্রকাশ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

২ — শাস্ত্রে কি সব কথা থাকে ?

কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় করিতে হইলে একমাত্র শাস্ত্রই মধ্যস্থ হইয়া নির্ণয়ের সহায়তা করিতে সমর্থ। তাই বলা হয়, "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।" ইহা সত্যকথা। কিন্তু শাস্ত্রের স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে এখানেও প্রকৃত সত্য রহস্যে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। শাস্ত্রেই আছে শ্রুতি ও স্মৃতি শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র। বস্তুতঃ সকল শাস্ত্রই তাঁহার আজ্ঞাস্বরূপ। ভগবৎ আদেশই শাস্ত্ররূপে জগতে প্রচারিত হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা প্রকৃত শাস্ত্র সম্বন্ধেই বলা হইতেছে। কর্তব্য নির্ণয় শাস্ত্রাত্মক ভগবৎ আজ্ঞার উপরই নির্ভর করে। গুরুকে ভগবৎস্বরূপ মনে করিলে গুরু আজ্ঞাও এক হিসাবে শাস্ত্রবৎ মান্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে শাস্ত্র অনন্ত। বেদ অনন্ত, স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র, এমন কি মহাজনের বাক্যও সর্বত্রই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে ভগবৎ নির্দেশ থাকিলেও তাহাও অনন্ত। এই অনন্ত

শাস্ত্রের অতি অল্প মাত্রই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও প্রকাশযন্ত্রের অপূর্ণতা নিবন্ধন অল্পাধিক বিকৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালে এই জন্যই বলা হইত যে বেদের স্বরূপ সূক্ষ্মা বাক্, তাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু ঋষিগণ ঐ সূক্ষ্মা বাক্‌কে সাক্ষাৎকার করিতেন এবং জীবের কল্যাণের জন্য ঋষিগণের মাধ্যমে লোকসংগ্রহের উপযোগিরূপে পূর্বোক্ত সূক্ষ্মাবাক্ বৈখরী রচনারূপে প্রকাশিত হইত। ইহাকে "বিল্ম" বলিয়া নির্দেশ করা হইত। ইহা বেদেরই বাহ্য প্রকাশ, কিন্তু উহাতে প্রকৃত বেদের স্বরূপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে আচ্ছন্ন থাকিত। সুতরাং ইহা বলিতেই হইবে শাস্ত্র অনন্ত বলিয়া এবং সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগোচর বলিয়া কাহারও পক্ষে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সম্ভব ও অসম্ভবের মানদণ্ড নির্মাণ করা চলে না। অনন্ত শাস্ত্রের কতটুকুই বা আমরা জানি এবং যতটুকু জানি তাহাও ঠিক ঠিক জানি কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। এই অবস্থায় যাহা শাস্ত্রে নাই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না— এইরূপ ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। শাস্ত্রে নাই এমন কোন বিষয় থাকিতে পারে না। কারণ শাস্ত্র অনন্ত ও সর্বজ্ঞানের আধার। কিন্তু শাস্ত্রের যে অংশটুকু আমাদের পরিচিত তাহাতে যে সব কিছু থাকিবে অথবা থাকিলেও আমাদের পরিমিত বুদ্ধিতে স্ফুরিত হইবে তাহার কোন আশা নাই। অনন্ত শাস্ত্র মহাজ্ঞানরূপে যখন কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশ করে তখনকার কথা আলাদা। সুতরাং শাস্ত্রে সব আছে একথা খুবই সত্য, আবার লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলে সব আছে একথা বলা সঙ্গত মনে হয় না। কারণ আমাদের পরিমিত জ্ঞানশক্তির নিকট পরিমিত শাস্ত্র ভাণ্ডারে সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই মা বলিয়াছেন, "দেখ, শাস্ত্রে কিন্তু সব কথা আছে, আবার নাই-ও।"

আর একটী বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক মনে হয়। ইহা চিরপুরাতন অর্থাৎ সনাতন এবং নিত্যনূতনের পরস্পর সম্বন্ধ। পূর্ণের মধ্যে অভিন্নরূপে অনন্ত সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং যাহাই হউক না কেন, কিছুই নূতন বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কারণ যাহা ভিতরে অভিন্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাই ভিন্নবৎ হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হয়। যাহা অভেদ অবস্থায় নিত্য বিদ্যমান তাহাই মায়াবলে ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং যাহা নাই তাহা হয়, ইহা বলা চলে না। কিন্তু মতান্তরে ইহাও সত্য যে যখন যাহা কিছু হয় সবই নূতন। প্রতিক্ষণেই নব নব উন্মেষ ঘটিতেছে। এক উন্মেষের পর ঠিক উহারই পুনরাবৃত্তি হয় না। প্রতি উন্মেষই পৃথক্ পৃথক্ নিত্য নূতন। অনন্ত বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রতি কণাতেও পুনর্বার অনন্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এইরূপে বিচার করিলে স্ফুরণের মধ্যে নিত্য নবীন ভাব পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যাহা চির পুরাতন তাহাই নিত্য নূতন, যাহা এক তাহাই অনন্ত, যাহা অখণ্ড তাহাই খণ্ডরূপে প্রকাশমান। এই জন্য মাও এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "অন্তে অনন্ত, অনন্তে অন্ত—সেই যে মহান ধারা যখন ধরা। মনোরাজ্যের ব্যাপারই কেবল নয়। নূতন ধারায় নিত্য নব নব রূপ যেখানে। অখণ্ড ধারায় যোগের মহাযোগ স্বাভাবিক।"

মা বিভিন্ন প্রসঙ্গে অতি স্পষ্ট ভাবেই বুঝাইয়াছেন যে সত্য নির্ণয়ের পথে ধারা, ধরা ও অধরা এই তিনটির স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ মনে রাখা আবশ্যক। এই যে সনাতন আর নবীনের সম্বন্ধের কথা বলিলাম ইহা ধারাতে নহে, অধরাতেও নহে, কিন্তু ধরাতে। অধরা পরম অগম্য নিগূঢ় রহস্য। তার সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না, কিন্তু ধারা আপন আপন বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রবাহিত। কিন্তু সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সমাধান ধরাতে পাওয়া যায়। সামান্যরূপে সবই সেখানে একের মধ্যে ধরা পড়ে, অথচ ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যটুকু নষ্ট হয় না। এইজন্য ধরাতেই এক

ও নানা অথবা সনাতন ও নবীন কিম্বা সামান্য ও বিশেষের পূর্ণ মীমাংসা সম্ভবপর। এই জন্যই সৎ বা অসৎ, অথবা কি হতে পারে, কি হতে পারে না এই সব মীমাংসা খণ্ডবুদ্ধিতে খণ্ড শাস্ত্রজ্ঞান হইতে সম্ভবপর নহে। মাও এই কথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "যেখানে এই কথা বলা চলে, সেখানে সবই সম্ভব, সেখানে কোন শাস্ত্রে বা গ্রন্থে পেলে না বলে প্রকাশ হতে পারে না বা হয় নাই বলা চলে না। কেন না প্রকাশ যা আছে তারই প্রকাশের জন্যত আকুলি-বিকুলি।"

৩ — গুরুর আবশ্যকতা

কেহ কেহ বলেন গুরুকরণ অনাবশ্যক, শুধু অনাবশ্যক নহে, সম্যক্ জ্ঞানের উদয়পথে প্রতিবন্ধক। গুরু-শিষ্য ভাব কল্পিত, সুতরাং কাহাকেও গুরু বলিয়া ধারণা করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্য লাভের প্রতিকূল। এই প্রসঙ্গে মা বলেন যে মূলে একই অখণ্ড সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং গুরুশিষ্যভাব সেই এক সত্যের উপরই আরোপিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কল্পিত ভাবের কোন সার্থকতা নাই—তাহাও বলা চলে না। বস্তুতঃ যিনি বলেন এই সম্বন্ধ কল্পিত এবং অনাবশ্যক তিনিও এক হিসাবে সত্যের উপদেশ দান করিতেছেন বলিয়া উপদেষ্টা হিসাবে গুরুপদবাচ্য। যাঁহার নিকট হইতেই বাক্য দ্বারা, ইঙ্গিত দ্বারা, ব্যবহার দ্বারা—অথবা তৎপ্রেরিত শক্তির সাহায্যে জ্ঞানের আবির্ভাব সম্বন্ধে সাহায্য পাওয়া যায় তাঁহাকেই এক হিসাবে গুরু বলা চলে। তাঁহাকে গুরু না বলিলেও বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার গুরুত্ব খণ্ডিত হয় না। কারণ উপদেষ্টা ও উপদেশভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। সংশয়নিবৃত্তির পর গুরুশিষ্য ভাব থাকে না, থাকিবার প্রয়োজনও থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ সংশয় বিদ্যমান ততক্ষণ তাহার সমাধানের জন্য গুরুও থাকে। কল্পনারাজ্যে শিষ্যও কল্পিত, গুরুও কল্পিত। তদ্রূপ সংশয় বা প্রশ্নও

কল্পিত ও সংশয়ের সমাধান রূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানও কল্পিত। পূর্ণ সত্য এক ও অদ্বৈত স্বতঃস্ফুরিত হয়। সেখানে গুরুশিষ্য নাই অথবা থাকিলেও সে নিজেই গুরু, নিজেই শিষ্য, দ্বিতীয় কেহ থাকে না। অবশ্য ইহা সত্য যে বাহিরে কাহারও নিকট হইতে উপদেশ না পাইয়াও ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অন্তর্দৃষ্টি ও আভ্যন্তরীণ উদ্যমের ফলে গ্রন্থিভেদ সম্ভবপর। আন্তর গ্রন্থিভেদ হইয়া গেলে সকল প্রকার সংশয়ভঞ্জন আপনিই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যাইবে যে সংশয়ের অবস্থিতি কালে গুরুসত্তা খণ্ডিত হইতেছে না। কারণ বাহ্য গুরুর ন্যায় আন্তর গুরুও আছে। অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামী প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শুধু যে সাক্ষী বা দ্রষ্টা রূপে জীবের কর্ম ও ভোগ দর্শন করেন তাহা নহে, তাহাকে নিয়ামক রূপে সত্যের পথে সঞ্চালনও করেন। ইহাও ত গুরুর কাজ। সুতরাং বাহ্যগুরু (মনুষ্যই হউক, সিদ্ধই হউক বা দিব্যই হউক) না থাকিলেও আন্তর গুরু থাকেই এবং সেই গুরুর কৃত্য অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ইহা কখন? যতক্ষণ সংশয় আছে ততক্ষণের জন্য। সংশয় নিবৃত্ত হইয়া গেলে আর আন্তর গুরুরও কোন কাজ থাকে না। কারণ তখন আত্মা নিজেতেই নিজে বিশ্রান্ত। তখন আত্মা স্বেচ্ছাবিহারী। তাঁহার সংশয় নাই, অজ্ঞানও নাই। তাঁহার স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকও কিছুই নাই। তখন সে তাহার নিত্যমুক্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া শিবরূপে বিরাজ করে। সুতরাং গুরুর প্রয়োজন নাই বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলেও প্রকারান্তরে গুরুর প্রয়োজনীয়তাই সিদ্ধ হয়।

কিন্তু এমন স্থিতিও আছে যেখানে প্রথম হইতেই ভিতরে সংশয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বাহ্য গুরু ত নাই-ই, আন্তর গুরুরও প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু ইহা ঠিক সেই স্থলে সম্ভবপর যেখানে সেই পূর্ণসত্তা, অনবচ্ছিন্ন স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা, জ্ঞান সহকারে নরদেহ ধারণ করিয়া প্রকট হন। কিন্তু ইহা সাধারণ জাগতিক জীবের কথা নহে।

একুশ

১ — নিজেই

মানুষ কালের জগতে সর্বদা এবং সর্বত্র একটি পরিবর্তন অনুভব করিয়া থাকে। কালের জগৎ বলিতে মায়ার জগৎ বুঝিতে হইবে। কিন্তু মায়ার অতীত ও কালের অতীত যে নিষ্ক্রিয় সত্তা রহিয়াছে সেখানে পরিবর্তন অথবা পরিণাম মোটেই নাই। একটি স্বভাবতঃ পরিণামহীন এবং অপরটি স্বভাবতঃই পরিণামী। দার্শনিক বিচারে এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ সত্তার সমন্বয় অত্যন্ত কঠিন প্রতীত হয়। কিন্তু এই সমন্বয়ের উপরেই পূর্ণ সত্যের স্বরূপজ্ঞান নির্ভর করিতেছে। বিচার ক্ষেত্রে কেহ নিষ্ক্রিয় অক্ষর সত্তার প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং অপর কেহ, বিশেষতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক, ক্রিয়াত্মক ক্ষর সত্তার প্রাধান্য স্বীকার করেন। কেহ কেহ অক্ষর সত্তাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং পরিণাম বা বিবর্তনকে মায়ার খেলা অথবা ভ্রম বলিয়া নিরূপণ করেন। অপর পক্ষে কেহ কেহ এই পরিণামের দিকটাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং অপরিণামী অথবা কুটস্থ সত্তার অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। বিজ্ঞানের ন্যায় প্রাচীন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী কতকটা এই প্রকার। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইটি দৃষ্টিই পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া পূর্ণ সত্য নির্ণয় বিষয়ে একান্ত অসমর্থ। আর একটি কথা। একটি সত্যই যদি একমাত্র সত্য হ'ত—তা যেটিই হউক না কেন,—তাহা হইলে অপর দিক্‌কার সত্যের আভাস পর্যন্ত জ্ঞানগোচর হইবার সম্ভাবনা কোথায় থাকিত? অবিদ্যার দোহাই দিয়া সমন্বয়ের চেষ্টা উভয় পক্ষেই হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত সমন্বয়ের পথ ইহাতে খোলে না। এইজন্য ক্ষর ও অক্ষরের সন্ধিস্থলে পূর্ণ সত্যকে স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। গীতাতে— ক্ষর পুরুষ ও

অক্ষর পুরুষের পরে পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম নামে তৃতীয় পুরুষ অঙ্গীকার করিবার ইহাই হেতু। ক্ষর এবং অক্ষর উভয়ের অতীত অথচ উভয়ের স্বভাবাত্মক একটি পরম বস্তুর সন্ধান না পাইলে আমাদিগের সত্যান্বেষণ সফলতা লাভ করিতে পারে না।

এই যে ক্ষরাক্ষরের অতীত অথচ ক্ষরাক্ষরময় পূর্ণবস্তু ইহাই আত্মা স্বয়ং। মা বহু প্রসঙ্গে এই স্বয়ং স্ব বা আত্মস্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গেও 'নিজে'-শব্দ দ্বারা সেই স্বয়ং প্রকাশ আত্মাকেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহাকে নামদ্বারা নির্দেশ করিতে হইলে যে কোন নামে নির্দেশ করা যাইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কারণ ইহা অন্য-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম, আত্মা, সর্বেশ্বর, ভগবান, যে কোন নাম ব্যবহার করা হউক না কেন, মূলে সব নামই এই স্বয়ংপ্রকাশ পরম বস্তুকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। এই বস্তুটির জন্ম নাই, তাই ইহার মৃত্যুও নাই। এই বস্তুটির অনবচ্ছিন্ন প্রকাশমানতা কখনই খণ্ডিত হয় না, তাই স্বরূপে বস্তুটির ভুল কখনই হয় না। সুতরাং যেখানে ভুলই হয় না সেখানে ভুল ভাঙ্গিবারই বা অবসর কোথায়? অথচ যাহাকে ভুল বলা হয়, তাহারও যে সত্তা না আছে তাহা নহে। এবং সে সত্তা স্বীকার্য বলিয়া ভুলভাঙ্গা সত্তাও অস্বীকার্য হইতে পারে না। অথচ এই ভুল হওয়া ও এই ভুল ভাঙ্গা, উভয়ই পরস্পর-বিরুদ্ধ হইলেও অখণ্ড প্রকাশে নিত্য প্রকাশমান। খণ্ডভাবে যে কোনও দৃষ্টিকোণ হইতে যে কোনও ভাবের দর্শন লাভ হউক, এবং এই সকল দর্শন পরস্পর যতই বিরুদ্ধ হউক, মূলে কিন্তু সবগুলি সেই মহাপ্রকাশ হইতে ভিন্ন কিছু নহে। ব্যবহারিক ভূমিতে ইহা বুঝান অত্যন্ত কঠিন, বুঝাও কঠিন। কারণ উভয়ই বুদ্ধির ব্যাপার। কিন্তু পরমার্থ সত্য বুদ্ধির অতীত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিস্থিত প্রতিবিম্ব ঐ পরমার্থ-প্রকাশ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে।

২ — ঝাঁকি দর্শন

এমন একটা স্থান আছে যেখানে প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, এমন কি বিরোধের প্রশ্নও সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ জাগতিক দিক্ হইতে বলিতে গেলে তাহাই প্রকৃত প্রকাশ। কারণ প্রকাশের প্রতিযোগিরূপে যদি অপ্রকাশ থাকে তাহা হইলে ঐ প্রকাশকে অখণ্ড প্রকাশ বলা চলে না। এই জন্য প্রকৃত প্রকাশ যখন ফুটিয়া উঠে তখন আর তাহার অপ্রকাশ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং সেই সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া ঐ প্রকাশ কিন্তু 'অখণ্ড প্রকাশরূপী' উহাকে প্রকাশ বলিয়া আর তখন চিনিতে পারা যায় না। যাহাকে 'ঝাঁকি দর্শন' বলা হয় অক্রমে মুহূর্ত মধ্যে প্রকাশরূপে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বিদ্যুতের চমকের ন্যায় পরক্ষণেই উহা মিলাইয়া যায়। যখন প্রকাশ খোলে তখন উহা পূর্ণ প্রকাশ বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ উহা পূর্ণ নহে। ঐ প্রকাশের সত্তাতে প্রকাশের সময়েও গুপ্তভাবে অপ্রকাশ নিহিত থাকে। যদি না থাকিত তাহা হইলে পরক্ষণে ঐ প্রকাশ অপ্রকাশ ভাবে পরিণত হয় কেন? উহা চিরস্থায়ী হয় না কেন? অপ্রকাশের বীজ প্রকাশের মধ্যে থাকে বলিয়াই প্রকাশের অন্তে অপ্রকাশের আবির্ভাব হয়। ইহাকেই মা স্ফুলিঙ্গ বলিয়া, সাময়িক ঝাঁকি দর্শন বলিয়া, বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ছাড়া যাহা প্রকৃত প্রকাশ তাহাই পূর্ণ। এই খণ্ড প্রকাশে অখণ্ড প্রকাশের মহিমা পাওয়া যায় না। তবে ইহারও একটি স্থান আছে। দাহিকা শক্তি পূর্ণ হইলে উহার প্রভাবে সকল অপ্রকাশই চিরদিনের জন্য দগ্ধ হইয়া যাইত। উহা বীজরূপে প্রকাশে নিহিত থাকিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করিত না। তাই মা বলিয়াছেন, "অনন্ত স্থান ত। দাহিকা শক্তিও পূর্ণ, কিন্তু ঝাঁকি রকমারীটার স্ফুলিঙ্গে সম্পূর্ণটা কোথায়? যেখানে সেখানেও তাই।"

৩ — প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

বিচারের একটি অবস্থাতে প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতকে পৃথক্ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হয়। এই দৃষ্টিতে প্রাকৃত আলাদা এবং অপ্রাকৃত আলাদা। কিন্তু প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে প্রবিষ্ট হইলে প্রাকৃত না থাকিয়াও থাকে, প্রাকৃতের অতিক্রম হয় মাত্র। কিন্তু প্রাকৃতের রূপান্তর বা লোপ হয় না। কিন্তু এমন স্থিতি আছে সেখানে প্রাকৃত ও তথাকথিত অপ্রাকৃত উভয়কে একই দৃষ্টিতে একই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-বিভাগ পূর্ণ সত্যের দৃষ্টি অনুসারে নহে।

৪ — কর্তব্য নির্ণয়

মানুষ নিজের যোগ্যতা অনুসারে কোন একটি স্থিতিকে নিজের রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার এই রূপটি পূর্ণরূপ নহে। কারণ পূর্ণরূপে রূপ-অরূপের পরস্পর বিরোধ মিটিয়া যায়। রূপ ও অরূপ যে একই বস্তু ইহা উপলব্ধিতে না আসিলে সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধিগোচর হইতে পারে না। প্রথমে খণ্ডরূপ হইতে সম্পূর্ণ রূপের উপলব্ধি আবশ্যক। এই উপলব্ধির মধ্যে রূপ-অরূপের চির সমন্বয় হইয়া যায়। ইহার পর শুধু সম্পূর্ণরূপের বোধে স্থিতি নিলে চলিবে না। কারণ এইটিও পরম স্থিতি নহে। বোধ ও অবোধের অতীত যে স্থিতি তাহাই প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং পূর্ণ বোধ পাইয়াই বোধে বিশ্রাম নিবার অবসর কোথায়? কারণ বোধ থাকিলেই তাহাকে ঘেরিয়া অবোধ থাকিবেই থাকিবে। কারণ বোধ ও অবোধ পরস্পর সাপেক্ষ সত্তা। অতএব বোধ-প্রাপ্তির পর এমন একটি স্থিতি পাওয়া আবশ্যক যেখানে বোধ-অবোধের দ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়। ইহাই প্রকৃত প্রকাশের মহিমা—শুধু বোধের প্রকাশই মুখ্য প্রকাশ নহে।

৫ — দর্শনে কৌশল

মা বলেন, একমাত্র নিজেই সদা সর্বত্র বিরাজমান। দ্বিতীয় কেহ নাই, ছিল না, থাকিবেও না, এবং এই একমাত্র বস্তু তুমি, অথবা ইহাই আমি। কারণ এখানে তুমি ও আমি একই বস্তু। এই জন্য প্রকৃত দৃষ্টি তাহাই যাহা সর্বদা এই এককে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। এমন কি যখন গণ্ডীর বা সীমার দর্শন হয় তখন এই গণ্ডীবদ্ধ দর্শনও অসীমের দর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, কারণ যাহা কিছু যেখানে প্রকাশমান সবইত সেই অনন্তেরই প্রকাশ। সুতরাং সীমারূপে খণ্ডরূপে যে প্রকাশ তাহাও সেই অখণ্ড প্রকাশেরই অঙ্গীভূত। এই দৃষ্টিই সমীচীন দৃষ্টি,—বাস্তবিক খণ্ড কিছুই নাই।

বাইশ

১ — সর্বাবস্থায় প্রকাশ

প্রকাশ বলিতে এখানে পূর্ণসত্তার প্রকাশ বুঝিতে হইবে। পূর্ণসত্তা স্বতন্ত্র, স্বয়ংপ্রকাশ ও নিরপেক্ষ। ইহা নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে কোন সাধন অথবা কোন উপায়ের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং কেহ যদি মনে করেন যে যিনি সাধনা দ্বারা উচ্চস্তরে পৌঁছিতে পারেন নাই তাঁহার নিকট পূর্ণের আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর নহে তবে তাহা ভুল হইবে। সাধনার প্রয়োজন আছে, কারণ কর্তৃত্বাভিমান ভাঙ্গিবার জন্য ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কর্ম করিয়া সাক্ষাৎভাবে কিছু না পাইলেও নিজের অভিমান চূর্ণ হইয়া যায়, ইহাই কর্মের মুখ্য ফল। পরম বস্তু যে নিজের সাধনা বা চেষ্টার অধীন নহে, ইহা উপলব্ধি করাই কর্মের ফল। এই জন্য প্রকৃত সত্য উপদেশ এই যে প্রত্যেক মনুষ্যই সব সময় সেই মহাপ্রকাশের জন্য প্রতীক্ষায়

থাকিবে। নিজের অযোগ্যতা অথবা দুর্বলতা মনে করিয়া নিজেকে প্রকাশের পাত্র বিবেচনা না করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। খণ্ড প্রকাশের দিক্ দিয়া ক্রম এবং যোগ্যতার একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু অখণ্ড প্রকাশ বাহিরের কিছুর উপরই নির্ভর করে না। যখন সে নিজেকে প্রকাশ করিতে উদ্যত হয় তখন কোন বাধাই তাহাকে রোধ করিতে পারে না। যোগ্যতা না থাকিলেও যোগ্যতার আধান মহাকরুণার ফলে হইতে কতক্ষণ লাগে। এইজন্য সাধারণ নিয়ম এই, প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে সেই মহান্ সত্যের অভিনন্দনের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা আবশ্যক।

বিদ্বান্, অবিদ্বান্, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, কর্মী, অকর্মী কোন প্রকারের ভেদ মানিবার প্রয়োজন এখানে নাই। এই জন্য মা বলিয়াছেন, "ভাব রাখা, যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সেখান হইতেই প্রকাশ হইবে। কখনও মনে করিবে না, আরে, আমি এই সব দুষ্কর্মে লিপ্ত রহিয়াছি— আমার কিছুই হইবে না। সব সময় ভগবৎ রাস্তায় চলিবার জন্য তৈরী হইয়া থাকিবে।" তাৎপর্য এই যে মহাপ্রকাশ কখন নিজেকে প্রকাশ করিবে তাহা কেহই জানে না। যে কোন ক্ষণে উহা সম্ভব। সুতরাং প্রত্যেকের পক্ষে উহাকে আবাহন করিবার জন্য তৈয়ার হইয়া থাকা আবশ্যক। ইহার ফলে যখন এই মহাপ্রকাশ বন্যার ন্যায় আসিয়া পড়িবে তখন কেহ নিজে সুপ্ত হইয়া যেন না পড়ে। শিবরাত্রির রাত্রিতে যেমন জাগিয়া থাকিতে হয়, তেমনি সকলকেই এই মহাপ্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিতে হইবে। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির রাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই।

২ — দীক্ষা

দীক্ষার সম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দেশ এই যে আধ্যাত্মিক জীবনের পথে উন্নতি লাভ করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ সাধারণতঃ একান্তই আবশ্যক। জীব বাস্তবিক পক্ষে শিব হইতে অভিন্ন। কারণ ভগবান স্বয়ংই লীলাচ্ছলে জীব সাজিয়া মায়িক জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। আর যে মতে জীব নিত্য ও ভগবৎস্বরূপের অংশ স্বরূপ সে মতেও অনাদিকাল হইতেই এই মায়িক জগতে জীব সংসার-ভ্রমণে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই জন্যই আচার্যগণ জীবকে অনাদি বহির্মুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় মতেই জীবের নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান গুরু হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা গুরু শিষ্যকে এই অপরোক্ষ জ্ঞান দান করেন তাহারই নাম দীক্ষা। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে, "দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্মবাসনা। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা জ্ঞানিভিঃ তন্ত্রবেদিভিঃ।" অর্থাৎ বিমল জ্ঞান প্রাপ্তি ও কর্মবাসনার ক্ষয়, এই দুইটি সম্পন্ন না হইলে দীক্ষার প্রকৃত সার্থকতা সিদ্ধ হয় না। কোন কোন তন্ত্রে স্পষ্টই বর্ণনা আছে যে পাপক্ষয় ও শিবত্ব-যোজন এই দুইটি ব্যাপারই দীক্ষার লক্ষণ। অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় এবং শিবত্ব লাভ হয় তাহাই প্রকৃত দিব্যজ্ঞান। কৈবল্য-মুক্তি দীক্ষার ফল নহে। কারণ দীক্ষা ব্যতিরেকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেক-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই আত্মা কৈবল্য-মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ স্থাপন হয় না। সুতরাং শিবস্বরূপ জীবাত্মার পক্ষে এই প্রকার কৈবল্য পরম পুরুষার্থ হইতে পাবে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, জীব দীক্ষা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পৌরুষ অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং ইহাও সত্য যে পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত না হইলে শিবরূপী জীবের শিবত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও যতক্ষণ জীব বৌদ্ধ অজ্ঞান হইতে নিবৃত্ত না হয় ততক্ষণ দীক্ষা হইতে প্রাপ্ত নিজের শিবত্বের উপলব্ধি করিতে পারে না। এইজন্য সাধনার

দ্বারা বৌদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত করিতে হয়। যখন গুরুকৃপাপ্রাপ্ত নিজের শিবস্বরূপ নিজের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে জীব তখন নিজেকে শিবরূপে অনুভব করে এবং জীবন্মুক্তির রস আস্বাদন করে। প্রারব্ধ ভোগান্তে দেহত্যাগের সময় পৌরুষ জ্ঞানের উদয় হয়। তখন বাস্তবিক শিবস্বরূপে স্থিতি হয়। এই দীক্ষা ব্যাপার আত্মার নিজের দিব্যজ্ঞান উন্মেষের দ্বার স্বরূপ। যট্‌চক্র ভেদের যে ফল সদ্‌গুরু হইতে প্রাপ্ত দীক্ষারও সেই একই ফল, অর্থাৎ জ্ঞান নেত্রের উন্মীলন। যটচক্র ভেদ প্রক্রিয়ায় নিজেকে পরিশ্রম করিয়া কুণ্ডলিনী জাগাইয়া চক্রের পর চক্র ভেদ করিতে হয়। কিন্তু সদ্‌গুরুর প্রদত্ত দীক্ষা ব্যাপারে গুরু কৃপাতেই জীবের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়। তবে চিত্ত নির্মল না হওয়া পর্যন্ত উহা এই নিরাবরণ সত্তার অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য যোগাদি সাধনা আবশ্যক হয়।

৩ — গুরু ও সদ্‌গুরু

গুরু ও সদ্‌গুরু একই বস্তু। কারণ অসদ্‌গুরু বলিয়া কোন বস্তু নাই। তবে বুঝাইবার সুবিধার জন্য গুরু হইতে সদ্‌গুরু শব্দের বৈলক্ষণ্য দেখান হয়। যাঁহার কৃপায় পূর্ণ সত্যের রূপ প্রত্যক্ষ হয়—যে প্রত্যক্ষের পর আর কোন আবরণ থাকে না—তিনিই সদ্‌গুরু। যিনি আবরণের আংশিক নিবৃত্তিতে সহায়ক হন তাঁহাকে গুরু বলা হয়। যিনি আবরণ অংশতঃও নিবৃত্ত করিতে সাহায্য করিতে পারেন না তাঁহাকে গুরু বলা যায় না। তান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে দীক্ষা ব্যাপারের যিনি অনুষ্ঠাতা তিনিই গুরু। প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু একমাত্র ভগবান, দ্বিতীয় কেহই নহে। কিন্তু জীব সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে ধরিতে পারে না। এইজন্য তিনি যোগ্য আচার্যের আধারে শিষ্য উদ্ধারের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। আচার্যকেও এইজন্য গুরু বলা হয়। দুর্গা প্রতিমাতে যেমন মহাশক্তি জগদম্বার অধিষ্ঠান হয় বলিয়া ঐ প্রতিমাকেও দুর্গা বলা হয় তদ্রূপ যে দেহকে আশ্রয় করিয়া নিত্য

গুরুশক্তি কার্য করিয়া থাকে সেই দেহকেও গুরু বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাই আচার্য দেহ। আচার্যের সহিত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাগত যোগ স্থাপিত না হইলে আচার্য ভগবানের প্রতিনিধিরূপে গুরুকার্য করিতে সমর্থ হন না। আচার্য জীবোদ্ধার ব্যাপারে নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃত গুরুরূপী ভগবানই যথার্থ কর্তা। প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ নিমিত্ত আশ্রয় না করিয়া সাক্ষাৎভাবে কি ভগবান অনুগ্রহ করিতে পারেন না? এর উত্তর এই, নিশ্চয়ই পারেন। তবে সাধারণতঃ তাহা করেন না। তাঁহার অনুগ্রহ বিতরণ দুই প্রকার জানিতে হইবে—একটিকে সাধিষ্ঠান অনুগ্রহ বলে, অপরটিকে নিরধিষ্ঠান অনুগ্রহ বলে। ভগবান স্বরূপতঃ প্রকৃতি, মায়া বা মহামায়ার অতীত। সুতরাং তাঁহার স্বরূপ হইতে অনুগ্রহ প্রাপ্তি সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যে সকল জীব প্রাকৃত বা মায়িক দেহে আবদ্ধ তাহারা ভগবৎ স্বরূপ হইতে নির্গত অনুগ্রহশক্তি ধারণ করিতে পারে না। যে সকল জীব বিবেক-জ্ঞানের প্রভাবে প্রকৃতি ও মায়া হইতে পৃথক হইতে পারিয়াছেন অথচ যাঁহাদের জীবত্ব বা পশুত্ব দিব্যজ্ঞান না পাওয়ার দরুণ এখনও নিবৃত্ত হয় নাই সেই সকল বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত আত্মার মধ্যে যাহাদের মল পরিপক্ক হইয়াছে তাহাদিগকে মলপাকের তারতম্য অনুসারে নবীন সৃষ্টির প্রাক্ক্ষণে ভগবান স্বয়ং অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দীক্ষা দান করিয়া থাকেন। ইহা নিরধিষ্ঠান দীক্ষা দানের দৃষ্টান্ত। এই স্থানে আচার্যের প্রয়োজন হয় না। কারণ ইহা সৃষ্টির পূর্বের অবস্থার কথা। সৃষ্টির অন্তর্গত জীবই সাধারণতঃ আচার্য হইতেই দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবশ্য স্বাতন্ত্র্যময় পরমেশ্বরের পক্ষে সব সময় সবই সম্ভবপর হয়। আমরা সাধারণতঃ যে আচার্যগুরুর কথা বলিয়া থাকি তাহার দেহ মনুষ্যস্তরের অন্তর্গত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সিদ্ধ ও দিব্য স্তরেও গুরুদেহ থাকিতে পারে এবং বর্তমান যুগেও অনেকে ঐ প্রকার গুরু হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

গুরু খণ্ড হইলে ও পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার না করিয়া থাকিলে

তাঁহাকে সদ্‌গুরু বলা যায় না। কিন্তু খণ্ডগুরুর প্রদত্ত জ্ঞানের মধ্যে পূর্ণতার অভাব বশতঃ একটা ক্রমিক ভাব বা তারতম্য বিদ্যমান থাকে। তদনুসারে ইহা বলা হইয়া থাকে যে গুরু স্বয়ং যে স্তরে থাকেন শিষ্যকেও দীক্ষা দ্বারা সেই পর্যন্ত উঠাইয়া নিতে পারেন। গুরুর জ্ঞান যদি খণ্ড না হয় তাহা হইলে এই শঙ্কা উত্থিত হইতে পারে না।

৪ — দীক্ষার প্রণালী

শাস্ত্র অনুসারে দীক্ষা ও শক্তিপাতের মধ্যে সাধারণতঃ কিছু কিছু ভেদ প্রদর্শন করা হয়। কারণ শক্তিপাত হয় সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে— কারণ, তিনি ভিন্ন অনুগ্রহ করিবার যোগ্যতা আর কাহারও নাই। সাপেক্ষ অনুগ্রহ নিম্নস্তর হইতেও হইতে পারে। কিন্তু পরম অনুগ্রহ করিবার যোগ্যতা একমাত্র ভগবানেরই আছে। পরম অনুগ্রহের ফলে শিবত্ব লাভ হয়। খণ্ড অনুগ্রহের ফলে নানা প্রকার উচ্চ অবস্থা লাভ হইতে পারে। যে জীবে শক্তিপাত হইয়াছে একমাত্র সেই জীবই দীক্ষা লাভের উপযুক্ত। আচার্যগুরু জ্ঞানী হইলে দৃষ্টিমাত্র বুঝিতে পারেন কাহারও শক্তিপাত হইয়াছে কিনা। যাহাতে শক্তিপাত হয় নাই এইরূপ জীবকে জ্ঞানীগুরু কখনই দীক্ষা দিতে অগ্রসর হন না। দীক্ষা ক্রিয়া-শক্তির কার্য। মূলে ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিন্নতাময় চিৎশক্তির ব্যাপার। সৃষ্টির পূর্বে বিদেহ আত্মাকে যে ভগবান স্বয়ং দীক্ষা দেন সেখানে জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির পার্থক্য থাকে না, যদিও আধার ভেদ অনুসারে সঞ্চারিত শক্তির মাত্রার তারতম্য থাকে। সৃষ্টির অভ্যন্তরে দেহবিশিষ্ট জীবকে অনুগ্রহ করিতে হইলে ক্রিয়া-শক্তির ব্যাপারটি আচার্যকে অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া শক্তিপাতের মূল ব্যাপারটি শুধু ভগবৎ সাপেক্ষ থাকে। শক্তিপাতের তাৎপর্য এই যে জীব-বিশেষকে উঠাইয়া নিবার জন্য ভগবান ইচ্ছা করিয়াছেন, অর্থাৎ জীব-বিশেষের উপর ভগবানের করুণাদৃষ্টি রহিয়াছে। ভগবানের এই

করুণাদৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য দীক্ষা দানে অগ্রসর হন। দীক্ষার ফলে জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয় শক্তিরই সঞ্চার হয়। ক্রিয়া শক্তির মাত্রা থাকে আংশিক। আধারের আপেক্ষিক বলাবলের উপর নির্ভর করিয়া সঞ্চারিত ক্রিয়া-শক্তির তারতম্য নিরূপণ করিতে হয়। অর্থাৎ দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পূর্ণরূপে জ্ঞানের অধিগমন হইলেও ক্রিয়াশক্তি ন্যূন থাকিলে ঐ জ্ঞানের সহিত সংসৃষ্ট ঐশ্বর্যের তারতম্য ঘটে। যখন জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ই পূর্ণ হয় একমাত্র তখনই শিবত্বের অবস্থা অভিব্যক্ত হয়, তৎপূর্বে নহে।

দীক্ষা-ব্যাপার মূলে একই, কিন্তু প্রণালী বা প্রক্রিয়া ভেদে বিভিন্ন প্রকার। মা বর্তমান প্রসঙ্গে মন্ত্রদীক্ষা, স্পর্শদীক্ষা, দৃষ্টিদীক্ষা, উপদেশ দীক্ষার কথা বলিয়াছেন। এইগুলি দীক্ষার প্রণালীগত ভেদ। শাস্ত্রে আছে, দীক্ষা দুই প্রকার। বাহ্যদীক্ষা ও আন্তরদীক্ষা। বাহ্যদীক্ষার নাম ক্রিয়াদীক্ষা এবং আন্তরদীক্ষার নাম বেধদীক্ষা। দীক্ষা প্রসঙ্গে পঞ্চভূতের আবশ্যকতা হয়। পূর্বে যে বাহ্যদীক্ষার কথা বলা হইল তাহা পৃথ্বী ও জলের উপকরণ স্থলে বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভিতরের দীক্ষায় এই উপকরণ আবশ্যক হয় না। ইহার পরিবর্তে তেজ, বায়ু, আকাশ ও মনের আবশ্যকতা হয়। তেজ সঞ্চার দ্বারা যে দীক্ষা সম্পন্ন হয় তাহার নাম চাক্ষুসী দীক্ষা। ইহারই নামান্তর দৃষ্টিদীক্ষা। কারণ গুরুর করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হইতে নির্গত তেজো-বিশেষের দ্বারা এই দীক্ষা সম্পন্ন হয়। তদ্রূপ বায়ুদ্বারা যে দীক্ষাকার্য নিষ্পন্ন হয় তাহার নাম স্পর্শদীক্ষা। স্পর্শ বায়ুরই ধর্ম। আকাশের ধর্ম শব্দ। সুতরাং আকাশ দ্বারা যে শব্দ নিষ্পন্ন হয় তাহা হইতে হয় শাব্দিক দীক্ষা। মন্ত্রদীক্ষা ইহারই অন্তর্গত। মনের দ্বারা দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হইলে তাহাকে ধ্যানদীক্ষা বলে। চাক্ষুষী দীক্ষা হইতে স্পর্শদীক্ষা সূক্ষ্ম। স্পর্শদীক্ষা হইতে শব্দদীক্ষা সূক্ষ্ম। শব্দ দীক্ষা হইতে মানসিক দীক্ষা সূক্ষ্ম। এই সকল তেজ বা শক্তি জড়-শক্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। চিৎ শক্তিই মুখ্যশক্তি। দীক্ষা বাস্তবিক পক্ষে তাহারই ক্রিয়া।

ক্রিয়া দীক্ষাতে হোম প্রভৃতি বাহ্যক্রিয়ায় প্রয়োজন হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দীক্ষাতে তাহার প্রয়োজন হয় না। চাক্ষুষী দীক্ষা গুরু কর্তৃক শিষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলে ফুটিয়া থাকে। মৎস্য যেমন শুধু ডিমের প্রতি দৃষ্টিদ্বারা ডিম ফুটাইয়া তোলে এবং তাহার পরেও ফুটন্ত সন্তানকে দৃষ্টিদ্বারাই পোষণ করিয়া থাকে, গুরুও ঠিক তেমনই করিয়া থাকেন। কুলার্ণবে আছে, "স্বাপত্যানি যথা মৎস্যো বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ। দৃগ্‌ভ্যোং দীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ পরমেশ্বরি।" স্পর্শ দীক্ষার স্থলে গুরু নিজের হস্তাদি দ্বারা শিষ্যের দেহের অঙ্গ বিশেষকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন। এই দীক্ষার দৃষ্টান্তস্থল পক্ষী। পক্ষী নিজের পাখার স্পর্শ দ্বারা তা দিয়া ডিম্বকোষ হইতে শাবককে বাহির করে এবং ঐরূপ স্পর্শদ্বারাই উহাকে পোষণ করে। যাহাকে মানসী দীক্ষা বলা হইয়াছে তাহাই বেধ-দীক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থলে গুরু শুধু ধ্যান অবলম্বন করিয়া দীক্ষা দান করেন। কূর্ম বা কচ্ছপ যেমন নিজে জলে থাকিয়াও তীরস্থিত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত নিজের অণ্ডসকলকে কেবল মানসিক চিন্তন দ্বারা ফুটাইয়া তোলে ইহাও কতকটা সেইরূপ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে, "দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে। জনয়েৎ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ।।" অর্থাৎ যিনি দৃষ্টিদ্বারা, স্পর্শদ্বারা অথবা শব্দদ্বারা কৃপাপূর্বক শিষ্যের দেহে শিবাবেশ উৎপাদন করিতে সমর্থ তিনিই প্রকৃত গুরু। এইস্থলে মূল হইতেছে কৃপা। তাহার পর দর্শন, স্পর্শ ও শব্দ এই তিনটি কৃপার প্রয়োগ ভেদ মাত্র। শিব পুরাণে আছে "গুরোঃ আলোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি। সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেৎ জন্তোঃ পাশোপক্ষয়কারিণী"।। এই স্থলেও পূর্ববৎ তিনটি প্রকারই বর্ণিত হইয়াছে। মা-ও বতর্মান প্রসঙ্গে এই সকল বিভাগের কথাই বলিয়াছেন।

৫ — দীক্ষা দানের সময়

অনেকে মনে করেন যিনি আধ্যাত্মিক মার্গে সাধনা করিতেছেন তিনি অন্যকে দীক্ষা দিয়া সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু ইহা পূর্ণ সত্য নহে। দীক্ষা পাইলেই দীক্ষা দেওয়া যায় না। স্বয়ং দীক্ষা না পাইলে ত কথাই নাই, দীক্ষা পাওয়ার পর সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ্যস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত অপরকে দীক্ষাদানের যোগ্যতা জন্মে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে সিদ্ধিলাভ করিলেও দীক্ষা দিবার অধিকার নিয়তভাবে জন্মে ইহা বলা চলে না। শক্তি সঞ্চার করিবার একটি বিশিষ্ট অধিকার আছে। শক্তিলাভ না করিলে ত তাহা হয়ই না, কিন্তু লাভ করিলেও যতক্ষণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত না করা যায় ততক্ষণ উহাকে সঞ্চার করা যায় না। যিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার জন্য মার্গ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ভগবৎ প্রাপ্তির পূর্বে শক্তির অপচয় করা সর্বথা অনুচিত। কারণ তাহাতে অন্যের ভগবৎ প্রাপ্তিরূপী উপকার সাধন ত হয়ই না। নিজেরও ভগবৎ প্রাপ্তি বা সিদ্ধিলাভে বাধা জন্মে। ভগবৎ প্রাপ্তির পূর্বে দীক্ষা দিলে নিজের উন্নতি পথে সমূহ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়া গেলে তাঁহার নির্দেশ ক্রমে অথবা তাঁহা দ্বারা সমাবিষ্ট হইয়া দীক্ষা দেওয়া পৃথক্ কথা। তাহাতে নিজের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ অন্যের কল্যাণ হয়।

৬ — গুরু ও জগদ্‌গুরু

যিনি গুরুপদে আসীন তিনি যদি জগদ্‌গুরুর সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব করেন, তাহা হইলে ঐ গুরুদেহের মধ্য দিয়াই জগদ্‌গুরুর ক্রিয়া করেন। কিন্তু জগদ্‌গুরুর সহিত তাদাত্ম্যবোধ না থাকিলে প্রকৃত গুরুই হওয়া যায় না। তথাপি যদি কেহ গুরুর কার্য করিতে থাকেন এবং তাঁহার উপর যদি শিষ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাহা হইলে শিষ্যের উন্নতির পথ

একপ্রকার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ গুরু অগ্রসর না হইলে তাহার আশ্রিত শিষ্যের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। কোন বিশেষ কারণে গুরু যদি কিছুদিন পর্যন্ত গতিহীন স্তব্ধ অবস্থায় থাকেন তাহা হইলে শিষ্যকেও ঐরূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে। শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু শিষ্য যদি গুরুকে জগদ্‌গুরুরূপে বিশ্বাস করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে উন্নতির পথ রুদ্ধ হয় না। অনেক স্থলে গুরু সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্বে শিষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে সর্বত্র গুরুকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। গুরু নিজ সাধনবলে ভগবত্তা লাভ না করিলেও শিষ্যের বিশ্বাসের প্রভাবে শিষ্য মুক্ত হইয়া যায়।

তেইশ

১ — পথ ও লক্ষ্যের ভেদ

সাধারণতঃ সর্বত্র ইহা প্রসিদ্ধ আছে বিভিন্ন মত বা পথ পরস্পর ভিন্ন হইলেও সত্য হইতে পারে। কোন একটি সত্য হইলেও অপরটি যে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া অসত্য হইবে এমন কোন কথা নাই। ইহা বুঝিতে হইলে দুইটি দিক্ হইতেই বিচার করিতে হইবে—একটি দিক্ লক্ষ্যের ভেদ ও অপর দিক্ লক্ষ্যের ঐক্য। যেখানে লক্ষ্য ভিন্ন সেখানে পথ যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে বিরোধের ত কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ যাহার যে লক্ষ্য সে ঐ লক্ষ্য প্রাপ্তির উপায় বা পথই গ্রহণ করিয়া থাকে। লক্ষ্যের ভেদ বশতঃ পথের ভেদ স্বাভাবিক। এই সরল সত্য বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। কিন্তু ইহাও সত্য যে লক্ষ্য এক হইলেও পথ ভিন্ন হইতে

পারে। এক বিশ্বনাথ মন্দিরে যাইতে হইলে নানা পথ দিয়াই যাওয়া যায়, ইহা মিথ্যা কথা নহে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বিচারণীয় যে যাত্রী কোথায় আছে এবং কি প্রকারের রুচি সম্পন্ন। সাধকের ব্যক্তিগত রুচি, সংস্কার, বল প্রভৃতি অনুসারে মার্গ নিরূপিত হয়। মহিম্নঃ স্তোত্রে আছে যে পূর্ণ সত্যে পৌঁছিবার নানা প্রস্থান আছে। পথিকের প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারে অধিকার ভেদ বশতঃ তন্মধ্যে কোনটি কাহারও হিতকর ও উপকারী। কেহ সরল পথে যায়, কেহ বক্রপথে ঘুরিয়া যায়। ইহারও মূলে রুচিগত বৈচিত্র্য। কিন্তু তা'তে একলক্ষ্যে পৌঁছিবার বাধা হয় না। তবে কালবিলম্ব হয়—ইহা সত্য। সমস্ত নদীই যেমন ঘুরিয়া সমুদ্রে গিয়া পৌঁছায় তেমন সমস্ত পথই সরল না হইলেও ফিরিয়া গম্য স্থান পর্যন্ত উপনীত হয়—'নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।' এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে লক্ষ্য পৃথক্ থাকিলেও পরম লক্ষ্য এক হয় কি প্রকারে। ইহার উত্তর এই যে আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্যের ভেদ থাকিলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোন ভেদ নাই। সালোক্য, সামীপ্য, লীলাপ্রবেশ, নির্বাণ, কৈবল্য যাহাই কিছু বলা যাউক না কেন, সবই পরম লক্ষ্যের অন্তর্গত। অন্তে পরম লক্ষ্য প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এক হিসাবে পথেই থাকা হইল বলিতে হইবে। তাই মা বলিয়াছেন,—"যেখানে মত আর বলাবলি নাই, সেখানে মূলে সে-ই। সে-ই এই নানা আকারে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "শেষ থাকলে কাল আছে, আর কাল থাকলে অকাল আছে। এই শেষ আর কালের যেখানে প্রশ্ন থাকে না, সেখানে মিলবে।"

২ — সাংসারিক সুখ ও ঐশ্বরিক সুখ

সাংসারিক সুখ প্রকৃত সুখ নহে। কারণ এই সুখের মধ্যেও দুঃখ আছে, সঙ্গে সঙ্গেও আছে এবং পূর্বে পশ্চাতেও আছে। ঐশ্বরিক সুখই প্রকৃত সুখ। উহাই পরম সুখদ ব্রহ্মানন্দ; উহা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। উহাতে

অভাবের লেশমাত্রও থাকে না। যদিও সাংসারিক সুখও স্বরূপতঃ ব্রহ্মানন্দ হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নহে তথাপি উহা ভগবৎ সুখের কণার কণা মাত্র। ঐশ্বরিক সুখের স্বরূপ এই যে এই সুখ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পাওয়া হইয়া যায়। নিজেকে প্রাপ্ত হইলে আর কিছু পাইবার অবশিষ্ট থাকে না। তাই আর অভাব জাগে নক্ত, দুঃখ ফোটে না। বস্তুতঃ ইহাই পূর্ণত্বলাভ। তাই মা উপদেশ ছলে বলিয়াছেন, "এতটুকু নিয়ে সুখী থেকো না। পূর্ণ হও, পূর্ণাঙ্গীণ হয়ে আমাকে পাও।" ইহা দ্বারা তিনি ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে পূর্ণ না হইলে মাকে পাওয়া যায় না অর্থাৎ নিজেকে পাওয়া যায় না, কারণ মা ও নিজস্বরূপ অভিন্ন।

চব্বিশ

১ — ব্রহ্মজ্ঞানী

মা বলিয়াছেন, 'হয় আর হয় না বলিলে যদি বিরোধ থাকে তবে টুকরা জ্ঞানের ব্রহ্মজ্ঞানী।' অর্থাৎ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানে যখন স্থিতি হয় তখন খণ্ডভাব থাকে না এবং তাহার ফলে কোন প্রকার বিরোধই ভাসে না। জাগতিক দৃষ্টিতে যেখানে স্পষ্টভাবে বিরোধ উপলব্ধ হয় ব্রহ্ম দৃষ্টিতে সেখানে উহার আভাস মাত্রও দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, এই অদ্বিতীয় অখণ্ড এক সত্তার যদি ভান হয় তবে আর দ্বিতীয়ের ভান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আর দ্বিতীয়ের ভান না হইলে বিরোধ কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? ভগবান শঙ্করাচার্যের পরমগুরু আচার্য গৌড়পাদ এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থাতে কোন প্রকার বিরোধ থাকিতে পারে না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো

নিশ্চিতা দৃঢ়ম্। পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে।। অর্থাৎ যাহারা দ্বৈতবাদী তাহাদের নিজ নিজ সিদ্ধান্তের ব্যবস্থাতে দৃঢ় আগ্রহ থাকে। এই জন্যই একজন দ্বৈতবাদীর সঙ্গে অপর একজন দ্বৈতবাদীর স্বভাবতঃই বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু যে অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মবিৎ তাহার বিরোধ কাহারই সঙ্গে ঘটিতে পারে না। কারণ সে সকলকে নিজের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলিয়া বোধ করে। ভেদ দর্শনের অভাব বশতঃ বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয় না। ভগবান শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন "সর্বানন্যত্বাৎ আত্মৈকত্ব দর্শন বক্ষসু ন বিরুধ্যতে" অর্থাৎ সকলের সহিত অনন্য অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া আত্মার একত্ব দর্শন কাহারও বিরোধী হয় না। একই বস্তু অনন্ত বিভিন্ন রূপে প্রস্ফুটিত হইতেছে। কিন্তু এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও বস্তুর স্বপ্রকাশ একত্ব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না। বস্তুতঃ বৈচিত্র্য বা নানাত্বও কল্পিত বা আরোপিত দৃষ্টি লইয়া বলা হইল। ঐ পরম স্থিতিতে একই পরম সত্যের ভান হইয়া থাকে। লোক দৃষ্টিতে অর্থাৎ ব্যবহার ক্ষেত্রে নানাত্বের ভান হয় কিন্তু সেখানে অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিতে নানাত্বের তিরোধানও হয় না, স্ফুরণও হয় না। সবই মহান্ অখণ্ড এক সত্তায় প্রকাশরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে। মা যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য এই যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টির স্বপ্রকাশ একত্বকে কোন প্রকার বিরোধই বাধা দিতে পারে না। এই অবস্থায় বাহির ভিতর এক হইয়া যায়-অধঃ ঊর্ধ্ব এক হইয়া যায়, অতীত ও অনাগত এক হইয়া যায়, পরম অণু ও পরম মহান এক হইয়া যায়। সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ, সক্রিয় নিষ্ক্রিয় যাবতীয় দ্বন্দ্ব একই মহান প্রকাশের অন্তর্গত হইয়া দেখা দেয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা অখণ্ড। দেশগত, কালগত, আকারগত কোন পরিচ্ছেদ ইহাতে থাকে না। দ্বিতীয় হইয়া অথবা দ্বিতীয় থাকিয়া, এই মহাজ্ঞান লাভ করা যায় না। নিজে ব্রহ্ম না হইতে পারিলে অর্থাৎ নিজের নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ না হইলে এই প্রকার অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের ধারণা সম্ভবপর হয় না।

যাহাকে জাগতিক দৃষ্টিতে দ্বৈত অথবা নানাত্ব বলা হয়, যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা এই মহাজ্ঞানে বা এই পরম স্থিতিতে একই অখণ্ড মহাসত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই অবস্থার উদয় হইলে অর্থাৎ এই অবস্থায় স্থিতি হইলে চ্যুতি অথবা পুনরাবর্তনের আশঙ্কা চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা প্রসঙ্গতঃ চারিটি ভূমির বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ভূমিটি অজ্ঞানী ও সংসারী জীবের ভূমি। দ্বিতীয় ভূমিতে একত্বের ভান হয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় না। তিনি উহাকে নির্বিকল্প সমাধিসিদ্ধ যোগীর ভূমি বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই একত্বের ভানও বিশুদ্ধ নহে। কারণ বিশুদ্ধ হইলে ইহা খণ্ডিত হইত না। ক্ষণকালের জন্যও স্থিতি ভঙ্গ হইলে ঐ স্থিতি যে পূর্ণ স্থিতি নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কারণ পূর্ণস্থিতির বা পরম ভূমির লক্ষণ এই— "যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে—" অর্থাৎ উহা প্রাপ্ত হইলে উহা হইতে আর ফিরিতে হয় না। কারণ আচার্যগণ উহাকে "সকৃদ্ বিভাত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একবারই উহার প্রকাশ হয় এবং সেই প্রকাশই চিরস্থায়ী হয়, উহার বার বার প্রকাশ হয় না। প্রকাশের পর অপ্রকাশ আসিলে বার বার প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে, যাহাকে প্রাচীন বৈষ্ণব দার্শনিকগণ 'শান্তোদিত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহার উদয়-অস্ত আছে বা আবির্ভাব-তিরোভাব আছে। কিন্তু যেটি প্রকৃতই পরমস্বরূপ তাহা শান্তোদিত নহে, তাহা 'নিত্যোদিত'। সেই অবস্থার উদয়ের পর আর উহার অস্ত হয় না। প্রশ্নকর্তার দ্বিতীয় ভূমি যে পরমভূমি নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যাহাকে তৃতীয় ভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই অবস্থায় একের কোলে বহু ভাসে অর্থাৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ ভাসমান হয়। অবশ্য প্রশ্নকর্তা এখানে জগৎকে মিথ্যারূপেই ভাসমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সত্যকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা ভাসমান হইতেছে, ইহাই এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য। ইহা ঠিক ভেদাভেদ অবস্থা কি না তাহা বলা যায় না। কারণ

ভেদাভেদ অবস্থায় ভেদ ও অভেদ দুইই সত্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ দৃষ্টি হয় না, উহা সমন্বয়ের দৃষ্টি। কিন্তু এই তৃতীয় ভূমিতে অভেদ সত্য, কারণ উহা ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ভেদাত্মক জগৎ ভাসমান হইলেও সত্য নহে, উহা বাধিতানুবৃত্ত। একটি কথা আছে। সত্যের পারমার্থিকরূপ ব্যতীত যেমন উহার একটি ব্যাবহারিক রূপ আছে তেমনি উহার একটি প্রাতিভাসিক রূপও আছে। তৃতীয় ভূমিতে ব্রহ্মের কোলে ভাসমান জগৎ যদি প্রাতিভাসিক সত্যরূপে গৃহীত হয় তাহা হইলে ঐ ভূমি ভেদাভেদ ভূমিরূপে বর্ণিত হইতে পারে কিনা তাহা বিবেচ্য। অবশ্য জগৎকে সত্য মানিয়াও ব্রহ্মের আশ্রয়ে তাহার প্রকাশমানতা মানা না যাইতে পারে এমন নহে। অঙ্গীকে আশ্রয় করিয়া অঙ্গের সত্তা বহু দার্শনিক স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ স্থলে অঙ্গকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন নাই। এই বিষয়ে বহু প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এখানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। প্রশ্নকর্তার মতে যাহা চতুর্থভূমি তাহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈত ভূমি। ঐ ভূমিতে দ্বৈতের ভান মোটেই থাকে না। এই ভূমি এবং মা'র বর্ণিত পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানীর স্থিতিভূমি ঠিক এক কিনা তাহা বলা যায় না। মা'র বিবরণ ধ্যান পূর্বক মনন করিলে উভয় ভূমির পার্থক্য বোধ হয় অনেকের নিকট স্পষ্ট হইতে পারে। অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে যাহাকে দ্বৈত বলা হয়, তাহাকে বাদ দিয়া বা অতিক্রম করিয়া অদ্বৈত স্থিতি এবং উহাকে গ্রহণ বা আত্মসাৎ করিয়া অদ্বৈত স্থিতি, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। অবশ্য স্থিতির স্বরূপগত একত্বের সম্বন্ধে প্রকাশের দিক দিয়া কোন প্রকার পার্থক্যের বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে।

২ — সর্বাঙ্গীণ ভাবে নিজেকে পাওয়া

মা বলেন, পূর্ণব্রহ্ম ভূমিতে স্থিতি না হইলে নিজেকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে পাওয়া হয় না। যে দৃষ্টিতে ব্রহ্ম বিশ্বের অতীত সেই দৃষ্টি অনুসারে

সর্বতত্ত্বময় বিশ্বকে অতিক্রম করিতে না পারিলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। বস্তুতঃ ইহা বিশ্বাতীত, নির্গুণ, নিষ্কল পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। পক্ষান্তরে বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে ঐ পরব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ—এই অনুভব প্রাপ্ত হইলে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় যে যাহাকে লোকে বিশ্ব বলে বা জগৎ বলে তাহাও বস্তুতঃ ব্রহ্মই। অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্ম এবং বিশ্বের বাহিরেও ব্রহ্ম। এই স্থলে ব্রহ্মদর্শন করিতে হইলে বিশ্বের বাহিরেই লক্ষ্য করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ ঐ ব্রহ্মসত্তা একই ভাবে, অক্ষত স্বরূপে, বিশ্বের মধ্যেও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই ব্রহ্মসত্তাই পূর্ণ ব্রহ্ম। এই স্থলে ভিতর বাহির সমান ও সাকার নিরাকার অভিন্ন। কারণ যে নিরাকার সেইত সঙ্গে সঙ্গে সাকারও, এবং যে সাকার সে সাকার থাকিয়াও নিরাকার। সাকার ও নিরাকার এই উভয়কে অভিন্নরূপে দর্শন, ইহাই পূর্ণব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। শুধু সাকার দর্শন ব্রহ্ম দর্শন হইতে পারে, কিন্তু উহা পূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন নহে। শুধু নিরাকার দর্শনও ব্রহ্ম দর্শন হইতে পারে কিন্তু উহা পূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন নহে। পূর্ণব্রহ্ম বলিতে সাকার ও নিরাকারের কোন প্রশ্নই নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। সাকার ও নিরাকারের যে বিরোধ উহা জাগতিক দৃষ্টির বিরোধ। স্বরূপ একই—এই একই স্বরূপের দর্শন পূর্ণব্রহ্ম দর্শন। ইহাই আত্মদর্শন। মা ইহাকে সর্বাঙ্গীণভাবে নিজেকে পাওয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা না হইলেও নিজকে পাওয়া যাইতে পারে, তবে আংশিক ভাবে, সর্বাঙ্গীণ-ভাবে নহে। সর্বাঙ্গীণ আত্মদর্শন হইলে জগতে সকলেই যে বস্তুতঃ একই তাহা বোধগম্য হয়। তখন কাহারও দৃষ্টিকে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় থাকে না। সেই জন্য মা বহুবার বহুস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, যে যেখান হইতে যাহা বলে সেখান হইতে উহাই ঠিক। এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের বিরোধ দৃষ্ট হইলে দর্শনে দর্শনে বিরোধ প্রতীত হয়। কিন্তু সকল স্থান বা অঙ্গই একই অঙ্গীর আত্মভূত ইহা বুঝিতে পারিলে কোন দর্শনকেই মিথ্যা বলিয়া পরিহার করা চলে

না। কোন দর্শনই মিথ্যা নহে, তবে খণ্ড। অখণ্ডের মধ্যে সকলের মহাসমন্বয় বিদ্যমান রহিয়াছে।

৩ — একের মধ্যে অনন্তের প্রকাশ

যাঁহারা জাগতিক বিরোধ-দৃষ্টি হইতে পূর্ণ সত্যেও বিরোধের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া থাকেন তাঁহারা মনে করেন যে অবস্থা বিশেষে জাগতিক বিরোধ স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। প্রশ্নকর্তা দৃষ্টান্তরূপে এই শঙ্কা উত্থাপন করিবার জন্য জিজ্ঞাসুভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—কেহ বিশ্বনাথ দর্শনের ইচ্ছা করিয়া দুর্গা বাড়ীতে যাইয়া দুর্গাকে যদি বিশ্বনাথ বলিয়া নির্দেশ করে তবে কি তাহা ঠিক হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে জানিয়া লইতে হইবে যে বিশ্বনাথ দর্শনেচ্ছু যাত্রী কি প্রকার অধিকার সম্পন্ন। যদি তাহাকে ভক্তরূপে যোগিরূপে অথবা বিশ্বনাথের দর্শন বিষয়ে তীব্র ইচ্ছা-সম্পন্নরূপে স্বীকার করা যায় তাহা হইলে লোকদৃষ্ট দুর্গা প্রতিমা দেখিয়াও সে যদি বলে 'এই বিশ্বনাথ' তবু তাহার বাক্য মিথ্যা হইবে না। সে সত্যই ঐ স্থানে দুর্গা প্রতিমার পরিবর্তে বিশ্বনাথের দর্শন করিতে পাইবে। অবশ্য ইহা তাহার একান্ত ভক্তি ও তীব্র ইচ্ছার ফল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার মূল রহস্য এই যে লোকদৃষ্টিতে দুর্গা ও বিশ্বনাথে ব্যবধান থাকিলেও বস্তুতঃ কোন ব্যবধান নাই। কারণ একেরই ত অনন্তরূপ। ভক্ত বা যোগী চাহিতে জানিলে যে কোন স্থান হইতে যে কোন বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে। ইহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে এবং হইবে। ইহাতে কিছুই আশ্চর্য হইবার নাই। কারণ 'সর্বং সর্বাত্মকম্— সর্বস্থানে সর্বসত্তাই বিদ্যমান রহিয়াছে। মূলে সবই এক সত্তাই—বিভিন্ন রূপেও। কারণ-সামগ্রী দ্বারা প্রস্ফুটিত করিতে পারিলে যে কোন স্থান হইতে যে কোন রূপের প্রস্ফুরণ হইতে পারে, যেহেতু কোন স্থানেই কিছুর অভাব নাই। ইহা বুঝিতে পারিলে জাগতিক বিরোধ যে মূলে বিরোধ নহে তাহা বুঝা সহজ হইবে। দেশগত

বিরোধ, কালগত বিরোধ, ভাবগত বিরোধ, আদর্শগত, গুণগত ও প্রকৃতিগত বিরোধ সবই তিরোহিত হইয়া যায়। খণ্ড দৃষ্টিতে বিরোধ আছে, ছিল এবং থাকিবে। অখণ্ড দৃষ্টিতে বা যোগদৃষ্টিতে বিরোধের কোন অস্তিত্বই নাই। কারণ বিরোধের ধর্ম পরস্পর পরস্পরকে পরিহার। একই অধিকরণে অনন্ত বিরুদ্ধ ধর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে বস্তুতঃ বিরোধের অস্তিত্ব থাকিবে কোথায়? ইহাতে লৌকিক দৃষ্টির বিরোধ-জ্ঞানকে অপলাপ করা হইতেছে না। সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে কোন বিরোধই সেখানে বাধক হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষেও অবস্থাবিশেষে প্রয়োজনের অনুরোধে বিরুদ্ধবৎ কার্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে। তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত নহে। মা বলিয়াছেন—"যেখান হইতে যাহা করিবার প্রয়োজন হয়, বাদ যায় না কিছু।" স্থিতি একে নিশ্চল হইলে অনন্ত চলনও স্থিতির বিরোধী হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

৪ — এক সত্তায় স্থিতি

মা বলেন, এক সত্তায় স্থিতি দুই প্রকার— অপরিপক্ক ও পরিপক্ক। অর্থাৎ ঐ স্থিতি লাভের পরও যদি উহা হইতে চ্যুত হইতে হয় তাহা হইলে উহা প্রকৃত স্থিতি নহে। উহাকে মা অপরিপক্ক স্থিতি বলিয়াছেন। আর যদি ঐ স্থিতি লাভের পর উহা হইতে স্খলন বা পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহা হইলে উহা পরিপক্ক স্থিতি বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষরূপে অনুধাবনের যোগ্য। এই যে অপরিপক্ক স্থিতির কথা বলা হইল ইহাকে কেহ যেন প্রাকৃত বা মায়িক স্থিতি বলিয়া মনে না করেন। কারণ ইহাও অজ্ঞানের অতীত অবস্থা। ভাব সাধনার ফলে ভাবসমাধি প্রাপ্ত হইলে এই স্থিতি লাভ করা যায়। ভক্তগণ ভাবরাজ্যে সঞ্চরণ করিতে করিতে পর্যায় ক্রমে বিরহ ও মিলনের অবস্থা অনুভব

করিয়া থাকেন। বিরহ বিয়োগের অবস্থা এবং মিলন যোগের অবস্থা। কিন্তু নিত্য লীলাতে বিয়োগও নিত্য নহে যোগও নিত্য নহে। কিন্তু লীলাটি নিত্য। তাই লীলার নিত্যতার অনুরোধে বিরহ বা বিয়োগের অবসান হয়। মিলনের আনন্দে বিরহের তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। মিলনের পরাবস্থা একটি সুশীতল শান্তিপূর্ণ অবস্থা। কিন্তু এই মিলন ত স্থায়ী হয় না। কিছুক্ষণ সম্ভোগের পর ইহা ভাঙ্গিয়া যায়, আবার বিরহ জাগিয়া উঠে। অষ্টকালীন লীলাতে প্রতিদিন কুঞ্জভঙ্গ লীলা এই জন্যই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্য যে মিলনের ফলভূত আনন্দ মিলনের পর না থাকিলেও প্রবল তাপময় বিরহাগ্নিতেও এক প্রকার আনন্দের অনুভব অনুস্যূত থাকে। কারণ এই বিরহে ত্রিতাপের খেলা নাই, কালের কলন নাই, প্রকৃতির পরিণাম নাই এবং অহমিকার আস্ফালন নাই। কিন্তু তথাপি বিরহ বিরহই, তাহার তাপ ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠে। ইহার পর পুনর্বার যখন মিলন সংঘটিত হয় তখন পূর্ববর্তি মিলন হইতে অধিকতর আনন্দ বা রসের আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকার অনন্ত লীলার পথে রসের সাধনার মধ্যে যোগ ও বিয়োগের আবর্তন চলিতে থাকে। এই ভূমিটিকে মা অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় 'টানাটানি'র ভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ একবার সাধক ভগবৎ সত্তার টানে তাহাতে প্রবিষ্ট হয় আবার তাহা হইতে চ্যুত হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে—টানটি তাঁহার অনুগ্রহ এবং ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওয়া তাঁহার নিগ্রহ। এই টানাটানির অবস্থাটি ভাব-সাধনার ভিতরে নিরন্তর রসাস্বাদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত থাকে। কিন্তু এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে অপক্ক অবস্থায় প্রবেশ করা চলে না। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত ভাবের অবস্থা অপক্ক অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ উহাতে আগম নির্গম রহিয়াছে। কিন্তু উহা যে একটি অতি চমৎকার অবস্থা তাহাও মা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত রসিকগণই উহার আস্বাদন পাইয়া থাকেন, অন্যের পক্ষে উহা দুর্লভ। কিন্তু যে পরিপক্ক অবস্থার

কথা বলা হইল অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করিতে না পারিলে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ অবস্থাটির স্পর্শ লাভকে জড় 'পাথর' স্পর্শ বলিয়া মা উল্লেখ করিয়াছেন—ঐ অবস্থাটি জড়বৎ পাষাণবৎ নিশ্চল স্থিরতার অবস্থা। ঐটিই পূর্ণ সত্যের গুহ্যতম স্থিতি। উহার স্পর্শ না পাইলে প্রকৃত অদ্বৈত ভাবের উদয় হইতেই পারে না। ঐ স্পর্শ পাইলে বহুর মধ্যেও নিজেকে অখণ্ড একের সত্তায় অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। এইটিই পরিপক্ক অবস্থা। এই অবস্থায় দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়। জগতের বিরোধ বৈচিত্র্য নানাত্ব সবই সে দেখে এবং জগতের দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মবিদ্‌ও পূর্বোক্ত বিরোধময় ব্যবহারের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বরূপ দৃষ্টিতে ঐ অবস্থায় আর কোন বিরোধের প্রশ্নই উঠে না। জগতের সঙ্গে জগতের অনুরূপ ভাবে ব্যবহার থাকিলেও সে নিজের অদ্বৈত ভূমিতেই সদা বিরাজ করে। তাহার নাবা ও উঠা, ভিতরে যাওয়া বা বাহিরে আসা, এ সব বস্তুতঃ থাকে না। লোকদৃষ্টিতে থাকে মনে হইলেও বাস্তবিক থাকে না। প্রথম অপরিপক্ক অবস্থায় এক-স্থিতি সাময়িক এবং তাহা অখণ্ডও নহে। তাই তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং কালান্তরে চ্যুতি হয়। কিন্তু পরিপক্ক অবস্থায় স্থিতি নিত্য। এই অবস্থায় দ্বিতীয় কিছুই ভাসে না—নিজের কাছে সদা সর্বদা নিজেই ভাসমান—একরূপে নানা রূপে এবং একও নানার বিরোধহীন অদ্বয়রূপে। ইহাই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞের স্থিতির কিঞ্চিৎ বিবরণ।

পঁচিশ

১ — লীলার মূলে এক অথবা দুই ?

যাঁহারা ভারতীয় সাধনের ও সাধকের ইতিহাস ক্রমবদ্ধভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে সাধনার লক্ষ্য সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রচলিত থাকিলেও স্থূলতঃ দুইটি মতকে প্রধান বলিয়া মনে করা যায়। প্রথম মতে অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য মুক্তি অথবা মোক্ষ—ইহাই পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ ও কাম পুরুষার্থরূপে পরিগণিত হইলেও চরম পুরুষার্থ নয়, কেননা এই তিনটির কোনটিই নিত্য নহে। একমাত্র মুক্তি অথবা মোক্ষই পরম পুরুষার্থরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। কারণ ইহা আত্মার স্বরূপ-স্থিতি বলিয়া নিত্য সিদ্ধ। সাধনের ফলে জ্ঞানের উদয়ে স্বরূপের আবরণ অপসারিত হইলে আত্মস্বরূপ আত্মার নিকট প্রকাশিত হয়—আত্মা যে স্বয়ংপ্রকাশ তাহা তখন বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকার আত্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে জীবের অনাদিকাল সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায় এবং দুঃখের উপশম হইয়া নিত্যশান্তির অভিব্যক্তি হয় —এই অবস্থা আত্মার স্বরূপভূত আনন্দে স্থিতির অবস্থা।

দ্বিতীয় মতে মুক্তি অথবা মোক্ষ পরমপুরুষার্থরূপে গৃহীত হয় না। এই মত অনুসারে পরাভক্তি অথবা ভগবৎ প্রেমই পরম পুরুষার্থ, মুক্তি নহে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়, কোন কোন শৈব সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ পরাভক্তি প্রাপ্তিকে মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। কেহ কেহ ইহাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই পরাভক্তি অথবা প্রেমলক্ষণা ভক্তি ইঁহাদের মতে মুক্তি অপেক্ষাও উচ্চতর আদর্শ। মুক্তি বস্তুতঃ এই পরাভক্তির পূর্ববর্তী

অবস্থা মাত্র। আত্মা স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হইলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে তাহার বিলাস রহিয়াছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। আত্মার স্বরূপে এক দৃষ্টিতে অংশাংশিভাব আছে। ইহা অনাদিকাল হইতেই ছিল এবং অনন্তকাল থাকিবে। বদ্ধ অবস্থায় এবং মুক্ত অবস্থায় ইহা সমরূপে বিদ্যমান থাকে—আত্মা অংশ, পরমাত্মা অংশী—স্বরূপ উভয়েরই এক, অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য। অংশ-চৈতন্য অণুরূপী, কিন্তু অংশী চৈতন্য মহান। জীব অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে নিজের স্বরূপ ও ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াছে। বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা কাটিয়া গেলে নিজের স্বরূপ দর্শন হয় এবং ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধও প্রকাশিত হয়। ইহার পর এই সম্বন্ধের অনুরূপ নিত্য রসাস্বাদ ঘটিয়া থাকে। এইখান হইতেই পরাভক্তি বা পঞ্চম পুরুষার্থের সূত্রপাত হয়। পক্ষান্তরে জীবাত্মা পরমাত্মার ন্যায় বিভু। দ্বৈতদৃষ্টিতে উভয়ে ভেদ থাকিলেও উভয়েরই বিভুত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে। অদ্বৈত মতে জীব ও ঈশ্বর একই বস্তু—যতক্ষণ স্বরূপের প্রকাশ না হয়, এবং উপাধি-সত্তা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ উভয়ের পার্থক্য স্বীকার্য, কিন্তু সর্ব আবরণের নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ মুক্ত অবস্থায় একই অখণ্ড আত্মা নিজের আলোকেই নিজের নিকট নিজেকে প্রকাশ করে। তখন জীবভাব ও ঈশ্বরভাব যে প্রকৃত স্বভাব নহে, উপাধি নিমিত্ত, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে সাধকবর্গের চিন্তারাজ্যে এই দুইটি মূল ধারার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

সাধারণতঃ ভক্তিবাদী সাধকগণ কোন না কোন আকারে দ্বৈতবাদ আশ্রয় করিয়া জীবনের চরম লক্ষ্যের ধারণা করিয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহারা চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া পরাভক্তিকেই চরম সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। জীব ও ঈশ্বর অথবা ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর ভেদ স্বীকৃত না হইলে ভক্তির অনুশীলন সম্ভবপর হয় না, ভক্তির সত্তাও থাকিতে পারে না, কারণ সেব্য-সেবক ভাবের উপর ভক্তির আস্বাদন

নির্ভর করে। অদ্বৈত সত্তাতে ভাবগত দ্বৈত থাকে না বলিয়া সেব্য-সেবকভাব সম্ভবপর হয় না। তাই উহারা অদ্বৈত স্থিতি অপেক্ষা অর্থাৎ মোক্ষ অপেক্ষা পরাভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করেন। নিম্নস্তরের ভক্তি জ্ঞানের পূর্ববর্তী সাধন বিশেষ। কিন্তু পরাভক্তি বস্তুতঃ মুক্ত পুরুষেরও পরম কাম্য এবং ইহা জ্ঞানের পর, এমন কি মুক্তিলাভেরও পর, কোন কোন ভাগ্যবান আত্মার জীবনে ভগবৎ কৃপায় আত্মপ্রকাশ করে। দার্শনিক দৃষ্টিতে এই পরাভক্তি লাভই পরামুক্তি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। প্রচলিত কৈবল্যমুক্তি এই মতে অপরা মুক্তি নামে পরিগণিত হয়। যাঁহারা অপরোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে আত্মার অভেদ স্থিতি স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে পরাভক্তি নামক কোন বস্তু স্বীকার্য নহে, এবং উহা মনুষ্যের জীবনের চরম আদর্শরূপে গৃহীত হইবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

পূর্বে মুক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে যে লীলা-প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে তাহা বাস্তবিক পক্ষে এই পরাভক্তি আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া। সাধারণতঃ শুষ্ক জ্ঞানী ভক্তিকে জ্ঞানের উপায়রূপ স্বীকার করিলেও উহা তাহার মতে একটি মায়িক বৃত্তিমাত্র। "ভক্তি র্জ্ঞানায় কল্পতে"—এই ভক্তি জ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দ্বৈত নিবৃত্তির ফলে তিরোহিত হইয়া যায়। কারণ তখন একত্বে প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া দ্বৈতমূলক কোন ভক্তির স্থান থাকে না। পক্ষান্তরে জাগতিক ভক্ত মায়াশ্রিত বলিয়া এবং মায়ার নিবৃত্তিতে দ্বৈতনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির অবসান আশঙ্কা করিয়া মায়ানাশক জ্ঞানকে চিরকাল ভয় করিয়া থাকে। জ্ঞানকে নিম্বফল বলিয়া এইজন্যই তাঁহারা বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ হইতে নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সাধক-সমাজে, সাধারণতঃ জ্ঞানমার্গে, ভক্তির মাহাত্ম্য ততটা স্বীকৃত হয় না, এবং প্রচলিত ভক্ত-সমাজেও তদনুরূপ জ্ঞানের মাহাত্ম্য অঙ্গীকৃত হয় না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু

দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত না হইলে এইরূপ বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি স্বাভাবিক। ভক্তি সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া নিত্যসিদ্ধরূপে তাঁহার সেবা করা। মায়া-জগতে অবস্থানের সময় এই প্রকার সেবা সম্ভবপর হয় না। কারণ মায়িক ভক্তের নিকট ভগবানের শুদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত হয় না এবং তাঁহার ধাম, পরিকর, লীলা, গুণ, ক্রিয়া কিছুই প্রকাশিত হয় না। এই সব অপ্রাকৃত সম্পদ্ প্রাকৃত মায়িক দৃষ্টির অবসান না ঘটিলে প্রকাশিত হইতে পারে না। এইজন্য পরাভক্তি-সাধকের পক্ষে ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশের পূর্বে নিজের সত্তাকে শোধিত করিয়া চিদানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ভাব, প্রেম ও রস এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া ভক্তের স্বরূপ-সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। সিদ্ধ রসময়ী তনু বিশুদ্ধ সত্ত্বে গঠিত। উহা নির্মল চৈতন্য দ্বারা নিত্য উদ্ভাসিত। এই প্রকার দেহে অধিষ্ঠিত হইতে না পারিলে ভগবদ্ধামে প্রবেশপূর্বক তাঁহার লীলার সহচর হওয়া কখনই সুসাধ্য নহে। এই কথা বলার তাৎপর্য এই যে ভক্তি-সাধনা যদি পরাভক্তি অথবা প্রেমলক্ষণা ভক্তির সাধনা হয় তবে উহাই নিত্য-লীলায় প্রবেশের সাধনারূপে পরিগণিত হয়। এই যে লীলার পথ এইটিই ভাবের পথ। কিন্তু ভাবের পথ হইলেও ইহা মায়ার অতীত এবং ত্রিগুণের পরপারে অবস্থিত। লীলার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অনন্ত বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকে বলিয়া প্রশ্নকর্তা আশঙ্কা করিয়াছেন যে ইহার মূলে দ্বৈতভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী। এক হিসাবে ইহা খুবই সত্য। কিন্তু মা যে উত্তর দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহা চরম সত্য নহে। কারণ পূর্ণ সত্য সর্বভাবের অতীত এবং পরম সাম্যময়। তাহা আয়ত্ত হইলে স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হয় এবং যাবতীয় সঙ্কুচিত ভাব তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং এই পরম স্থিতি লাভ করার পর যে কোন প্রকার ভাব লইয়া খেলা করা যায় অথচ নিজের অখণ্ডরূপ চ্যুত হয় না। এই জন্য পূর্ণ অদ্বৈত অবস্থার উপলব্ধির পরেও লীলার আস্বাদ গ্রহণ অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ ঐ অবস্থায় লীলাতীত পরম সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত হইয়াও সঙ্গে সঙ্গে লীলাময়রূপে

স্ফুরিত হওয়া কিছু বিসদৃশ ব্যাপার নহে। কেহ কেহ ঐ প্রকার স্থিতি অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করেন এবং বস্তুতঃ ইহাই যে শ্রেষ্ঠ স্থিতি তাহাও মা ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"দুই মেনে বলছে, সেও একেই—কেউ কেউ এটা নেয়।" অর্থাৎ নিত্যলীলায় দুই না মানিয়া যে হইতে পারে না এমন কোন কথা নয়।

২ — লীলাগত বৈচিত্র্য

লীলা স্বীকার করিলেই তাহার আনুষঙ্গিক ভাবে আকৃতি বা দেহ, ধাম, কালগত ভেদ, অনন্ত প্রকার ভাব ও তদনুরূপ ক্রিয়া ও গুণের তারতম্য সবই স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহারা এই জন্য লীলাকে মায়িক বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। মায়ার অতীত চিৎস্বরূপে ক্রিয়াদি থাকা সম্ভবপর নহে, ভেদ থাকাও সম্ভবপর নহে। এই জন্য যদিও চিত্তকে ভগবন্মুখে আকর্ষণ করার জন্য ভাগবতী লীলার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার্য, তথাপি অদ্বৈতবাদিগণের দৃষ্টিতে পরম সত্তাতে অর্থাৎ অদ্বৈতস্বরূপে স্থিত হইলে লীলা অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কারণ মায়া অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্ক্রিয় সত্তাতে স্থিতি হয়। লীলার উপযোগিতা সত্ত্বেও লীলার পারমার্থিকতা তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা একদেশী মত। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, তাহাতে সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজঃ ও তমঃ গুণের মিশ্রণ থাকে। সত্ত্ব প্রবল হইলেও একেবারে রজঃ ও তমঃ গুণ হইতে মুক্ত হয় না, কারণ প্রকৃতির মধ্যে ত্রিগুণ অনোন্যমিথুন। কিন্তু ভগবল্লীলা অপ্রাকৃত অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত। উহা গুণের খেলা তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ গুণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, যাহাতে রজঃ ও তমের লেশমাত্র মিশ্রণ নাই। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবানের উপাধি। শুধু শ্রীভগবানের নহে, যাঁহারা তাঁহার কৃপায় শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হন

তাঁহাদেরও ইহাই উপাধি। শ্রীভগবানের এবং তাঁহার ভক্তগণের দেহ এই বিশুদ্ধ সত্ত্বদ্বারা গঠিত। শ্রীভগবানের কায়া অনাদি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। কিন্তু তাঁহার মুক্ত ভক্তগণের কায়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের হইলেও সাদি, কিন্তু অনন্ত। ত্রিপাদ বিভূতিস্বরূপ অনন্ত ভগবদ্ধাম বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বলিয়াই সর্বদা চিদানন্দরসে পরিপূর্ণ থাকে। কালের পরিণাম, অবিদ্যার প্রকোপ, মায়ার দৃষ্টি এবং বহির্মুখ বৃত্তির উল্লাস এই চিন্ময়ধামে থাকে না। এই অবস্থা দ্বৈতদৃষ্টিতে ভক্তগণের নিকট যেমন সম্ভবপর অদ্বৈতদৃষ্টিতেও ভক্তগণের পক্ষে তেমনি সম্ভবপর। দ্বৈতদৃষ্টির এই লীলারস সম্ভোগ প্রেমলক্ষণা ভক্তির আভাসমাত্র। কারণ এই ভক্তি নিত্য নহে। ইহা মহাজ্ঞানে পর্যবসিত হয় এবং তখন নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নিষ্কল, অনাকার ব্রহ্মসত্তাতে স্থিতি লাভ হয়। কিন্তু ইহার অপর একটি দিক্ আছে। সেই দিক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাঁহারা পূর্ণ সত্তাতে শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হন তাঁহারা এক অদ্বৈত মহাসত্তাতে থাকিয়াও লীলাচ্ছলে অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন, এবং এই অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের রসাস্বাদনও করিতে সমর্থ হন। এই অবস্থায় লীলারস সম্ভোগ উপলক্ষ্যে যে ভক্তিরসের আস্বাদন ঘটে তাহাই প্রকৃত প্রেমলক্ষণা ভক্তি, উহার আভাস মাত্র নহে। এই অবস্থায় এই অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত প্রকার সম্ভোগ, অনন্ত প্রকার আস্বাদন সত্ত্বেও স্বপ্রকাশ, অখণ্ডস্বরূপ, অদ্বৈত স্থিতির ব্যতিক্রম হয় না। কারণ উহা নিত্য প্রাপ্ত। পূর্বের অবস্থায় স্বরূপস্থিতির অভাব থাকে এবং উহা প্রাপ্ত হইতে হইলে লীলারাজ্য অতিক্রম করিয়া ঐ স্থিতি গ্রহণ করিতে হয়। পূর্বের এবং পরের অবস্থাতে ভক্তি ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়। অজ্ঞানীর রসাস্বাদন যে ভক্তির পরিণাম তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না—তাহার পরিপূর্ণ পরিপক্কতায় জ্ঞানের উদয় হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞানের উদয় প্রথমে হয় এবং তাহার পরে লীলাচ্ছলে ভক্তিরসের আস্বাদন ঘটে। এই ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর অবিরোধী। যাহা হউক, মোটের উপর ইহা সত্য যে অদ্বৈত অবস্থায়

উপনীত হইয়াও খেয়াল হইলে অনন্ত প্রকার দ্বৈতভাব আশ্রয় করিয়া খেলা চলিতে পারে—বস্তুতঃ ঐ অবস্থায় দ্বৈতভাব মোটেই থাকে না। যাহা ভেদ বলিয়া লৌকিক দৃষ্টিতে প্রতিভাসমান হয় তাহা ভেদ নহে, ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির বিচিত্র বিলাস মাত্র। বৈষ্ণব আচার্যগণ ইহাকে 'ভেদ' না বলিয়া 'বিশেষ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিশেষের লক্ষণ এই—"ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্যনির্বাহকো বিশেষঃ।" অর্থাৎ যেখানে ভেদ নাই, পার্থক্য নাই, এক অখণ্ড সত্তা অদ্বিতীয় রূপে প্রকাশমান রহিয়াছে সেখানেও এই মহাসত্তার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্যের উদ্ভাবন হইয়া থাকে। ইহা আপাতদৃষ্টিতে ভেদ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ ভেদ নহে। ইহাকে তাঁহারা 'বিশেষ' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈত পরব্রহ্ম এই দৃষ্টি অনুসারে সবিশেষ। তাই তিনি এক হইয়াও এবং এক থাকিয়াও প্রকৃতই নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন, তাহাতে তাহার একত্বের হানি হয় না। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে দুই বা বহু মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তখন এক ভিন্ন দ্বিতীয়ের প্রকাশ থাকে না। প্রকাশ অনন্ত প্রকার বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা এক ও অভিন্ন। ইহা অতি গভীর রহস্য, সাধারণ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা ধারণাযোগ্য মনে হয় না। কিন্তু ইহা সত্য যে জ্ঞানের পূর্ণতা হইলে তাহাতে যেমন নিত্য-সত্যরূপে, কুটস্থ নিষ্ক্রিয়রূপে, এক পরমতত্ত্ব বা তত্ত্বাতীত ভাসমান হয় তেমনি তাহাতে উহার সঙ্গে সঙ্গে একই সময় অনন্তও ভাসমান হয়, এবং ঐ পরম দৃষ্টিতে ঐ একত্বে ও অনন্তত্বে বস্তুতঃ কোন ভেদ থাকে না। তবে ঐ অখণ্ড দৃষ্টি না হইলে ইহা অবশ্য বুঝিতে পারা যায় না। তাই মা বলিয়াছেন, "এই লীলার মধ্যেও অদ্বৈত বাদ যায় না। লীলার আস্বাদ রস আর বেদান্তে দুই এর কোন প্রশ্নই নাই। ভক্তিবাদীদিগের দুই দেখা গেলেও তবুও একই। এই চশমা না পড়লে উহা ধরা যায় না। ঐখান হইতে ঐরূপই দেখায়।"

৩ — মুক্তি ও পরাভক্তি

জ্ঞানীর লক্ষ্য মুক্তি, কিন্তু ভক্তের লক্ষ্য পরাভক্তি। মুক্তি ও পরাভক্তি আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে বিরুদ্ধ নহে। ভক্তের দৃষ্টিতে অংশাংশিভাব থাকে। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্মবস্তু নিরংশ বলিয়া অংশাংশিভাব থাকে না। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে এই থাকা ও না থাকার মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, কারণ উভয়ের স্বরূপ এক ও অভিন্ন। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, মহান ও অখণ্ড সৎবস্তু। জীব ভক্তের দৃষ্টিতে চিদ্‌বস্তু হইলেও অণু পরিমাণ ও ব্রহ্মের আশ্রিত নিত্যবস্তু। উভয়ত্রই স্বরূপ এক বলিয়া একদিকে যেমন অদ্বৈতভাবে কথিত হয়, অপর দিকে তেমনি আশ্রয় ও আশ্রিত ভাব থাকে বলিয়া এই অদ্বৈতভাবের মধ্যেও একটা 'আমি-তুমি' ভাব জাগ্রত থাকে—'সোহহং' ভাব অথবা 'দাসোহহং' ভাব, দুইই সত্য। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সোহহং ভাবের মহিমা জাগ্রৎ থাকে, কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে সেব্য-সেবক ভাব নিত্য প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণবস্তুর স্বরূপে প্রবিষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে মার্গস্থ পথিকভাব অতিক্রান্ত হইয়াছে। তখন আপন আপন আধারের অধিকার অনুসারে ঐ পরম স্থিতির পরম আস্বাদন ভাষাযোগে প্রকাশ করা হয়। যে নিজেকে সেই পরম সত্তার সহিত অভিন্নরূপে চিনিতে পারিয়াছে ও 'সোহহং' জ্ঞানের পাত্র। কিন্তু যে সেই পরম বস্তুকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং নিজেকে তাহার নিত্য আশ্রিত বুঝিতে পারিয়া উভয়ের সম্বন্ধ অনুভব করিতেছে সে স্বভাবতঃই নিজেকে তাহার সেবক বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সেবা বন্ধ অবস্থায় সম্ভব হয় না। মুক্ত না হইলে অর্থাৎ মায়ার বন্ধন কাটাইতে না পারিলে এই সেবাতে প্রবেশ পথ পাওয়া যায় না। এই সেবা ভাবরূপী তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই ভাবও মহাভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাই পরাভক্তির প্রকাশ। মায়া অতিক্রান্ত না হইলে অর্থাৎ নিজে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত না হইলে এইরূপ সেবক হওয়া যায় না। ভক্ত চিরদিন ভগবানের সেবা করিতেই ভালবাসে। সেব্য-সেবক-ভাব বিরহিত কৈবল্যমুক্তি, এমন কি সাযুজ্যমুক্তিও, তাহার

প্রীতিকর হয় না। সাধারণ ভক্তি সাধন-ভক্তিরূপে গণ্য হয়। সাধন ভক্তির পর বন্ধন কাটিয়া গেলে পরাভক্তির উদয় হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ও 'ব্রহ্মভূত' এবং 'প্রসন্নাত্মা' হওয়ার পর পরাভক্তি লাভ করার কথা 'মদ্ভক্তিং লভতে পরাং' এই বাক্যাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হইল একদিকের কথা। অন্যদিকে 'সোঽহং' ভাবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাবাতীত পরম স্থিতির আবির্ভাব হয়। ঐ স্থিতি বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপস্থিতি। উহাতে ভাবের, এমন কি মহাভাবেরও, স্পর্শ থাকে না। উহা নিজকে সেই পরমবস্তুর সহিত এক জানিয়া বোধরূপে স্থিতি। প্রথম অবস্থাটি আনন্দের আস্বাদনের অবস্থা। কিন্তু এই আস্বাদন ক্রিয়াত্মক ব্যাপার নহে, বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপে স্থিতির নিদর্শন। বস্তুতঃ আনন্দ ও চিৎ অভিন্ন বলিয়া উভয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই। আর একটি কথা—যেটি প্রকৃত মহাস্থিতি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে চিৎ ও আনন্দের কল্পিত বিশেষত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। মা এই বিষয়ে যে দুই একটি কথা বলিয়াছেন তাহাতে এই গভীর রহস্যটির উপর স্বচ্ছ আলোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "এক আত্মস্বরূপ যেখানে— 'তিনি প্রভু আমি দাস' নিয়াও যদি থাকে—আপত্তি কি? প্রথম ছিল রাস্তা, পাওয়ার দিকে। প্রকাশের পর তিনি সেবা কচ্ছেন— এই পেয়ে-সেবাই সেবা। এ'কে মুক্তি বল, পরাভক্তি বল যা' বল।" অর্থাৎ প্রাপ্তির পরে যে সেবা তাহাই পরাভক্তিরূপ সেবা। বস্তুতঃ ইহা মুক্তি হইতে ভিন্ন কিছু নহে। এই যে সেবা ইহার মূলে কোন অভাববোধ নাই, তাই ইহা স্বভাবের সেবা।

৪ — ঠিক ঠিক প্রাপ্তি কাহাকে বলে?

ঠিক ঠিক প্রাপ্তি হইলে নির্বীজ অবস্থা লাভ হয়। তখন বীজ থাকে না, অর্থাৎ তাহা হইতে অঙ্কুর-উদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থায় পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হয়। সুতরাং যদি কেহ খেয়ালের বশে সেবা

করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে কোন বাধা নাই। আর যদি কেহ সেবা করিতে প্রবৃত্ত না হয় তাহাতেও কোন দোষ নাই। বস্তুতঃ ঐ অবস্থায় সেবা করা আর না করায় কোন পার্থক্য নাই। তখনকার সেবা লীলার একটি প্রকার-ভেদ মাত্র। ঐ অবস্থায় সিদ্ধ পুরুষ লীলাচ্ছলে যা' কিছু করুন না কেন কিছুতেই তিনি বদ্ধ হন না। তিনি যা' সব সময়ই তিনি তা'ই থাকেন। স্বরূপের এবং প্রকাশের উপর আবরণ আর কখনই পড়ে না। মা বলিয়াছেন "সিদ্ধ হবার পর তুমি যা' বানাও—কিন্তু সৃষ্টির বীজ আর নাই।" প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রাপ্তি অবস্থাটা যখন এক ও অভিন্ন তখন এই লীলারূপ বৈচিত্র্যটা কোথা হইতে আসে? এই রহস্যের সমাধানের জন্য মা যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই উপযোগী। তিনি বলিয়াছেন, "যে যে পথে চলবে তার ত একটা জিনিষই—যা' পেলে আর অমীমাংসাটা থাকবে না।"

৫ — অভাবের সেবা ও স্বভাবের সেবা

সেবা বলিতে এখানে পূজা, অর্চনা, আরাধনা সবই বুঝিতে হইবে। যতক্ষণ অভাব থাকে ততক্ষণ সেবার প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা সবাই বুঝিতে পারে। কিন্তু অভাব নিবৃত্ত হইয়া গেলে অর্থাৎ জ্ঞানের উদয় হইলে এবং অদ্বৈতভাবে স্থিতি হইলে সেবাদির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না এবং অনেকে তাহা সম্ভবপর বলিয়াও মনে করেন না। মুক্ত হওয়ার পর ভজন পূজন সেবা প্রভৃতি অর্থহীন, ইহাই অনেকের ধারণা। এক হিসাবে দেখিতে গেলে কথাটা যে সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ অভাব মিটাইবার জন্য সাধনার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু অভাব মিটিয়া গেলে, স্বরূপে স্থিতি হইলে, সাধনার অথবা ভজনের আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। ইহা হইল একদিক্‌কার কথা। এই দিক্ হইতেই বলা হয় ভক্তির পর জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি। ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। কিন্তু ইহার অন্য

দিক্‌ও আছে। যদি না থাকিত তবে শুকদেব মুক্ত হইয়াও ভাগবত শুনাইতে গেলেন কেন? অবশ্য মুক্তির পর ভজন পূজন স্থলবিশেষে যাহা কিছু দৃষ্ট হয় তাহাকে ভজন পূজন না বলিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কারণ উহা প্রয়োজনহীন লীলা মাত্র, স্বতঃসিদ্ধ আনন্দের স্বাভাবিক উল্লাস মাত্র। এই দৃষ্টি হইতে মুক্তির পরেও যে ভক্তি সম্ভবপর তাহা বুঝিতে পারা যায়। শুধু সম্ভবপর নহে, মুক্ত পুরুষের ভজনই প্রকৃত ভজন। অভাবগ্রস্ত বদ্ধজীবনের ভজন হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রাচীন আচার্যগণও শ্রীভগবানকে 'মুক্তোপসৃপ্য' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ মুক্তগণের দ্বারাই তিনি উপসর্পণীয়। ইহার তাৎপর্য এই যে মুক্ত না হইলে, বাসনা সংস্কারাদি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে না পারিলে ভগবানকে উপসর্পণই করা যায় না, অর্থাৎ তাঁহার নিকট অগ্রসর হওয়া যায় না, ভগবন্মুখী দৃষ্টিই উন্মীলিত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয়ে একটি বচন আছে, সেইটি এই— "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো র্নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতগুণো হরিঃ। অর্থাৎ মুনিগণ গ্রন্থিহীন হইয়াও, মুক্তিলাভ করিয়াও এবং বিষয়তৃষ্ণাহীন আত্মারাম অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াও অনন্ত গুণসম্পন্ন এবং অচিন্ত্যলীলাবিলাসী শ্রীভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভগবানের এমনি মহিমা যে আনন্দস্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াও এবং যাবতীয় প্রয়োজন হইতে মুক্ত হইয়াও স্বভাবের বশে ভক্তগণ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার অনন্তমঙ্গলময় গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বভাবতঃই তাঁহাকে ভজন করিয়া থাকেন। ইহা এক হিসাবে লীলা মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভজনাত্মিকা লীলা মুক্তির পরাবস্থা, ইহাতে প্রয়োজনের কোন গন্ধ থাকে না। এই ভজন এবং বদ্ধ জীবের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় ভজন যে এক প্রকার নহে তাহা বলাই বাহুল্য। মা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে অভাবের অবস্থায় খণ্ডপূজা হয়, কিন্তু অভাব কাটিয়া গেলে স্বভাব হইতেও পূজা হইতে পারে। তাহা বস্তুতঃ অখণ্ড পূজা, তাহাকে

পূজা বলা যাইতে পারে, না বলিলেও ক্ষতি নাই। মা এ বিষয়ে যাহা বুঝাইয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই, সৃষ্টির বীজ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অঙ্কুরিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করিলে আর সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। তখন স্বভাবে স্থিতি হয় অর্থাৎ সাধক সেই পূর্ণ সত্তাই হইয়া যায়। ইহা ভক্তিদ্বারাই হউক বা বেদান্তবিচার দ্বারাই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। এই প্রকার সিদ্ধ অবস্থার পর সবই সম্ভবপর। তখন যে কোন প্রকার স্থিতি সেখান হইতে আহরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা পরমস্থিতিকে ক্ষুণ্ণ করে না বলিয়া উহাকে পরমস্থিতির বিলাস মাত্র বলা যায়। এই অবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ। ইহাকে যাঁহারা পাথর হইয়া যাওয়া অর্থাৎ পাষাণের ন্যায় জড়বৎ অবস্থার প্রাপ্তি মনে করেন, তাঁহাদের বিচার আপেক্ষিক ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিরাকার সত্তায় সকল আকারই খেয়ালের বশে ফুটিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিরাকার নিরাকারই থাকে। আকারের প্রতিভাস এবং আকারহীন নিরাভাস অবস্থা উভয়ই পূর্ণদৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন।

৬ — 'পর্দা যেটা বলা হয় সেটা গতি'

পূর্ণসত্য নিরাবরণ প্রকাশ স্বরূপ। বস্তুত ঐ সত্তাতে বা প্রকাশে কোনও প্রকার আবরণ থাকিতে পারে না। অথচ আবরণ যে আছে প্রতীত হয় তাহাও মিথ্যা নহে। ইহার কারণ এই, জাগতিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ঐ পূর্ণ সত্যের মধ্যে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ দিক্ লক্ষিত হয়—একটি অক্ষর অথবা কূটস্থ অপরিণামী স্থির সত্তা, অপরটি ক্ষর অর্থাৎ পরিণামী চল সত্তা। একই সঙ্গে ক্ষর ও অক্ষর পরমস্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। অক্ষর গতিহীন, দ্রষ্টা, নির্বিকার ও স্বয়ংপ্রকাশ, ইহাই নিঃস্পন্দ পরমভাব। ক্ষর গতিরূপ চলনাত্মক, স্পন্দস্বরূপ। অক্ষর ও ক্ষর পরস্পর বিরুদ্ধ। যখন অক্ষরে ক্ষর নিষ্ক্রিয়ভাবে বিলীন থাকে তখন প্রকাশ অনাবৃতভাবে নিজেকে

নিজে প্রকাশিত করে। ইহাই শক্তির অন্তর্লীন অবস্থা। কিন্তু যখন স্পন্দশক্তির অভ্যুদয় হয় তখন এই স্পন্দময়ী দৃষ্টির দিক্ হইতে নিঃস্পন্দ-স্বরূপ স্বপ্রকাশ হইলেও ঢাকা পড়ে। ইহাই প্রকাশের আবরণ। বস্তুতঃ প্রকাশ অনাবৃতই, কারণ আবরণও ত প্রকাশের মহিমাতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা ধরিতে না পারিলে আবরণকে প্রকাশ হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। ঐস্থলে উহা স্বরূপের আচ্ছাদক না হইয়া পারে না। বস্তুতঃ এই আচ্ছাদন গতিরই খেলামাত্র। গতিহীন অবস্থায় আবরণ থাকে না, গতির উদয়ে আবরণ আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্য মা বলিয়াছেন, "যা' নিত্য তাই বলা হয় আছে। আবরণ বা পর্দা যেটা বলা হয় সেটা গতি। গতিটা পরিবর্তন হইয়া যায় বদলে যায়।" যেখানে গতি সেইখানেই দুইএর বোধ। কারণ স্বরূপের আবরণ হইতেই দ্বিতীয়ের আভাস জাগে। যেখানে গতি নাই সেখানে একই এক—দ্বিতীয় কোথায়? সেখানে ভোক্তা যে ভোগ্যও সেই, কর্তা যে কার্যও সেই, জ্ঞাতা যে জ্ঞেয়ও সেই, বিষয় যে আশ্রয়ও সেই, এবং এই আপাত প্রতীয়মান সম্বন্ধটিও সেই। ত্রিপুটী তখন থাকে না অর্থাৎ থাকিয়াও না থাকার মধ্যে ভাসিতে থাকে। তখন সেই স্বপ্রকাশ সত্তা অভিন্ন ও অখণ্ড থাকিয়াও পরস্পর বিরুদ্ধ অনন্তরূপে প্রকাশ পায়।

৭ — বাদ দিলেও বাদ যায় না

পূর্ণ স্থিতিতে ত্যাগ ও গ্রহণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, সুতরাং সেখানে দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে প্রতীয়মান বিরোধ অস্তমিত হয়। কারণ সেখানে না করিয়াও সব কিছু করা যাইতে পারে এবং সব কিছু করিয়াও কিছু করা হয় নাই, এরূপ স্থিতিতে থাকা যায়। সেখানে ত্যাগ ও গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং বাদ দেওয়া অথবা বাদ না দিয়া গ্রহণ করা, ইহা অর্থশূন্য বাক্য। সেই অবস্থায় পূজা না করিয়াও পূজা হয় এবং পূজা

করিয়াও পূজাহীন স্থিতি বলা চলে। এইজন্য মা বলিয়াছেন, "এর পর যদি বলে আমি মুক্তি বাদ দেই বা ঠাকুর পূজা বাদ দেই তখন বাদ দিলেও কোনটা বাদ যায় না—বাদ অবাদের সেখানে স্থান নাই কিনা।"

৮ — আদি প্রবৃত্তির ভিন্নতার কারণ

মূলে যখন সবই এক তখন সকলেই এই ধারাতে চলে না কেন, এরূপ প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে জাগে। কর্মগত বৈচিত্র্য, ভাবগত বৈচিত্র্য, ইচ্ছাগত বৈচিত্র্য, এই সব সৃষ্টির ভিতরের কথা। কিন্তু যেখানে মূলের কথা বলা হইতেছে সেখানে এক ভিন্ন ত দুই হইতে পারে না। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সে একের প্রকাশ একই ভাবে না হইয়া অনন্ত-ভাবে হয় কেন? এরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে। ইহার একমাত্র উত্তর যাহা হইতে পারে তাহাই মা স্বল্পাক্ষরে বলিয়াছেন, "তিনি অনন্ত-রূপে প্রকাশ, সেই ত।" ইহার তাৎপর্য এই যে এই অনন্ত বৈচিত্র্য অহেতুক। ইহার কোন কার্যকারণ ভাবের সহিত সম্বন্ধ নাই। ইহা স্বরূপের অনুবন্ধি, কারণ তিনি এক হইয়াও অনন্ত এবং অনন্ত হইয়াও যে এক সে একই এক। এই অনন্তত্ব তাহার স্বরূপের অন্তর্গত। ভাবগত ক্রিয়াগত, গুণগত, রূপগত ও শক্তিগত অনন্ত বৈচিত্র্য তাহারই আত্মপ্রকাশ। অপচয় হয় না, তাই যিনি অনন্ত তিনি অনন্তরূপেই প্রকাশ পাইবেন। ইহাতে আর প্রশ্নের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে অনন্তরূপে প্রকাশ পাইলেও বস্তু একই। মূলে একই অনন্ত এবং অনন্তই এক, উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির নিকট বিরোধ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বুদ্ধির অতীত স্বরূপ-সত্তা যেখানে সেখানে কোনও বিরোধ নাই।

ছাব্বিশ

১ — পূর্ব স্মৃতির অভাব

সাধারণতঃ মানুষের পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকে না। অবশ্য কোন কোন জাতিস্মর লোকের যে সন্ধান না পাওয়া যায় তাহাও নহে। এবং কোন কোন স্থলে পূর্বস্মৃতি আংশিকভাবে বিদ্যমান থাকিলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং সাংসারিক পরিবেশের প্রভাবে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যাহাদের বাল্যকালে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে পূর্বজন্মের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহারাও অধিকাংশ স্থলে জাগতিক স্পর্শের ফলে ঐ স্মৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকের মধ্যেই বিস্মৃতি ব্যাপকভাবে এবং অনেকটা স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি, ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে মা সংক্ষিপ্তভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বিস্মৃতির মূল কারণ অজ্ঞান। জগৎ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল সত্তার মধ্যে পরিবর্তনহীন সত্তা একমাত্র আত্মা। এই স্থির আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার না পাওয়া পর্যন্ত পরিবর্তনময় জগতের প্রভাব আত্মার উপর না পড়িয়া পারে না। ইহার ফলে দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধ উন্মেষ প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ আত্মজ্ঞানের উদয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই পরিবর্তনশীল স্রোত হইতে মুক্তিলাভের আশা দুরাশা মাত্র। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে সেই স্থির আলোকে সমগ্র বিশ্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। অতীত তখন আর অতীত রূপে অব্যক্ত থাকে না। কারণ উহা জ্ঞানের আলোকে অভিব্যক্ত হইয়া বর্তমানরূপে প্রকাশিত হয়। দূরস্থ বস্তু তখন আর দূরস্থ থাকে না, উহা ব্যবধান রহিত হইয়া সন্নিহিতরূপে প্রতীত হয়। এইজন্য স্পষ্ট

চিদালোকে জ্ঞানমাত্রই সাক্ষাৎকারাত্মক অথবা অনুভবরূপ হইয়া পড়ে। নিজের ব্যক্তিগত ধারার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে দৃষ্টিশক্তির তীব্রতা অনুসারে এবং জ্ঞানালোকের স্বচ্ছতার অনুপাতে বহুদূর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সংস্কার সাক্ষাৎকার না করিলেও পূর্বজন্মের পরম্পরা অখণ্ড বর্তমানের মধ্যে বর্তমানবৎ প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের আলোকে ভ্রম নিবৃত্ত হয়, বিস্মৃতি থাকে না এবং দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সর্বপ্রকার আবরণ খসিয়া যায়। সেইজন্য এই অবস্থায় পূর্বস্মৃতি আপনা আপনি ভাসিয়া উঠে। কিন্তু আত্মিক বিকাশ এতটা না হইলে প্রযত্ন অথবা সংযম অবলম্বন করিয়া অতীতের গাঢ় তমসা আংশিক পরিমাণে ভেদ করিতে পারা যায়। তদনুসারে কোন যোগী এক জন্ম, কেহ বা দুই জন্ম এবং অন্য কেহ তদপেক্ষা অধিক জন্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তথাপি ইহার একটা সীমা আছে। কারণ উক্ত যোগীর বিকশিত জ্ঞানশক্তিও পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে এই জ্ঞানশক্তি অপরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন প্রথম অবস্থায় নিজের ব্যক্তিগত ধারার পূর্ববর্তী জন্মগুলি স্মৃতিরূপে ফুটিয়া উঠে। অনাদি কালের স্মৃতি জাগে এমন কোন কথা নাই। শক্তির বিকাশ যাহার যতটা হয় তাহার জ্ঞান ততটাই প্রসারিত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ করিলে এই প্রসারণ শক্তি অনন্ত হইয়া যায়। তখন শুধু যে নিজের ব্যক্তিগত ধারা স্মরণ হয় তাহা নহে, জগতের যাবতীয় সত্ত্বেরই পূর্বস্মৃতি যোগীর হৃদয়ে স্ফুটভাবে জাগিয়া ওঠে। কারণ লৌকিক দৃষ্টিতে অন্যান্য সকলের আত্মিক সত্তা যোগী হইতে পৃথক্ প্রতীত হইলেও যোগজ জ্ঞানোৎকর্ষের ফলে সর্বত্র অভিন্ন আত্মার স্বরূপই অশেষ বিশেষ সহকারে ফুটিয়া ওঠে। এই দৃষ্টিতে সকলের ধারাই মূলে এক ধারারূপে পরিগণিত হয়। কারণ আত্মা অভিন্ন দৃষ্টিতে জাগিয়া উঠিয়া সর্বত্র নিজের রূপই দেখিতে পায়। তখন নিজের পূর্বস্মৃতি ও অন্যের পূর্বস্মৃতি বলিয়া কোন ভেদবোধ থাকে না। সবই সমগ্ররূপে এবং অক্ষুণ্ণভাবে যোগীর হৃদয়াকাশে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু যতদিন আত্মার স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া যায়,

ততদিন পূর্বস্মৃতি জাগে না—যাহা জাগে তাহা আংশিক। ধারার দিকেও ব্যক্তিগত এবং প্রকাশের দিকেও সীমাবদ্ধ। বৌদ্ধদার্শনিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে দিব্যজ্ঞানের এবং ঋদ্ধির উদয়কালে পূর্বস্মৃতি জাগিয়া ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে খণ্ড পূর্বস্মৃতি না বলিয়া শুধু স্মৃতিশক্তির জাগরণ বলাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই গীতাতে এবং কোন কোন আগম গ্রন্থে বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে পরমাত্মার জ্ঞান স্মৃতি ও অপোহন এই ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতিরূপে যে প্রকাশ উদিত হয় তাহা জ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার সার্থকতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মনে প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। ইহার উত্তর এই— এমন একটি বিচিত্র স্থিতি আছে যেখানে জ্ঞানমাত্রই অনুভব এবং অনুভব মাত্রই একদিক্ হইতে স্মৃতিরূপে এবং অপর দিক্ হইতে প্রত্যভিজ্ঞারূপে প্রতীতিগোচর হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে আত্মস্বরূপ জ্ঞানের উদয় হইলেই তদনুবিদ্ধ অনন্ত স্মৃতিরও উদয় হইয়া থাকে। ভুলের রাজ্যে ইহা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ভুল কাটিয়া গেলে ইহা একটি অতি সাধারণ সত্যরূপে সকলেরই অনুভব গোচর হয়। বলা বাহুল্য এই অবস্থা শুদ্ধ মনের স্থিতি কালে হইয়া থাকে। মনোরাজ্য অতিক্রম করিলে অর্থাৎ উন্মনী অবস্থাতে এই স্থিতি ভিন্ন হইয়া পড়ে।

২ — সংস্কার ও মন

সংস্কার বলিতে ভাব অথবা পদার্থের একটি সূক্ষ্মছাপ বুঝিতে হইবে। এই ছাপটি অন্তঃকরণে বা মনে বিদ্যমান থাকে। অনুভব বা ক্রিয়া উভয়ই অবস্থা-বিশেষে চিত্তক্ষেত্রে সংস্কার সৃষ্টি করে। এই সকল সংস্কারের মধ্যে কতকগুলি উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতি উৎপাদন করে এবং অন্যগুলি উত্থিত হইয়া হৃদয়ে সুখ দুঃখের বোধ উৎপাদন করে। এই জন্য যোগিগণ বাসনা ও কর্মাশয় ভেদে এই সকল সংস্কারকে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কার

যে প্রকারেরই হউক না কেন তাহার উদ্ভব স্থান এবং বিশ্রাম স্থান অন্তঃকরণ। কারণ আত্মাতে কোন প্রকার সংস্কার থাকে না এবং থাকিতেও পারে না। মনের অতীত অবস্থাতে সংস্কারের, কোন কথাই উঠে না। এই সকল সংস্কার, অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু যোগী যোগজ সন্নিকর্ষ বলে যে অলৌকিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে তাহাতে এই সকল সংস্কার অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও বিষয়ীভূত হয়।

৩ — একে অনন্ত, অনন্তে এক

প্রশ্ন হয় যে অনন্তে এক অথবা একে অনন্ত, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টির প্রকাশ প্রথমে হয়। ইহার উত্তরে ইহাই বলা চলে যে অনন্তরূপে অনন্তের আত্মপ্রকাশ হইলে একের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ পৃথক্ রূপে অনন্তের দিক্‌টা সমগ্রভাবে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে স্বভাবতই একের দিক্‌টাও আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। এটা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে। শুধু নানা অথবা ভেদ দর্শন করিলেই অভেদের সাক্ষাৎকার হয় না। কিন্তু এই ভেদ দর্শন করিতে করিতে যদি অনন্তে মন অবরুদ্ধ হয় অর্থাৎ সীমাপ্রাপ্তির অভাব বশতঃ যদি ভূমা হৃদয় ক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠে তখন অভাবরূপে অনন্তই জাগ্রত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনন্তে প্রতিষ্ঠিত এক অখণ্ড সত্তা প্রকাশমান হয়। বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত হইতে যেমন একের জ্ঞান সম্ভবপর তেমনি পক্ষান্তরে একের জ্ঞান হইতেও অনন্তের আভাস ফুটিয়া উঠা কিছুই অসম্ভব নহে। সাধকের অন্তঃ প্রকৃতি এবং সংস্কারের তারতম্যবশতঃ কেহ অনন্তের মধ্য দিয়া এককে ধরে এবং কেহ বা একের মধ্য দিয়া অনন্তকে ধরিতে সমর্থ হয়। মোট কথা মা সংক্ষিপ্তভাবে বলিয়াছেন, “এক আর অনন্ত আলাদা কোথায়? একের মধ্যে অনন্ত ও অনন্তের মধ্যে এক।”

৪ — সাধকের জীবনে বিভূতির স্থান

আধ্যাত্ম জীবনের পথে ঠিকভাবে চলিতে পারিলে সাধকের বিভূতি লাভ অবশ্যম্ভাবী। অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তি আছে তদ্রূপ চিৎস্বরূপ আত্মার চৈতন্যময়ী শক্তি নিত্য বিদ্যমান। অগ্নি প্রাপ্ত হইলে যেমন তাপ অথবা দাহিকা শক্তিকে পৃথক্ ভাবে প্রাপ্ত হয় না তদ্রূপ শক্তিমানকে পাইলেই শক্তিও আয়ত্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধকের স্থিতি ও লক্ষ্য অনুসারে এই শক্তির সহিত সম্বন্ধ নিয়মিত হইয়া থাকে। যে সাধকের লক্ষ্য অদ্বৈত সে পরমতত্ত্ব হইতে পৃথক্ ভাবে শক্তিকে গ্রহণ করিতে পারে না, এইজন্য সাধনার ফলে বিভূতির উদয় হইলেও সে উহাকে গ্রাহ্য করে না। যাহার লক্ষ্য একে নিবদ্ধ সে কখনই নানাভাবে তাহার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় না। কিন্তু যে সাধক অদ্বৈত পথে না চলিয়া সাকার ও সগুণ উপাসনার মার্গে চলিতেছে তাহার জীবনেও বিভূতির উদয় হইতে পারে। এই সাধক কিন্তু বিভূতিকে উপেক্ষা করে না, কিন্তু উপেক্ষা না করিলেও লৌকিক পুরুষের ন্যায় বিভূতি পাইয়া মোহিত হয় না। সে বিভূতিকে গ্রহণ করে বটে, কিন্তু 'তৎ' ভাবেই গ্রহণ করে অর্থাৎ তাঁহার কৃপা বা স্বরূপ শক্তির পরিচয়রূপে আদর করিয়া থাকে, জাগতিক ঐশ্বর্যরূপে নহে। কারণ বিভূতি মাত্রেই ইষ্টেরই আত্মপ্রকাশ ব্যতীত অপর কিছু নহে। কর্ম করিলেই যেমন তাহার ফল উৎপন্ন হয় তেমনি ঠিক পথে সাধনা করিলেই তাহার প্রভাবে কোন না কোন প্রকার বিভূতির উদয় হয়। একেরই অনন্তরূপে প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। তাই মা বলেন— "বিভুর দিকে লক্ষ্য রাখিলে বিভূতির আবির্ভাব স্বতঃসিদ্ধ। বিভূতি গ্রহণ করিলে দ্বৈত ভাবে স্থিতি হয়, তাই অদ্বৈত পথে বিভূতি গ্রহণ চলে না। কিন্তু সগুণ উপাসক বিভূতি ঠিক ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে।

৫ — একটি বিচিত্র স্থিতি

আধ্যাত্ম জীবনে সাধককে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। সাধকের অধিকার সম্পদ ভিন্ন বলিয়া তাহার প্রাপ্তিও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। একটি অবস্থা কোন কোন সাধকের জীবনে ঘটিয়া থাকে, যাহাকে অতি গভীর অন্ধকারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ অবস্থায় দ্বৈত ত থাকেই না, অদ্বৈতেরও কোন বোধ থাকে না—নিজ বোধ থাকে না, পর বোধও থাকে না। ওটি স্বয়ং প্রকাশের অবস্থা নহে সুতরাং উহা যে জড়বোধ বা গভীর লয়ের অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা চিন্ময় অবস্থা ত নহেই, এমন কি আংশিকরূপেও চিদালোকে আলোকিত নহে। সাংখ্যের প্রকৃতিলয় ও তন্ত্রের প্রলয়াকল অবস্থা কিয়দংশে ঐ বিচিত্র অবস্থার অনুরূপ মনে করা যাইতে পারে। ঐ অবস্থায় কেহ পতিত হইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। ঐ স্থানে কালের কলন-ক্রিয়া হয় না বলিয়া কর্ম-বিপাক ঘটে না। উহা ঘোর সুষুপ্তির সমভাবাপন্ন একটি আতঙ্কময় দশা। কর্মের ফলভোগ সম্ভবপর নহে বলিয়া ভোগান্তে ঐ দশা হইতে ব্যুত্থানও সম্ভবপর নহে। ওখানে কেউ কাহাকেও চেনে না এবং নিজেকেও নিজে চেনে না। কালের বা মহাকালের আবর্তনেই হোক অথবা অহেতুক মহাকরুণার প্রভাবেই হোক ঐ অবস্থা হইতে উদ্ধার ঘটিয়া থাকে।

মা এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— "ঐ যে বলা হ'লো সমস্তটি জ্ব'লে এক হ'য়ে গেল, যেন তাকেই খুঁজে পাওয়া যায় না। এক হ'য়ে যে গেল এখানে একটি অন্ধকার আছে। স্বয়ংপ্রকাশ তো নয়, চিন্ময়রাজ্যেও আসে নাই। এখান হইতে কখন যে উত্থিত হবে বলা যায় না।"

৬ — চিন্ময় রাজ্যের বৈশিষ্ট্য

প্রাকৃত রাজ্য ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকার। ইহা জড় ও অচেতন। এই রাজ্যে ক্রম আছে, যাহা দেশ ও কালের মধ্যে পূর্বাপর ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু চিন্ময়রাজ্যে পর-পর ভাব নাই। উহা অপ্রাকৃত ভাগবত ধাম। ওখানে শুধু একটি বস্তু আছে—একমাত্র সেই আছে, দ্বিতীয় কিছু নাই। 'তৎ' হিসাবে 'তৎ' রূপে এখানে বিগ্রহ নিত্য বিদ্যমান—ইহা একমাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই একের মধ্যে নানাত্ব আছে, কিন্তু ইহা জাগতিক নানা নহে। জগতে দুঃখ আছে, এখানেও তাহার অনুরূপ দুঃখ আছে, কিন্তু এই দুঃখ রসময় বিরহেরই একটি মূর্তি। চিন্ময় রাজ্যে বিরহ আনন্দের রূপ ধরিয়াই প্রকাশ পায়। শুধু তাহাই নহে, এ বিরহ অফুরন্ত, কারণ বিরহ হইতেই ত প্রতিক্ষণে নব নব প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। নিত্য নূতন লীলা এ বিরহেরই ফল। এইজন্য এই বিরহের অন্ত নাই, পূর্ণ প্রাপ্তির বক্ষঃস্থলে এই নিত্য বিরহ জাগিয়া থাকে। স্থিতির দুইটি দিক্ বিচারশীল মনুষ্যের সম্মুখে লক্ষিত হয়—একটি স্বয়ংরূপ এবং অপরটি এই স্বয়ংরূপের বিগ্রহ রূপ। একটি অব্যক্ত, অপরটি ব্যক্ত—উভয়ই নিত্য। নিত্যধামে এই অব্যক্ত ও ব্যক্ত উভয়ই অখণ্ড প্রকাশে প্রকাশময়। নিত্যধাম ইহারই নামান্তর—ইহাই নিত্য বৃন্দাবন। হৃদয় সীমাহীন হইয়া প্রকাশিত হইলে অপ্রাকৃত নিত্য বৃন্দাবনের রূপ ধারণ করে। এই অবস্থার উদয় হইলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের-ভেদ চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায়। তখন সমগ্র বিশ্বই তাঁহার স্বরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া তাঁহার লীলাক্ষেত্র নিত্য বৃন্দাবনরূপে ফুটিয়া উঠে। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক আস্পৃহার ইহাই চরম লক্ষ্য।

সাতাশ

১ — দীক্ষা ও তাহার ফল

দীক্ষা ও তাহার ফল সম্বন্ধে মা বলিয়াছেন—"দীক্ষার ফলে বাহিরে ও ভিতরে তখনই স্ফুরণ হয়। তোমার ভিতরে সমগ্রটাই রয়েছে। শুধু প্রকাশের জন্য বাহির ভিতর এক করার জন্য স্থূলে হয়ত কেহ কৃপা করে গেল। দীক্ষা পেয়ে সাধনায় কেহ হয়ত সিদ্ধ হয়। কেহ বা কিছুই পেল না, মরে গেল।"

মা এই অল্প কয়েকটি কথাতে সাধনার অতি গভীর রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। দীক্ষা সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে নানা প্রকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ধারণার মূলে কতটা সত্য আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। কেহ বলেন দীক্ষা ভিন্ন জীবের পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না এবং পরা মুক্তি সিদ্ধ হয় না। কারণ শাস্ত্রে আছে— "দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্দ্ধ্বং শৈবং ধাম নয়ত্যপি।" আবার কোনও কোনও মতে দীক্ষার আবশ্যকতা মোটেই স্বীকৃত হয় না। এই সব স্থলে দীক্ষা শব্দের পারিভাষিক অর্থের তারতম্যবশতঃ এইরূপ সিদ্ধান্তগত ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ শাস্ত্রে কোনও স্থলে দীক্ষা শব্দে শক্তিপাত অর্থাৎ ভগবৎ অনুগ্রহ বুঝাইয়া থাকে এবং অন্য কোনও কোনও স্থানে ভগবদনুগ্রহের জন্য ক্রিয়া বিশেষকে দীক্ষারূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। কারণ মূলে শক্তিপাত না হইলে বাহ্য ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে না। অদ্বৈত আগম শাস্ত্রানুসারে অজ্ঞান পৌরুষ ও বৌদ্ধ এই দুই প্রকার। তদ্রূপ জ্ঞানও পৌরুষ ও বৌদ্ধ ভেদে

দুই প্রকার। পৌরুষ অজ্ঞানই মূল অজ্ঞান। অর্থাৎ যখন পূর্ণ অখণ্ড সত্য লীলাবশতঃ নিজে অখণ্ড থাকিয়াও খণ্ডিতবৎ হন অর্থাৎ নিজের পূর্ণ শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া নিজেকে জীবরূপে প্রকাশিত করেন, তখন জীবের স্বরূপ-জ্ঞান অর্থাৎ সে যে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন সেই জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। যে অজ্ঞানের ফলে আত্মবিস্মৃতি ঘটে তাহাই পৌরুষ অজ্ঞান অর্থাৎ শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় নিজে সর্বজ্ঞ ও স্বরূপজ্ঞ হইয়াও বহু হওয়ার জন্য যে অজ্ঞান দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন তাহাই পৌরুষ অজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। ইহাই ভগবানের নিগ্রহশক্তি অথবা তিরোধান শক্তি যাহার দ্বারা তিনি নিজেকে নিজে আচ্ছন্ন করিয়া বিভিন্নরূপে প্রকট হন। এই অজ্ঞানের নিবৃত্তি যোগ, তপস্যা সাধনা, উপাসনা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। ইহা তখনই নিবৃত্ত হইতে পারে যখন পরমেশ্বর স্বয়ং নিজের আবরণ নিজে অপসারণ করেন। এই অপসারণ ক্রিয়াকে তাহার অনুগ্রহ শক্তির ক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যিনি শিব হইয়াও স্বেচ্ছায় পশু সাজেন তিনি আবার স্বেচ্ছাতেই পশুভাব পরিহার করিয়া পুনর্বার নিজের শিবময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। উভয়ই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের খেলা। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি সাধনার কোনও উপযোগিতা নাই? ইহার উত্তর এই—উপযোগিতা আছে এবং তাহাতে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। সাধনের সার্থকতা উক্ত আবরণের নিবৃত্তিতে নহে, কিন্তু বুদ্ধিতে মূল অজ্ঞানের প্রতিবিম্বরূপে যে অজ্ঞান ভাসমান হয় সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে। এই অজ্ঞানকে বৌদ্ধ অজ্ঞান বলে। মূলে পৌরুষ অজ্ঞান না থাকিলে বৌদ্ধ অজ্ঞান হইতেই পারে না। আকাশে চন্দ্র উদিত না হইলে সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব কোথা হইতে আসিবে? পৌরুষ অজ্ঞান জাগতিক দৃষ্টিতে অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে। বুদ্ধি প্রকৃতির বিকার। সুতরাং দেহ গ্রহণকালে যখন বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয় তখন উহাতে ঐ অনাদিকালের মূল অজ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবিম্বিত হয়।

ইহাই খ্রীষ্টিয় সাধকগণের Original Sin প্রভৃতি কল্পনার মূল রহস্য। জীবের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে এই অজ্ঞানও মূল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা মূল নহে এবং বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সহজেই উন্মূলিত হইবার যোগ্য। যোগ, তপস্যা, উপাসনা, ব্রতচর্যা, তীর্থসেবা প্রভৃতি সবই জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল সন্দেহ নাই। কিন্তু পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্তি এই সকল উপায়ের উপর নির্ভর করে না। মনুষ্যমাত্রই স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। কিন্তু অভিন্ন হইলেও পরমাত্মার স্বাতন্ত্র্য বশতঃ তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে কল্পিত। কেহ কেহ এই ভিন্নতা উপলক্ষ্য করিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে অংশাংশি ভাব কল্পনা করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, দীক্ষা ভিন্ন কোনও উপায়েই উক্ত পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব নহে। এমন কি স্বচ্ছ বুদ্ধিতে আবির্ভূত নির্মল মহাজ্ঞান দ্বারাও উক্ত অজ্ঞানের নাশ ঘটে না। বৌদ্ধ অজ্ঞান বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহার পূর্বে ভগবৎ অনুগ্রহ শক্তির প্রভাবে দীক্ষাদি দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ঐ বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জীবন্মুক্তির উদয় হইতে পারে। কিন্তু যদি কোনও বিশেষ কারণে অর্থাৎ উপযুক্ত সাধনাদি উপায় অনুষ্ঠানের অভাবে কাহারও পক্ষে বৌদ্ধজ্ঞানের আবির্ভাব না ঘটে অথচ ভগবৎ কৃপায় সদ্‌গুরু প্রদত্ত দীক্ষা প্রভাবে তাহার পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে এই প্রকারে দীক্ষিত পুরুষ জীবন্মুক্তি লাভ না করিতে পারিলেও দেহান্তে পূর্ণত্ব অথবা অখণ্ড স্বরূপের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ অবশ্যই করিয়া থাকে। কারণ দীক্ষার প্রভাবে পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধিনিষ্ঠ অন্তরায় দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌরুষ জ্ঞানের উদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির যাবতীয় অন্তরায় নিবৃত্ত হইয়া যায়। কারণ প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ দেহের অবস্থান পর্যন্ত, তাহার পর নহে।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রাকৃত দীক্ষার

মহত্ত্ব আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝা যাইবে যে সাধনাদিরও উপযোগিতা আছে। দীক্ষার মহত্ত্ব এই যে ইহা যথাবিধি সদ্‌গুরুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে ইহার ফলে পূর্ণত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী। কারণ যে সকল মল মায়াশক্তির প্রভাবে নিজের পূর্ণ স্বরূপকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে দীক্ষার দ্বারা ঐ সকল মল অপসৃত হইয়া যায়। একমাত্র প্রারব্ধ অবশিষ্ট থাকে যাহার শোধন ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জীবকে ভোগ করিতে হয়। বৌদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে, এমন কি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' রূপ বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলেও পূর্ব প্রকার পূর্ণত্ব লাভরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। কিন্তু সাধনার উপযোগিতা এই যে বুদ্ধিগত অন্তরায় ইহার দ্বারা অপসারিত হইলে দেহে অবস্থান কালেই পূর্ণত্বের অনুভূতি হইতে পারে। অর্থাৎ দীক্ষার প্রভাবে পূর্ণত্বের উদয় হয় কিন্তু দেহগত ও বুদ্ধিগত মলিনতাবশতঃ উহার অভিব্যক্তি হয় না। সাধনার প্রভাবে বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে দীক্ষাপ্রাপ্ত পূর্ণত্ব অনুভূতি-গোচর হয়। সুতরাং সাধনার মহত্ত্ব নাই এই কথা বলা চলে না।

মা যে বলিয়াছেন দীক্ষার পরে বাহিরে ভিতরে তখনই স্ফুরণ হয় ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে স্ফুরণ না হইয়া পারে না। পৌরুষ অজ্ঞানবশতঃই মানুষ নিজেকে পরমাত্মারূপে না দেখিয়া অনন্ত প্রকার বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকে। যখন এই অজ্ঞান দূর হইয়া যায় তখন ভিতরে ভিতরে এই নানা ভাব কাটিয়া যায় এবং নিজের স্বকীয় ভাব বা স্ব-ভাবের স্ফুরণ হয়। কিন্তু স্ফুরণ হইলেও সকলে ইহা অনুভব করিতে পারে না। অনুভব না করিতে পারার কারণ বুদ্ধির জড়ত্ব এবং মলিনতা। সাধনা, উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে উক্ত স্ফুরণের অনুভবটা আপনিই উদিত হয়। মা যে বলিয়াছেন— "দীক্ষা পেয়ে সাধনায় কেউ হয়ত সিদ্ধ হল— কেউ হয়ত কিছুই পেল না, মরে গেল।" ইহার তাৎপর্য এই যে দীক্ষার পরে সাধনা দ্বারা বৌদ্ধ জ্ঞান উদয়

হইলে সিদ্ধিলাভ ঘটে। কিন্তু যে সাধনায় নিরত না হয় অথবা যাহার সাধনা সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত না হয় তাহার বৌদ্ধ জ্ঞান জন্মে না বলিয়া দেহে থাকিতে থাকিতে কোনও প্রকার অনুভব হয় না। এই জন্যই সে কিছু পেল না এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধনার অভাব অথবা উৎকর্ষের অভাব দীক্ষার সার্থকতার অন্তরায় নহে। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষালব্ধ অনাবরণ ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশ্ন এই— দীক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণ অখণ্ডের শক্তিপাতজনিত ব্যাপার হওয়া আবশ্যক। কারণ মূলে অখণ্ডের অনুগ্রহ শক্তি না থাকিলে দীক্ষা শুধু একটি বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্রে পরিণত হয়। ইহা হইতে যথার্থ ফল উদিত হয় না।

২ — সাধনক্ষেত্রে আত্মতৃপ্তির মুখ্য বিশ্লেষণ

স্থূলেই হউক অথবা সূক্ষ্মেই হউক মনুষ্য কখনও কখনও অচিন্ত্য কারণ বশতঃ নিজের মধ্যে একটা আকস্মিক তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। এ তৃপ্তির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে অভাববোধ তাহাকে বিভিন্ন কর্মের প্রেরণা দিতেছিল তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। কেহ কেহ এই তৃপ্তিকেই দীক্ষাদি অনুগ্রহ ব্যাপারে ফল বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য নহে। কারণ এই তৃপ্তি যদি তৃপ্তি রূপেই আত্মপ্রকাশ করে এবং ইহার সঙ্গে একটি অচিন্ত্য পরমতত্ত্বের স্পর্শ বোধ না থাকে তাহা হইলে ইহার মূল্য খুব অধিক নহে। আধ্যাত্মিক এই জাতীয় তৃপ্তিকে 'তুষ্টি' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। উহা সাধনপথের বিঘ্ন স্বরূপ। কিন্তু এই তৃপ্তি যদি শুধু তৃপ্তি না হইয়া প্রকৃত সত্যের নিদর্শন হয় তাহা হইলে উহা একটি মূল্যবান সম্পদ রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এইজন্য অনেক সময় কেহ তৃপ্তিলাভ করিলেও সে যে পূর্ণ সত্যের স্পর্শ পাইয়াছে তাহা বলা চলে না। কারণ হয়ত সে পাইয়া থাকিলেও ঠিক ঠিক উহা ধরিতে পারে না, অথবা স্পর্শ না পাইয়া না থাকিলেও পাইয়াছি বলিয়া মনে করে। তবে প্রথম অবস্থায় এই রূপ সংশয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও যখন ঐ অবস্থাটি

ধীরে ধীরে পরিপক্বতা লাভ করে তখন সকল সংশয় কাটিয়া যায় এবং সে নিজেকে নিজে চিনিতে পারে। তাই মা বলিয়াছেন—"যিনি গ্রহীতা তিনি যদি একবার খাঁটি সোনা হয়ে ওঠেন তবে তিনিই সময়ে বুঝে নেবেন।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে একেবারে খাঁটি সোনা না হওয়া পর্যন্ত সংশয় থাকা স্বাভাবিক। ইহা নিজের সম্বন্ধে যেমন সত্য, অপরের সম্বন্ধেও তেমন সত্য।

৩ — শক্তি সঞ্চার ও ক্রিয়া-দীক্ষা

পূর্বেই বলা হইয়াছে গুরু-শক্তির সঞ্চারই অর্থাৎ অখণ্ড পূর্ণ সত্তার অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চারই জীবের পূর্ণত্ব লাভের একমাত্র উপায়। এই শক্তি সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য ক্রিয়া দীক্ষা আবশ্যক হইতে পারে। আবার কোনও কোনও স্থলে বাহ্য দীক্ষার আবশ্যকতা নাও থাকিতে পারে। খণ্ড গুরু যত বড়ই হউন প্রকৃত গুরু নন। কারণ অখণ্ড গুরুর শক্তি তাঁহাতে সঞ্চারিত না হইলে তিনি অখণ্ড গুরুর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করিতে পারেন না এবং জীবকে শক্তি সঞ্চারও করিতে পারেন না। কারণ "স্বয়ম্ অসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়েৎ।" অর্থাৎ নিজে সিদ্ধ না হইলে অন্যকে সিদ্ধির পথ দেখাইতে পারা যায় না। দীক্ষা দুই প্রকার। তদনুসারে অনুগ্রহ শক্তির সঞ্চারও দুই প্রকার। একটি নিরধিকরণ এবং অপরটি সাধিকরণ। অর্থাৎ যখন শ্রীভগবান সাক্ষাৎভাবে কাহাকেও কৃপা করেন ও অন্য কোনও মনুষ্য বা সিদ্ধপুরুষ বা দেবতাদির মধ্যস্থতার অপেক্ষা রাখেন না, তখন তাঁহার সেই অনুগ্রহকে নিরধিকরণ অনুগ্রহ বলে— অর্থাৎ Immediate and Direct Grace. কিন্তু যখন কোনও না কোনও উচ্চস্তরের দেহকে মাধ্যম করিয়া অর্থাৎ সেই সেই দেহকে আশ্রয় করিয়া কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করেন তখন এই অনুগ্রহ প্রণালীকে সাধিকরণ অনুগ্রহ বলে। অনুগ্রহের মাত্রা অত্যন্ত তীব্র হইলে মধ্যস্থ পুরুষের প্রয়োজন হয় না। তীব্রতার

পরাকাষ্ঠা যখন হয় তখন সাক্ষাৎ ভাবেই ঐ শক্তি পতিত হয় ও জীবকে একই মহাক্ষণে শিবরূপে পরিণত করে। কিন্তু অনুগ্রহের মাত্রা পূর্বাপেক্ষা কম হইলে ঐ শক্তি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন সাধকের হৃদয়ে প্রাতিভ জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞান গুরু হইতে অথবা শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা নিজের চিত্তে আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠে। ইহা অনৌপদেশিক জ্ঞান। যোগিগণ ইহাকে 'তারক জ্ঞান' বলিয়া থাকেন। ইহাতে একই মুহূর্তে অতীত অনাগত বর্তমান আন্তর ও বাহ্য সমগ্র পদার্থের পরিস্ফুট জ্ঞান উদিত হয়। ইহাকে higher intuition বলা যাইতে পারে। এই স্থলেও বাহ্য গুরুর আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু অনুগ্রহের মাত্রা আরও কম হইলে তদনুসারে বিভিন্ন স্তরের বাহ্য গুরুর প্রয়োজন হয়। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে বাহ্য দীক্ষা সর্বত্রই যে আবশ্যক এমন কোনও কথা নাই। অবশ্য আধার অত্যন্ত মলিন হইলে বাহ্য দীক্ষার প্রয়োজন থাকে ইহা সত্য। মোট কথা মা বলিয়াছেন—"ভিতরে খাঁটি প্রকাশ হলে তখন আর বাইরের অভাব থাকে না।" অবশ্য এই খাঁটি প্রকাশের নানা প্রকার লক্ষণ আছে।

৪ — জপ সমর্পণ

জপ সমর্পণ সম্বন্ধে আমাদের দেশে শাস্ত্রানুগত প্রচলিত প্রথা যে আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ যে বাক্য উচ্চারণ করিয়া অথবা স্মরণ করিয়া অনুষ্ঠিত জপ সমর্পণ করিতে হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে জাপকের ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভের পক্ষে এই সমর্পণ প্রণালী অত্যন্ত অনুকূল। যথাবিধি জপক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতার অন্তঃকরণে একটি শুদ্ধ তেজের অভিব্যক্তি হয়। ইহাতে ব্রহ্মবর্চস বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইহা ঠিক তাহা না হইলেও তাহার আভাস মাত্র। এই সাত্ত্বিক তেজ দেহ

ও অন্তঃকরণে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই জপক্রিয়ার ফল। ইহাকে নিজের মধ্যে সঞ্চিত না রাখিয়া বিশিষ্ট কোনও স্থানে সুরক্ষিত রাখার জন্য অর্পণ করাই জপ সমর্পণের উদ্দেশ্য। এই সুরক্ষিত স্থান ইষ্ট অথবা গুরু ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না। দেহাবচ্ছিন্ন সত্তার ঊর্ধ্বে নির্মল চিদাকাশে গুরু অথবা ইষ্টের চরণে কর্মফল অর্পণ করা উচিত। এইজন্যই শাস্ত্রে অর্পণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। নিজের মধ্যে সঞ্চিত থাকিলে ক্রিয়মাণ কর্মের দ্বারা উহা নষ্ট হইবার বা বিকৃত হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু শুদ্ধ স্থানে অর্পিত হইলে উহার উপর নিজ কর্মের প্রভাব পতিত হয় না। এই সাত্ত্বিক তেজ ক্রমিক অর্পণের ফলে ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়। বৃদ্ধির মাত্রা ষোলকলা পূর্ণ হইলে ইহা আর গুপ্ত থাকিতে পারে না। নিজেকে নিজে প্রকাশ করে। ইহাকে মন্ত্রসিদ্ধির অবস্থা বলিয়া আচার্যগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই জন্য জপসমর্পণের বাক্যে আছে—"সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি (বা দেব)" ইত্যাদি। অবয়বের পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধি না হইলে সিদ্ধি হয় না, এবং কর্মফল ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে না—নিজের অপরাধের এবং অসাবধানতার ফলে অনর্পিত তেজ নষ্ট হইয়া যায় ও বহুদিনের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই জন্য দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও অনেক সময়ে সফলতা লাভ করা যায় না। কতদিন পর্যন্ত এই সমর্পণ কার্য করিতে হইবে তাহাও এক প্রকার নিশ্চিতই আছে। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত সঞ্চিত তেজ ষোলকলাতে পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত সঞ্চয় ও সংরক্ষণ উভয়ই আবশ্যক। মাত্রা পূর্ণ হইলে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। ভিতরের বস্তু আপনিই ফুটিয়া বাহির হয়। দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া মা যেমন সন্তানকে প্রসব করেন সাধকের দেহও তেমনি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সাধনতেজকে ভিতরে ধারণ করিয়া রাখে। পরে যখন উহা পূর্ণ হইয়া বাহিরে প্রকট হয় তখন উহার সাক্ষাৎকার হয় এবং উহা 'সিদ্ধি' নামে অভিহিত হয়। সুতরাং মন্ত্র সমর্পণ একটি বৃথা

অমূলক অনুষ্ঠান নহে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে এই সমর্পণ-ব্যাপার ভাবাত্মক। শুধু বাহ্যক্রিয়া নহে। যদি কেহ জপ-সমর্পণ না-ও করে অথচ সদ্‌গুরু নিত্য জাগ্রত ভাবে শিষ্যের নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী রূপ ধারণ করিয়া পশ্চাতে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে তিনি উহা সংরক্ষণ করিবার ভার গ্রহণ করেন। শিষ্য বাহির হইতে কিছুই বুঝিতে পারে না। তখন বাহ্যতঃ জপ-সমর্পণ না হইলেও গুরুই জপকে সুরক্ষিত রাখিবার ভার গ্রহণ করেন।

আটাশ

১ — পূর্ণ জ্ঞান ও স্মৃতি

আত্মজ্ঞানের পর স্মৃতি থাকে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলিয়াছেন, "যখন জ্ঞান হয় হওয়া মাত্র নিত্যত্ব প্রকাশ। ঐ যে আলোর তলে অন্ধকারটা বলে কি করে? আলোতেই তো।" বিষয়টি অত্যন্ত গভীর। অদ্বৈত আত্মস্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান উদিত হওয়ার পর পরবর্তী কোন সময়ে ঐ জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল জ্ঞানীর পক্ষে ঐরূপ স্মৃতি থাকা সম্ভবপর কিনা? ইহা অতি জটিল প্রশ্ন। যখন অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন একটি মহাক্ষণের মধ্যেই পরিপূর্ণ জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই স্থলে কেহ কেহ মনে করেন যে জ্ঞান যখন অন্তঃকরণের বৃত্তিস্বরূপ তখন জ্ঞানজন্য সংস্কার উৎপন্ন হওয়ার কথা এবং সংস্কার হইতে পরবর্তী সময়ে স্মৃতির উদয় হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই প্রকার বিচার সঙ্গত নহে, কারণ আত্মসাক্ষাৎকার অথবা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার কালের ক্রম ধরিয়া উৎপন্ন হয় না। ইহা কাল-সংকর্ষণী শক্তির খেলা। আত্মসাক্ষাৎকার প্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাল নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহা হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয় না।

ইহা অন্তঃকরণের বৃত্তিজ্ঞানরূপে বর্ণিত হইলেও বস্তুতঃ ইহা অন্তঃকরণের অতীত স্বরূপাত্মক জ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয় হওয়া আর অপ্রকট আত্মস্বরূপ নিজের নিকট নিজের প্রকট হওয়া একই কথা। ইহার সংস্কার নাই কার্যরূপে, এবং কারণরূপে ইহার হেতুও নাই। ব্যবহার ভূমিতে ইহা লৌকিক বৃত্তিজ্ঞানের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ইহা যাবতীয় জ্ঞানবৃত্তি হইতে বিলক্ষণ। বুদ্ধদেবের যে মহাজ্ঞান উদিত হইয়াছিল উহা দার্শনিকগণ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারেন নাই। আকস্মিক বিদ্যুৎচমকের ন্যায় উহাকে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক প্রভার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব ক্ষণের মধ্যে প্রতিভাত হয়। বুদ্ধদেবেরও ঐ এক ক্ষণিক মহাজ্ঞান দ্বারা দুঃখ, দুঃখের হেতু, দুঃখের নির্বাণ এবং নির্বাণগামী মার্গ এই চারিটি আর্যসত্য একসঙ্গে সংশয় রহিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জ্ঞান সংস্কারের আধান করে না এবং পরম্পরা ক্রমে স্মৃতিতে পর্যবসিত হয় না। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, যে প্রকৃত জ্ঞানী সে কখনই আপন সাক্ষাৎকারকে পরবর্তীকালে স্মরণ করে না। ক্ষণমধ্যে যে প্রকাশের উদয় উহা নিত্যপ্রকাশ। অনেকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিতে পারেন, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর জীবন্মুক্তি হয় কি প্রকারে। আগমশাস্ত্রে ইহার সুস্পষ্ট বিবেচন লক্ষিত হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর ঐ সাক্ষাৎকার সাধারণ চিত্তবৃত্তির ন্যায় নিবৃত্ত হয় না এবং সংস্কার আধান করে না। উহা দেহাবস্থান কাল পর্যন্ত সর্বদাই অনুবৃত্ত থাকিলেও বুদ্ধিক্ষেত্রে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত উহাকে অনুভবরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৌদ্ধজ্ঞানের ফলে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু সাক্ষাৎকারের সংস্কার হয় না। এই সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে এই সাক্ষাৎকারাত্মক মহাজ্ঞান কালাতীত। কাশ্মীরীয় সিদ্ধ মহাত্মা উৎপলাচার্য অতি সুন্দর একটি কারিকাতে এই সাক্ষাৎকারের স্পষ্ট বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আত্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশের বিবরণ প্রসঙ্গে এই স্থিতির বর্ণনা দিয়াছেন। ইহা একটি প্রসিদ্ধ সত্য যে আত্মজ্ঞানের বিকাশের ক্রমিক ধারার মধ্যে যখন সমনা

অবস্থার উদয় হয় তখন কালসাম্য অবস্থা প্রকাশিত হয়। ঐ সময় কালের নিজ সত্তা পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইয়া যায়। এই অবস্থার প্রাপ্তিতে যোগীর নিকট অনন্তকাল একটি ক্ষণের তুল্য প্রতীত হইয়া থাকে। উৎপলদেব এই অবস্থা প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন—

> ন তদা ন সদা ন চৈকদেত্যপি সা যত্র ন কালধীর্ভবেৎ।
> তদিদং ভবদীয় দর্শনং ন চ নিত্যং ন চ কথ্যতেঽন্যথা।।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে আত্মসাক্ষাৎকার অথবা ভগবৎ সাক্ষাৎকার কালের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। তাই ইহা নিত্যও নয়, অনিত্যও নয়। এই অবস্থায় কালের কলনা থাকে না। প্রাচীন ক্রমবিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইহাকে মহাকাল-কালীর অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রমস্তোত্রে এই স্থিতি বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—

> নক্তং মহাভূতলয়ে শ্মশানে দিক্ খেচরীচক্রগণেন সাকম্।
> কালীং মহাকালমলং গ্রসন্তীং বন্দে অচিন্ত্যাং অনিলানলাভাম্।।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে এই অবস্থা শুধু কালের অতীত নহে, মহাকালেরও অতীত। কারণ এই অবস্থায় মহাকালও থাকে না। দেহের সহিত তাদাত্ম্য-মূলক প্রমাতৃভাব, প্রাণ প্রমাতৃভাব, পূর্যষ্টক প্রমাতৃভাব এমন কি শূন্য প্রমাতৃভাব সবই পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন অন্তঃপ্রকাশ পূর্ণ হৃদয়রূপী শ্মশানে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় স্থানে বিরাজমান চিদ্রূপা মহেশ্বরী বিভিন্ন প্রকার শক্তিবর্গের সহিত মহাকালকে গ্রাস করেন। তিনিই মহাকালকালী নামে সিদ্ধগণের নিকট প্রসিদ্ধ।

এই যাহা বলা হইল ইহা একদিকের কথা। ইহাই পরমার্থ বা তত্ত্বের দিক; কিন্তু একটা ব্যবহারের দিকও আছে, কেননা অখণ্ডে কিছুই বাদ যায় না। যখন সেই দৃষ্টিতে দেখা যায় তখন ব্যবহারের দৃষ্টি, তখন আত্ম-স্বরূপ চিত্ত এবং আনুষঙ্গিক ভৌতিক সত্তা প্রভৃতি সবই স্বীকার করা

চলে। যখন সেই দৃষ্টিতে দেখা যায় তখন সাক্ষাৎকারকে অনুভবের সহিত এক করিয়া লইয়া অনুভবজন্য সংস্কার-মূলক স্মৃতির কথা বলা চলে। কারণ অখণ্ড সত্তাতে বাদ দিবার কিছুই নাই, তবে কোনটা পরমার্থ বা কোনটা ব্যবহারের দিক তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। অন্ধকার নাই আবার অন্ধকার আছেও বটে এবং তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থান্তর ঘটে ইহাও সত্য। ঐ যে মা বলিয়াছেন— "ঐ যে আলোর তলে অন্ধকারটা বলে কি করে? আলোতেই ত।" এইটি স্বীকার করিতে না পারিলে এবং বোধগম্য না হইলে জীবন্মুক্তের পক্ষে তত্ত্বের উপদেশ দান সম্ভব হইত না। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে অনুভব সাক্ষাৎকারকে স্পর্শ করিতে পারে না অথচ না করে যে এমনও নহে। একই স্রোতে একদিকে যেমন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপে অবিদ্যা ভাসে অন্যদিকে তেমনি তুরীয় রূপে পূর্বোক্ত অবিদ্যার জ্ঞানও ভাসে, পক্ষান্তরে তুরীয়াতীতে বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ প্রতিভাস থাকে না—উভয়ের অন্তরালবর্তী অখণ্ড সত্তার প্রকাশ হয়। তাহাতে আছে ও নাই এই বিরূদ্ধ ভাবের নিত্য সমন্বয় হইয়া যায়। ইহাতে অবিদ্যার স্পর্শও নাই, বিদ্যার স্পর্শও নাই অথচ উভয়ই আছে।

২ — মনের চঞ্চলতা

মন চঞ্চল—চঞ্চলতাই তাহার স্বভাব, কিন্তু বস্তুতঃ মন চঞ্চল কেন, ইহার প্রকৃত রহস্য কি তাহা অনেকেই অনুধাবন করে না। এই প্রসঙ্গে মা যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন তাহা বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। মা'র বক্তব্যের সারাংশ এই যে মন পূর্ণতা চায়, অর্থাৎ তৃপ্তিলাভ করিতে চায়, তাই সে চঞ্চল। তৃপ্তিই আনন্দস্বরূপ। চঞ্চল মন আনন্দের প্রার্থী। আনন্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন স্থির হইয়া যায়, তাহার সর্বপ্রকার চঞ্চলতা দূর হইয়া একদিকে পরম শান্তি অপরদিকে আনন্দের আবির্ভাব হয়। মন মহাশক্তির একটি ক্ষুদ্র রশ্মি মাত্র, কণাও বলা যাইতে

পারে। তাই উহা নিরন্তর অভাবগ্রস্ত। স্বরূপে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মনের চঞ্চলতা দূর হইতে পারে না। জাগতিক সকল পদার্থের ন্যায় মনও ত্রিগুণাত্মক। তাহাতে একদিকে রজোগুণের খেলা হয়, একদিকে স্তব্ধ জড়ত্ব লাগিয়া থাকে, আর একদিকে শুদ্ধ প্রকাশের উদয় হয়। মন তমোগুণ প্রধান হইলে তাহাতে স্তব্ধতা আসিয়া পড়ে। ইহা জড়ত্বের নামান্তর এবং সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইলে জড়ত্ব কাটিয়া যায়। লাঘব এবং প্রকাশময়ত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মন নিজের স্বরূপে থাকিলে স্বভাবতই তমোগুণকে পরিহার করিয়া সত্ত্বগুণকে আশ্রয় পূর্বক গুণাতীত পরমানন্দময় স্বরূপ-সত্তায় অবগাহন করে। মধুকর যেমন মধু পানের জন্য মধুপূর্ণ পুষ্পের চারিদিকে উড়িয়া বেড়ায় ও নিরন্তর গুঞ্জন করিতে থাকে মনও সেইপ্রকার একটি সুখময় আস্বাদের জন্য তৃষ্ণার্ত হইয়া ঘোরাফেরা করে। স্থায়ী আনন্দের স্পর্শ পাইলে মনের চঞ্চলতা কাটিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশগুণের বিকাশ হয়, যাহার ফলে উহা চির আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া চঞ্চলতা পরিহার পূর্বক মহাশক্তির স্বরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া অখণ্ড সত্তাতে জাগিয়া উঠে। মনে রাখিতে হইবে যে মনের স্তব্ধতা গুরুত্বের সূচক। উহা জড়ত্বের নামান্তর মাত্র। আবরণ সরিয়া গেলে এই জড়ত্ব কাটিয়া যায় এবং তাহার পর শান্ত প্রকাশে মন আত্মসমর্পণ করে। ইহাই নিবৃত্তির অবস্থা। ইহার ফল শান্তি ও পরমানন্দের স্থিতি। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ সাধারণতঃ মনকে তটস্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য এই যে মন স্বরূপতঃ আলো আঁধারের সন্ধিতে অবস্থিত। তথাপি ইহা সত্য যে অধ্যাত্মবিকাশের ফলে ইহা অন্ধকার ত্যাগ করিয়া আলোর দিকে অগ্রসর হয় এবং চরম অবস্থায় ইহা আলোর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেও ইহার স্বরূপগত তটস্থভাব নষ্ট হয় না, তাই ইহা আলোতে ডুবিয়া না গিয়া আলোর বাহকরূপে অন্ধকার রাজ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। স্বচ্ছ মন ব্যতিরেকে আনন্দময় আলোর সন্ধান আর কেহই দিতে পারে না।

৩ — কাম ও প্রেম

কাম ও প্রেমের স্বরূপগত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন "কাম সৃষ্টি করে, তাই মোহ। তাই বলে ভগবৎ টান হলে প্রেম আর জাগতিক টান হলে কাম।"

মা'র এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য অতি গভীর। সাধারণতঃ আমরা কাম ও প্রেমের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি না। প্রাচীন বৈষ্ণব তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে স্বরূপদৃষ্টিতে কাম ও প্রেমের কোন ভেদ নাই। চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ইহাই বলিয়াছেন। ভেদ না থাকার কারণ এই যে দুইটিই ইচ্ছাস্বরূপ কিন্তু স্বরূপগত একত্ব থাকিলেও আগন্তুক মল সম্বন্ধবশতঃ উভয়ের মধ্যে বিশাল ভেদ রহিয়াছে। যে ইচ্ছা নিজের তৃপ্তি সাধক—নিজের তৃপ্তির দিকে উন্মুখ তাহারই নাম কাম। যে ইচ্ছা নিজের ব্যক্তিগত তৃপ্তির প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া ভগবান অথবা ইষ্টবস্তুর তৃপ্তির বিধানে নিত্য উন্মুখ থাকে তাহাকে প্রেম বলা হয়। কামের লক্ষ্য ভোগ করা—প্রেমের লক্ষ্য ত্যাগ করা। কাম হইতে দ্বৈতের সৃষ্টি হয়— বিশ্ব জগতের আবির্ভাব হয়; এবং প্রেম হইতে দ্বৈতের সংহার হয় ও বিশ্বজগতের অন্তর্গত ভেদভাব তিরোহিত হয়। কাম দুই ব্যতীত হয় না, প্রেমও তদ্রূপ দুই ব্যতীত হয় না। কামে একজন অপরজনকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু প্রেমে একজন অপরকে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা করে। ভোগের পথে ভেদ ও অনন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় কিন্তু আত্মসমর্পণের পথে অনন্ত বৈচিত্র্যের লোপ হইয়া এক অদ্বৈত স্বরূপে স্থিতি হয়। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে স্থূলতঃ কাম ও প্রেম একজাতীয় মনে হইলেও উভয়ে স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে, উভয়ের পরমসত্তা ইচ্ছারূপ। একদিকে ইচ্ছা হইতে অনন্ত জগতের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে ইচ্ছা নিবৃত্ত হইয়া পরমানন্দের আবির্ভাব হয়। শাস্ত্রে আছে ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি সৎ অখণ্ড সত্য, নিষ্কল ও নিরঞ্জন, শুধু সৎমাত্র নহেন। এই সত্তা মহাপ্রকাশময়—তাই ইহা চিৎ। কিন্তু শুধু ইহা

প্রকাশ নয়—ইহা অনুকূল প্রকাশ। ইহাতে প্রতিকূলতা নাই, বিরোধ নাই। কারণ দ্বিতীয় হইতে বিরোধ হয়, এখানে দ্বিতীয়ের কোন স্থান নাই। কিন্তু দ্বিতীয় না থাকিলেও একই দুই সাজিয়া নিজেকে নিজে আস্বাদন করেন। ইহারই নাম আনন্দ। ইহাই প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ। এখানে আশ্রয় ও বিষয় এক। কারণ যিনি আস্বাদন করেন তিনি যাহা এবং যাহাকে আস্বাদন করেন তিনিও তাহাই। ইহাই সচ্চিদানন্দ রহস্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই প্রেমের তত্ত্ব।

বিশেষ শব্দ বিবরণ

অভাব ও স্বভাব— পৃঃ ৩৯

মানব জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমরা সর্বদা অভাবের তাড়না অনুভব করিতেছি। এই অভাব দূর হইতে পারে একমাত্র স্বভাবের দ্বারা। কিন্তু আমরা স্বভাবকে চিনি না, তাই অভাবের দ্বারা অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করি। অভাবকে স্বভাবের স্থানে বসাই— তাই অভাব দূর হয় না এবং তৃপ্তিও আসে না। অভাবের তাড়নায় যাহাকে ভাবরূপে গ্রহণ করি পরে দেখিতে পাই তাহা অভাবেই পর্যবসিত হয়। এইপ্রকার অনন্তকাল চলিলেও অভাব নিবৃত্ত হইবার আশা নাই। অভাবনিবৃত্তি তখনই হইতে পারে যখন স্বভাবের প্রাপ্তি ঘটে। পিপাসা পাইলে জলের অভাব বোধ হয়, তখন জলকে আমরা স্বভাব বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু জল তো স্বভাব নহে, স্বভাবের আভাস মাত্র। তাই জল পাইলেও আবার পিপাসার উদয় হয়। চিরদিনের জন্য পিপাসা নিবৃত্ত হয় এমন জল সংসারে নাই, এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। আমরা কোন স্থলেই স্বভাবকে পাইতেছি না। স্বভাবের আভাসমাত্র দিয়া অভাবকে সাময়িকভাবে তৃপ্ত করি মাত্র। প্রকৃত স্বভাবের প্রাপ্তি যখন ঘটিবে তখন চিরদিনের জন্য অভাব মিটিয়া যাইবে এবং অভাবের ক্রন্দন জাগিবে না। বাস্তবিক পক্ষে তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে অভাব ও স্বভাব মূলে একই বস্তু। যিনি পূর্বে অভাবরূপে প্রকাশ পান, তিনিই পরে স্বভাবরূপে ফুটিয়া উঠিয়া অভাবের চির অবসান করিয়া দেন। বস্তুতঃ অভাব ও স্বভাব একই বস্তুর দুইটি দিক। স্বভাবরূপে আত্মপ্রকাশের পূর্বে আদিতে তিনি অভাবরূপে ফুটিয়া উঠেন। তাই মা বলিয়াছেন—"অভাব ও স্বভাব এক জায়গায়ই—একমাত্র ঐ-ই।"

অনুত্তর ধাম— পৃঃ ১২৫

এইখানে মাতৃকাচক্রবিবেক নামক আগম গ্রন্থের রচয়িতা একজন মহাসিদ্ধের মত প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি বলেন লোকে সাধারণতঃ সংসারের যতটা বিস্তার মনে করে তাহার পরেও সংসার রহিয়াছে। এই সকল বিচারই আপেক্ষিক। তদনুসারে পশুর যেমন সংসার আছে, তেমনি শিবেরও সংসার আছে। আবার পশুও নয়, শিবও নয় এমন যে পরম শিব তাঁহারও সংসার আছে। তবে এই সব সংসার পৃথক্ পৃথক্। পশুর অর্থাৎ জীবের সংসার দ্বৈতভাবময়। অবিদ্যার প্রভাবে ভেদভাব এই সংসারে নিত্য জাগ্রত রহিয়াছে। পরন্তু শিবের সংসার এরূপ নহে। এরূপ সংসারকে তিনি বলিয়াছেন অদ্বৈত সংসার। বিদ্যার প্রভাবে অভেদজ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্বৈত সংসারের আবির্ভাব হয়। জীব ও শিবের সংসারের ন্যায় পরম শিবেরও সংসার আছে। একই সঙ্গে বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রভাব থাকিলে যুগপৎ ভেদাভেদের স্ফুরণ হয়— ইহাই পরম শিবের সংসার। এই তিনটি অবস্থা সংসার পদবাচ্য, কেননা অন্তর্মুখ বিশ্রামরূপী অবস্থা এখানে নাই। এই তিন সংসারের ঊর্ধ্বে যে শান্তিধাম লক্ষিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত বিশ্রামপদ। ইহারই নাম অনুত্তর ধাম অথবা বিন্দু। আত্মা সেই অবস্থায় নিরন্তর অন্তর্মুখে বিশ্রান্ত থাকেন। ইহাই বিশ্রামস্থান। কিন্তু বিশ্রামস্থান হইলেও মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত তিন সংসারের অনুসন্ধান এইখানে লক্ষিত হয়। ইহারও অতীত যে স্থিতি তাহারই নাম 'মহাবিন্দু'। বৈদিক সাহিত্যে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহাকেই 'পরমব্যোম' বলা হইয়া থাকে। এই অবস্থাটি অত্যন্ত উন্নত অবস্থা। বস্তুতঃ পূর্ণত্ব এই স্থানেই প্রকাশিত হয়। এই মহাবিন্দুই অখণ্ড মহাসত্তার কেন্দ্রবিন্দু। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও তুরীয়াতীতেরও অতীত এই অবস্থা।

অভিনয়— পৃঃ ৩

কেহ কেহ মনে করেন স্বরূপে স্থিতি হইলে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ব্যবহার করা চলে না। ব্যবহার ভূমিতে আসিতে হইলে মনের সাহায্য নিয়া ত্রিপুটীক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। এই দৃষ্টিতে প্রতিভাস ও ব্যবহার সত্য হইলেও পারমার্থিক সত্য নহে। ব্যবহার ব্যবহারিক সত্য নিয়া হইয়া থাকে। স্বরূপস্থিতিতে ঐ ব্যবহারিক সত্তাদি সব বাধিত, কিন্তু স্বরূপস্থিতির ধারণা আরও ব্যাপক ও গভীর হইলে দৃষ্টি ভিন্ন হইয়া যায়। তখন স্বরূপ স্থিতি হইতে ব্যবহারভূমিতে স্বরূপসত্তা ত্যাগ করিয়া অবতীর্ণ হইতে হয় না। বস্তুতঃ আত্মা অখণ্ড, অদ্বৈত সমস্ত ভেদ, ব্যবহার, প্রতিভাস প্রভৃতি সমস্তই উহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান। স্বরূপের বাইরে কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। ঐ দৃষ্টি অনুসারে একই অখণ্ড সত্তাতে নিত্য বিরাজমান থাকিয়া আন্তর ও বাহ্য উভয় কার্য চলিতে পারে। ইহাকেই লীলা অথবা অভিনয় বলে। জ্ঞানী পুরুষ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি অজ্ঞানী শিশুর সঙ্গে নিজেও শিশুর ভাবেই ভাবিত থাকিয়াই ব্যবহার করিতে পারেন, কারণ জগতের যত বিচিত্র স্থিতি সবই এক মহাস্থিতিতে অনুস্যূত রহিয়াছে। এই জন্যই মা নিজেই বুঝাইয়াছেন যে যাহাকে সাধারণে অভিনয় বলে তাহা স্বরূপস্থিতি হইতে চ্যুত হইয়া নামিয়া আসার কথা নহে, কারণ আত্মা সব সময় স্বরূপে স্থিতই থাকেন—তাহার নামা উঠা নাই। তিনি যে ব্যবহার করেন উহা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। যাহার সঙ্গেই হউক না কেন উহা নিজের সঙ্গেই নিজের ব্যবহার। দ্বিতীয় তো কেহ নাই। এই অদ্ভুত স্থিতিতে ব্যবহার করা এবং ব্যবহারের অতীত সত্তাতে স্থিত থাকা সম্পূর্ণ অভিন্ন। যাহা কিছু ভেদ তাহা অজ্ঞানীর দৃষ্টি। স্বরূপস্থিতি ঠিকভাবে সম্পন্ন হইলে এই অনন্ত বৈচিত্র্য সেই একেরই স্বেচ্ছাগৃহীত বিলাস মাত্র। তাই ইহাকে অভিনয় বা লীলা বলা হয়। মনকে গ্রহণ করা না করার প্রশ্নও উঠে না, কারণ এই দৃষ্টিতে মনও তো আত্মারই এক রূপ, সুতরাং ব্যুত্থান ও সমাধির প্রশ্ন কোথায়?

অন্তর গুরু— পৃঃ ১১

যিনি অজ্ঞানান্ধ জীবের দৃষ্টিকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা উন্মীলিত করেন, তাহাকেই বস্তুতঃ গুরু বলা হইয়া থাকে। সুতরাং গুরুতত্ত্ব বা সদ্‌গুরুতত্ত্ব মূলে ভগবৎ তত্ত্বেরই অন্তর্গত। ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপের মধ্যে একটি স্বরূপ আছে যাহাকে অন্তর্যামী বলা হইয়া থাকে। অন্তর্যামী রূপে ভগবান প্রতি জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। অনন্ত প্রজ্ঞা ও করুণা এই স্বরূপে নিহিত আছে। প্রত্যেক জীবের সঙ্গেও এই স্বরূপটি নিহিত। ইহা প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেও ইহার দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয় না, কারণ ইহা প্রবুদ্ধ না হইলে যথোচিত কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। যাহাকে আমরা বাহ্য জগতের অধিষ্ঠাতা ভগবান বলি, তিনি ও এই অন্তর্যামী পুরুষ একই বস্তু। ইহাকে জাগাইতে হইলে বাহির হইতে গুরুশক্তির ক্রিয়া আবশ্যক। অবশ্য অবস্থা বিশেষে বাহিরের উদ্দীপন না থাকিলেও আপনা আপনিই ইহা জাগিতে পারে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিরল। এক প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তর জ্বালান সহজ, কিন্তু চক্‌মকি পাথর ঘসিয়া আগুন জ্বালান কঠিন। ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই বাহ্যগুরু দুই প্রকার— একটি হইল সব জগতের অধিষ্ঠাতা ও তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চারক স্বয়ং ভগবান। তিনি কালাবচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া জগতের সকল গুরুরই তিনি একমাত্র গুরু। সাক্ষাৎ ভাবে তাহার নিকট হইতে জ্ঞান পাওয়া অতি কঠিন, বিশেষতঃ ইহা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে এক প্রকার দুর্লভই বলা যাইতে পারে। প্রলয়ের সময় জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলে যখন আত্মা সকল বিদেহ অবস্থায় থাকেন, তখন যাহাদের মল পরিপাক হইয়াছে, তাঁহারা অযাচিত ভাবে সাক্ষাৎ ভগবৎ কৃপা লাভ করেন। এই কৃপার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জ্ঞানদেহের প্রাপ্তি হয় এবং তখনই জ্ঞাননেত্রেরও উন্মীলন ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টির সময়ে যখন জীবের দেহাভিমান বিদ্যমান থাকে, তখন দেহী গুরুর আবশ্যকতা হয়। এই দেহী গুরুও ভগবানের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ সম্পন্ন।

ইনিই জীবের দীক্ষাদি কার্য সম্পন্ন করেন। নিজের অন্তঃসত্তা জাগ্রত হইলে নিজের মধ্যেই সব সময় তাঁহাকে পাওয়া যায়। ইহাকেই অন্তর্যামী বা অন্তরগুরু বলে। যখন গুরুশক্তি জাগ্রত হয় এবং কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ হয় তখন ভিতর হইতেই গুরুশক্তির ক্রিয়া অনুভব করা যায়। গুরুতত্ত্বের প্রকাশ যেখানে যেভাবেই হউক—মূলে কিন্তু এক, অভিন্ন। গুরুর উপদেশও বাক্য দ্বারাও হইতে পারে, বিনা বাক্যেও হইতে পারে। এই মৌন উপদেশ হইতে শিষ্যের যাবতীয় সংশয় দুর হইয়া যায়। তাই বলে —গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্ন সংশয়াঃ। ইহা intuition ও revelation এর সন্ধি স্থলের অবস্থা।

অর্পণভাব— পৃঃ ৪৮

অর্পণভাব স্বরূপতঃ দুই প্রকার। একটি কর্ম ফলের অর্পণ এবং দ্বিতীয়টি কর্মার্পণ। প্রথমটি প্রাথমিক অবস্থা, দ্বিতীয়টি অন্তিম অবস্থা। কর্ম অহঙ্কার হইতে প্রসূত হয়। এই অবস্থায় কতৃর্ত্ব অভিমান থাকে, কিন্তু কর্ম ফলের দিকে লোভ না থাকিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং অপর দিকে বিশ্বকল্যাণ হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ জ্ঞানের উদয় হইলে বুঝিতে পারা যায় যে ‘আমি’ বস্তুতঃ কর্ম করি না। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আপন গুণের দ্বারা কর্ম করিয়া থাকে। আমরা অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করি। কিন্তু পরে বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতির গুণের দ্বারা কর্ম হয় বটে কিন্তু উহার অধ্যক্ষ পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই নিজ হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহাকেই কর্ম অর্পণ করিতে হয়। ইহারই নাম শরণাগতি, ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। এই অর্পণ ক্রিয়া সুচারুরূপে অর্পিত হইলে আর কোন দায়িত্ব থাকে না। এই অবস্থায়ই বলিতে পারা যায়—‘তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।’

আশ্রয়হীন আশ্রয়— পৃঃ ৩

মানুষ কর্তৃত্বাভিমান সম্পন্ন এবং মনোরাজ্যে নিবাস করিয়া থাকে। 'হ্যাঁ ও না' এই দ্বন্দ্বের মধ্যে তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। কারণ সৃষ্টির মধ্যে, ভিতরে ও বাহিরে এই দ্বন্দ্বের খেলা সর্বত্র বর্তমান। কেহ কিছু মানে এবং অপরে কিছু মানে না; অপর কেহ অন্য দিক্ দিয়া আবার কিছু মানে, কিছু মানেও না। অদ্বৈতসত্তা মায়ারাজ্যে সর্বপ্রথম এই দুই ভাবে প্রকাশিত হয়। দুই এর পর বহু ভাবের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু মানুষের যাহা যথার্থ লক্ষ্য সেখানে যাইতে হইলে এই দ্বন্দ্বের বাহিরে যাইতে হইবে। যে সত্যই দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারে তাহার পক্ষে ধ্যান ধারণা অথবা কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান প্রভৃতি মার্গ অবলম্বনের কোনই সার্থকতা নাই। মানুষ দ্বন্দ্বপীড়িত বলিয়া স্বীকার অস্বীকারের দিক্ আছে। সুতরাং দ্বন্দ্বের বাহিরে যাওয়া ও স্বীকার অস্বীকারের পারে যাওয়া একই কথা। এখানে প্রশ্ন উঠে তাহার জন্য তো আশ্রয় আবশ্যক, কারণ জগতের যাবতীয় বস্তু দ্বন্দ্বভাবে কলঙ্কিত। তাহাকে আশ্রয় করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হওয়া কি প্রকারে সম্ভব? এই প্রকার প্রশ্ন সাধারণের মনে উদিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এইখানে যে আশ্রয়ের কথা বলা হইল তাহা জাগতিক কোন বস্তু নহে—তাহা সেই দ্বন্দ্বাতীত সত্তা। তাহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এবং মনের দ্বারা আহ্বান করিয়া তাহাকে আশ্রয় করা যায় না। যাহার বিবরণ বাক্যের দ্বারা সম্ভবপর তাহার প্রাপ্তিও সম্ভবপর। যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না এমন যে আশ্রয় তাহাই প্রকৃত আশ্রয় তাহা চাহিতে হয় না, অথচ পাওয়া যায়। ইহারই নাম আশ্রয়হীন আশ্রয়। একমাত্র ইহাই দ্বন্দ্বের বাহিরে অর্থাৎ স্বীকার অস্বীকারের বাহিরে নিয়া যাইতে পারে।

একাংশ সর্বাংশ— পৃঃ ৩২

জাগতিক সকল বস্তুই নিরংশ নহে বলিয়া তাহাতে অংশগত ভেদ আছে। অংশ পরস্পর পৃথক্, সুতরাং জাগতিক দৃষ্টিতে এক অংশ হইতে অপর অংশের

ভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সর্বত্রই সব আছে— 'সর্বং সর্বাত্মকম্।' যে অংশ অভিব্যক্ত তাহাতে অব্যক্তরূপে অপর অংশ আছে। এই প্রকারে অংশের মধ্যে অংশী এবং অংশীর মধ্যেও অংশ আছে। একটি ক্ষুদ্র কণার মধ্যেও সমস্ত বিশ্ব আছে; কিন্তু তাহা অব্যক্ত বলিয়া কেহ দেখিতে পায় না। এইজন্য ব্যাসদেব যোগভাষ্যে বলিয়াছেন— 'জাত্যনুচ্ছেদেন সর্বং সর্বাত্মকম্।' গীতাতেও বলা হইয়াছে— 'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ' ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য এই যে প্রকৃত বুদ্ধিমান মনুষ্য কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখিতে পায় এবং অকর্মের মধ্যেও কর্মকে দেখিতে পায়। ইহাই কৃৎস্নদর্শন অর্থাৎ সমগ্র দর্শন। গুরুশক্তির ইহাই মহিমা যে তাহার প্রভাবে একাংশকে আশ্রয় করিয়াই সর্বাংশের প্রকাশ হয়। যে সর্বাংশ একাংশে অব্যক্ত রহিয়াছে তাহাই গুরুশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়। এইজন্যই গুরুর আদেশ পালন করা আবশ্যক, কারণ উহাতেই গুরুশক্তি নিহিত রহিয়াছে।

এর মধ্যেও অন্তর্মুখের সঙ্গে যোগ রয়েছে— পৃঃ ৮১

বিশ্ব রচনার দিকে দৃষ্টি দিলে জানিতে পারা যায় যে এক অখণ্ড মহাপ্রকাশ সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। সৃষ্টির ধারাতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় উহাই সর্বাতীত ও সকলের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। জাগতিক প্রবাহের দিক দিয়া আমরা সংযম ও নিরোধের মধ্য দিয়া অন্তর্মুখ গতিতে চলিতে চলিতে যতক্ষণ সেই মহাপ্রকাশে উপনীত না হই ততক্ষণ চলিতে হয়। অন্তর্মুখ গতির দ্বারা কখনও না কখন সেই মহাপ্রকাশে উপনীত হইবার আশা রাখি, কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে সে মহাপ্রকাশের কোন দ্বার নাই। অন্তর্মুখ গতিতেই যে সেই মহাপ্রকাশের প্রাপ্তি হইতে পারে, বহির্মুখীগতিতে যে হইতে পারে না এমন কোন কথা নাই। কারণ যে সত্তা সর্বত্রই রহিয়াছে তাহাকে একদিক দিয়াই পাইতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। কিন্তু এমনও স্থিতি হয় যে বহির্মুখী বিপরীত গতিতেও

সেই মহাপ্রকাশের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। আসল কথা এই সেই মহাপ্রকাশে যাইবার কোন পথ নাই। একটি মহা আবরণ সেই মহাপ্রকাশকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেই আবরণটি ঝট্ করিয়া সরিয়া গেলেই মহাপ্রকাশের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হয়। অন্তর্মুখী গতিতে গেলেও কখনও না কখনও সেই আবরণ সরিয়া গেলে মহাপ্রকাশের দর্শন লাভ ঘটিতে পারে। কিন্তু কদাচিৎ বহির্মুখ গতিতেও যদি সেই আবরণ সরিয়া যায় তাহা হইলে সেই মহাপ্রকাশের সাক্ষাৎকার হইবে না কেন। ইহা আদর্শ পথ নহে এবং লোক সমাজে আদর্শ রূপে প্রদর্শনের যোগ্য নহে কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে অনাদি কালের কর্মসংস্কার এবং তাহার পাকগত তারতম্য বশতঃ ইহা সম্ভবপর। দৃষ্টান্তরূপে বিল্বমঙ্গল অথবা St. Paul এর দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে বহির্মুখী গতি হইতেও কাল পরিপূর্ণ হইলে মহাপ্রকাশের সাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব নহে। মা বলিয়াছেন—'এই যে বাহিরে এনে দেয়, এর মধ্যেও অন্তর্মুখের যোগ আছে।' সেই মহাসত্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে অসম্ভব কিছুই নাই, কারণ সব খান হইতেই সব কিছু হইতে পারে।

কায়ব্যূহ— পৃঃ ৩১১

এইটি যোগশাস্ত্রের শব্দ। সিদ্ধ যোগী প্রয়োজন বোধ করিলে একই চিত্তকে বহুচিত্তে পরিণত করিতে পারেন এবং এক কায়াকে বহু কায়া রূপে পরিণত করিতে পারেন। এই প্রকার চিত্তকে নির্মাণচিত্ত বলে এবং কায়াকে নির্মাণকায়া বলে। যোগীর সামর্থ্য অনুসারে তাহার নির্মাণচিত্ত একও হইতে পারে, কিম্বা বহুও হইতে পারে। উভয়ই প্রয়োজনের অনুরোধে। এই সকল বিভিন্ন কায় বিভিন্ন কার্যের জন্য নির্মিত হইয়া থাকে। অনেক সময় এমনও ঘটিয়া থাকে একই যোগী একই সময়ে এক দেহে যোগের কার্য করিতেছেন এবং অপর দেহে রাজ দণ্ড ধারণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন এবং অপর দেহে বিভিন্ন প্রকার লৌকিক সুখে

মত্ত রহিয়াছেন। যে দেহের যতটা ভোগকাল ঐ দেহের দ্বারা ঐ কাল পর্যন্ত তাহার অনুরূপ কার্য হইয়া থাকে। প্রয়োজন শেষ হইলে সেই দেহের নিবৃত্তি হয় এবং নির্মাণচিত্ত, যাহা উহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া উহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল, উহা যোগীর মূলচিত্তে ফিরিয়া যায়। এই মূল চিত্তটিকে প্রযোজকচিত্ত বলে। নির্মাণচিত্তের যথার্থ প্রয়োজন শিষ্যকে জ্ঞান উপদেশ দান। প্রাকৃতচিত্ত সংস্কার যুক্ত, তাই জ্ঞান ও উপদেশ দানের অধিকারী নহে। সিদ্ধ যোগিগণ নির্মাণচিত্ত দ্বারাই উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু শিষ্য তাহা বুঝিতে পারে না। মহর্ষি কপিল আসুরিকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই নির্মাণচিত্ত দ্বারাই দিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে অনেক সময় শিষ্যের অনেক ভোগ ভোগের দ্বারা নষ্ট করিবার জন্য মন্ত্রবিদ্ সিদ্ধগুরু শিষ্যের জন্য কায়ব্যূহ রচনা করেন।

চরম পরম — পৃঃ ২৩

আমরা যে কোন দৃষ্টি নিয়া জগৎকে দর্শন করি তাহা চরম দৃষ্টি নহে। দ্বৈত দৃষ্টি চরম নহে, অদ্বৈত দৃষ্টিও চরম নহে। দ্বৈত দৃষ্টিতে দ্বৈত সত্য, অদ্বৈত কল্পিত। কিন্তু অদ্বৈত দৃষ্টিতে অদ্বৈতই সত্য, দ্বৈত কল্পিত মাত্র। দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুইটি ভাব। এই দুইটি ভাবের অঞ্জন চক্ষুতে মাখিয়া জগৎকে দেখিতে গেলে হয় দ্বৈতরূপে জগৎকে দেখা যাইবে, নতুবা অদ্বৈত রূপে দেখা যাইবে। ইহার দ্বারা জগতের দ্বৈততা কিম্বা অদ্বৈততা প্রমাণিত হয় না। নীল চশমা দিয়া দৃশ্যকে দেখিতে গেলে দৃশ্য নীল বলিয়া প্রমাণিত হয়, লাল চশমা দিয়া উহা লালই দেখায়। এই যে নীল ও লালরূপে দর্শন ইহা নীল ও লাল চশমার সম্বন্ধের ফল। যখন দ্বৈত কিম্বা অদ্বৈত কোন ভাবের ধারা ভাবিত না হইয়া জগৎকে দেখা যায় তখন জগতের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারা যায়। তখন বুঝা যায় যে জগৎ জগৎই — উহা দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়। এই প্রকার শুদ্ধ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিই চরম পরম। এই দৃষ্টির সম্মুখে কোন প্রকার বিকল্পের উদয় হয় না।

বাস্তবিক পক্ষে দ্বৈতও যেমন বিকল্প, অদ্বৈতও তেমনি বিকল্প। প্রকৃত সত্য যাহা তাহা বিকল্পহীন। তাহাকে দ্বৈত বলাও যেমন পক্ষপাত, অদ্বৈত বলাও তেমনি—উহা যাহা তাহাই। প্রাচীন আচার্য্যগণ বলেন—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্।।

এই দৃষ্টিই চরম পরম এবং সত্যের এই স্বরূপই 'যা তা'।

তৎ স্ব— পৃঃ ১৫

মা এই প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে প্রকারান্তরে গুপ্তভাবে নিজের পরিচয়ের আভাস দিয়াছেন। এই পরিচয়ের ভাষা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মা এমন একটি স্থিতির কথা বলিয়াছেন যেখানে থাকিলে ভেদ ও অভেদের কোন বন্ধন থাকে না। 'তৎ' রূপে সেই সত্তা সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে গ্রাস করিয়াছে। সগুণ সাকার, নির্গুণ নিরাকার, সাবয়ব নিরবয়ব, চেতন অচেতন, দেশ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও দেশ কালের অতীত ঐ 'তৎ' এর অন্তর্গত। উহাতে অণু আছে, মহানও আছে, ঊর্ধ্ব আছে, অধঃ আছে— সবই এক সঙ্গে একাকারে রহিয়াছে। চেতন, অচেতন, অণু, মহৎ কোন বিভেদ তাহাতে নাই। উহাই 'তৎ'। এই যে তৎ অর্থাৎ অখণ্ড সত্তা— যাহার মধ্যে সৎ অসৎ সবই আছে। ইহাকে মা বলিতেছেন 'স্ব' তাহার স্বরূপ। বলা বাহুল্য যে ইহা অখণ্ড দৃষ্টির ব্যাপার। ইহার বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না। সব লইয়া ইহা একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ত্রিকায়— পৃঃ ১৭৪

ইহা মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরিভাষা। ত্রিকায় শব্দে এখানে বুদ্ধের তিনটি কায়া বুঝিতে হইবে। যে আধারে বুদ্ধত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে এই তিনটি কায়া নিয়মিত ভাবে কার্য করিয়া থাকে। উহাদের নাম নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্মকায়। বুদ্ধের যেটি মনুষ্যরূপ যাহা মায়িক

জগতে সকলে দর্শন করিত তাহা এই দৃষ্টি অনুসারে নির্মাণকায়ের অন্তর্গত। সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধের নিকট যখন উপদেশ গ্রহণ করিতে তখন বুদ্ধ যে কায়াকে অধিষ্ঠান করিয়া উপদেশ দিতেন উহাই নির্মাণকায়। কিন্তু বোধিসত্ত্বগণকে যখন বুদ্ধ উপদেশ দান করিতেন তখন বুদ্ধ যে দেহকে আশ্রয় করিয়া উপদেশ দান করিতেন তাহাই সম্ভোগকায়। বুদ্ধের সম্ভোগকায় সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু বোধিসত্ত্বগণ নিরন্তর সম্ভোগকায়ের দর্শন করিয়া থাকেন। সম্ভোগকায় দুই প্রকার ঃ— একটি স্বসম্ভোগকায় অপরটি পরসম্ভোগকায়। স্বসম্ভোগকায়ে বুদ্ধ নিজের আনন্দ নিজে আস্বাদন করেন। কিন্তু আস্বাদনের আনন্দ অন্যকে দেয় পর-সম্ভোগকায়। কিন্তু বুদ্ধের ধর্মকায় এই উভয় হইতে পৃথক্। ধর্মকায়টি পূর্ণতত্ত্বের স্বরূপভূত। ইহাই বুদ্ধের পারমার্থিক স্বরূপ। এই ত্রিকায়বাদ ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া হিমবৎ প্রদেশে অথবা তিব্বতে কায়চতুষ্টয় রূপে পরিণত হইয়াছে। এই চতুর্থ কায়টি বুদ্ধের স্বভাবকায়।

নিজকে পাওয়া— পৃঃ ৪১

মানুষ অভাব গ্রস্ত। এই অভাব দূর করিবার জন্য কিছু পাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু পাইলেও সাময়িকভাবে অভাব নিবৃত্তি হয় বটে, তবে আবার অভাব জাগিয়া উঠে। তাই ঐ অভাব নিবৃত্তির জন্য অন্য জিনিষ পাইতে চেষ্টা করে। এই প্রকার চাওয়া ও পাওয়ার ব্যাপারে তাহার দীর্ঘজীবন কাটিয়া যায়। কিন্তু চাওয়ার শেষ হয় না এবং পাওয়াও ঘটে না। কারণ যাহাই কিছু সে পাকনা কেন কিছু অপ্রাপ্ত থাকেই। যাহাই পাওয়া যাক না কেন তৃপ্তি কিছুতেই ঘটে না। এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় চাওয়ার শেষ নাই, তাই পাওয়ারও শেষ হয় না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে এমন জিনিষটি চাওয়া হইতেছে না যাহা পাইলে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেই জিনিষটি আত্মা স্বয়ং। যে চাহিতেছে এবং যাহা চাহিতেছে তাহার আত্মাই সেই বস্তু। তাহা এক হইয়াও অনন্ত; কেন

না তাহার মধ্যেই সব আছে। তাহাকে পাইতে পারিলে সব কিছু পাওয়া হইয়া যায়, কোন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিন্তু তাহাকে পাইতে হইলে অন্তর্মুখ হইতে হয়। অন্তর্মুখে যাহা আমি অর্থাৎ নিজে স্বয়ং, বহির্মুখে তাহাই অনন্ত বিশ্বরূপে ভাসিতেছে। খণ্ড খণ্ড ভাবে বাহ্য বস্তু চাহিলে চাহিবার প্রয়োজন কখনও নিবৃত্ত হইবে না। অন্তর্মুখ হইয়া যখন নিজেকে পাওয়া যাইবে তখন বহির্মুখ ভাব থাকে না; তাই পৃথক্ পৃথক্ চাওয়াও থাকে না। একটি পাওয়াতে সব চাওয়ার অবসান হইয়া যায়।

নিত্যোদিত—পৃঃ ৩৪৫

সূর্য একবার উদিত হন এবং আবার অস্ত যান, পুনরায় উদিত হন, পুনরায় অস্ত যান। এইভাবে তাহার নিরন্তর উদয়াস্তের আবর্তন চলিতে থাকে। সূর্য যখন উদিত হন তখন তাহার রূপটি উদিতরূপ নামে পরিচিত হয়, এবং সূর্য যখন অস্ত যান তখন তাহার রূপটিকে শান্তরূপ বলে। সাধারণতঃ সূর্যের উদয় ও অস্ত দুইটি ব্যাপার আছে বলিয়া তাহার যে রূপ আমরা দেখিতে পাই ইহা শান্তোদিত রূপ অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে অনুদিত বা শান্ত অবস্থায় ছিলেন, ইহাই তাৎপর্য। যদি সূর্যের অস্ত মোটেই না থাকে তাহা হইলে তাহার শান্তোদিত রূপ থাকে না, তাহার সব রূপই নিত্যোদিত। নিত্যোদিত রূপের অস্ত হয় না, উহা সর্বদা জাগ্রৎ থাকে। পরম সত্যের অর্থাৎ আত্মার রূপ নিত্য স্বপ্রকাশ, তাই তাহার রূপ নিত্যোদিত—শান্তোদিত নহে। ইহা সর্বদাই স্বপ্রকাশ এবং এই প্রকাশের আবরণ কখনই ঘটে না।

বোধদেব—পৃঃ ২৯৩

যে বোধ লইয়া মনুষ্য এই জগতের খণ্ড খণ্ড পদার্থের অথবা ভাবের অনুভব করে তাহা পরিচ্ছিন্ন বোধ। কিন্তু গুরুকৃপার প্রভাবে এই বোধই এমন বিশাল আকার ধারণ করে যে উহাতে পূর্বকালীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধগুলি

প্লাবিত হইয়া যায়। তখন ঐ ক্ষুদ্র বোধগুলি ব্যাপক বিশ্ববোধে পরিণত হয় অর্থাৎ একটি isolated unit রূপ নহে, কিন্তু as a wave of the universal surge অর্থাৎ খণ্ডবোধ বিশ্বব্যাপক মহাবোধের অন্তরঙ্গ সত্তারূপে প্রকাশ পায়। ইহাই বোধদেব।

মহাশূন্য— পৃঃ ২৯২

যেখানে কোন প্রকার সৃষ্টি নাই তাহার যেটি চরম পরিস্থিতি তাহারই নাম মহাশূন্য। উপাধিভেদে শূন্যকে নানা প্রকারে বিভক্ত করা হয়। মহাশূন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টি সমস্তের অতীত। অথচ চৈতন্য রাজ্যের অন্তর্গত নহে, কেন না মহাশূন্য ভেদ করিতে না পারিলে চৈতন্য রাজ্যে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। সন্তগণ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের পরে মহাশূন্যের স্থিতি বলিয়াছেন। আগমবাদিগণ ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃত্যণ্ড, মায়াণ্ড, এবং শাক্তাণ্ডের পরে মহাশূন্যের স্থিতি বলিয়াছেন। সর্বত্রই মহাশূন্যের ভেদ একান্ত আবশ্যক। শূন্যের বিভিন্ন প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মহাশূন্যই প্রধান।

মহাজ্ঞান— পৃঃ ১২৭

যে জ্ঞানে সব সময় অনাবৃতভাব রহিয়াছে এবং যাহার পরিচ্ছিন্নতা কোন দিক্ হইতেই ঘটে না, দেশ ও কাল কিছুই যাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না তাহাই মহাজ্ঞান।

মহাপ্রকাশ— পৃঃ ২২১

ইহাই সর্বব্যাপী প্রকাশ। এই প্রকাশ সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশিত করে। ইহা শূন্যকেও প্রকাশ করে এবং শূন্যের ঊর্ধ্বে সমস্ত ভাবসত্তাকে প্রকাশ করে। এই প্রকাশের দ্বারা প্রকাশমান না হইলে কোন বস্তুরই সত্তা উপপন্ন হয় না। এই প্রকাশের উপরেই সমগ্র বিশ্ব ভাবরূপে এবং অভাবরূপে নিরন্তর ভাসিতেছে। ইহাই ব্রহ্মস্বরূপ।

বিরজাসলিল— পৃঃ ১৭৪

শ্রীভগবানের অনন্ত বিভূতি চতুষ্পাদ বিভূতি নামে প্রসিদ্ধ। এই চতুষ্পাদ দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার এক ভাগে প্রাকৃত জগতের স্থান, এবং অপর ভাগে অপ্রাকৃত জগৎ অবস্থিত। প্রাকৃত জগৎকে ভগবানের একপা বিভূতি বলা হইয়া থাকে ও অপ্রাকৃত দিব্য জগৎকে ত্রিপাদ বিভূতি নামে বর্ণনা করা হয়। এই ত্রিপাদবিভূতিরূপ নিত্যধাম চিদানন্দময়। ত্রিপাদ বিভূতি ও একপাদ বিভূতির মধ্যে একটি ব্যবধান আছে। ইহাকেই সাধারণতঃ কারণ সলিল বা বিরজানদীরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ইহাই পরবর্তীযুগে যমুনা, কালনদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে। নিত্যধাম কালের অতীত ইহা বলাই বাহুল্য। জ্ঞানী ভক্তের আত্মা মৃত্যুর পর ভগবৎ কৃপায় প্রাকৃত জগৎ হইতে অপ্রাকৃত জগতে গমন করে। এই যে গমনের মার্গ ইহা প্রাচীন সিদ্ধ ভক্তগণের সুপরিচিত। ভক্তের আত্মা মৃত্যুকালে দশমদ্বার বা ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা বহির্গত হয়। বহির্গত হইয়া কোন নাড়ী অবলম্বন না করিয়া চলন সম্ভবপর নহে বলিয়া ঊর্ধ্বমুখী সুযুম্না নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া উৎক্রমণ করে। এই সুযুম্নাই সূর্যরশ্মিরূপে আত্মাকে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য ইহা দেবযান গতিরই অন্তর্গত। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম সত্তা সূর্যমণ্ডলে গমন করে। তারপর সূক্ষ্মসত্তা সূর্যমণ্ডলে বিসর্জন দিয়া কারণ সত্তা লইয়া বিরজাগর্ভে প্রবেশ করে। কারণসত্তা ঐ বিরজা সলিলে লীন হইয়া যায়। তখন আত্মা কারণ সলিল হইতে উত্থিত হইয়া দিব্য অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্ত হয়। এই অপ্রাকৃত চিদানন্দময় শরীর কারণ সলিল হইতে উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আনন্দময় নিত্যশরীর লইয়া আনন্দময় নিত্যধামে ভগবানের সাহচর্য লাভ হয়।

যা' তা'— পৃঃ ১

আমরা জাগতিক দৃষ্টি নিয়া দেখিতে পাই জগতে সর্বত্রই নিরন্তর একটি পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু ইহা কালের দৃষ্টিতে। এই পরিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টির দ্বারা বিভিন্ন ব্যাপার লক্ষিত হয়। কোন দৃষ্টিতে ইহা পরিণাম (স্বরূপের), কোন দৃষ্টিতে ইহা পরিণাম (গুণের), কোন দৃষ্টিতে ইহা পরিণাম নহে—আরম্ভ মাত্র,— ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের সম্মূর্ছন বশতঃ আরম্ভ মাত্র। কোন কোন দৃষ্টিতে ইহা একটি স্থির সত্তাকে অবলম্বন করিয়া উহারই বিবর্তরূপে প্রকাশ মাত্র। এই প্রকার বিভিন্ন দৃষ্টি অনুসারে উহা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই সব আবর্তন বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃত সত্যের স্বরূপটি, যাহা অনাদিকাল হইতে আছে, সব সময়ই থাকে। তাহার পরিবর্তন হয় না, কারণ সকল প্রকার পরিবর্তনের অন্তরে ও বাহিরে যাহা আছে তাহাই থাকে। ইহা কালের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারা, ভাবের দ্বারা অস্পৃষ্ট পরম সত্তা।

শব্দসূচী

বাণী

ব্যাখ্যা